মূলধারার রাজনীতি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬

হারুন-অর-রশিদ

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের একটি অনন্য ও অসাধারণ ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল। জাতির পিতার নেতৃত্বে এ দল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেই থেমে থাকেনি, রাষ্ট্রের সার্বিক গঠন ও উন্নয়নে শুরু থেকে একচ্ছত্র নেতৃত্ব দিয়ে দলটি দেশকে বর্তমান পর্যায়েও তুলে এনেছে। স্বাধীনতাসহ জাতির এ পর্যন্ত যা কিছু শ্রেষ্ঠ অর্জন এর সিংহভাগ কৃতিত্ব এ দলের। বিভিন্ন সময়ে অনেকে দল ছেড়েছেন কিন্তু আওয়ামী লীগ কখনও ভাঙেনি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, দলত্যাগে দুর্বল না হয়ে বরং তাতে দল আরও শক্তিশালী হয়েছে। কী করে সেটি সম্ভব? জাতির স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্বদান করার পরও দীর্ঘ সময় ধরে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজনীতির অগ্রভাগে থেকে কোনো দলের এরূপ নেতৃত্বদানের উদাহরণ খুব বেশি নেই। আওয়ামী লীগের পক্ষে এ-রকম অবিচল ভূমিকা পালন কীভাবে সম্ভব হচ্ছে? দলের এ অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস কী? কীভাবেই বা এ দল বাঙালির সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির মূলধারা তথা সমন্বয়, সমতা, সম্প্রীতির আদর্শ বিগত প্রায় ৭ দশক ধরে বহতা নদীর মতো ধারণ করে চলেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর বর্তমান গ্রন্থে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রতিষ্ঠা থেকে এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের মোট ২০টি নিয়মিত কাউন্সিল, ২টি বিশেষ কাউন্সিল এবং ২০টি পরিশিষ্ট নিয়ে পরিকল্পিত। প্রধানত প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী এ গবেষণা কর্মে দলের নেতৃত্ব নির্বাচন, নীতি-নির্ধারণ, ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র, কর্মসূচি প্রভৃতিতে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজনের ধারায় কীভাবে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল থেকে কাউন্সিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মহিমা নিয়ে গড়ে ওঠেছে, গ্রন্থটিতে তাও দেখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। সম্ভবত এ ধরনের গবেষণাকর্ম বাংলাদেশে এই প্রথম।

হারুন-অর-রশিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর। তিনি বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ১৯৪৭-পূর্ব ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন অবিভক্ত বাংলা, পাকিস্তানি শাসনকাল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সমসাময়িক ভারত ও বাংলাদেশের রাজনীতি, এর গতিধারা ও রাজনৈতিক উন্নয়ন তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র। বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র গঠন সবসময় তাঁর গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডব্লিউ এইচ মরিস-জোনস-এর তত্ত্বাবধানে ১৯৮৩ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন। এ ছাড়াও তিনি সুইডেনের উপসালা ও জাপানের রিউকোকু (কিওটো) বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা করেন।

প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ একজন প্রথিতযশা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও গবেষক। তাঁর গবেষণা-গ্রন্থের মধ্যে *The Foreshadowing of Bangladesh 1906-1947* (fourth edition, UPL 2015), *Inside Bengal Politics 1936-1947: Unpublished Correspondence of Partition Leaders* (second edition, UPL 2012), *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পুনর্পাঠ* (ইউপিএল ২০১৩), *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়* (আগামী প্রকাশনী ২০০৩), *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০* (নিউ এজ পাবলিকেশন্স), *'আমাদের বাঁচার দাবী' : ৬ দফা'র ৫০ বছর* (বাংলা একাডেমি ২০১৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ বর্তমানে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এনসাইক্লোপিডিয়া' (২০ খণ্ড) রচনা প্রকল্পের প্রধান হিসেবে গবেষণাকর্মে নিয়োজিত।

মূলধারার রাজনীতি
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মূলধারার রাজনীতি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬

হারুন-অর-রশিদ

বাংলা একাডেমি

www.pathagar.com

মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬
হারুন-অর-রশিদ

প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২৩/ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাএ ৫৬১৯

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪২৩/ডিসেম্বর ২০১৬। পাণ্ডুলিপি : গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ, বাংলা একাডেমি। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। প্রকাশক : ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : ড. আমিনুর রহমান সুলতান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান : ইমরুল ইউসুফ, পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। মূল্য : ৪০০.০০ টাকা।

MULDHARAR RAJNITI BANGLADESH AWAMI LEAGUE : COUNCIL 1949-2016 [Mainstream Politics Bangladesh Awami League : Council 1949-2016] by Harun-or-Rashid. Published by Dr. Jalal Ahmed, Director (in-charge), Sales, Marketing and Reprint Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Reprint : Reprint Sub-Division, February 2017. Price : Taka 400.00 Only.

ISBN 984-07-5628-1

www.pathagar.com

উৎসর্গ

'শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে
এগিয়ে চলেছি দুর্বার
এখন সময় বাংলাদেশের
মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার'
যাঁদের রক্তে বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

প্রাক্‌কথা

ভূমিকা

অধ্যায় : এক
রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন ১৯৪৯ : আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা ১

অধ্যায় : দুই
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৩ : দলের পূর্ণাঙ্গ রূপদান ১০

অধ্যায় : তিন
ময়মনসিংহে বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৩ : যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রসঙ্গ ১৯

অধ্যায় : চার
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৫ : দলের নামের অসাম্প্রদায়িকীকরণ ২৮

অধ্যায় : পাঁচ
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৭ : দল থেকে ভাসানীর বিদায় ৫১

অধ্যায় : ছয়
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৪ : দলের পুনরুজ্জীবন ৭০

অধ্যায় : সাত
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৬ : 'আমাদের বাঁচার দাবী' ৬-দফা ৮৮

অধ্যায় : আট
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৮ : বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ১০৩

অধ্যায় : নয়
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭০ : জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি ১১৯

অধ্যায় : দশ
স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম কাউন্সিল ১৯৭২ : দেশ গড়ার সংগ্রাম ১৩৮

অধ্যায় : এগারো
সংকট-সন্ধিক্ষণে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৪ : স্বাধীনতা-বিরোধী ও 'ভুয়া বিপ্লবীদের' ষড়যন্ত্র নস্যাৎ এবং 'সোনার বাংলা' গড়ার অঙ্গীকার ১৫৫

অধ্যায় : বারো
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৭ : দল পুনর্গঠনের উদ্যোগ ১৭৪

অধ্যায় : তেরো
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৮ : দলীয় ঐক্য রক্ষার সংকট ১৮৮

www.pathagar.com

অধ্যায় : চৌদ্দ
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৮১ : ঐক্যের প্রতীক শেখ হাসিনা ২০১

অধ্যায় : পনেরো
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৮৭ : গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম ২১৯

অধ্যায় : ষোলো
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯২ : নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা ২৪২

অধ্যায় : সতেরো
বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯৫ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচন নয় ২৬৫

অধ্যায় : আঠারো
কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯৭ : ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ২৭২

অধ্যায় : উনিশ
কাউন্সিল অধিবেশন ২০০২ : বিএনপি-জামায়াত চক্রের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দলের ঐক্যের আহ্বান ২৮৭

অধ্যায় : বিশ
কাউন্সিল অধিবেশন ২০০৯ : দিনবদলের সনদ 'ভিশন ২০২১' ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ৩০৭

অধ্যায় : একুশ
কাউন্সিল অধিবেশন ২০১২ : সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার ৩৩২

অধ্যায় : বাইশ
কাউন্সিল অধিবেশন ২০১৬ : 'এখন সময় বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার' ৩৪৯

অধ্যায় : তেইশ
উপসংহার ৩৭৯

পরিশিষ্ট

এক. রোজগার্ডেনে আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে যোগদানের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের আহ্বান, ১৯৪৯ ৩৮৯

দুই. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর সাংগঠনিক রিপোর্ট, ১৯৫৩ ৩৯১

তিন. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, ১৯৫৫ ৪০০

চার. আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর জেনারেল সেক্রেটারির রিপোর্ট, ১৯৫৭ ৪২০

www.pathagar.com

পাঁচ.	আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, ১৯৬৪	৪২৫
ছয়.	আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবাবলি, ১৯৬৪	৪৩২
সাত.	'ক্ষমতা দখল নয়– দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবে' : আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, ১৯৭০	৪৩৬
আট.	'দাবী আদায়ের জন্য যারা প্রাণ দিল তাদের রক্তের ডাক যেন আপনারা ভুলিয়া না যান' : কাউন্সিলরদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বান, ১৯৭০	৪৩৯
নয়.	'দেশগড়ার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন' : আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান, ১৯৭২	৪৪৪
দশ.	আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব, ১৯৭২	৪৪৭
এগারো.	আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো, ১৯৭২	৪৫০
বারো.	'এক যুদ্ধের শেষ আর এক যুদ্ধের শুরু' : বিজয় দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ১৯৭৩	৪৫২
তেরো.	'দেশের সার্বিক কল্যাণ ও দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য আরও ত্যাগ চাই, শ্রম চাই– চাই আত্ম-সমালোচনা, আত্ম-সংযম ও আত্ম-শুদ্ধি' : আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু, ১৯৭৪	৪৫৮
চৌদ্দ.	১৯৭৪ সালের ১৮-২০শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর বাণী	৪৬১
পনেরো.	'উল্লসিত হওয়ার কারণ দেখি না' : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা, ১৯৮১	৪৬২
ষোলো.	আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৪৯-২০১৬ : তারিখ ও স্থান	৪৬৪
সতেরো.	আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ১৯৪৯-২০১৬	৪৬৬
আঠারো.	আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬ : উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি ও উদ্বোধক	৪৬৭
উনিশ.	আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী/ওয়ার্কিং কমিটি (প্রেসিডিয়ামসহ), ১৯৪৯-২০১৬	৪৬৯
বিশ.	আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য, ১৯৪৯-২০১৬	৪৭০
তথ্য-উৎস ও গ্রন্থপঞ্জি		৪৭১
নির্ঘণ্ট		৪৭৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় আমার রচিত *মূলধারার রাজনীতি : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থের সকল কপি বিক্রি হয়ে যায়। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত আমার *'আমাদের বাঁচার দাবী' : ৬ দফার পঞ্চাশ বছর* গ্রন্থের সকল কপিও স্বল্প সময়ের মধ্যে বিক্রি হয়েছিল। এরপর এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুইটি বই পাঠকপ্রিয় হওয়ার পেছনে লেখকের ব্যক্তিগত কোনো কৃতিত্ব নেই। তবে গ্রন্থ দুইটি আমার মৌলিক গবেষণা ও কঠোর পরিশ্রমের ফসল। *মূলধারার রাজনীতি : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬* গ্রন্থটিতে প্রতিষ্ঠা থেকে এ-পর্যন্ত দলটির ৬৭ বছরের কাউন্সিল নিয়েই কেবল আলোচনা করা হয়নি, এতে প্রত্যেক কাউন্সিলের পটভূমি অংশে সমসাময়িক রাজনীতির প্রধান ঘটনাবলিও গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষিত হয়েছে। সে অর্থে, আমাদের ৬৭ বছরের জাতীয় রাজনীতির হালচিত্র এতে ফুটে উঠেছে। ৫১৯ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ২৩টি অধ্যায়, ২০টি পরিশিষ্ট এবং পাঠকদের সুবিধার্থে বিস্তৃত নির্ঘণ্ট রয়েছে। এই বই মুখ্যত প্রাথমিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে রচিত। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যেসব দুর্লভ রাজনৈতিক রিপোর্ট করেছেন সেগুলোও এই গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বহু অজানা তথ্য প্রথমবারের মতো গ্রন্থটিতে উঠে এসেছে, যেমন– মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত (আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৭০), মহিলাদের জন্য আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের শতকরা ১০ ভাগ পদ প্রত্যেক ইউনিট কর্তৃক সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা (কাউন্সিল ১৯৭৪) ইত্যাদি। গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশও খুব গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ, একটি পরিশিষ্টে আওয়ামী লীগের এ-পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২৬টি কাউন্সিল (২০টি নিয়মিত ও ৬টি বিশেষ)-এর প্রত্যেকটির স্থান ও তারিখ দেয়া হয়েছে (পরিশিষ্ট সতের)।

গ্রন্থটির পাঠক-প্রিয়তায় আমি খুবই আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত। এজন্য আমি সকল পাঠকের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। খুব কম সময়ের মধ্যে প্রথম পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করায় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, পরিচালক ড. জালাল আহমেদ এবং প্রেসের ব্যবস্থাপক ও মুদ্রক ড. আমিনুর রহমান সুলতান-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হারুন-অর-রশিদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রাক্‌কথা

আওয়ামী লীগ দেশের শুধু অন্যতম প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলই নয়, রাজনীতির মূল ধারাও। প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯) থেকে শুরু করে বিগত ৬৭ বছর ধরে সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির সমন্বয়, সমতা ও সম্প্রীতির আদর্শকে আওয়ামী লীগ সর্বদা ধারণ করে আসছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাসহ জাতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ অর্জন, তার মূলে রয়েছে জনগণের এ প্রতিষ্ঠান ও এর নেতৃত্ব। আওয়ামী লীগের ইতিহাস বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল অর্জন ও সংগ্রামের ইতিহাস। জাতির সেই ইতিহাসকে জানতে হলে আওয়ামী লীগকে জানতে হয়। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের জাতীয় জীবনে আওয়ামী লীগের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বা অবস্থান সত্ত্বেও এ দল সম্বন্ধে তথ্য-উপাত্তভিত্তিক মৌলিক গবেষণা কর্ম নেই বললেই চলে। বর্তমান গ্রন্থটি রচনার তাগিদ সেখান থেকেই। আশা করি এ গ্রন্থটি অনেকাংশে সে শূন্যতা পূরণে সক্ষম হবে।

ইতিহাস যেমন একদিনে রচিত হয় না, তেমনই একটি রাজনৈতিক দলও দীর্ঘ সময় পরিসরে গড়ে ওঠে, বিকশিত ও বিস্তৃত হয়। আবার প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই থাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মসূচি– দলের কাউন্সিলে যা নির্ধারিত হয়। কাউন্সিল হচ্ছে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সংস্থা। একটি দল, তার নীতি-আদর্শ, নেতৃত্ব, রাজনৈতিক লক্ষ্য, কর্মসূচি, ভূমিকা ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রে কাউন্সিলের তুলনা নেই। এ কারণেই প্রতিষ্ঠা থেকে এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের অনুষ্ঠিত নিয়মিত সকল কাউন্সিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কাউন্সিলসমূহকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে আলোচ্য গ্রন্থটি পরিকল্পিত।

২০১৬ সালের ৫ই জুন ছিল ঐতিহাসিক ৬-দফার পঞ্চাশ বছর। এ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি থেকে 'আমাদের বাঁচার দাবী : ৬-দফা'র ৫০ বছর' শিরোনামে আমার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ২০১৬ সালের ২২ ও ২৩শে অক্টোবর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০তম নিয়মিত কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলকে উপলক্ষ্য করে এবারে প্রকাশিত হয় আমার এ গ্রন্থ। ঘটনাক্রমে এর প্রকাশকও বাংলা একাডেমি।

গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে আমি অনেকের কাছে ঋণী। সর্বাগ্রে যাঁর নাম উচ্চারণ করতে হয় তিনি হলেন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে আমার বর্তমান গ্রন্থটি রচনার কথা অবহিত করলে, তিনি লেখার অগ্রগতি এবং প্রয়োজনীয় সব তথ্য পেয়েছি কি-না জানতে চান। তাঁর ঐ উৎসাহে আমি খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করি। এজন্য তাঁর কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপ-পরিষদের উদ্যোগে এর চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম-এর সভাপতিত্বে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ২০১৬ সালের ১৩ই অক্টোবর 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংগ্রাম' শীর্ষক দলের সর্বশেষ প্রাক্-কাউন্সিল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে আমার আলোচ্য গ্রন্থটির প্রসঙ্গ এলে উপস্থিত সকলে গভীর আগ্রহ নিয়ে দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করার তাগিদ দিয়ে নতুন করে আমাকে অনুপ্রাণিত করেন।

www.pathagar.com

যে-কোনো গ্রন্থ রচনা কষ্টসাধ্য। প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে মৌলিক গ্রন্থ রচনা আরও শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর। লেখক-পাঠকমাত্রে জানেন যে, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলেই বই হয় না। এজন্য আরও অনেক কিছু করণীয় থাকে এবং অনেকের সহযোগিতা আবশ্যক হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে নানাভাবে আমাকে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর মো. নোমান উর রশীদ, আমার প্রিয় ছাত্র ও বাংলা একাডেমির পরিচালক ড. জালাল আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক ও ড. কল্পনা ভৌমিক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মো. নাসিরউদ্দীন, ড. মো. মনিরুজ্জামান শাহীন এবং আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিআরআই-র সাজ্জাদ সাকিব বাদশার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কম্পোজ করার ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বজলুর রশিদ ও আশুতোষ দেওয়ান অনেক পরিশ্রম করেছেন।

প্রধানত বিভিন্ন উৎস, যেমন দলের কাউন্সিল অধিবেশনসমূহের উদ্বোধনী ভাষণ, সভাপতি/সভানেত্রীর ভাষণ, সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নির্বাচনি ইশতেহার, পুরানো দিনের পত্রিকা ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য ব্যবহার করে গ্রন্থটি রচিত। এছাড়া কতিপয় গ্রন্থ ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যেরও সহায়তা নেওয়া হয়েছে। সেসবের মধ্যে নূহ-উল-আলম লেনিন (রচিত ও সম্পাদিত), *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, ঢাকা ২০১৫ এবং ড. আবুল কাশেম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ : ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা ২০০১, গ্রন্থ দুটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তথ্য সংগ্রহে সহায়তার জন্য বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, জাতীয় মহাফেজখানা (আর্কাইভস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দুর্লভ সেকশন, আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিআরআই ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বই আকারে প্রকাশের ব্যাপারে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের সঙ্গে আলাপকালে তিনি 'আপনার ৬-দফা'র ৫০ বছর আমরা প্রকাশ করেছি, এটিও আমরা করবো' এ কথা বলে তাৎক্ষণিক সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাঁর সহৃদয়তা ও আনুকূল্য আমি বরাবর পেয়ে আসছি। এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলা একাডেমির পরিচালক মোবারক হোসেন সব সময়ই অত্যন্ত যত্ন ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর জন্য থাকল আমার অনেক প্রশংসা। বরেণ্য শিল্পী হাশেম খানের হাতে আমার অধিকাংশ বইয়ের প্রচ্ছদ। আলোচ্য গ্রন্থটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিশেষে, আমার স্ত্রী নার্গিস আক্তার হেলেন, পুত্র ইশতিয়াক রশিদ, কন্যা বর্ণালী রশিদ, পুত্রবধূ রাইসা তারিন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মামুন উর রশিদ আমার সকল সৃষ্টিশীল কর্মের নিত্যসঙ্গী ও নিরন্তর প্রেরণার উৎস। আমার সাফল্যই তাদের আনন্দ।

প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রন্থটি আওয়ামী লীগের ২০তম কাউন্সিলের পূর্বেই প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু সর্বশেষ কাউন্সিল নিয়ে আলোচনা এটিতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভেবে আরও কিছু সময় পরে গ্রন্থটি এখন পূর্ণাঙ্গরূপে বিজয়ের এ মাসে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬

হারুন-অর-রশিদ

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশের অন্যতম পুরাতন, সবচেয়ে বৃহৎ, সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আওয়ামী লীগ সমন্বয়, সমতা ও সম্প্রীতির আদর্শভিত্তিক বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতির মূলধারার সার্থক প্রতিনিধিত্বকারী দল। ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন এই দলের প্রতিষ্ঠা। তখন থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের ন্যায্য দাবি আদায়ের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক ধাঁচের রাষ্ট্রযন্ত্র, এর দুঃশাসন, শোষণ ও জাতি-নিপীড়নের নিগড় থেকে বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামে এই দল নেতৃত্ব প্রদান করে। ৫২-র ভাষা-আন্দোলন, ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের আন্দোলন, যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, ৫৮-র মার্শাল ল' বিরোধী আন্দোলন, আইয়ুবের এক দশকের স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলন, ৬২ ও ৬৪-র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-র ঐতিহাসিক ৬-দফা'র আন্দোলন, ৬৮-র আগরতলা মামলা-বিরোধী ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৬-দফাভিত্তিক ৭০-এর নির্বাচন ও ঐতিহাসিক বিজয়, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের (১৯৭১) ভাষণ, পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ২-২৫শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসনপর্বে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালির স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বা বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ঘটে। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এরই চূড়ান্ত পরিণতি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতি ও আওয়ামী লীগের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়, জাতিসংঘসহ বিশ্ব সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ, সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান প্রণয়ন (১৯৭২), নতুন করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান (৭ই মার্চ ১৯৭৩), সর্ব পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকাঠামো নির্মাণ, ভারতে আশ্রয় নেওয়া ১ কোটি শরণার্থী ও মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে সম্ভ্রম হারানো কয়েক লক্ষ মা-বোনের পুনর্বাসন এসব কাজে আওয়ামী লীগ যখন জাতির জনকের নেতৃত্বে আত্মনিয়োগ করে বহু ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়, ঠিক এমন এক অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত দেশি-বিদেশি শত্রুর ষড়যন্ত্রে সংঘটিত হয় বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি, ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড। জাতি হারায় তার শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ কার্যত পরিণত হয় পাকিস্তানের নব্য সংস্করণে। প্রত্যাবর্তন ঘটে পাকিস্তানি আমলের চরম সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল, সেনা-আমলা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ধারার। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ (অসাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্র, শোষণমুক্তি) নির্বাসিত হয়। দেশ ও জাতির পাশাপাশি সংগঠনগতভাবে আওয়ামী লীগ এক চরম বৈরী ও বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ লাভ করে বর্তমানে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির অগ্রভাগে অবস্থান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা জাতির জনকের আদর্শকে ধারণ করে দ্রুতলয়ে দৃপ্তপদে দেশ ও জাতির উন্নয়নধারাকে একচ্ছত্র নেতৃত্বে অবিরাম এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আওয়ামী লীগের পক্ষে এ অবস্থানে পৌঁছা এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। সংগ্রামের এ অধ্যায়ের নায়ক বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা।

আওয়ামী লীগ শুধু বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়ই নেতৃত্ব দান করেনি, এ রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের সিংহভাগ কৃতিত্বও এ দলের। ২০১৬ সালের ২৩শে জুন ছিল আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার ৬৭তম বছর। প্রতিষ্ঠা থেকে এ পর্যন্ত এর ২০টি নিয়মিত কাউন্সিল এবং ৬টি বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৬ সালের ২২ ও ২৩শে অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হয় দলের ২০তম নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশন।

কাউন্সিল একটি দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সংস্থা। এখানে যেসব নীতি ও কর্মসূচি গৃহীত হয়, তদনুযায়ী দল পরিচালিত হয়ে থাকে। কাউন্সিলে দলের নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন বা পরিবর্তন আনা হয়। কাউন্সিল একটি দলের প্রাণস্বরূপ। কাউন্সিলে সারাদেশ থেকে দলের বিভিন্ন ইউনিটের নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি যোগ দেন। কাউন্সিলরগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং দলের নীতিনির্ধারণী বিভিন্ন বিষয়ে ভূমিকা পালনের সুযোগ পান। তাই কাউন্সিল অধিবেশনকে ঘিরে দলে নবপ্রাণের সঞ্চরণ ঘটে, সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। এ কারণে কাউন্সিলর ছাড়াও সারাদেশ থেকে বহু ডেলিগেট ও অসংখ্য নেতা-কর্মী এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে উন্মুখ হয়ে থাকেন। শীর্ষ নেতৃত্বের মুখ থেকে তারা শুনতে চান সম্ভাবনার কথা, প্রত্যাশা করেন রাজনীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা। কাউন্সিলকে কেন্দ্র করেই একটি দলের আবর্তন-বিবর্তন বা পরিবর্তনের ধারা সঞ্চালিত হয়।

প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে গত ৬৭ বছর যাবৎ আওয়ামী লীগের যতগুলো নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটির এবং দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কাউন্সিলসহ মোট ২২টি কাউন্সিলের পরিপ্রেক্ষিত, স্থান, সাংগঠনিক রিপোর্ট, নেতৃবৃন্দের নীতিনির্ধারণী ভাষণ, সাংগঠনিক জেলার প্রতিনিধিদের বক্তব্য, বিতর্ক, দলের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচি, গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন বা সংশোধন, বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত প্রস্তাব, নেতৃত্ব নির্বাচন, দলে ভাঙন চেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে বর্তমান গ্রন্থটি রচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে ভূমিকা ছাড়া উপসংহারসহ মোট ২৩টি

www.pathagar.com

অধ্যায় ও ২০টি পরিশিষ্ট রয়েছে। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র, নির্বাচনি ইশতেহার, সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, সভাপতির ভাষণ, পত্রপত্রিকা, আর্কাইভস থেকে সংগৃহীত তথ্য, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বই, জার্নাল ইত্যাদি সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি রচিত। বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে নিচে কিছুটা ধারণা দেয়া হলো :

অধ্যায় এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন ১৯৪৯ : আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি, রোজ গার্ডেনের রাজনৈতিক সম্মেলন, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা, প্রতিষ্ঠাকালীন খসড়া ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৩ : দলের পূর্ণাঙ্গ রূপদান

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর পরবর্তী কাউন্সিল অনুষ্ঠানে দীর্ঘ বিলম্বের (৪ বছর) কারণ, প্রাথমিক পর্যায়ে সংগঠনকে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও ভূমিকা, কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর রিপোর্ট পেশ, মওলানা ভাসানীর ভাষণ, আওয়ামী লীগের নামের অসাম্প্রদায়িকীকরণ বিষয়ে বিতর্ক, দলের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন, সোহরাওয়ার্দীর কেন্দ্রীয় আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে সংযুক্তির 'প্রশ্নে' পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের শর্তসাপেক্ষে সম্মতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় তিন ময়মনসিংহে বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৩ : যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রসঙ্গ

ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল আয়োজন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি, যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রশ্নে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বিতর্ক, বঙ্গবন্ধু ও অন্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দের অবস্থান, কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত, আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার, কাউন্সিল-পরবর্তীকালীন ঘটনাবলি ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

অধ্যায় চার কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৫ : দলের নামের অসাম্প্রদায়িকীকরণ

আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে একে অসাম্প্রদায়িকী-করণ, এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ, সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানীসহ অন্য নেতৃবৃন্দের অবস্থান, কাউন্সিলে এ বিষয়ে বিতর্ক ও ভোটাভুটির ফল, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও সংযোজন, যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন, আবদুস সালাম খানসহ আওয়ামী লীগের কিছু আইন পরিষদ সদস্যের দল থেকে বহিষ্কার, পাকিস্তানে সেনা-আমলাকেন্দ্রিক ষড়যন্ত্রের রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

অধ্যায় পাঁচ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৭ : দল থেকে ভাসানীর বিদায়

পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী বনাম মওলানা ভাসানীর বিরোধ, এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বামপন্থি উপদলের

www.pathagar.com

সৃষ্টি, ভাসানীর নেতৃত্বে নতুন দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন, মন্ত্রিসভা থেকে বঙ্গবন্ধুর পদত্যাগের (মে ১৯৫৭) অজানা কাহিনি, ভাসানী ও তাঁর বামপন্থি অনুসারীদের দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন দল গঠনের পর বঙ্গবন্ধুর শক্ত হাতে আওয়ামী লীগ সংগঠনের হাল ধরা ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ছয় কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৪ : দলের পুনরুজ্জীবন

১৯৫৭ ও ১৯৬৪ এই দুই কাউন্সিলের মধ্যবর্তী ঘটনাবলির বর্ণনা, জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুবের ক্ষমতা দখল, বঙ্গবন্ধু ও সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তার, আইয়ুবের তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা, আইয়ুব-বিরোধী মঞ্চ এনডিএফ গঠন, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু ও বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন প্রশ্নে দলের মধ্যে ভিন্নমত, 'সমাজতান্ত্রিক' অর্থনীতির পক্ষে কাউন্সিলে প্রস্তাব গ্রহণ, 'দুই অর্থনীতির' শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতির দাবি, যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের প্রস্তাব ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় সাত কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৬ : 'আমাদের বাঁচার দাবী' ৬-দফা

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণা, এ কর্মসূচি প্রণয়নের পটভূমি, কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর 'কেন এই ৬-দফা ও তা কী' সেটি ক্ষুরধার যুক্তিসহ বিশ্লেষণ, বঙ্গবন্ধুর নীতিনির্ধারণী ভাষণ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায় আট কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৮ : বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা

৬-দফা কর্মসূচি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রচার অভিযান, ৬-দফা প্রশ্নে আইয়ুব সরকারের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও একে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করা, বঙ্গবন্ধুকে বারবার গ্রেপ্তার, ৭ই জুনের (১৯৬৬) হরতাল, আগরতলা মামলা দায়ের ও 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' মামলায় বিচার শুরু, আইয়ুব-বিরোধী নতুন মঞ্চ পিডিএম প্রশ্নে আওয়ামী লীগে নতুন বিভাজন ও বহিষ্কার, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে ভাঙন, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আইয়ুব সরকারের নতুন ষড়যন্ত্র ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় নয় কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭০ : জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি

আগরতলা মামলায় 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগে বিচারের সম্মুখীন অবস্থায় উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধুর নিঃশর্ত মুক্তিলাভ, একই মামলায় বন্দি থাকা অবস্থায় সিনিয়র কতিপয় নেতার আওয়ামী লীগ ভাঙার ষড়যন্ত্র এবং কর্মীদের কারণে তা ব্যর্থ হওয়া, ৭০-এর নির্বাচন বানচালের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর কঠোর হুঁশিয়ারি, আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর 'জয় বাংলা' স্লোগান ব্যাখ্যা, আওয়ামী লীগের জাতীয়করণ নীতি, যমুনা ও বুড়িগঙ্গা সেতু নির্মাণে বঙ্গবন্ধুর দাবি, আওয়ামী লীগের কাউন্সিল শেষে রেসকোর্স ময়দানের প্রথম নির্বাচনি জনসভায় বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনাপূর্ণ ভাষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

অধ্যায় দশ স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম কাউন্সিল ১৯৭২ : দেশ গড়ার সংগ্রাম

১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রদত্ত জনগণের রায় বানচালে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ষড়যন্ত্র, বাঙালিদের হত্যায় ইয়াহিয়ার জান্তা সরকারের 'অপারেশন সার্চলাইট', বঙ্গবন্ধুর

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ঘোষণা, বঙ্গবন্ধুকে প্রধান করে প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠন, ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জ, স্বাধীনতার পরপর অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনা ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ, সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন/সংযোজন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসহ বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত প্রস্তাব ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

অধ্যায় এগারো সংকট-সন্ধিক্ষণে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৪ : স্বাধীনতা-বিরোধী ও 'ভুয়া বিপ্লবীদের' ষড়যন্ত্র নস্যাৎ এবং 'সোনার বাংলা' গড়ার অঙ্গীকার

স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধু সরকারের দেশ পুনর্গঠন-পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ, চীনপন্থি গোপন সংগঠনের সশস্ত্র তৎপরতা ও 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী' জাসদ-এর চরম হঠকারী তৎপরতা মোকাবেলা, বঙ্গবন্ধুর নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিদান, কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রশংসায় কাউন্সিলে বিদেশি অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য, সম্মেলন উপলক্ষ্যে দলের প্রত্যেক ইউনিট থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের বিধানসহ গঠনতন্ত্রে সংশোধনী, বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব, বঙ্গবন্ধুর দলের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানো ও কার্যকরী কমিটির সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায় বারো কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৭ : দল পুনর্গঠনের উদ্যোগ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড-পরবর্তীকালে চরম অস্থিতিশীল অবস্থা ও হত্যা-ক্যু'র ঘটনা, জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড, জেনারেল জিয়ার উত্থান, ৭৫-পরবর্তী অবস্থায় আওয়ামী লীগকে স্বনামে পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত ও সে মর্মে উদ্যোগ গ্রহণ, বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা হত্যা-পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিলের মর্মান্তিক দৃশ্য, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি তথা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ সমুন্নত রাখতে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ইত্যাদি বিষয় এ অধ্যায়ে গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে।

অধ্যায় তেরো কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৮ : দলীয় ঐক্য রক্ষার সংকট

এই অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সংবিধানের প্রস্তাবনাসহ চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে জেনারেল জিয়ার মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো, ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠনে অনুমতি প্রদান, আওয়ামী লীগের পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে চরম নেতৃত্বের কোন্দল ও উপদল সৃষ্টি, ভাঙনের হাত থেকে সাময়িকভাবে হলেও দলের রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি।

অধ্যায় চৌদ্দ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৮১ : ঐক্যের প্রতীক শেখ হাসিনা

দলকে সংগঠিত করার অংশ হিসেবে জেনারেল জিয়ার অধীনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ উভয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ, ১৯৭৮ সালে মিজানুর

www.pathagar.com

রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে দলের একটি অংশের আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে গিয়ে পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন, ১৯৮১ সালের কাউন্সিলকে সামনে রেখে পুনরায় দলের মধ্যে চরম নেতৃত্বের কোন্দল, উপদল সৃষ্টি এবং আওয়ামী লীগের ভেঙে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে তাঁর অনুপস্থিতিতে (তখন তিনি নির্বাসনে) সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত করে কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া ও দলকে নিশ্চিত ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা হয় তার নেপথ্য কাহিনি, সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ হাসিনার প্রতিক্রিয়া, ১২ সদস্যবিশিষ্ট প্রেসিডিয়াম গঠনসহ দলের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন ও সংশোধনী, কাউন্সিলে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ইত্যাদি সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় পনেরো কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৮৭ : গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম

১৯৮১ সালে নিজে উপস্থিত না থেকেও সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এরশাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলন, আন্দোলনে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব, আন্দোলনের দুর্বলতা, নির্বাচনকে আন্দোলনের অংশ হিসেবে গ্রহণের কৌশল, স্বৈরতন্ত্রের চির অবসান ঘটাতে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা ইত্যাদি ব্যক্ত করে প্রথমবার দলের কাউন্সিলর-ডেলিগেট ও উপস্থিত নেতা-কর্মীদের সম্মুখে শেখ হাসিনা ৭৫ মিনিটের যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন, তার প্রধান বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায় ষোলো কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯২ : নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা

এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে তিন জোটের অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণা ও এরশাদের পতন, ৯১-র ২৭শে ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যাওয়া ও বিএনপি-র বিজয়, সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন, শেখ হাসিনার সার্বিক সহযোগিতায় গণ-আদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের প্রতীকী বিচার (১৯৯২), দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ড. কামাল হোসেনের গণতান্ত্রিক ফোরাম/গণফোরাম গঠন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সম্বন্ধে ড. কামাল হোসেনের অভিযোগ, প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ জেনারেল সেক্রেটারি জিল্লুর রহমানের বক্তব্য ও ড. কামাল সম্বন্ধে তাঁর অভিমত, শেখ হাসিনার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বাকশালের আওয়ামী লীগে ফিরে আসা, আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ৬২ মিনিটের বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ দিক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ সমুন্নত রাখতে তাঁর অঙ্গীকার, পরিবর্তিত বিশ্ব বাস্তবতায় আওয়ামী লীগের 'জনকল্যাণমূলক নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা' গ্রহণ, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অভিজ্ঞতার সঙ্গে জ্ঞান-প্রযুক্তি, প্রবীণের সঙ্গে নবীনের সংযোগ সাধন এবং বিকল্প সরকারের পূর্ব-প্রস্তুতি থাকার ওপর গুরুত্বারোপ, দ্বি-বার্ষিকের স্থলে ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, সভানেত্রীর উপদেষ্টা পরিষদের বিধানসহ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও সংশোধনী ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

অধ্যায় সতেরো বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯৫ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচন নয়

আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বানের কারণ, এতে শেখ হাসিনার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের নতুন দাবি ও এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা, তাঁর দেওয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা, আন্দোলনে বিজয় সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস, আন্দোলনের পাশাপাশি পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণে নেতা-কর্মীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ, সর্বোপরি তাঁর উন্নয়ন-ভাবনা এবং পরবর্তী নির্বাচনে দলের সম্ভাব্য কর্মসূচি সম্বন্ধে তাঁর দেওয়া ধারণা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে।

অধ্যায় আঠারো কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯৭ : ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়

বেগম খালেদা জিয়ার শাসনকালে (১৯৯১-১৯৯৬) শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলন এবং তা মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করা, ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন (২৩শে জুন ১৯৯৬), বিরোধী দলে থাকা অবস্থায়ই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের পূর্ব-প্রস্তুতি, পদ্মাসেতু নির্মাণের পরিকল্পনাসহ তাঁর উন্নয়নের ভিশন, রাজনীতিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত তাঁর অগ্রিম চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

অধ্যায় উনিশ কাউন্সিল অধিবেশন ২০০২ : বিএনপি-জামায়াত চক্রের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দলের ঐক্যের আহ্বান

১৯৯৬ সালে ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অর্জন, ২০০১ সালের নির্বাচনের পর চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠন, জোট সরকারের ১৪ মাসের দুঃশাসন, আওয়ামী লীগ, সংখ্যালঘু ও মুক্তমনা ব্যক্তিবর্গের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন, সন্ত্রাস, জোট সরকারের মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের চিত্র তুলে ধরতে জাতীয় কনভেনশন আয়োজন (ফেব্রুয়ারি ২০০২), বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার কার্যে জোট সরকারের অসহযোগিতা ও তা স্থগিত করে রাখা, ধর্মীয় নামাবলি পরিহিত জঙ্গিগোষ্ঠীর সন্ত্রাসী তৎপরতা, তাদের প্রতি জোট সরকারের আনুকূল্য, কাউন্সিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা, বিএনপি-জামায়াত চক্রের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল ও শক্তির প্রতি শেখ হাসিনার ঐক্যের আহ্বান ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় বিশ কাউন্সিল অধিবেশন ২০০৯ : দিনবদলের সনদ 'ভিশন ২০২১' ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার

২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অব্যাহত দুঃশাসন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি প্রতিশোধমূলক আচরণ, হত্যা-খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, শেখ হাসিনার প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে জনসমাবেশে গ্রেনেড হামলা (২১শে আগস্ট ২০০৪), তত্ত্বাবধায়ক

www.pathagar.com

সরকারের ওপর বিএনপি-জামায়াত জোটের দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা, উদ্ভূত চরম রাজনৈতিক সংকট-সহিংসতা, ১/১১-র সৃষ্টি ও সেনা নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা, সরকারের নীল নকশা, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার গ্রেপ্তার, তথাকথিত সংস্কারের নামে নেপথ্যের সেনানায়কদের দলে বিভাজন ও বিরাজনীতিকরণের চেষ্টা, 'মাইনাস টু থিওরি', আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে শেখ হাসিনার ভূমিকা, সাব-জেলে শেখ হাসিনার বন্দি থাকাকালীন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান ও দলের মুখপাত্র সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের ভূমিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগস্টের (২০০৭) ছাত্র-শিক্ষক বিক্ষোভ, ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের বিপুল বিজয় ও সরকার গঠন, আওয়ামী লীগের উন্নয়নের রূপকল্প বা ভিশন ২০২১, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার ইত্যাদি সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় একুশ কাউন্সিল অধিবেশন ২০১২ : সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার

শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (২০০৯) বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচার সম্পন্ন করে ফাঁসির রায় কার্যকর করা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন, উচ্চ আদালত কর্তৃক সংবিধানের ৫ম, ৭ম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা, এর রাজনৈতিক প্রভাব, ৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনঃস্থাপন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের বিধানসহ সংবিধানের ১৫তম সংশোধনী, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু, বিএনপি-জামায়াত জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধিতা, বিএনপি-জামায়াত জোটের দীর্ঘ সংসদ বর্জন, সারাদেশে হরতাল, লংমার্চ প্রভৃতি কর্মসূচি পালনের নামে বিএনপি-জামায়াত জোটের হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য, আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ও এর প্রধান দিকসমূহ, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তাঁর নতুন অঙ্গীকার, কাউন্সিলে দলের আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী পেশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

অধ্যায় বাইশ কাউন্সিল অধিবেশন ২০১৬ : 'এখন সময় বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার'

এ অধ্যায়ে আওয়ামী লীগের ২০তম কাউন্সিল অনুষ্ঠানের পটভূমি, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, দলের নতুন নেতৃত্বের ধরন, শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ, সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিক, কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাব, গঠনতন্ত্র সংশোধনী, সরকার ও দলের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন ভাবনা, দলের কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারী ও তরুণ নেতৃত্বের অবস্থান, নির্বাচনের জালে আবদ্ধ না থেকে নেতৃত্বের সুদূর বিস্তৃত দৃষ্টি, ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচন ও নির্বাচিত সরকারের বর্ষপূর্তিতে ২০১৫ সালের ৫ই জানুয়ারি থেকে বিএনপি-জামায়াত

www.pathagar.com

জোট দুই পর্যায়ে চরম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, হেফাজতে ইসলাম নামে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ একটি সংগঠনের অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা, ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ফাঁসির রায় কার্যকর হওয়া, শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চের সৃষ্টি, আত্মঘাতী জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান ও সরকার কর্তৃক শক্তহাতে দমন ইত্যাদি বিষয় আলোকপাত করা হয়।

অধ্যায় তেইশ উপসংহার

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল, এর গুরুত্ব, শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন কাউন্সিলে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তাবলি, নেতৃত্ব নির্বাচন ও নির্বাচনের ধরন, দলের বৈশিষ্ট্য, কীভাবে আওয়ামী লীগ অন্য দল থেকে স্বতন্ত্র, এর অন্তর্নিহিত শক্তি ও এই শক্তির উৎস, আওয়ামী লীগ কেন এ দেশের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির মূলধারা, এক কথায় গ্রন্থটির ২২টি অধ্যায়ের সারকথা উপসংহারে তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় : এক

রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন ১৯৪৯ : আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছর দশ মাসের মধ্যে পুরান ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা। এটি ছিল পাকিস্তানের প্রথম কার্যকর কোনো বিরোধী দল। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের যাত্রাই শুরু হয় বাঙালিদের স্বার্থের সত্যিকার ও আপসহীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে। তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রে কোনো বিরোধী দল গঠন কিছুতেই সহজসাধ্য ছিল না। শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু আর সকল বাধা-প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের শুধু প্রতিষ্ঠা লাভই ঘটেনি, অতি দ্রুত এর জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কী করে এটি সম্ভব হলো? এর প্রতিষ্ঠার পটভূমিই বা কী ছিল? এ অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এসব প্রশ্নের উত্তর জানার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পটভূমি

'৪০-এর দশকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণভাবে দ্বি-ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে–সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ বনাম খাজা গ্রুপ।[১] এ বিভক্তি ছিল একদিকে মধ্যবিত্ত, অন্যদিকে অভিজাত জমিদারি স্বার্থের দ্বন্দ্ব। অনেকে একে জনগণ বনাম প্রাসাদ দ্বন্দ্ব হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ ছিলেন খাজা গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় অবাঙালি নেতৃত্বের সমর্থন-সহানুভূতিও ছিল এঁদের প্রতি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের পেছনে ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত ও ছাত্র-তরুণদের নিয়ে গঠিত এক বিশাল কর্মীবাহিনী। তারাই ছিল বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের মূল শক্তি। সোহরাওয়ার্দীর প্রত্যক্ষ সমর্থন নিয়ে ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর বাংলায় লীগকে সুদৃঢ় সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে তিনি নিজেকে সার্বক্ষণিকভাবে নিবেদিত করেন। তাঁর প্রগতিশীল নেতৃত্বের কারণে শত-শত ছাত্র-যুবক দলের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে। তাদের কাজ-কর্ম, থাকা-খাওয়া চালিয়ে নেওয়ার জন্য ছিল 'পার্টি হাউজ'। ঢাকার ১৫০ 'মুগলটুলী পার্টি হাউজ' ছিল পূর্ব বাংলার তরুণ লীগ কর্মীদের প্রধান কেন্দ্র। ১৯৪৪ সালে আবুল হাশিমের নির্দেশে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। খাজা গ্রুপের হেডকোয়ার্টার্স ঢাকার 'আহসান মঞ্জিল'-এর বিপরীতে 'মুগলটুলী ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' বা পার্টি হাউজ গড়ে উঠেছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম প্রথমে পাকিস্তানে না এসে ভারতে থেকে যান। এর মূলে ছিল মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

www.pathagar.com

বিদ্বেষী আচরণ। আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ৫ই আগস্ট কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে পূর্ব বাংলার জন্য মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সোহরাওয়ার্দীর স্থলে লীগ হাইকমান্ডের প্রিয়ভাজন খাজা নাজিমুদ্দীন নতুন নেতা নির্বাচিত হয়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। এমনকি, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে সোহরাওয়ার্দী পেশাগত কারণে একবার ঢাকা এলে তাঁকে জোর করে স্টিমারে তুলে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[২] পাকিস্তানের গণপরিষদ থেকে তাঁর সদস্যপদ পর্যন্ত বাতিল ঘোষণা করা হয়।[৩] যাহোক, এ সময় ১৫০ মুগলটুলী ওয়ার্কার্স ক্যাম্প বা পার্টি হাউজ ছিল সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থক ছাত্র ও তরুণ কর্মীদের মিলনস্থল। এখান থেকে তাঁরা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা স্থির করেন। এভাবে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী সরকারি দল মুসলিম লীগকে কার্যত একটি 'পকেট সংগঠন' বানিয়ে রাখে। লীগের ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতা-কর্মী, যাদের অধিকাংশ সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের দলে বা সরকারের কোথাও কোনো স্থান দেওয়া হলো না। উদ্ভূত অবস্থায় করণীয় স্থির করার লক্ষ্যে টাঙ্গাইল ও নারায়ণগঞ্জে প্রগতিশীল মুসলীম লীগ কর্মীদের দুটি সভাও ডাকা হয়েছিল।[৪] যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিরা সর্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিল, ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান তাদের সেই প্রত্যাশিত রাষ্ট্র ছিল না। শুরুতেই তাদের ওপর নেমে আসে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ, আঞ্চলিক বৈষম্য ও জাতি-নিপীড়ন। পাকিস্তানের স্বাধীনতাকে বঙ্গবন্ধু আখ্যায়িত করেছিলেন 'ফাঁকির স্বাধীনতা' বলে।[৫] সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা দাঁড়ায় 'এক শকুনির হাত থেকে আরেক শকুনির হাতে পড়া'র মতো।[৬] বাংলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'– পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই ভাষানীতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদের বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষী ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। এদিকে রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-নির্যাতন চলছিলই। এমতাবস্থায় বিভাগ-পূর্ব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থকরা একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে থাকেন। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান সংগঠক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ সময় ভারতে অবস্থান করলেও ঢাকার মোগলটুলী ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মী-সংগঠকদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এদিকে, পাশাপাশি সময়ে আরওও দুটি ঘটনা বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছিল। এর একটি হলো, ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্বদানের কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং অপরটি, একই মাসে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগের প্রার্থীকে পরাজিত করে ১৫০ নম্বর মুগলটুলী পার্টি হাউজের প্রগতিশীল লীগ কর্মীদের প্রধান সংগঠক শামসুল হকের (টাঙ্গাইলের শামসুল হক নামে

www.pathagar.com

খ্যাত) বিজয়।[৭] শেষের ঘটনাটি মুসলীম লীগ সরকার-বিরোধী লীগ নেতা-কর্মীদের বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করে।

রোজ গার্ডেনের কর্মী সম্মেলন

পুরান ঢাকায় যে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, তার জন্য ঢাকা শহরের কোথাও হল বা জায়গা না পাওয়া যাওয়ায় কে এম দাস লেনের কে এম বশির-এর প্রাইভেট বাড়ি 'রোজ গার্ডেন'-এ (হুমায়ুন সাহেবের বাড়ি নামে পরিচিত) ২৩ ও ২৪শে জুন ১৯৪৯ ঐ কর্মী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও কৃষকনেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সরকার-বিরোধী লীগ কর্মীদের সঙ্গে পূর্বেই একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর নামেই এ কর্মী সম্মেলন ডাকা হয়। সম্মেলন যাতে সফল না হতে পারে সেজন্য সরকার ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ অপচেষ্টা কম করেনি। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী, ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ এবং সিটি মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ সাহেবে আলম ২১শে জুন এক বিবৃতিতে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ক্ষমতালোভী, পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টকারী, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে ঐ সম্মেলনে যোগদান বা এর সঙ্গে কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতা না রাখার জন্য পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণ বিশেষ করে ঢাকাবাসীর উদ্দেশে যৌথ আহ্বান জানিয়ে বলেন :

> মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবের দ্বারা আগামী ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে ঢাকায় মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনের নামে যে সভা আহূত হইয়াছে, তাহার সহিত মুসলিম লীগের কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুত ইহা দলগত স্বার্থ ও ক্ষমতালাভের জন্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টির দ্বারা মুসলমান সংহতি নষ্ট করিয়া পাকিস্তানের স্থায়ীত্ব এবং অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছে।[৮]

কর্মী সম্মেলনের পাঁচ দিন পূর্বে তড়িঘড়ি করে ১৮-২০শে জুন কার্জন হলে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ঐ সম্মেলনেও বিরোধীলীগ কর্মী সম্মেলন আহ্বানের নিন্দা ও মুসলমানদের তাতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৯]

যাহোক, আতাউর রহমান খানের[১০] সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রোজ গার্ডেনের কর্মী সম্মেলনে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি যোগ দেন। অনেক রাজনৈতিক নেতাও যোগ দিয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, খয়রাত হোসেন এমএলএ, বেগম আনোয়ারা খাতুন এমএলএ, আলী আহমেদ খান এমএলএ, আল্লামা রাগীব আহসান, হাবিবুর রহমান চৌধুরী ওরফে ধনু মিয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১১] সম্মেলনের প্রথম দিনেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে (জেলে বন্দি অবস্থায়) যুগ্মসম্পাদক ও ইয়ার মোহাম্মদ খানকে কোষাধ্যক্ষ করে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ' নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। 'আওয়ামী' শব্দের অর্থ জনগণ। অর্থাৎ সরকারি মুসলিম লীগের বিপরীতে জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা। দলের প্রতিষ্ঠাকালীন কর্মকর্তারা ছিলেন[১২] :

সভাপতি	:	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
সহ-সভাপতি	:	আতাউর রহমান খান
"		আব্দুস সালাম খান
"		আলী আহম্মদ খান
"		আলী আমজাদ খান
"		সাখাওয়াত হোসেন
সাধারণ সম্পাদক	:	শামসুল হক
যুগ্ম-সম্পাদক	:	শেখ মুজিবুর রহমান
সহ-সম্পাদক	:	খন্দকার মোশতাক আহমদ
"		এ কে এম রফিকুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ	:	ইয়ার মোহাম্মদ খান

রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন, নতুন দলের প্রতিষ্ঠা এবং তার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নিজের সম্পৃক্ততা সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> ...পুরানা লীগ কর্মীরা মিলে এক কর্মী সম্মেলন ডাকল ঢাকায়–ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন সে সভা আহ্বান করা হয়েছিল। ...আমরা জেলে বসেই সে খবর পাই... আমরা সম্মেলনের ফলাফল সম্বন্ধে খুবই চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল, আমার মত নেওয়ার জন্য। আমি খবর দিয়েছিলাম, "আর মুসলিম লীগের পিছনে ঘুরে লাভ নাই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণবিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের মুসলিম লীগে নিতে চাইলেও যাওয়া উচিত হবে না। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে। একে আর জনগণের প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। এদের কোনো কর্মপন্থাও নাই।" আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমি ছাত্র প্রতিষ্ঠান করব, না রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন হলে তাতে যোগদান করব? আমি উত্তর পাঠিয়েছিলাম, ছাত্র রাজনীতি আমি আর করব না, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই করব। কারণ বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে। ...সকলেই একমত হয়ে নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন; তার নাম দেওয়া হল, 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী [মুসলীম] লীগ।' মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি, জনাব শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং আমাকে করা হল জয়েন্ট সেক্রেটারী। খবরের কাগজে দেখলাম, আমার নামের পাশে লেখা আছে, 'নিরাপত্তা বন্দি'।[১৩]

'মুসলিম' শব্দ যুক্ত করে নব প্রতিষ্ঠিত দলের নামকরণ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু

www.pathagar.com

ম্যানিফেস্টো থাকবে। ভাবলাম, সময় এখনও আসে নাই। তাই যারা বাইরে আছেন তারা চিন্তাভাবনা করেই করেছেন।[১৪]

উল্লেখ্য, আলোচ্য রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন সফল করতে পুরান ঢাকার দুই কৃতী সন্তান ও নিবেদিতপ্রাণ লীগ কর্মী শওকত মিয়া (১৫০ মোগলটুলী পার্টি হাউজের স্বত্বাধিকারী) ও ইয়ার মোহাম্মদ খান (কারকুন বাড়ি লেন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১৫] শুরুর দিকে শওকত মিয়ার বাড়িই ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগের অফিস।

নতুন এ দলের জন্য ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। দলের নব নির্বাচিত কর্মকর্তা ছাড়াও বেগম আনোয়ারা খাতুন এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, আবদুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, নারায়ণগঞ্জের আবদুল আউয়াল, আলমাস আলী, শামসুজ্জোহা প্রমুখ এর সদস্য ছিলেন। সরকারি হয়রানি-গ্রেপ্তারের ভয়ে কমিটির বেশকিছু সদস্য অচিরেই বিবৃতি দিয়ে পদত্যাগ করেন।[১৬] তাঁদের মধ্যে সাখাওয়াত হোসেন ও এ কে এম রফিকুল ইসলাম ছিলেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। আর্থিক অসুবিধা ও সরকারের এডভোকেট জেনারেলের চাকরিটি তাঁর প্রয়োজন এ কথা বলে তিনিও ওয়ার্কিং কমিটি থেকে অব্যাহতি নেন।[১৭]

সে যাহোক, কর্মী সম্মেলনের পর দ্রুত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের মধ্যে যে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়েছিল (পূর্বে উল্লিখিত), তার মধ্যে সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থক হিসেবে পরিচিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রগতিশীল অংশের নেতাকর্মীরা জেলায়-জেলায় এ সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে সংগঠিত হতে থাকেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশজুড়ে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক রূপ লাভের ক্ষেত্রে এই বিশেষ অবস্থা খুবই অনুকূল হয়েছিল। এছাড়া, বিভিন্ন গণদাবি যেমন বিদ্যমান খাদ্য সংকট নিরসনের ব্যাপারে সভা-সমাবেশ, ভুখা মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের ওপর অব্যাহত চাপ প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করায় নতুন এ দলের প্রতি দ্রুত জনসমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

খসড়া ম্যানিফেস্টো

আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে শামসুল হক 'মূল দাবি' নামে একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে বিবেচনার জন্য তা পেশ করেন। পরে কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন করে খসড়া ম্যানিফেস্টো আকারে তা গৃহীত হয়। এর প্রধান দিকসমূহ ছিল:[১৮] পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, পূর্ণ গণতন্ত্র, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত দুটি পৃথক আঞ্চলিক ইউনিট এবং এর জন্য পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, জনগণের সার্বভৌমত্ব, সকল সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার সমান অধিকার, সভা-সমাবেশ-সংগঠনসহ পূর্ণ বাক-স্বাধীনতা, সর্বজনীন ভোটাধিকার, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, বিভিন্ন স্থানে পর্যাপ্ত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিপুলসংখ্যক যুবকের কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা,

www.pathagar.com

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, সারাদেশে দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গরিবদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, বৃদ্ধ, অনাথ, অক্ষম, দুস্থদের রক্ষণাবেক্ষণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সর্বক্ষেত্রে নারীদের সম অধিকার, মাতৃমঙ্গল, শিশু সদন ও শিশু শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মুসলিম দেশসমূহের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, বিশ্ব শান্তি রক্ষা, পাট, চা, ব্যাংক, বীমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ, খনিজ সম্পদসহ প্রাথমিক শিল্প জাতীয়করণ, সমবায় ও যৌথ কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন, ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ গ্রহণ ইত্যাদি।

আশু লক্ষ্য ও কর্মসূচি হিসেবে যেসব বিষয় গৃহীত হয় তার মধ্যে ছিল : প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠান, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন, অবিলম্বে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, মূল শিল্প জাতীয়করণ, কুটির শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য ও উৎসাহদান, প্রশাসন ও সমাজ থেকে দুর্নীতি দূরীকরণ, পাটচাষিদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ, প্রশাসনের ব্যয় হ্রাস, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে রাজস্বের ন্যায্য বণ্টন ইত্যাদি।

সময়ের বিচারে এটি অনেক অগ্রবর্তী কর্মসূচি ছিল। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, লীগের প্রগতিশীল অংশের রাজনৈতিক চেতনা এবং শুরু থেকেই পূর্ব বাংলার পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রশ্ন প্রকাশ পায়। খসড়া ম্যানিফেস্টোতে ইসলামের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপকে পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা এবং তৎকালীন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক চিন্তার আলোকে দেখা সমীচীন হবে। খসড়া ম্যানিফেস্টোর চেতনামূলে ছিল গণতন্ত্র।

খসড়া গঠনতন্ত্র

আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ম্যানিফেস্টোর পাশাপাশি দলের একটি খসড়া গঠনতন্ত্রও প্রণয়ন করেন, যা দলের ওয়ার্কিং কমিটি কাউন্সিলের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রহণ করে।[১৯] গঠনতন্ত্র অনুযায়ী[২০] দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি অনুগত ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের পূর্ব পাকিস্তানের যে-কোনো মুসলমান এর সদস্য হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

দলের কর্মকর্তারা : সভাপতি, সহ-সভাপতি ৫, সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ৩, কোষাধ্যক্ষ, স্থায়ী (দপ্তর) সম্পাদক। প্রতিবছর কাউন্সিল কর্তৃক সবাই নির্বাচিত।

দলের কাঠামোগত বিন্যাস ছিল এরূপ : ১. কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের নিয়ে বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশন, ২. কাউন্সিল, ৩. ওয়ার্কিং কমিটি, ৪. জেলা কমিটি, ৫. মহকুমা এবং শহর কমিটি, ৬. প্রাথমিক কমিটি (ইউনিয়ন, পৌরসভা, ওয়ার্ড)।

কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা রাখা হয় ১০৪৩। বিভিন্ন জেলা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় এঁরা নির্বাচিত। এছাড়া, আরও ২০ জন অতিরিক্ত কাউন্সিলর কো-অপ্ট্ করার বিধান

www.pathagar.com

রাখা হয়। কাউন্সিলের সময় ছিল ১ বছর। বছরে অন্তত দুটি কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠান আবশ্যকীয় ছিল। প্রত্যেক কাউন্সিল সদস্যকে বছরে ২/- রূপি চাঁদা দিতে হতো। কাউন্সিলের কার্যাবলির মধ্যে ছিল : দলের কর্মকর্তা নির্বাচন, দলে বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন, অধস্তন কমিটি অনুমোদন কিংবা বাতিল, শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে যে-কোনো সদস্য/শাখা কমিটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, দলের নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ, দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ, বার্ষিক বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগ ইত্যাদি।

ওয়ার্কিং কমিটি : দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহকারী সম্পাদকবৃন্দ, দপ্তর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়াও আরও ৩৫ জন সদস্য নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের বিধান করা হয়। দলের উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ পদাধিকার বলে এর সদস্য ছিলেন। অপরদিকে, ৩৫ সদস্যের মধ্যে ৩০ জন কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত এবং ৫ জন দলের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত। মাসে অন্তত একবার ওয়ার্কিং কমিটির সভা হওয়ার কথা ছিল। ওয়ার্কিং কমিটির দায়িত্বের মধ্যে ছিল : দলের কার্যাবলি সম্পাদন, কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বার্ষিক ও বিশেষ অধিবেশনের স্থান ও সময় নির্ধারণ, কার্য সম্পাদনের জন্য সাব-কমিটি গঠন, বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, অফিসের সাপোর্ট স্টাফ নিয়োগ, কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক সময়ে-সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলি তাতে পেশ ইত্যাদি।

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা রোজ গার্ডেনে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর যাত্রা আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সরকার-বিরোধী হওয়ার কারণে কোথাও রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মতো স্থান না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন সাহেব নামে পরিচিত পুরান ঢাকার এক বাসিন্দার ব্যক্তিগত বাগানবাড়িতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ সরকারের বিরোধিতা দিয়ে শুরু হলেও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা ছিল পাকিস্তানি জাতি-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিদের দ্রোহ, যা দিনে-দিনে স্পষ্ট হতে থাকে। এ সংগঠনের আর একটি বিশেষ দিক হলো, মাঠপর্যায় থেকে জনগণের হয়ে এর আত্মপ্রকাশ আর জনগণের হয়েই দীর্ঘ পরিসরে রাজনীতির মূলধারা হিসেবে টিকে থাকা। এর প্রতিষ্ঠাতাগণ সবাই কি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন এর দ্বারা কী ইতিহাস তাঁরা রচনা করতে যাচ্ছেন?

তথ্যনির্দেশ

১. Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh : The Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1906-1947*, UPL 2003, pp. 159-165; আরওও Abul Hashim, *In Retrospection*, Dhaka 1974, *Passim*

২. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার (সম্পাদিত), *হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতিকথা*, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৫৩

৩. *ঐ*, পৃ. ১৫৯

৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউপিএল ২০১২, পৃ. ১০১-১০২; অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫*, ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ৯৬

www.pathagar.com

৫. ১৯৭৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, ঢাকা ২০০০, পৃ. ২১৫

৬. ১৯৭২ সালের ১১ই এপ্রিল বাংলাদেশ গণপরিষদে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, মিজানুর রহমান মিজান, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, *ঐ*, পৃ. ৯৮

৭. ১৯৪৯ সালের ২৬শে এপ্রিল টাঙ্গাইলের একটি শূন্য আসনে প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতিতে বহুল আলোচিত ও চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ঘটনা। এ নির্বাচনে সরকারি দল মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন টাঙ্গাইলের বিখ্যাত জমিদার পরিবারের সদস্য খুররম খান পন্নী। তখন পর্যন্ত পাকিস্তানে কার্যকর কোনো বিরোধী দল প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। ঢাকার ১৫০ মোগলটুলী ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম সমর্থক প্রগতিশীল লীগ কর্মীদের প্রধান সংগঠক শামসুল হক সরকারি দলের প্রার্থী খুররম খান পন্নীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। পারিবারিক প্রভাব-ঐতিহ্যের পাশাপাশি সরকারি প্রশাসন খুররম খান পন্নীর অনুকূলে সক্রিয় ছিল। উপরন্তু টাঙ্গাইল ছিল পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের নিজের জেলা। পক্ষান্তরে, শামসুল হক শুধু বয়সে তরুণ তা নয়, তাঁর অর্থ-বিত্ত বলতে কিছুই ছিল না। তাঁর সম্বল ছিল জনগণের সেবায় সর্বস্ব ত্যাগ ও আত্মনিবেদন এবং একদল তরুণ কর্মীবাহিনী। নির্বাচনে তাঁর নিকট খুররম খান পন্নীর পরাজয় ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সরকার দলীয় প্রার্থীর এ পরাজয়। শাসকগোষ্ঠীর গণবিরোধী নীতি এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপর জুলুম-নির্যাতনের কারণে এমনটি হয় বলে সর্বমহলের ধারণা। মুসলিম লীগ সরকার স্বাভাবিকভাবে এ ফলাফল গ্রহণ করতে পারেনি। তাই শেষ পর্যন্ত নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে শামসুল হকের নির্বাচন বাতিল ঘোষণার ব্যবস্থা করা হয়। দ্রষ্টব্য, হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকা ২০০১, পৃ. ১৯৫; অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি*, পৃ. ৮৮-৮৯; বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৭০, পৃ. ২২৩-২৩৩

৮. বিস্তারিত *আজাদ*, ২২শে জুন ১৯৪৯, পৃ. ৬

৯. *ঐ*, ১৯শে জুন ১৯৪৯, পৃ. ১

১০. ঢাকা জেলার ধামরাইতে ১৯০৭ সালে আতাউর রহমান খানের জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বিএ (অনার্স) ও পরে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করে তিনি ঢাকা জেলা বারে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। তিনি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় (১৯৫৪) আওয়ামী লীগ মনোনীত মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৬-৫৮ সময়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৬৯ সালে তিনি জাতীয় লীগ নামে নতুন দল গঠন করেন। স্বাধীনতা-উত্তর জেনারেল এরশাদের সময় তিনি ৯ মাস সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯১ সালে এ বর্ষীয়ান নেতা মৃত্যুবরণ করেন।

১১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১২০

১২. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি*, পৃ. ৯৮। আরও যাঁদের নাম জানা যায়, তাঁরা হলেন (খান সাহেব) এম ওসমান আলী, কামরুদ্দীন আহমেদ, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, এমএ ওয়াদুদ, খন্দকার মোঃ ইলিয়াস, আলমাছ আলী, আবদুল আউয়াল, শওকত আলী ওরফে শওকত মিয়া, আবদুল হামিদ চৌধুরী, নুরজাহান বেগম, শামসুজ্জোহা প্রমুখ। দ্রষ্টব্য,

www.pathagar.com

মুস্তাফা সারওয়ার, 'পঁচিশ বছরের সংগ্রাম: আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু', *ইত্তেফাক*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৫, ৮, ১০, ১৪, ১৫, ১৭

১৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১১৯-১২১

১৪. *ঐ*, পৃ. ১২১

১৫. *ঐ*, পৃ. ১২০-১২১

১৬. *ঐ*, পৃ. ১৬৬; আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩২

১৭. *ঐ*

১৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টো', ড. আবুল কাশেম (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ–ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা ২০০১, পৃ. ১৫-৩০; 'Draft Consititution and Rules of the East Pakistan Awami Muslim League', পৃ. ৩১-৪৯। ১৯৫০ সালে খসড়া গঠনতন্ত্রটি মুদ্রিত হয়।

১৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ১২৭

২০. ড. আবুল কাশেম, *আওয়ামী লীগ–ঐতিহাসিক দলিল*, 'Draft Consititution and Rules of the East Pakistan Awami Muslim League'

www.pathagar.com

অধ্যায় : দুই

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৩ : দলের পূর্ণাঙ্গ রূপদান

প্রতিষ্ঠার ৪ বছর পর ১৯৫৩ সালে পুরান ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে ৩-৫ জুলাই তিনদিনব্যাপী আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] এতে সভাপতিত্ব করেন দলের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কাউন্সিল উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন দলের অন্যতম সহ-সভাপতি আবদুস সালাম খান। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বছরান্তে কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও আলোচ্য কাউন্সিল দীর্ঘ বিলম্বে অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কারণ ছিল নব প্রতিষ্ঠিত এ দলের প্রতি মুসলিম লীগ সরকারের চরম নির্যাতন-নিবর্তনমূলক আচরণ, নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার ও দীর্ঘ কারাবাস। পুরান ঢাকার প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান ও দলের কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহাম্মদ খানের সহযোগিতায় কাউন্সিল অধিবেশনের ভেন্যু হিসেবে মুকুল সিনেমা হল পাওয়া গেলেও সরকারের রোষানলে পড়ার ভয় ও অন্যান্য কারণে কাউন্সিলরদের থাকার জন্য কোনো স্থান পাওয়া যায়নি। অগত্যা সদরঘাটে বড় বড় নৌকা ভাড়া করে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।[২]

পটভূমি

প্রতিষ্ঠা থেকে (১৯৪৯) আলোচ্য সময় পর্যন্ত প্রধান ঘটনাবলি ছিল নেতৃবৃন্দের ওপর মুসলিম লীগ সরকারের চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ও গ্রেপ্তার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলন, মূলনীতি কমিটি (বিপিসি) রিপোর্ট (১৯৪৯), গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন (১৯৫০), ভাষা-আন্দোলন (১৯৫২), জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সংযুক্তি (১৯৫২) ইত্যাদি।

আনুষ্ঠানিকভাবে দলের প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্বে হরতালের সমর্থনে রাস্তায় পিকেটিং করা অবস্থায় ঢাকার সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারীদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও তাতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের কারণে তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়।[৩] একই বছর ২৩শে জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি কারাগারে বন্দি ছিলেন এবং সে অবস্থায়ই দলের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন, যা পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুরু থেকেই ছিলেন দলের প্রধান সংগঠক বা প্রাণশক্তি। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেছিলেন, 'যো আওয়ামী লীগ করেগা,

www.pathagar.com

উসকো শের হাম কুচাল দে গা'[৪] –অর্থাৎ যে আওয়ামী লীগ করবে তার ঘাড় আমি ভেঙ্গে দেব। ১৯৪৯ সালের ১১ই অক্টোবর লিয়াকত আলী খানের ঢাকা আগমনের দিন দেশের খাদ্য-সংকটের সমাধান ও রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে এক বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভা শেষে দলের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও যুগ্মসম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মিছিল বের হলে পুলিশ তাঁদের ওপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনাস্থল থেকে শামসুল হকসহ অনেকে গ্রেপ্তার হন। মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে সময় গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হলেও কিছুদিনের মধ্যে প্রথমে মওলানা ভাসানী ও পরে বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হন। জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় শামসুল হকের মানসিক সমস্যা দেখা দেয় এবং এক পর্যায়ে স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। মওলানা ভাসানীও মুক্তি পেয়ে ৫২-র ভাষা-আন্দোলনের সময় পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘদিন কারাভোগ শেষে মুক্তি লাভ করেন। অপরদিকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিসেম্বর ১৯৪৯ থেকে দুবছর তিন মাস একনাগারে কারাগারে বন্দি থাকা ও ১১ দিন অনশন শেষে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ কারামুক্ত হন। উল্লেখ্য, ৫২-র ভাষা-আন্দোলনের সময় শামসুল হক, খয়রাত হোসেন এমএলএ-সহ আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। শামসুল হক এবার একবছরের মতো বন্দি থেকে ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে মুক্তি লাভ করেন। এ দফায় কারাভোগের সময় তাঁর মানসিক সমস্যার আরও অবনতি ঘটে।

১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদে ভবিষ্যৎ সংবিধানের মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে রিপোর্ট তৈরির উদ্দেশ্যে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়, যা 'মূলনীতি কমিটি' (বিপিসি) নামে অভিহিত। গণপরিষদের সভাপতি মৌলভী তমিজউদ্দিন খান এর সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে কমিটির প্রথম বা অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। এর প্রধান দিকসমূহ ছিল—উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা, উচ্চ কক্ষে সকল প্রদেশের সমানসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব, উচ্চ ও নিম্ন উভয় কক্ষের সমান ক্ষমতা, কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে উভয় কক্ষের যৌথসভায় তার নিষ্পত্তি ইত্যাদি।[৫] এক-রাষ্ট্রভাষা নীতি, কেন্দ্রীয় আইনসভার গঠন ও ক্ষমতা, প্রদেশের ক্ষমতা ইত্যাদি প্রশ্নে পূর্ব বাংলায় এ রিপোর্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, ৪-৫ই নভেম্বর ১৯৫০ ঢাকায় আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে একটি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।[৬] এতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবিসহ বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে, সরকার শেষ পর্যন্ত মূলনীতি কমিটি রিপোর্ট প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে, ১৯৫১ সালে আততায়ীর গুলিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিহত হলে তাঁর স্থলে খাজা নাজিমুদ্দীন (তখন তিনি গভর্নর জেনারেল) প্রধানমন্ত্রী হন। ঢাকা সফরকালে ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পল্টনের জনসভায় তিনি উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। তাঁর এ ঘোষণাকে

www.pathagar.com

কেন্দ্র করে ভাষা-আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব শুরু হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলি হয়। রক্ত দিয়ে রচিত হয় মহান একুশের ভাষা ও শহিদ দিবস। অন্যদিকে, ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর নেমে আসে চরম নির্যাতন ও গ্রেপ্তার। এ ঘটনা বাঙালির চেতনামূলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়।

১৯৫০ সালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ছিল এ সময়ের অন্যতম আলোচ্য ঘটনা। মুসলিম লীগ সরকার ইসলামের দোহাই দেওয়া ছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনকে ঘিরে মানুষের, বিশেষ করে বাঙালিদের যে স্বপ্ন ছিল, তা পূরণে কিছুই করতে সক্ষম হয়নি বা চেষ্টাও করেনি। অপরদিকে, তারা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অত্যাচার-জুলুম, অন্তর্দ্বন্দ্ব, লাইসেন্স-পারমিট, ব্যবসা ও সামরিক-বেসামরিক আমলা নিয়ন্ত্রিত ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। ষড়যন্ত্রের রাজনীতির অংশ হিসেবেই ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে খাজা নাজিমুদ্দীনকে সরিয়ে তাঁর স্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলী বগুড়া-কে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানো হয়। তরুণদের মধ্যে এ সময় বেকারত্ব দেখা দেয়। পাটচাষিরা ন্যায্যমূল্যের পাওনা থেকে বঞ্চিত ও কালোবাজারির শিকার হন। বাঙালিদের মধ্যে ক্রমেই পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে শাসন-শোষণ-বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলা থেকে সম্পদ দেশের অপর অংশে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

১৯৪৯ সালে ভারত থেকে পাকিস্তানে ফিরে এসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি শহরে বসবাস ও সেখানকার কোর্টে আইন পেশা শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি 'জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি দল গঠন করেন। 'জিন্নাহ'র নাম দলের নামের সঙ্গে যুক্ত করা কৌশলের অংশ ছিল। কেননা, তখন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বাইরে দল গঠন খুবই কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাছাড়া সোহরাওয়ার্দী ছিলেন তখন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর চক্ষুশূল। ১৯৪৯ সালে তাঁর সম্মতি ও প্রেরণায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও এতদিনেও সেটি তাঁর জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়নি। দলের নামের সঙ্গে ব্যক্তির নাম (জিন্নাহ) যুক্ত থাকায় বঙ্গবন্ধু ও অন্যদের জোড় আপত্তি ছিল। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের নিজস্ব ম্যানিফেস্টো, গঠনতন্ত্র তো ছিলই, যা থেকে তাঁরা সরে আসতে কোনো অবস্থায়ই সম্মত ছিলেন না। যাহোক, শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দীর ইচ্ছায় ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং বঙ্গবন্ধুর দাবি অনুযায়ী তাঁর (সোহরাওয়ার্দী) সম্মতিক্রমে দলের নাম, গঠনতন্ত্র, ম্যানিফেস্টো অপরিবর্তিত রেখে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সংযুক্ত হয়।[৭]

দীর্ঘ ২ বছর ৩ মাস কারাগারে বন্দি থাকার পর ১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি মুক্তি লাভের কিছুদিনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার কাজে বেরিয়ে পড়েন এবং সারাদেশ সফর করেন। তখন দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক কারাবন্দি। তাই দলের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধুকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর তিনি মুক্তি পেয়ে সংগঠনের কাজে

www.pathagar.com

নিয়োজিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ৬ মাসের মধ্যে ডিসেম্বরে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। তাই, তখন তিনি তেমন কোনো সময়ই পাননি। এবার বছরাধিক সময় সংগঠন শক্তিশালী করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার সুযোগ পান। সারাদেশে একের পর এক জনসভা ও সাংগঠনিক সভা করতে থাকেন। তাতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও যোগ দেন। চট্টগ্রামে আবদুল আজিজ ও জহুর আহমদ চৌধুরী, কুমিল্লায় আবদুর রহমান খান ও খন্দকার মোশতাক আহমদ, ময়মনসিংহে আবুল মনসুর আহমদ, হাশিমউদ্দিন আহমদ, রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া, হাতেম আলী তালুকদার, নোয়াখালীতে আবদুল জব্বার খদ্দর, খুলনায় শেখ আবদুল আজিজ, পাবনায় ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও আবদুর রব ওরফে বগা, দিনাজপুরে রহিমুদ্দীন, ফরিদপুরে আছমত আলী খান প্রমুখ স্ব-স্ব জেলায় সংগঠন গড়ার কাজে এগিয়ে আসেন। ছাত্রলীগের কর্মী ও তরুণরাও এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অধিবেশনকে সামনে রেখে ৩ মাসের মধ্যে জেলা ও অন্যান্য ইউনিটের নির্বাচন সম্পন্ন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। এভাবে সম্মেলনের পূর্বে শুধু জেলা পর্যায়ে নয়, শতকরা ৭০ ভাগ ইউনিয়নেও আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব হয়।[৮]

সাংগঠনিক ও জাতীয় রাজনীতির উল্লিখিত পটভূমিতে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগের আলোচ্য কাউন্সিল।

কাউন্সিল অধিবেশন

৩রা জুলাই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে মুকুল সিনেমা হলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এতে বিভিন্ন জেলা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলর যোগ দেন। শুরুতে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি আবদুস সালাম খান স্বাগত ভাষণ দেন। এরপর ছিল সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে আলোচ্য সময় পর্যন্ত সংগঠন ও এর বাইরে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে কাউন্সিলে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন (পরিশিষ্ট দুই দ্রষ্টব্য)। তাঁর রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ ছিল : আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি, দলের নামকরণ থেকে সৃষ্ট সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা, সরকারের 'চণ্ডন নীতি', খাদ্য মিছিলে নেতৃত্বদান করতে গিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের গ্রেপ্তার হওয়া, ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়ে দাঙ্গা প্রতিহত করার আহ্বান, বিপিসি রিপোর্ট-বিরোধী প্রতিক্রিয়া, গ্রেপ্তার বরণসহ ভাষা-আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ভূমিকা, ভাষা-আন্দোলনের গুরুত্ব, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্ন, রাজবন্দিদের মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী জোটের বিরোধিতা, জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ, দলের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খানের এশীয় আঞ্চলিক শান্তি কমিটির অন্যতম

www.pathagar.com

সহ-সভাপতি ও পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়া, প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদার প্রথা উচ্ছেদ, ভূমি সংস্কার, মৌলিক শিল্প জাতীয়করণ, পাটের সর্বোচ্চ মূল্য ও বিদেশি বাজারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাণিজ্যিক নীতি, তাঁতসহ কুটির শিল্পের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা, ছাত্র বিক্ষোভ, বেকারত্ব, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে লোকবল ছাঁটাইয়ের বিরোধিতা, অপরিকল্পিতভাবে সরকারের কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ, দেশের বিদ্যমান খাদ্য সংকট, মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে 'শোষণমুক্ত সমাজ' প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ইত্যাদি। দলের জন্য সুষ্ঠু কর্মসূচি থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সরকারী নীতির গতানুগতিক সমালোচনাই বিরোধী দলের কাজ নহে। বিরোধী দলকে প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই গণস্বার্থের ও গণসমৃদ্ধির পরিপূরক কর্মসূচী।' আওয়ামী লীগের শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'আঃ মুঃ লীগ... উহার কর্মসূচীতে শোষণমুক্ত সমাজের কথাই ঘোষণা করে নাই– উহা প্রতিষ্ঠার শপথও ঘোষণা করিয়াছে।' বঙ্গবন্ধু তাঁর রিপোর্ট শেষ করেন এই বলে :

> আমাদের এই মহান কাউন্সিল অধিবেশন সাংগঠনিক ও অন্যান্য ব্যাপারে এমন গভীর বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্ত [গ্রহণ] করিবে যে, উহা আমাদের সংগঠনকে উদ্দীপিত, বিরোধীদের নিরস্ত ও সংশয়বাদীদের আমাদের সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক দুনিয়ার জন্য এক অমর ইতিহাস সৃষ্টি করিবে।

সভাপতির ভাষণ

দলের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কাউন্সিলে একটি লিখিত ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করে করাচিতে 'রাজ-প্রাসাদ' গড়া, পাকিস্তান জুট বোর্ড কর্তৃক পাট চাষিদের ন্যায্যমূল্য পাওনা থেকে কৌশলে বঞ্চিত করা, সংসদের আসন বণ্টনে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবি উপেক্ষা, সরকারি চাকরি ও সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানিদের ন্যায্য দাবির অস্বীকৃতি, পূর্ব পাকিস্তানে ৬ টাকার কাপড় ১৬ টাকায় এবং ১ আনার লবন ১৬ টাকা সের মূল্যে বিক্রয়–কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপন করে তিনি বলেন, 'আমি দেশের এই গুরুতর পরিস্থিতি নিয়া বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখিয়াছি। ইহার পাকাপাকি সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের কথা বিশেষভাবে ভাবিতে হইবে।' তিনি আরও বলেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা একরূপ নয়, সুতরাং দুই অংশের প্রোগ্রামও ভিন্ন হইবে।' পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন'-এর দাবি জানিয়ে তিনি এ মর্মে সংশ্লিষ্ট মহলের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, অন্যথায় 'মূল লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত স্টেটস্ আমরা পুনর্বিবেচনা করিতে বাধ্য হইব।' তিনি তাঁর অভিভাষণের শেষে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন সভার আসন্ন নির্বাচনের ওপর গুরুত্বারোপ করে সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 'সম্প্রীতি ও একতা' গড়ে তুলতে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থাধীনে (Joint Electorates) ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।[৯]

www.pathagar.com

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতি ও অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির ভাষণ এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশের পরপরই মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাসভবনে তলব করা হয়।[১০] এ ঘটনাও প্রমাণ করে কী বৈরী অবস্থার মধ্যে তাঁদের এ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত করতে হয়।

আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণ প্রসঙ্গে কাউন্সিলে বিতর্ক

আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আওয়ামী লীগের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত বা আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িকীকরণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। পরিবর্তিত জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন ৫২-র ভাষা-আন্দোলন ও ভাষা শহীদ, মুসলিম লীগ সরকার ও মুসলিম লীগ দল-বিরোধী তীব্র গণ-অসন্তোষ, লীগ নেতৃত্বের গণবিচ্ছিন্নতা এবং ভারত-পাকিস্তান আন্তর্দেশীয় সম্পর্কের উন্নতি[১১] ইত্যাদি বিবেচনায় সংগঠনের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত করার বিষয়টি কাউন্সিলে আলোচনার দাবি রাখে বলে বঙ্গবন্ধু মনে করেন। তাঁর সাংগঠনিক রিপোর্টে প্রচ্ছন্ন আকারে তিনি তা এভাবে উল্লেখ করেন :

> ঢাকা সিটি হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর মফঃস্বল পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই সমালোচনা শুনিতেছি যে, আওয়ামী মুসলিম লীগ আদর্শগতভাবে সকল স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিলেও উহার সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার জন্য সকলকে সমবেত করিতে পারিতেছে না। ... এই কাউন্সিল অধিবেশন এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন বলিয়া আমাদের একান্ত বিশ্বাস।[১২]

জানা যায়, কাউন্সিল উপলক্ষ্যে গঠিত বিষয় নির্বাচনি কমিটি (Subjects Committee) দলের নাম পরিবর্তন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পরও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। দলের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খান কাউন্সিলে এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সভার সভাপতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব আহ্বান করেন। কাউন্সিলরদের মধ্য হতে বিভিন্ন প্রস্তাব আসতে থাকে এবং এ নিয়ে সভায় এক পর্যায়ে তুমুল বিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বারবার আবেদন সত্ত্বেও উত্তেজনা প্রশমনে ব্যর্থ হয়ে সভার সভাপতি মওলানা ভাসানী কাউন্সিলরদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, 'তাঁহারা জাতির ভাগ্য নির্ধারণের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। কেহ যেন ইহাকে 'যাত্রার আসর' বলিয়া মনে না করেন।'[১৩] এ পর্যায়ে আবদুস সালাম খান, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ আবদুল আজিজসহ আরও অনেকে বিষয়টির ওপরে বক্তৃতা করেন। এক পর্যায়ে কাউন্সিলের সম্মুখে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এই কাউন্সিলেই এ বিষয়ে 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত' হবে, না তা সংগঠনের সভাপতির ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। এমনি এক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'নিজে ব্যক্তিগতভাবে অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষপাতী' বলে উল্লেখ করে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার মওলানা ভাসানীর ওপর ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তাঁর এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর মওলানা ভাসানী তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে 'তিনি ব্যক্তিগতভাবে অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী' একথা উল্লেখ করে বলেন যে, এ বিষয়ে তিনি হঠাৎ কিছু করার পূর্বে জনসাধারণ ও সংগঠনের প্রত্যেক

www.pathagar.com

জেলার সঙ্গে আরও সলা-পরামর্শ করে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের পরবর্তী বিশেষ অধিবেশনে তাঁর মতামত প্রদান করবেন।[১৪]

কর্মকর্তা নির্বাচন

কাউন্সিলের শেষদিন দলের কর্মকর্তা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাতে পার্টির সাধারণ সম্পাদক না হন সেজন্য প্রবীণ নেতৃত্বের একটি অংশ কাউন্সিল অধিবেশনের তারিখ ঘোষণার পর থেকে গোপনে তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুস সালাম খান, হাশিমউদ্দিন আহমেদ (ময়মনসিংহ), খয়রাত হোসেন (রংপুর), আলমাস আলী (নারায়ণগঞ্জ), আবদুল আউয়াল (নারায়ণগঞ্জ) প্রমুখ।[১৫] এঁরা প্রচারণা চালান একজন সিনিয়র নেতা দলের জেনারেল সেক্রেটারি হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই মহল প্রথমে আতাউর রহমান খান এবং পরে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাবেক (১৯৪৩-১৯৪৭) সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমকে দলের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত করার চেষ্টা গ্রহণ করেন। এঁদের বাইরেও কাউকে প্রার্থী করা যায় কিনা তাঁদের সে প্রচেষ্টাও ছিল কিন্তু কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন :

> কয়েকজন নেতা তলে তলে ষড়যন্ত্র করছে। তারা বলে বেড়ান একজন বয়েসী লোকের জেনারেল সেক্রেটারি হওয়া দরকার। দুঃখের বিষয় এই ভদ্রলোকদের এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ নাই যে, আমি জেল থেকে বের হয়ে রাতদিন পরিশ্রম করে প্রতিষ্ঠানের একটা রূপ দিয়েছি।[১৬]

যাহোক, মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান এঁরা চাচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধু পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হোন। কাউন্সিলের সাধারণ সদস্য প্রায় সকলেই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে। কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনের পর দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী কর্মকর্তাদের একটি তালিকা প্রণয়নের জন্য আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, আবুল মনসুর আহমদ ও বঙ্গবন্ধু এ চারজনকে দায়িত্ব দেন। তাঁদের প্রস্তুতকৃত তালিকা কাউন্সিলের সম্মুখে পেশ করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। দলের নির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন[১৭] :

সভাপতি	:	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
সহ-সভাপতি	:	আতাউর রহমান খান
	:	আবুল মনসুর আহমদ
	:	আবদুস সালাম খান
	:	খয়রাত হোসেন
সাধারণ সম্পাদক	:	শেখ মুজিবুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	কোরবান আলী
প্রচার সম্পাদক	:	আব্দুর রহমান
দপ্তর সম্পাদক	:	মোহাম্মদউল্লাহ
কোষাধ্যক্ষ	:	ইয়ার মোহাম্মদ খান

সদস্য : মুজিবুর রহমান (রাজশাহী), শামসুল হক (রাজশাহী), মশিউর রহমান

www.pathagar.com

(যশোর), আবদুল খালেক (যশোর), ডা. মাযহার উদ্দিন আহমেদ (রংপুর), রহিমুদ্দিন আহমেদ (দিনাজপুর), মজিবুর রহমান (বগুড়া), ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (পাবনা), সৈয়দ আকবর আলী (পাবনা), জহুর আহমদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম), আবদুল আজিজ (চট্টগ্রাম), আবদুর রহমান খান (কুমিল্লা), আবদুল বারি (কুমিল্লা), জসিমুদ্দিন আহমদ (সিলেট), সিরাজুদ্দিন আহমদ (নোয়াখালী), এ ডব্লিউ লকিতুল্লাহ (বরিশাল), আবদুল মালেক (বরিশাল), আবদুল হামিদ (ময়মনসিংহ), আছমত আলী খান (ফরিদপুর), খোদা বক্স (টাঙ্গাইল), আকবর হোসেন আখন্দ (বগুড়া), আবদুল হাই (যশোর), শেখ আবদুল আজিজ (খুলনা)।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠাকালে দলের জন্য সহ-সভাপতি ৫, যুগ্ম-সম্পাদক ১ ও সহ-সম্পাদকের ২টি পদ ছিল। ১৯৫০ সালে প্রণীত খসড়া গঠনতন্ত্রে ২টি সহ-সম্পাদকের স্থলে ৩টি সহ-সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালে ৫টি সহ-সভাপতির পদের স্থলে ৪টি সহ-সভাপতির পদের বিধান করা হয়। অপরদিকে, যুগ্ম-সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালে দপ্তর সম্পাদকের পদ না থাকলেও ১৯৫০ সালে প্রণীত খসড়া গঠনতন্ত্রে 'পার্মানেন্ট সেক্রেটারি' নামে সেটি সৃষ্টি করা হয় এবং বর্তমান কাউন্সিলে দপ্তর সম্পাদক নামে ঐ পদের নামকরণ করা হয়। এর বাইরে সাংগঠনিক সম্পাদক ও প্রচার সম্পাদকের পদ নতুন করে সৃষ্টি করা হয়। বিষয় কমিটিতে দীর্ঘ আলোচনার পর সম্মেলনে দলের যে ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়, তাতে এসব পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে মনে হয়।[১৮] লক্ষণীয় যে, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের নাম নতুন কমিটিতে নাই। অবশ্য তাঁর মানসিক সমস্যার তখন এতটাই অবনতি ঘটেছিল যে, তাঁর পক্ষে কোনো স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন এর অন্যতম সহ-সম্পাদক খন্দকার মোশতাক আহমদের নাম নতুন কমিটির কোথাও না থাকাটা ছিল সত্যিই কৌতূহলের বিষয়।

প্রতিষ্ঠার পর এটি ছিল আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল। নেতৃত্ব নির্বাচন, ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে আলোচ্য কাউন্সিলে দলের পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়া হয়। এ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এর পূর্বে (১৯৫২ সাল থেকে) তিনি ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের শুরু থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতির বাইরে বাঙালির স্বার্থের পক্ষে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারা হিসেবে আপসহীনভাবে অগ্রসর হওয়া, যা সর্ব পাকিস্তান পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন দলের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার প্রশ্নে স্পষ্টত প্রকাশ পায়।

তথ্যনির্দেশ

১. এ পর্যন্ত প্রকাশিত অধিকাংশ বইয়ে এই কাউন্সিলের তারিখ ১৪ই নভেম্বর উল্লেখ করা হয়েছে, যা সঠিক নয়। যেমন নূহ-উল-আলম লেনিন (রচিত ও সম্পাদিত), *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, ঢাকা ২০১৫, পৃ. ৩৬; আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, পৃ. ৩১। আসলে ঐ তারিখে ময়মনসিংহে দলের

www.pathagar.com

বিশেষ কাউন্সিল সভা হয়, ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে নয়। দ্রষ্টব্য, *আজাদ*, ৪ঠা জুলাই ১৯৫৩, পৃ. ১; *ঐ*, ১৫ই নভেম্বর ১৯৫৩, পৃ. ১

২. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৩৭
৩. বিস্তারিত ঐ, পৃ. ১১১, ১১৭
৪. *ঐ*, পৃ. ১৩৪
৫. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২০০-২০১
৬. *ঐ*; আরও Kamruddin Ahmad, *A Social History of Bengal*, Dacca 1970, pp. 102-103
৭. সমগ্র বিষয়টি বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে (পৃ ২১৬) তুলে ধরেন, যা খুবই প্রণিধানযোগ্য। ঘটনার বর্ণনাটি এরূপ : সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলে, তিনি বঙ্গবন্ধুকে বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কোনো এফিলিয়েশন নেয় নাই। আমি তো তোমাদের কেউ নই।' বঙ্গবন্ধু প্রত্যুত্তরে বলেন, 'আপনি তো আমাদের নেতা আছেনই। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আপনাকে তো নেতা মানে, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও আপনাকে সমর্থন করে।' বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, 'আপনি জিন্নাহ আওয়ামী লীগ করেছেন, আমরা নাম পরিবর্তন করতে পারব না। কোনো ব্যক্তির নাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ করতে চাই না। দ্বিতীয়ত আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, তার পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয়। ... যদি আপনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র মেনে নেন ...।' এরপর বঙ্গবন্ধু লেখেন, 'অনেক আলোচনার পরে তিনি মানতে রাজি হলেন এবং নিজ হাতে তাঁর সম্মতির কথা লিখে দিলেন।'
৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৩৭
৯. বিস্তারিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিলে (১৯৫৩) মওলানা ভাসানীর অভিভাষণ, *আজাদ*, ৪ঠা জুলাই ১৯৫৩, পৃ. ১, ২, ৫
১০. *ঐ*, পৃ. ১
১১. ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি এবং ভারত ও পাকিস্তান এ দুই রাষ্ট্রের সৃষ্টি, এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে লক্ষ-লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষের দেশান্তর ইত্যাদি ঘটনাও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। উভয় দেশে সংখ্যালঘুদের জীবন, সম্পদ হানির পাশাপাশি তাদের জন্য এক 'ভীতির রাজত্ব' বিরাজ করে। এদিকে, দেশ বিভাগের পরপর (১৯৪৭-৪৮) কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ-রকম পরিস্থিতিতে ১৯৫০ সালে দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মধ্যে উভয় দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে দুদেশের সমস্যার সমাধান মর্মে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, যা নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি নামে পরিচিত।
১২. দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট দুই
১৩. বিস্তারিত *আজাদ*, ৫ই জুলাই ১৯৫৩, পৃ. ১
১৪. *ঐ*, ৫ই জুলাই ১৯৫৩, পৃ. ১ ও ৮
১৫. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৩৭-২৩৯
১৬. *ঐ*, পৃ. ২৩৮
১৭. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, পৃ. ৩২
১৮. সংশোধিত আকারে গৃহীত নতুন গঠনতন্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

অধ্যায় : তিন

ময়মনসিংহে বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৩ : যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রসঙ্গ

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের চার মাসের সামান্য পর ময়মনসিংহের অলকা সিনেমা হলে ১৪-১৫ই নভেম্বর দুদিনব্যাপী দলের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] এতে সভাপতিত্ব করেন দলের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন দলের সহ-সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ। অধিবেশনে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর আহ্বায়ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যোগদান করেন। তাঁর সঙ্গে সীমান্ত প্রদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখর ও আজাদ পাকিস্তান পার্টির নেতা মিয়া ইফতেখারউদ্দীনও এসেছিলেন।

পটভূমি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও ব্রিটিশ শাসনাধীনে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন অনুযায়ী দেশের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা চলছিল। ৫ বছরের হিসেব ধরলে সে অনুযায়ী ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। কিন্তু নানা অজুহাতে শাসকগোষ্ঠী তা বিলম্বিত করে আসছিল। এর মূলে ছিল নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১ বছর ৮ মাসের সামান্য পরে (২৬শে এপ্রিল ১৯৪৯) টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থীর পরাজয় থেকে তা স্পষ্ট হয়। এই বিষয়ে বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর থেকে বছরের পর বছর ধরে ৩৪টি শূন্য আসনে মুসলিম লীগ সরকার আর কোনো উপনির্বাচন দেওয়া থেকে বিরত থাকে। ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকেই এটি স্পষ্ট হয় যে, সরকার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন আর বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না এবং সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে তা অনুষ্ঠিত হবে[২] (প্রকৃতপক্ষে তা ১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয়)। ১৯৫৩ সালের ৩-৫ই জুলাই অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনেও নির্বাচনের প্রসঙ্গটি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছিল। তাই প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের বিষয়টি সামনে রেখেই ময়মনসিংহে দলের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করা হয়।

কাউন্সিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রসঙ্গে বিতর্ক

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠলে ময়মনসিংহের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বেই আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে নির্বাচন যৌথ না এককভাবে হবে এ নিয়ে গোপনে-গোপনে দুটি ধারা বা পক্ষের সৃষ্টি হয়। একটি অংশ

www.pathagar.com

সরকারবিরোধী অন্যান্য দলের সঙ্গে যৌথভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে এবং অপর অংশ এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পক্ষে। প্রথম অংশের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুস সালাম খান, হাশিমউদ্দিন খান (ময়মনসিংহ) ও অন্যরা এবং দ্বিতীয় অংশে ছিলেন সভাপতি মওলানা ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরও অনেকে। আতাউর রহমান খান দ্বিতীয়মতের পক্ষে ছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবস্থানও ছিল প্রায় অনুরূপ। তবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে যাওয়ার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিল খুবই স্পষ্ট ও এর বিরোধী। সালাম খান-হাশিমউদ্দিন গ্রুপ, যাঁরা সংখ্যায় কম ছিল, তাঁদের লক্ষ্য ছিল ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটানো এবং ক্ষমতা লাভ করা। অপরদিকে, বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, যাদের আদর্শ নাই, নীতি নাই, যারা দলছুট বা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বা যুক্তফ্রন্ট গঠন করে কোনো লাভ নেই। কেননা 'ক্ষমতায় যাওয়া যেতে পারে, তবে জনসাধারণের জন্য কিছুই করা সম্ভব হবে না, আর এ ক্ষমতা বেশিদিন থাকবেও না'।[৩] যাহোক, কাউন্সিল অধিবেশনের প্রাক্কালে পরস্পরবিরোধী উভয় পক্ষের মধ্যে এক ধরনের অঘোষিত প্রতিযোগিতা এবং তা থেকে কিছুটা উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়।

কার্ডধারী প্রতিনিধির ছাড়া বাইরের কেউ কাউন্সিল অধিবেশনে প্রবেশ করে দলভারী করতে না পারে সেজন্য দলের সেক্রেটারি হিসেবে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করে বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ ও সাহসী বেশ কয়েকজনকে কাউন্সিল স্থলের প্রবেশপথে দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তাতে কাজও হয়।

মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে সকল জেলার প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। অধিবেশনের শুরুতে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে গণতন্ত্রে বিরোধী দলের আবশ্যকতা ও আসন্ন প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন যে, এ নির্বাচন হবে আওয়ামী লীগের জন্য নেতৃত্বের পরীক্ষা।[৪] তাঁর এ বক্তব্যের পর পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনের কার্যাবলি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। অতঃপর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বক্তব্য রাখেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখর ও মিয়া ইফতেখারউদ্দিন কাউন্সিলে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তব্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে ৯২-ক ধারায় জাতীয় ও পূর্ব বাংলার নুরুল আমিন মন্ত্রিসভার অপসারণের দাবি জানান। তিনি কী কারণে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হবে, তা এর সমর্থকদের কাছে জানতে চেয়ে ঘোষণা করেন, 'আমরা আমাদের কার্য্যসূচী কোরবানী দিব না।'[৫] তিনি বিনা বিচারে আটক রাখা নীতিরও তীব্র সমালোচনা করেন। পূর্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের এই কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে করাচি থেকে ঢাকা বিমান বন্দরে এসে পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জনগণের প্রতিনিধিত্বহীন গণপরিষদ বাতিল করে অনতিবিলম্বে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি জানান।[৬]

প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সরকারের লোকজনের সত্যিকার ইসলামি আদর্শে বিশ্বাস না করা, দেশের দুরবস্থা ও

www.pathagar.com

জনগণের দুর্ভোগের জন্য ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে দায়ী করা, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা কায়েমের আবশ্যকতা, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ ইত্যাদি দাবি তুলে ধরেন। তিনি কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার বিরোধিতা এবং 'তাহারা কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, তা মিথ্যা' বলে উল্লেখ করে আওয়ামী মুসলিম লীগের দাবি অনুযায়ী 'পররাষ্ট্র, মুদ্রাব্যবস্থা এবং দেশরক্ষা বাদে অন্য সকল ক্ষমতা প্রদেশসমূহের হাতে ন্যস্ত' করার দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।[৭]

দুদিনের কাউন্সিল অধিবেশনে পররাষ্ট্রনীতি ও যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিষয় দুটি ছিল প্রধান বিবেচ্য। প্রথমটির ওপর আলোচনা শেষে কাউন্সিল সভায় বঙ্গবন্ধু 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ' পররাষ্ট্রনীতির প্রস্তাব উত্থাপন করলে আবদুস সালাম খান এর বিরোধিতা করে বঙ্গবন্ধুকে 'প্রগতিবাদী' আখ্যায়িত করে আক্রমণাত্মক ভাষায় তাঁর সমালোচনা করেন। তবে কোনোরূপ ভোটাভুটি ছাড়াই বঙ্গবন্ধু উত্থাপিত প্রস্তাব পাস হয়।[৮]

এরপর কাউন্সিলে আসন্ন নির্বাচনে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা না-করা প্রশ্নে তুমুল বির্তক শুরু হয়। আবদুস সালাম খান, হাশিমউদ্দিন খান[৯] প্রমুখ ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন বা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ছিলেন, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পার্টির সহ-সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ উভয়ই[১০] তাঁদের দলে ছিলেন। ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনপন্থিরা অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে যাওয়ার প্রস্তাব কাউন্সিলে আনলে বঙ্গবন্ধু এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেন :

> আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য বিরোধী কোনো দল আছে কি না? যাদের নীতি ও আদর্শ নাই তাদের সাথে ঐক্যফ্রন্ট করার অর্থ হল কতকগুলি মরা লোককে বাঁচিয়ে তোলা। এরা অনেকেই দেশের ক্ষতি করেছে। রাজনীতি এরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য করে, দেশের কথা ঘুমের ঘোরেও চিন্তা করে না।[১১]

উল্লেখ্য, এ সময় আওয়ামী লীগই ছিল একমাত্র সংগঠিত বিরোধী দল। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেউ-কেউ দল গঠন করছিলেন, যেমন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের[১২] কৃষক শ্রমিক পার্টি (২৭শে জুলাই ১৯৫৩), মওলানা আতাহার আলীর নিজাম-ই ইসলামী (১৯৫৩) ইত্যাদি (পরবর্তীকালে যারা হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের শরিক দল)। হক সাহেবের সাবেক ভক্তরা তাঁর নতুন দলে এসে ভিড় করতে থাকল। এছাড়া ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগে তখন চলছিল মন্ত্রিত্ব-নেতৃত্বের প্রশ্নে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেখান থেকে হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)-র নেতৃত্বে কিছু লোক নতুন এ দলে যোগ দিল। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় এদের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন:

> আমার বক্তৃতায় একটু ভাবপ্রবণতা ছিল। কারণ এদের মধ্যে অনেকে ১৯৪৮, ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনকে দমাবার জন্য সকল রকম চেষ্টা করেছে। লীগ সরকার আমাদের দিনের পর দিন কারাগারে বিনা বিচারে বন্দি করে রেখেছিল।[১৩]

বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ছিল, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ভিত্তি ও জনসমর্থন, অপরদিকে মুসলিম লীগ সরকারের জনসমর্থনে ধস ও গণবিচ্ছিন্নতা, এমনি অবস্থায় আওয়ামী লীগ এককভাবেই নির্বাচনে জয়লাভ করবে আর যদি কোনো কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন

www.pathagar.com

নাও পায়, তাহলে আদর্শ নিয়ে বিরোধী দলে থাকাও উত্তম, কেননা 'রাজনীতি স্বচ্ছ থাকবে, জগাখিচুড়ি হবে না। আদর্শহীন লোক দিয়ে ক্ষমতায় গেলেও দেশের কাজ হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার হতে পারে।'[১৪]

কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত

মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ এতই তীব্র ছিল যে, তারা এর হাত থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছিল। ফলে বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের পক্ষে দেশে এক ধরনের সাধারণ জনমত গড়ে উঠেছিল। এটিই ছিল যুক্তফ্রন্টপন্থিদের প্রধান সম্বল। এরপরও, বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য অনুযায়ী, কাউন্সিলে ভোট হলে যুক্তফ্রন্টের প্রস্তাব পাস হতো না।[১৫] তেমনটিই হওয়ার কথা, কেননা অধিকাংশ কাউন্সিলরই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ত। তিনিই আওয়ামী লীগের মূল সংগঠক। সারাদেশ ঘুরে কঠোর পরিশ্রম করে তিনি এ সংগঠন গড়ে তুলেছেন। তবে প্রধানত জনমতের কারণে, আওয়ামী লীগ ঐক্য চায় না–এরূপ ধারণা যাতে জনমনে না হয়, তা পরিহার করতে বঙ্গবন্ধু কিছুটা নমনীয় অবস্থান গ্রহণে সম্মত হন। মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান এঁরাও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন।[১৬] ফলে দ্বিতীয় দিনের কাউন্সিল সভায় বিরোধী দলসমূহকে নিয়ে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৭] নির্বাচন প্রশ্নে আরও যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেগুলো ছিল :[১৮]

ক. ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন বা যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রশ্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীকে অন্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা প্রদান।

খ. সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীকে ১০ দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা প্রদান। কাউন্সিল কর্তৃক এসব সদস্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হবেন।

গ. মূলনীতি কমিটির (বিপিসি) রিপোর্টকে জাতির পক্ষে 'ক্ষতিকর' হিসেবে অভিহিত করে তা প্রত্যাখ্যান।

ঘ. বর্তমান গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে তদ্স্থলে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন নির্বাচনের দাবি।

ঙ. পূর্ববঙ্গে যাতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে, তজ্জন্য সরকারের সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরামর্শ করা।

এতদ্ব্যতীত কাউন্সিলে আরও যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেগুলো হলো :

১. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।
২. সুপারি ও লবণের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের আরওপিত ট্যাক্স প্রত্যাহার।
৩. ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথা উঠিয়ে দেওয়া।
৪. নিরাপত্তা আইন ও রাজবন্দিদের ওপর হতে অন্তরীণ আদেশ প্রত্যাহার এবং বিনা বিচারে আটক সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি।
৫. পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান মন্ত্রিসভার অপসারণ ও নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি।
৬. কমনওয়েলথের সঙ্গে পাকিস্তানের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি।

www.pathagar.com

৭. পাকিস্তানের কোনো প্রকার সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে ও 'শান্তির ক্যাম্পে' থাকার পক্ষে প্রস্তাব।

নির্বাচনি ইশতেহার গ্রহণ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সমাপ্তি অধিবেশনে ৪২-দফার একটি নির্বাচনি ইশতেহার গৃহীত হয়। এটি প্রণয়ন করেন দলের সহ-সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ।[১৯] এর প্রধান দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ :[২০]

১. পাট ও চা শিল্প জাতীয়করণ করা।
২. বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা রহিতকরণ।
৩. সকল নিরাপত্তা আইন রহিতকরণ।
৪. সংবাদপত্র, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে সকল বাধানিষেধ প্রত্যাহার করা।
৫. মন্ত্রীদের বেতন মাসিক এক হাজার টাকা ধার্য ও শাসনকার্যের ব্যয় হ্রাস করা।
৬. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত ইউনিটে পরিণত করে এর হাতে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও মুদ্রাব্যবস্থা ব্যতীত আর সব বিষয়ই ন্যস্ত করা।
৭. পূর্ববঙ্গকে দেশরক্ষার ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল করা। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ববঙ্গে একটি সামরিক কলেজ ও একটি অস্ত্রের কারখানা স্থাপনে চাপ প্রয়োগ করা।
৮. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।
৯. বিচার বিভাগ থেকে শাসন বিভাগ পৃথক করা।
১০. সকল বর্তমান ও প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমান ও প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী, বর্তমান ও প্রাক্তন এমএলএ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের ১৯৪০ সাল হতে তাঁদের টাকা-পয়সা ও সম্পত্তির হিসাব দাখিল করা। যথোপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারিলে তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।
১১. পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য বর্তমান গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন গণপরিষদ নির্বাচন এবং এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একযোগে কাজ করা।
১২. পরিষদে কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে তিনমাসের মধ্যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং আওয়ামী লীগের মনোনীত কোনো প্রার্থী উপর্যুপরি ৩টি উপনির্বাচনে পরাজিত হলে দলের মন্ত্রিসভার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা।
১৩. কুটির শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া।
১৪. মোহাজেরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
১৫. বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ তুলে দেওয়া।
১৬. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় ছুটির দিবস ঘোষণা করা।
১৭. স্কুল গৃহগুলির ওপর হতে হুকুমদখল প্রত্যাহার করা।
১৮. অল্পখরচে ও বিনাবেতনে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

আওয়ামী মুসলিম লীগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে ৫ বছরের মধ্যে এ পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করা হবে মর্মে নির্বাচনি ইশতেহারে অঙ্গীকার করা হয়।

কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাব ও নির্বাচনি ইশতেহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাতে জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও দাবির প্রায় সবকিছুই স্থান পেয়েছে। ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে এ বিশেষ কাউন্সিল ও পরবর্তী প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন ও ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা-শহীদ দিবসের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করবে, তা খুবই প্রত্যাশিত ছিল। এর পূর্বে একই বছর জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন থেকে দলটি 'বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা' করার জোর দাবি জানিয়ে আসছে। পুনরায় আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা থেকেই পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হয়, যা বিশেষ কাউন্সিলে গৃহীত ৪২-দফা নির্বাচনি ইশতেহারে গুরুত্বসহকারে স্থান পায়। শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ সামরিক জোটভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে দলের বৈদেশিক নীতি স্থির করে, যা নির্বাচনি ইশতেহারের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মন্ত্রী, এমপি, সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব দাখিল এবং যথোপযুক্ত প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হলে সম্পদ বাজেয়াপ্ত–এটি ছিল খুবই সাহসী পদক্ষেপ। দলের বিশেষ কাউন্সিলে গৃহীত ভারতের সঙ্গে পাসপোর্ট প্রথা বাতিল এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচনের পূর্বে মন্ত্রিসভা বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তাব ছিল যুগান্তকারী ও খুবই অগ্রবর্তী ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য, ৩৭ বছর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবি বাংলাদেশের রাজনীতিতে অন্যতম প্রধান ইস্যুতে পরিণত হয় এবং এক পর্যায়ে তা সংবিধানেও অন্তর্ভুক্ত হয় (১৯৯৬)।

জনসভা

দলের সে সময়কার রেওয়াজ অনুযায়ী কাউন্সিল অধিবেশনের শেষদিন অপরাহ্নে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ময়মনসিংহে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও অন্য নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তৃতায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণে ব্যর্থতা, বিনা বিচারে আটক রাখা সংক্রান্ত বিধি পাস, পাকিস্তানের জন্য এ পর্যন্ত কোনো শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে না পারা, পাটের মূল্য হ্রাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশচুম্বী মূল্য এসবের জন্য সরকারকে দায়ী করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় যুক্ত নির্বাচনেরও দাবি করেন।[২১]

কাউন্সিল-পরবর্তী ঘটনা

আওয়ামী মুসলিম লীগের ময়মনসিংহের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পর বিরোধী দলের সমন্বয়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এদিকে ১৯৫৩ সালের ১৬ই নভেম্বর কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি এ কে ফজলুল হকের কে এম দাস লেনের বাসায় অনুষ্ঠিত জেলা প্রতিনিধিদের এক জরুরি সভায় মুসলিম লীগ-বিরোধী দলগুলির সমন্বয়ে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই সঙ্গে ফজলুল হক ও আবদুল লতিফ বিশ্বাসকে সংশ্লিষ্ট দলগুলির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।[২২] উভয়

www.pathagar.com

দলের শীর্ষ নেতাদের একাধিক বৈঠক শেষে ৪ঠা ডিসেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনে ঐকমত্যের কথা ঘোষণা করা হয়।[২৩] মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নিজাম-ই-ইসলামী[২৪] ও হাজী মোহাম্মদ দানেশের গণতন্ত্রী দল[২৫] তাতে যোগ দেয়। এভাবে গঠিত হয় মুসলিম লীগ-বিরোধী নির্বাচনি জোট যুক্তফ্রন্ট। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হন এর চেয়ারম্যান। আওয়ামী লীগ থেকে আতাউর রহমান খান ও কৃষক শ্রমিক পার্টি থেকে কফিলুদ্দিন চৌধুরীকে জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং কামরুদ্দিন আহমদকে অফিস সেক্রেটারি করা হয়। তবে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী এবং তরুণ নেতৃত্বের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এর কর্ণধার।

গণতন্ত্রী, মধ্যপন্থি, ইসলামপন্থি ও বামপন্থি দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ছিল সত্যিকার অর্থে একটি ব্যাপকভিত্তিক নির্বাচনি জোট, যদিও আওয়ামী লীগ ছিল সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় একমাত্র দল। অপরদিকে, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ব্যক্তি-জনপ্রিয়তা তখনো ছিল কিংবদন্তিতুল্য। মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্যের বিরোধিতা ছিল এর মূল ভিত্তি। লক্ষ্য ছিল একটিই, মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটিয়ে যুক্তফ্রন্টের বিজয় নিশ্চিত করা।

সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম, যুক্তফ্রন্টের এমনি একটি ২১-দফা নির্বাচনি ইশতেহার ছিল। এটি রচনার ভার পড়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনি ইশতেহার রচয়িতা আবুল মনসুর আহমদ-এর ওপর। তিনি বাঙালির জাতীয় চেতনা অর্থাৎ ভাষা-আন্দোলন ও মৌলিক দাবি তথা পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এ দুটি বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিলে গৃহীত ৪২-দফা নির্বাচনি ইশতেহার কাটছাট এবং কিছু পয়েন্ট যুক্ত করে ২১-দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ভাষার প্রশ্নে ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ছাত্রদের জীবনদানের ঘটনা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই দফার সংখ্যা এভাবে স্থির করা হয়।[২৬]

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে[২৭] ২২৩টি আসন (ফ্রন্টভুক্ত প্রধান দল আওয়ামী মুসলিম লীগ এর মধ্যে ১৪৩টি) এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬৪ ভাগ ভোট লাভ করে। পক্ষান্তরে, সরকারি দল মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন[২৮] এবং শতকরা ২৭ ভাগ ভোট। বাকি ৫টি মুসলিম আসনের ৪টি পান স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এবং ১টি আবুল হাশিমের খেলাফতে রব্বানী পার্টি। এরা মিলে পায় ৯ ভাগ ভোট। এক কথায়, এ নির্বাচনি ফলাফল ছিল মুসলিম লীগের দুঃশাসন, দুর্নীতি, চরম ব্যর্থতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর জেল-জুলুম-নির্যাতন ও জাতি-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ব্যালট বিপ্লব। এ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ থেকে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী প্রার্থী অহিদুজ্জামান (ঠান্ডা মিয়া)-কে বিপুল ভোটে[২৯] পরাজিত করে প্রথমবারের মতো আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। প্রথমে ৩রা এপ্রিল (১৯৫৪) শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে ৪ সদস্যবিশিষ্ট[৩০] যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৫ই মে তা সম্প্রসারিত হলে মন্ত্রিসভায় আরও ১০ জনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কৃষি ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন।

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. দ্রষ্টব্য *আজাদ*, ১৫ই নভেম্বর ১৯৫৩, পৃ. ১; আরও দ্রষ্টব্য, *আজাদ*, ১৪ই নভেম্বর ১৯৫৩, পৃ. ১। নূহ-উল-আলম লেনিন তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, পৃ. ৩৭-এ লিখেছেন যে, ময়মনসিংহে দলের বিশেষ কাউন্সিল ১৯৫১ সালের ১১ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়, এই তথ্য সঠিক নয়। সঠিক তারিখ হলো ১৪-১৫ই নভেম্বর ১৯৫৩।

২. ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান গণপরিষদ এক আইনবলে পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক আইনসভার মেয়াদ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ পর্যন্ত বর্ধিত করে। দ্রষ্টব্য Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh : Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, University of Dhaka 1980, p. 165

৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৫০

৪. *আজাদ*, ১৫ই নভেম্বর ১৯৫৩, পৃ. ১

৫. *ঐ*

৬. *আজাদ*, ১৪ই নভেম্বর ১৯৫৩, পৃ. ১

৭. কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর সভাপতির ভাষণ, দ্রষ্টব্য, *আজাদ*, ১৫ই নভেম্বর ১৯৫৩, পৃ. ১

৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪৮

৯. হাশিমউদ্দিন আহমদ ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে শেরে বাংলা ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন মন্ত্রী হয়েছিলেন।

১০. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা ১৯৭৫, পৃ. ৩২২; শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪৬

১১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪৮

১২. এ সময় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা চলছিল। তিনি চাঁদপুরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আওয়ামী লীগের একটি সভায় বক্তৃতাও করেন। দ্রষ্টব্য শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪৪-২৪৫

১৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪৮

১৪. *ঐ*, পৃ. ২৪৯

১৫. *ঐ*, পৃ. ২৪৮-২৪৯

১৬. নীতিগতভাবে মনে মনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত একই কারণে মওলানা ভাসানী কাউন্সিলে তাঁর প্রথম দিনের ভাষণে বলেন, 'অত্যাচারী মোছলেম লীগ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য তাঁহার দল যুক্তফ্রন্ট গঠনে রাজি আছে।' *আজাদ*, ১৫ই নভেম্বর ১৯৫৩, পৃ. ১

১৭. *আজাদ*, ১৭ই নভেম্বর ১৯৫৩, পৃ. ১

১৮. *ঐ*, পৃ. ১ ও ৫

১৯. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ৩২২-৩২৩; আরও দ্রষ্টব্য, শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৫১

www.pathagar.com

২০. দ্রষ্টব্য 'আওয়ামী লীগের এশতেহার', *আজাদ*, ১৭ই নভেম্বর ১৯৫৩, পৃ. ১ ও ৬

২১. ঐ, পৃ. ৫

২২. ঐ, পৃ. ৬

২৩. দ্রষ্টব্য Najma Chowdhury, *Legislative Process in Bangladesh*, p. 158

২৪. নিজাম-ই-ইসলাম দলের প্রতিষ্ঠা ১৯৫৩ সালে। এটি ইসলামপন্থি একটি দল। এর প্রধান ছিলেন মওলানা আতাহার আলী। কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী এর সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে নিজাম-ই-ইসলাম থেকে ১৯৫৪ সালে ১৯ জন সদস্য আইনসভায় নির্বাচিত হন। এটি গণভিত্তিসম্পন্ন কোনো দল ছিল না। তবে, যুক্তফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত থাকায় নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রচারণা মোকাবেলায় সহায়ক হয়। নির্বাচনের পর এ কে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করলে এ দল থেকে একজন তাতে অন্তর্ভুক্ত হন। যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে ফজলুল হকের এক পর্যায়ে মতবিরোধ দেখা দিলে নিজাম-ই-ইসলাম এ কে ফজলুল হকের পক্ষ অবলম্বন করে।

২৫. গণতন্ত্রী দল-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে। ঢাকার আরমানিটোলার ময়দানে বামপন্থি কর্মীদের এক সম্মেলনে তেভাগা আন্দোলনের বিখ্যাত কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশকে (দিনাজপুর) সভাপতি ও মাহমুদ আলী (সিলেট)-কে সাধারণ সম্পাদক করে এ দল গঠিত হয়। এটি র‍্যাডিক্যাল কর্মসূচিতে বিশ্বাসী ছিল। রাজনৈতিক দলের চেয়ে বরং এটি ছিল বামপন্থি কর্মীদের একটি সংঘ বা গ্রুপ। এটি গঠনের পেছনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে হাজী মোহাম্মদ দানেশসহ এ দল থেকে ১৩ জন সদস্য নির্বাচিত হন। দলটি বেশিদিন টিকে থাকেনি।

২৬. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পৃ. ৩২৩

২৭. ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ১৯৫৪ সালেও বহাল ছিল এবং এ ব্যবস্থাধীনে ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০৯টি আসনের ২৩৭টি মুসলিম আসন এবং বাকি ৭২টি অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত।

২৮. নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত ফজলুল কাদের চৌধুরী (চট্টগ্রাম) নির্বাচনের পরপর মুসলিম লীগে যোগ দিলে এ দলের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১০।

২৯. বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অহিদুজ্জামান (ঠান্ডা মিয়া)-র চেয়ে ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হন।

৩০. শেরে বাংলা ছাড়া অপর তিনজন হলেন তাঁর দল কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার (বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়) ও সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) (শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প মন্ত্রণালয়) এবং নিজাম-ই-ইসলাম দলের আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (বেসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)।

www.pathagar.com

অধ্যায় : চার

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৫ : দলের নামের অসাম্প্রদায়িকীকরণ

১৯৫৫ সালের ২১-২৩শে অক্টোবর পুরান ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সারাদেশ থেকে ৭০০ জনের মতো কাউন্সিলর অংশগ্রহণ করেন।[১] অধিবেশনের উদ্বোধক ছিলেন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এতে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান ওসমানীও অধিবেশনে যোগ দেন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে এ কাউন্সিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে তা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। কাউন্সিলের প্রধান দিক ছিল দলের নামের অসাম্প্রদায়িকীকরণ। এছাড়া যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও এক ইউনিট প্রথা বাতিলের প্রস্তাব দুটিও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পটভূমি

১৯৫৩ সালের কাউন্সিল থেকে বর্তমান কাউন্সিলের মধ্যবর্তী সময়ের প্রধান ঘটনাবলির মধ্যে ছিল কেন্দ্র কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ও গভর্নরের শাসন জারি (৩০শে মে ১৯৫৪), চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী পেপার মিলস ও নারায়ণগঞ্জ আদমজি পাট কলে বাঙালি-বিহারি শ্রমিক দাঙ্গা (১৯৫৪), শেরে বাংলা ফজলুল হকের কোলকাতা সফর (৩০শে এপ্রিল ১৯৫৪) ও সেখানে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক' উক্তির অভিযোগ, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ (২৩শে জুলাই ১৯৫৪), পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ বাতিল (২৫শে অক্টোবর ১৯৫৪), মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র নেতৃত্বে 'কেবিনেট অব ট্যালেন্টস' (২৫শে অক্টোবর ১৯৫৪), সোহরাওয়ার্দীর আইনমন্ত্রী হিসেবে মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র মন্ত্রিসভায় যোগদান (২০শে ডিসেম্বর ১৯৫৪), পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে 'সংখ্যাসাম্য নীতি' (১৯৫৪), মারি চুক্তি (৭ই জুলাই ১৯৫৫), পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট গঠন (১৯৫৫), ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে বিরোধ, ফজলুল হকের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে অনাস্থা প্রস্তাব (১৯৫৫), আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কতিপয় সদস্যের ফজলুল হককে সমর্থন করায় দল থেকে বহিষ্কার, কৃষক শ্রমিক পার্টি নেতা আবু হোসেন সরকারের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার (১৯৫৫) প্রতি আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত সদস্যদের সমর্থন ও যোগদান, পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচনা, সেনা-আমলানির্ভর ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতার হাত বদল ইত্যাদি।

www.pathagar.com

'৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় সত্ত্বেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এ নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্থানীয় দোসরদের চরম ভরাডুবি ঘটে বটে। তবে নির্বাচনের এ রায় ছিল পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় শাসন-শোষণ, জাতি-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিদের গণপ্রতিবাদ। এর ফলে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কিছুতেই এ অবস্থা মেনে নিতে পারছিল না। তাই প্রথম থেকেই শুরু হয় তাদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। নির্বাচনের ১৫ দিনের মধ্যে ২৩শে মার্চ (১৯৫৪) পূর্ব পাকিস্তানের চন্দ্রঘোনা কর্ণফুলী পেপার মিলস-এ বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তাতে ১৩ জনের প্রাণহানি ঘটে। সরকার গঠনের কিছুদিন পর যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কোলকাতা সফরে যান। বহু স্মৃতিঘেরা এ কোলকাতা শহর। এখানে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সুদীর্ঘ ও মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয়। সফরকালে ৩০শে এপ্রিল এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগ-আপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙালিত্বকে কোনো শক্তিই কোনোদিন ভাগ করিতে পারিবে না। দুই বাংলার বাঙালি চিরকাল বাঙালিই থাকিবে।'[২] রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ সমর্থক *ডন* পত্রিকাসহ পাকিস্তানের অন্যান্য পত্রিকায় এ বক্তব্য বিকৃত করে ছাপা হয়। ২রা মে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের সম্মুখে জেল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় মহল্লাবাসীর মধ্যে এক সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষ যুক্তফ্রন্ট সরকারের জন্য ছিল খুবই বিব্রতকর। সবচেয়ে খারাপ ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে ১৫ই মে তারিখে। ঐদিন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হয় এবং অন্যান্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এতে মন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। প্রায় একই সময় ঢাকার অদূরে আদমজি পাটকলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধে। তাতে দেড় হাজারের মতো শ্রমিক নিহত হয়। এদের মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যাই ছিল বেশি। এমনই এক বৈরী অবস্থায় *New York Times* পত্রিকার সংবাদদাতা জন পি কালাহানকে দেওয়া মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের কথিত 'প্রয়োজনবোধে পূর্ব বাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে'[৩] এই সাক্ষাৎকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে একটি মোক্ষম অস্ত্র তুলে দেয়। কেন্দ্র কথিত এ উক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের আভাস পায়। উল্লেখ্য, সে সময়ে সামরিক সহযোগিতাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের দ্রুত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। ফজলুল হক তাঁর অবস্থান তুলে ধরে পত্রিকায় বিবৃতি দেন। কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে তিনি করাচি গিয়ে সরকারের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের নিকট তাঁর প্রকৃত অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হয়নি।

এভাবে সরকার গঠনের ৫৬ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ৩০শে মে (১৯৫৪) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত এবং পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন কায়েম হয়। ফজলুল হককে পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'আত্মস্বীকৃত বিশ্বাসঘাতক' (self-confessed traitor) হিসেবে আখ্যায়িত করে[৪] আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা এবং 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা' রক্ষায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ

www.pathagar.com

থেকে প্রচার করা হয়। চৌধুরী খলেকুজ্জামানকে সরিয়ে তদ্‌স্থলে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে পূর্ব বাংলার গর্ভনর করে পাঠানো হয়। শেরে বাংলা ফজলুল হককে নজরবন্দি করে রাখা হয়। বিরোধী দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ওপর নেমে আসে সরকারি দমন-পীড়ন-নির্যাতন। প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গতিবিধি সীমাবদ্ধ করা হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী তখন শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে ইউরোপে। তাঁর দেশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়। ইস্কান্দার মীর্জা ঘোষণা করেন, 'ভাসানী দেশে ফিরলে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হবে।'[৫] আইনসভার সদস্যসহ দলের শতশত নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার, অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ও পলাতকদের সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হয়। এভাবে আওয়ামী লীগের প্রায় ১২০০ নেতা-কর্মী এবং আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্রী দলের ৩০ জন আইন পরিষদ সদস্যকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।[৬] কিছুদিনের মধ্যে (২৩শে জুলাই ১৯৫৪) সরকারি এক ঘোষণায় কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়।

এদিকে সরকার পূর্ব বাংলার বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঐক্য বা যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার এক নীলনকশা নিয়ে অগ্রসর হয়। এরই অংশ হিসেবে শুরু হয় নতুন করে ষড়যন্ত্র আর বেচা-কেনার রাজনীতি। পাশাপাশি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে প্রবল হয়ে ওঠে সেনা-আমলা কর্তৃত্ব। দেখা দেয় একের পর এক ষড়যন্ত্র ও নেতৃত্বের চরম কোন্দল। এরই ধারাবাহিকতায় ২৫শে অক্টোবর ১৯৫৪ গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক প্রথম গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা করা হয়। একইদিন মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র নেতৃত্বে অন্যদের সঙ্গে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা, জেনারেল আইয়ুব খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (বেসামরিক আমলা) এদের অন্তর্ভুক্ত করে 'কেবিনেট অব ট্যালেন্টস' নামে কথিত তাঁর দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ৫ই আগস্ট ১৯৫৫ মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে সরিয়ে নিজে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন। কয়েক দিনের মধ্যে মোহাম্মদ আলী বগুড়া-কে সরিয়ে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী-কে কেন্দ্রে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

পাকিস্তানি রাজনীতির এ-রকম এক অবস্থায় দেশের উভয় অঞ্চলের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন অসুস্থ অবস্থায় চারমাস ধরে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে চিকিৎসাধীন। আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলের গ্রেপ্তারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মাধ্যমে পাকিস্তানে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় শাসকদের সঙ্গে জুরিখে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় এক ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করেন। শাসকদের একটি অংশও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এর ফলে দেশে ফেরার পর ১৯৫৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর তিনি মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। তাঁরই উদ্যোগে গ্রেপ্তারকৃত অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী মুক্তিলাভ করেন। প্রায় এক বছর দেশের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়ে অবশেষে আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ২৫শে

www.pathagar.com

এপ্রিল ১৯৫৫ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হন। এর পূর্বে ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৪) দলের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগার থেকে মুক্তি পান।

সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী থাকাকালে প্রধানত তাঁর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ১৯৫৫ সালের ৭ই জুলাই 'সংখ্যাসাম্য নীতি'র (parity) ভিত্তিতে আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব, রাষ্ট্রভাষা-প্রশ্ন, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, নির্বাচন ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা 'মারি চুক্তি' নামে পরিচিত।[৭] চুক্তিতে জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আইন পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সমান সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে একত্রিত করে এক ইউনিট গঠন করার সুপারিশে পূর্ব বাংলায় সাধারণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। উল্লেখ্য, এই চুক্তির ওপর ভিত্তি করেই ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়।

এদিকে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর নীলনকশা অনুযায়ী ফজলুল হক ও তাঁর দল কৃষক শ্রমিক পার্টির সঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগের দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে এবং শীঘ্রই তা প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ আইন পরিষদ সদস্যদের মন্ত্রিত্ব প্রত্যাশী ও রক্ষণশীল একটি অংশ ফজলুল হকের পক্ষ অবলম্বন করে। কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যকার এ বিরোধের পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করে। এরই অংশ হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর পর ফজলুল হকের মনোনীত আবু হোসেন সরকার-কে মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (৪ঠা জানুয়ারি ১৯৫৫)। ফজলুল হকের প্রথম দিকের নিষ্ক্রিয়তা এবং এরপর যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগ ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর অলিখিত সমঝোতার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসেবে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে।[৮] আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বাধীনে আইন পরিষদের আওয়ামী লীগের সদস্যদের অংশটি ফজলুল হককে সমর্থন দেওয়ায় অনাস্থা ভোট পাস করা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনার ফলে আবদুস সালাম খান ছাড়াও আওয়ামী লীগের ৮ জন[৯] আইন পরিষদ সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের আশীর্বাদ নিয়ে ৬ই জুন (১৯৫৫) আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় নতুন সরকার গঠন করা হয়। আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত অংশটি এতে যোগ দেয় এবং আবদুস সালাম খান ও হাশিমউদ্দিন খান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।[১০] কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের হকপন্থি অংশটির এ সরকার নিজেদের 'যুক্তফ্রন্ট সরকার' হিসেবে পরিচয় দিতে থাকে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায়[১১] ১০ই আগস্ট ১৯৫৫ মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং পরের দিন চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠিত হয়, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ফজলুল হক এ সরকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। অপরদিকে মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিত্বেরও অবসান ঘটে।

www.pathagar.com

১৯৫৪ সালের ৩০শে মে কেন্দ্র কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ও কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা, আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানীর দেশে প্রত্যাবর্তনের ওপর প্রায় একবছর ধরে নিষেধাজ্ঞা, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দীর্ঘ অসুস্থতা ও চিকিৎসার্থে বিদেশে অবস্থান, দলের সাধারণ সম্পাদক ও মূল সংগঠক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তার ও সাত মাসের মতো কারাবন্দিত্ব, শত শত নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার ও হুলিয়া এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এ-রকম অবস্থায় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যথাসময়ে কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠান কিছুতেই সম্ভব ছিল না। যাহোক, ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৪) কারামুক্তি লাভের পরপর বঙ্গবন্ধু দলের সংগঠনের কাজে বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর ১৯৫৫ সালের ২১-২৩শে অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের আয়োজন করা হয়।

কাউন্সিল অধিবেশন

২১শে অক্টোবর ছিল কাউন্সিল অধিবেশনের প্রথম দিন। দলের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সকাল ৮:৩০ টায় শুরু হয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলার পর পরবর্তী দিন বিকেল ৩টা পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়।

সোহরাওয়ার্দীর উদ্বোধনী ভাষণ

প্রথমে কাউন্সিলের উদ্বোধক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন। তাতে পাকিস্তানের সংকটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জরুরি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা, আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িকীকরণ, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার (Separate Electorates) স্থলে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা (Joint Electorates) প্রবর্তন, পাকিস্তানের 'স্থায়ীত্ব' ও 'অখণ্ডত্ব'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, পূর্ব বাংলার প্রতি শাসকগোষ্ঠীর অবিচার, পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষোভ, মোহাম্মদ আলীর স্থলে জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার গভর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হওয়া, মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র পরিবর্তে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর কেন্দ্রে সরকার গঠন ও এসবের নেপথ্য কাহিনী, ফজলুল হকের কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ চক্রের নিকট 'আত্মসমর্পণ', একটি 'চক্রের হাতে' দেশের নেতৃত্বভার ন্যস্ত হওয়া, জাতীয় বা দেশের স্বার্থের পরিবর্তে ক্ষমতাসীনদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে 'ক্ষমতার অপব্যবহার', প্রয়োজনে বিগত দিনের মতো 'আগামী ৮ বছরও' আওয়ামী লীগের বিরোধী দলে থাকার মানসিক প্রস্তুতি, মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র মন্ত্রিসভায় নিজের যোগদানের উদ্দেশ্য, গণপরিষদের নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন।[১২] আইনমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রে মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় তাঁর যোগদান সম্পর্কে বলেন, 'আমি এই বিশ্বাসে মোছলেম লীগের সহিত সরকারে যোগদান করিয়াছিলাম যে, আমার জাতীয় প্রচেষ্টার পথে [তারা] অগ্রসর হইবে এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং আইন সভার সমর্থনহীন মনোনীত মন্ত্রিসভার শাসন শেষ হইবে।'[১৩] পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরম নীতিহীনতা এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে পরিচালিত হওয়া ও এর ফল সম্বন্ধে বলেন, 'যাঁহারা ক্ষমতাসীন রহিয়াছেন, তাঁহারা জাতির নিকট প্রদত্ত ওয়াদা নিবৃত হইয়া স্বীয় স্বার্থ হাসিল করিয়া চলিতেছেন। ইহার ফল যে কি মারাত্মক হইতে

www.pathagar.com

পারে, ইহা তাঁহারা ভাবিতেছেন না। ইঁহারা নিজেদের কর্ম্মধারা দ্বারাই নিন্দিত হওয়ার যোগ্য এবং তাঁহারা কোনক্রমেই জাতীয় নেতৃবৃন্দের আপন দাবী করিতে পারে না।'[১৪] কাউন্সিলে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের আগের দিন ঢাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গণপরিষদে বিরোধী দল হিসেবে[১৫] আওয়ামী লীগ তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নে যে ভূমিকা পালন করে আসছে তার ব্যাখ্যা করে এজন্য সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপরিষদ গঠন এবং দেশের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কতিপয় মৌলিক নীতিতে 'সমঝোতার' আবশ্যকতা তিনি তুলে ধরেন।[১৬]

বঙ্গবন্ধুর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

সোহরাওয়ার্দীর উদ্বোধনী ভাষণের পর দলের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনের এক বিস্তারিত রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। এতে পাকিস্তানের দুবছরের 'ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক উত্থান-পতন', ৯২-ক ধারায় কেন্দ্র কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের পর তাঁকে ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার, বছরে ন্যূনপক্ষে একবার কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বানের বিধান থাকলেও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১৯৫৪ সালে তা না করতে পারা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, তা '৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে হঠাৎ করে ফজলুল হক,[১৭] মওলানা আতাহার আলী[১৮] এঁদের দল গঠন, যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা 'জগাখিচুড়ি দল' নিয়ে ঐক্য গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর নীতি ও আদর্শিক অবস্থান,[১৯] একই কারণে প্রথমদিকে তাঁর যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিরোধিতা এবং এজন্য 'জীবন নাশের ভয় দেখিয়ে [তাঁকে] বেনামী কয়েকখানা চিঠি দেওয়া', মুসলিম লীগের দুঃশাসন ও চরম ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে তখন পূর্ব বাংলায় গড়ে ওঠা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ময়মনসিংহে আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে (১৪-১৫ নভেম্বর ১৯৫৩) 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের প্রতি অবশেষে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন, শরিকদের কারণে ত্যাগী ও যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের অনেককে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে না পারা, নির্বাচনোত্তর যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরিক আওয়ামী মুসলিম লীগকে অন্তর্ভুক্ত না করে ফজলুল হকের তাঁর নিজ দল ও নিজাম-ই-ইসলামী-র প্রতিনিধিদের নিয়ে ৪-সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন, প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে মোকাবেলা ও ২১-দফা কর্মসূচির স্বার্থে আওয়ামী লীগের হকের সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় (১৫ই মে ১৯৫৪) যোগদান, আদমজি শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও অন্যান্য অজুহাতে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভায় যোগদানের পনের দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল, ফজলুল হকের 'আত্মজীবনী' লেখায় ব্যাপৃত বলে নীরব ভূমিকা পালন, হঠাৎ করে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রথম গণপরিষদ বাতিল ঘোষণা (২৫শে অক্টোবর ১৯৫৪), সম্ভাব্য সেনাশাসন থেকে দেশকে রক্ষা ও গণতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সোহরাওয়ার্দীর যোগদান, একই মন্ত্রিসভায় ফজলুল হকের প্রতিনিধি হিসেবে

www.pathagar.com

আবু হোসেন সরকারের অন্তর্ভুক্তি, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ফজলুল হকের 'গোপন আঁতাত' ও অন্যান্য কারণে তাঁর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অনাস্থা প্রস্তাব আনা, মন্ত্রিত্বের লোভে আওয়ামী লীগের ৩৪ জন আইন পরিষদ সদস্যের ফজলুল হকের পক্ষ অবলম্বন, ফলে দল থেকে তাঁদের বহিষ্কার, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে গণপরিষদের বিকল্প হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর 'শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন' গঠনের প্রস্তাব আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গ্রহণে অস্বীকৃতি, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে হলেও কী কারণে ও কী অবস্থায় আওয়ামী লীগ সংখ্যাসাম্য নীতি (parity) মেনে নেয় তার ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় গণপরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ফজলুল হক ও তাঁর সমর্থক এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে বিরোধ আরও তীব্র করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ববাংলা থেকে ৯২-ক ধারা রাতারাতি তুলে নিয়ে হকের মনোনীত প্রার্থী আবু হোসেন সরকারকে দিয়ে প্রদেশে নতুন সরকার গঠন, নতুন গণপরিষদ গঠিত হওয়ার পর মোহাম্মদ আলী বগুড়া-র পরিবর্তে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে সম্ভাব্য কোয়ালিশন সরকারে ৫-দফার ভিত্তিতে[২০] আওয়ামী লীগের যোগদান করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও ফজলুল হকের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী পদে 'বিনাশর্তে' সমর্থন দানে সম্মতি জ্ঞাপনে সে উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়া,[২১] পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের শাসন-শোষণ অব্যাহত ও তা পাকাপোক্ত করতে সেখানকার প্রদেশসমূহকে 'এক কলমের খোঁচায়' চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সরকার কর্তৃক 'এক ইউনিটে'[২২] রূপান্তরিত করা, আওয়ামী মুসলিম লীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণ, 'সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থাকে পূর্ববঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের মূল প্রতিবন্ধক' হিসেবে চিহ্নিত করা, পাটশিল্পকে জাতীয়করণের দাবির পুনরুল্লেখ, শিল্প-বাণিজ্য বিকাশের উপযোগী শিল্পনীতি গ্রহণ করে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূর করা, শিল্পপতি ও মুনাফাবাজদের স্বার্থে শিল্পনীতি ও পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার ফলে শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার ওপর এর প্রভাব, দেশে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার ব্যাপারে সরকারের ঔদাসীন্য, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলনে ব্যর্থতা, গরিব জনগণের স্বাস্থ্য সমস্যা, বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে 'ভারতের সহিত সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা' গ্রহণের তাগিদ, সংগঠন, মতপ্রচার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ জনগণের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করা, 'সমাজ ব্যবস্থা নির্বিশেষে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সহিত সহ-অবস্থান' ও 'বিশ্ব শান্তির' পক্ষে রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি গুরুত্ব সহকারে স্থান পায়।[২৩] রিপোর্টের শেষ অংশে সংগঠন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শক্তিশালী সংগঠন, দলের কর্মীদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সংগঠনের শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে নীতিভ্রষ্ট, সুবিধাবাদীদের দ্বারা সংগঠন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সম্বন্ধে বলেন :

> অতীতে এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, কতিপয় সুবিধাবাদী ব্যক্তি আমাদের সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনুরূপ দুর্বলতা অভূতপূর্ব না হলেও সংগঠনের পক্ষে মারাত্মক। তাই আওয়ামী লীগকে দৃঢ় সংগঠনের উপর দাঁড় করিয়ে একটি সত্যিকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কাজকেই বর্তমানে আমরা প্রধানতম কর্তব্য বলে মনে করি।[২৪]

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু রিপোর্টে সাংগঠনিক তৎপরতা সম্বন্ধে কাউন্সিলকে অবহিত করেন যে, প্রদেশের সকল জেলায় এবং শতকরা ২৫ ভাগ ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের সংগঠন হয়েছে। শক্তিশালী সংগঠনই 'আমাদের পরিপূর্ণ সাফল্যের পক্ষে আগাইয়া লইয়া যাইবে' এ কথা বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, 'ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে আমরা প্রদেশের সকল ইউনিয়নে এমনকি সকল গ্রামেই আওয়ামী লীগের ঝান্ডা উড়াতে সক্ষম হব।'[২৫] পরিশেষে, শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে উপস্থিত কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বলেন, 'এই মহান কাজে আপনারা সর্বশক্তি নিয়োগ করুন এবং দেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক কর্মীকে আমাদের ত্যাগ ও কর্মক্ষমতা দিয়ে আকৃষ্ট করে তুলুন।'[২৬] দেশবাসীর উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, '...আপনারা দলে দলে আওয়ামী লীগে যোগদান করে জাতির মুক্তির পথকে প্রশস্ত করুন।'[২৭]

মওলানা ভাসানীর সভাপতির ভাষণ

কাউন্সিল সভার সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে :[২৮] আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানে বিলম্বের কারণ, পাকিস্তান আন্দোলনের পেছনে সাধারণ মানুষের যে বিপুল স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক তা ধূলিসাৎ হওয়া, আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি, শুরু থেকে নতুন এ দলের ওপর সরকারের দমন-পীড়ন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের একটি শক্তিশালী জন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠা, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সরকার-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা, যুক্তফ্রন্টের মহাবিজয়কে ঘিরে জনগণের মধ্যে নতুন করে সৃষ্ট উৎসাহ ও আশাবাদ কীভাবে দ্রুত নির্বাচন-পরবর্তী ঘটনায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তা, নীতি ও আদর্শের কারণেই[২৯] যুক্তফ্রন্ট থেকে আওয়ামী লীগের বের হয়ে আসা, যুক্তফ্রন্টভুক্ত ফজলুল হক পন্থিদের ২১-দফা নির্বাচনি কর্মসূচির প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস বা অঙ্গীকারের অনুপস্থিতি, গণধিকৃত মুসলিম লীগের সঙ্গে হকপন্থী যুক্তফ্রন্টের আঁতাত, দ্বিতীয় গণপরিষদে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিরোধী দলের ভূমিকা পালন, পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব ও 'ভাগ্যনিয়ন্তা' হয়ে বসা, ৪ মাসেও আবু হোসেন সরকার কর্তৃক পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপনা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান না করা, পরিষদের সভা আহ্বানের দাবি, ফজলুল হক-সমর্থিত আবু হোসেন সরকার-এর তথাকথিত যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্তৃক ২১-দফা কর্মসূচির অন্যতম ভাষা-শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি দিবস ঘোষণা, বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণাগার করা এর কোনোটিই কার্যকর না করে 'বাংলা ভাষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা', ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন বৈঠকে 'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রস্তাব পাসের' দাবি, 'পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকারের সকল অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার প্রবর্তন' এবং ''স্কুল-কলেজের অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় মুদ্রিত' করার দাবি, দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রাব্যবস্থা এ তিন বিষয় ছাড়া আর সকল বিষয় আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া, নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ববঙ্গে স্থাপন, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রাদেশিক সরকারের হাতে

www.pathagar.com

রাখা, জমিদারি ক্রয় আইন বাতিল করে ২১-দফা দাবি অনুযায়ী বিনা খেসারতে জমিদারি ও মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ আইন পাস, প্রাইমারি শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করা, পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করা, বেকারত্ব, ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিক সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, কুটির শিল্পের প্রতি সরকারের আর্থিক সহায়তা, পাটের ন্যূনতম দাম বেঁধে দেওয়া, লাইসেন্স তুলে দেওয়া এবং জুটবোর্ড কেলেঙ্কারির তদন্ত, সীমান্ত চোরাচালান ও কালোবাজারি বন্ধে পাটচাষি ও কৃষকদের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে নদী, নালা, খাল খনন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বন্যা রোধে অবিলম্বে বন্যানিরোধ কমিশন গঠন, ভারত ও তিব্বত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে বের করা, মাথাভারী প্রশাসনের নীতি পরিহার, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য হ্রাস, ২১-দফা দাবি অনুযায়ী মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকা ধার্য করা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করে তা মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিল পাসের সমালোচনা, লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির পুনরুল্লেখ, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন, সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন প্রতিরক্ষা চুক্তিসহ সামরিক জোট বা যুদ্ধনীতির সমালোচনা, জোটনিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি, সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা ও এশিয়া হতে সর্বপ্রকার ঔপনিবেশিকতার অবসানে আওয়ামী লীগের সমর্থন, আওয়ামী মুসলিম লীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে দলের ভেতরে ও বাইরে সাধারণ জনমত সৃষ্টি ইত্যাদি।

লক্ষণীয় যে, দলের সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ও সভাপতির ভাষণ উভয় বিষয়গতভাবে সমধর্মী। এর ভেতর দিয়ে দেশের তৎকালীন বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধের রূপ বা প্রকৃতির প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। উভয় নেতার বক্তব্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনার পাশাপাশি দলের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি বিশেষ করে বিগত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন উপলক্ষে গৃহীত ২১-দফা দাবির বিভিন্ন বিষয় গুরুত্ব সহকারে স্থান পায়।

আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণ

আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণ ছিল কাউন্সিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। স্মর্তব্য, ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠাকালে দলের নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। 'মুসলিম' শব্দটি নামের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও চেতনাগতভাবে এটি ছিল অসাম্প্রদায়িক। ভারত বিভক্তির সময় যেভাবে ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, সে পরিস্থিতিতে জিন্নাহ'র দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা দূরে থাক, বিরোধী দল গঠনই সহজসাধ্য ছিল না। প্রধানত নতুন দলের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ধর্মীয় অস্ত্র ব্যবহারের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কৌশলগত কারণে দলের এভাবে মুসলিম নামকরণ করা হয়। যাহোক, এরূপ নামকরণের কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্য ধর্ম মতালম্বীদের এর সদস্যপদ লাভ সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরম অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা

www.pathagar.com

বিশেষ করে ৪৮ ও ৫২-র ভাষা-আন্দোলনের কারণে দ্রুত গণবিচ্ছিন্ন ও গণধিকৃত হয়ে পড়া-জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িকীকরণের ক্ষেত্র তৈরি হয়। তাই পূর্বে ১৯৫৩ সালে দলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিলে বিষয়টি আলোচনায় আসে এবং দলের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাংগঠনিক রিপোর্টেও তা স্থান পায়। সম্ভবত ১৯৫৪ সালের আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে নাম পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন হবে না ভেবে নেতৃবৃন্দ তখন আর অগ্রসর হননি। তবে ঐ কাউন্সিল অধিবেশনে দলের সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও জনমত নিরূপণ করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার দেওয়া হয়। তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তা বর্তমান কাউন্সিলের (১৯৫৫) হাতে ছেড়ে দেন।

আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দীর্ঘ ৫০ মিনিট বক্তৃতা করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে একে অসাম্প্রদায়িক করার ক্ষেত্রে যুক্তি দেখাতে গিয়ে তিনি পাকিস্তান আন্দোলন ও ভারত বিভক্তির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'ভারতের হিন্দু কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার দেয় নাই বলিয়া মুসলমানরা পাকিস্তানের দাবী করিয়াছিল।'[৩০] প্রায় অনুরূপভাবে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর মুসলিম লীগ সরকার হিন্দুদিগকে তাদের 'ন্যায্য অধিকার' হতে বঞ্চিত করে আসছে। এর ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে 'আনুগত্য' তথা জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠা সম্ভব নয়—এ অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য আজ হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া কাজ করিয়া যাইতে হবে। মনে রাখিতে হইবে আমরা সকলে পাকিস্তানী।'[৩১]

উল্লেখ্য, আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে এর একদিন পূর্বে ঢাকা পৌঁছার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, 'অবস্থার পরিবর্তনের সাথে দলীয় নীতিরও পরিবর্তন হয়।'[৩২] আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে কি-না, সে সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি ঐ সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'প্রতিষ্ঠানে গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত কতিপয় ব্যক্তি বা প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হইতে পারে না। আর প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই ধরনের কোনো প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়ও, তবে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের।'[৩৩] দলের অসাম্প্রদায়িকীকরণের ব্যাপারে তাঁর এ বক্তব্য ভিন্ন কিছু ছিল না। তিনি এ দ্বারা পদ্ধতিগত দিকটিই তুলে ধরেন। সে সময় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় আওয়ামী মুসলিম লীগের অধিভুক্ত ছিল। শাসনতন্ত্র-গঠনতন্ত্র মেনে চলা ছিল সোহরাওয়ার্দীর আদর্শ।

অপরদিকে, দলের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিলে তাঁর বার্ষিক রিপোর্টে প্রতিষ্ঠাকালে দলের 'মুসলিম' নামকরণের যৌক্তিকতা এবং পরিবর্তিত

www.pathagar.com

অবস্থায় এর দ্বার সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করার আবশ্যকতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন :

> বন্ধুগণ! একথা অনস্বীকার্য্য যে, যেসময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় তখনকার বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সংগঠনকে একটি "সাম্প্রদায়িক" প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হয়েছিল। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের ধর্ম্মানুরাগের সুযোগে ইসলামকে হাতিয়ার করেই তার শাসন অব্যাহত রেখেছিল। জনগণও তখন লীগ সরকারের বিভ্রান্তি হতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে সক্ষম হয়নি। এ অবস্থায় আমাদের সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক করা সম্ভব হলেও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবের মোকাবিলা করার কাজে তা ব্যর্থ হতো। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থান আর নেই। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আজ অবসান ঘটেছে। ... আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে এ-কথা ঘোষণা করতে পারি যে, দেশের সকল ধর্ম্মের সকল বর্ণের এবং সকল ভাষাভাষী মানুষকে আজ একটি গণপ্রতিষ্ঠানে সমবেত [করা] প্রয়োজন। বস্তুত, আওয়ামী লীগ দলকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য অবারিত করার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের প্রগতিশীল ভূমিকাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হব। অদ্যকার অধিবেশনে এই বিষয়টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।[৩৪]

দলের সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িকীকরণের ব্যাপারে পূর্বের কাউন্সিলে (জুলাই ১৯৫৩) তাঁর ওপর চূড়ান্ত ভার অর্পণ করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কাউন্সিল অধিবেশনের প্রথম দিন কাউন্সিলরদের উদ্দেশে সভাপতির ভাষণে বলেন :

> আমি ভিন্ন ভিন্ন জেলা, মহকুমা আওয়ামী লীগ কর্মীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, দেশের অধিকাংশ লোকই, বিশেষত কর্মীদের বহুলাংশ প্রতিষ্ঠানকে অসাম্প্রদায়িক করার শুধু পক্ষপাতীই নন, জোর দাবিও জানাইয়াছেন।[৩৫]

কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের যে অধিবেশনে দলের অসাম্প্রদায়িক নামকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দী উত্থাপিত ঐ প্রস্তাবের ওপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মওলানা ভাসানী দলের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দ কেন যুক্ত করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন :

> পাকিস্তান হওয়ার পর যাঁহারা সরকারের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, সরকারের হাতে তাঁহারা কিরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন, পাকিস্তানের প্রত্যেকটি লোক তাহা জানে। প্রতি কথায় কথায় সরকার তাঁহাদিগকে "রাষ্ট্রদ্রোহী" "ভারতের দালাল" ও "পঞ্চম বাহিনী" আখ্যা দেয়।...ঢাকায় ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণ বাংলা ভাষার আন্দোলন আরম্ভ করে। সরকার তখন এই আন্দোলন পায়জামা পরিহিত হিন্দুদের সৃষ্ট বলিয়া অপপ্রচার চালাইতে শুরু করে।...এই অবস্থায় সেই সময় যদি আমরা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতাম, তাহা হইলে সূচনায়ই তাহার মৃত্যু হইত।[৩৬]

এরপর তিনি প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়ার পূর্বে বলেন, 'আমি সমগ্র প্রদেশ সফর করিয়া আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক করার দাবী উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী

www.pathagar.com

হিসেবে আমি গণতান্ত্রিকভাবে আপনাদের মতামত জানিতে চাই।' অতঃপর প্রস্তাবটি ভোটে দিলে তা গৃহীত হয়। উপস্থিত প্রায় ৭'শ কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র ৫ জন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়।[৩৭] উল্লেখ্য, ১৯৫৩ সালে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক নামকরণের আলোচনাকালে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বাধীন একটি অংশ (যারা পরবর্তীকালে ভিন্ন কারণে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে গঠিত তথাকথিত যুক্তফ্রন্ট সরকারে যোগ দেয়) তখন এর বিরোধিতা করেছিল।[৩৮]

কাউন্সিল অধিবেশনে নামকরণ পরিবর্তন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর দলের কতিপয় পরিষদ সদস্য 'প্রতিষ্ঠানের নাম' ও 'মূলনীতি'র কতগুলিতে[৩৯] মৌলিক পরিবর্তন আনায় সে বিষয়ে বিবেচনার জন্য অবিলম্বে পার্টির পার্লামেন্টারি শাখার সভা অনুষ্ঠানের 'রিকুইজিশন নোটিশ' পেশ করেন। এতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন এস ডব্লিউ লতিকুল্লাহ (বরিশাল), শামছুল হক (রাজশাহী), মো. ওয়ালিউল্লাহ (ত্রিপুরা), আবদুল হামিদ মজুমদার (ত্রিপুরা), আবদুর রহমান মিয়া (রংপুর), এ কে এম রফিকুল হোসেন (ত্রিপুরা) প্রমুখ।[৪০]

'আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর নাম পরিবর্তন করে 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ ছিল এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এর ফলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণের সকল অংশের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা রইল না। এরপর থেকে বিগত ৬ দশকেরও অধিক সময় ধরে আওয়ামী লীগ এদেশের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারাকে বলিষ্ঠভাবে ধারণ ও তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ

পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে, না যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে—এটি ছিল আওয়ামী লীগের ১৯৫৫ সালের কাউন্সিলের অপর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। স্মর্তব্য, ১৯০৬ সালে ব্রিটিশ ভারতে আগা খানের নেতৃত্বে মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় ৩৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল সিমলায় গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা (Separate Electorate) দাবি করে। সর্বক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে পিছিয়ে থাকা ছিল তাঁদের দাবির পক্ষে প্রধান যুক্তি।[৪১] মুসলমান ও হিন্দু ভোটারদের তাদের স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের জন্য পৃথকভাবে পূর্বনির্ধারিত সংখ্যক আসনে ভোট দিয়ে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকারই হলো এ ব্যবস্থা। যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা (Joint Electorate) হলো এর বিপরীত। মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবি অনুযায়ী ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনে তা গৃহীত হওয়ার পর থেকে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যকর হয়। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোটারদের বিভাজন ও নির্বাচন হওয়ায় এটি 'সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা' (Communal Electorate) নামেও অভিহিত। অনেকে মনে করেন, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কালক্রমে বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে, যার চূড়ান্ত পরিণতি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা।[৪২] পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেও দীর্ঘ ৯ বছর এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে।[৪৩] ১৯৫৪ সালের পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন এ ব্যবস্থাধীনেই অনুষ্ঠিত হয়। একক জাতি ও রাষ্ট্র গঠনে এ নির্বাচন ব্যবস্থা যে খুবই অন্তরায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতাগণ শুরু থেকেই এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন। শুরুতে যে কারণে দলের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দ যুক্ত করা হয়েছিল, ঠিক একই কারণে নির্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তখন তাঁরা প্রকাশ্যে মতামত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকেন। ৪৮ ও ৫২-র ভাষা-আন্দোলন এবং ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর সম্পূর্ণ অনুকূল ভিন্ন এক অবস্থার সৃষ্টি হলে, এবার কালবিলম্ব না করে নেতৃবৃন্দ দলের অসাম্প্রদায়িকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আর এর সঙ্গে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ ছিল খুবই যৌক্তিক ও স্বাভাবিক ঘটনা।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে ১৯৫৫ সালে দলের কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ক্ষুরধার যুক্তি সহকারে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন যে, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য, সংহতি ও উন্নয়নের স্বার্থে 'যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া আমাদের মধ্যকার বিভেদের অবসান করিতে হইবে।'[৪৪] সোহরাওয়ার্দী ছিলেন খুবই প্রাজ্ঞ ও ধীমান রাজনীতিক। তাই তিনি আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশনের একদিন পূর্বে ঢাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে 'অবস্থার পরিবর্তনের সাথে দলীয় নীতিরও পরিবর্তন হয়' মর্মে যে উক্তি করেছিলেন, যা ইতোমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে, তা দলের অসাম্প্রদায়িকীকরণের পাশাপাশি যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। বস্তুত, উভয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেই সোহরাওয়ার্দী তাঁর ঐ উক্তি বা মন্তব্য যে করেছিলেন, ঘটনাক্রম দ্বারা তা প্রমাণিত।

দলের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নির্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, 'পাকিস্তানে শুধু মুসলমানই পাকিস্তানী নহে, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, হিন্দু সকলেই পাকিস্তানী জাতি।' কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র এর নাগরিকদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে পারে না– একথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'পাকিস্তানে দ্বি-জাতিতত্ত্বের অবসান করিতে হইলে স্বতন্ত্র [নির্বাচন] প্রথার বিলোপ সাধন করিতে হইবে।'[৪৫] যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার বিরোধিতাকারীদের 'দালাল' হিসেবে আখ্যায়িত করে ভাসানী প্রথম দিনের অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির অভিভাষণে যুক্তি দেখান, 'পাক-ভারতে বহুকাল যাবৎ লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যুক্ত নির্বাচন হইয়া আসিতেছে, কেহ কোনদিন কোন রকম আপত্তি করে নাই।'[৪৬] অতঃপর অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কাউন্সিলে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাব

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের শেষদিনে ৮০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :[৪৭]

www.pathagar.com

১. যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন : এ প্রস্তাবে গণপরিষদের সদস্যদের নিকট মুসলমান ও অমুসলমান সকলের জন্য যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, জাতীয় ঐক্য ও দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার খাতিরে যুক্ত নির্বাচন অপরিহার্য।

২. এক ইউনিট বিল : এ সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এক ইউনিট বিল পাশ করা হয়েছে।[৪৮] আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তারা এক ইউনিট আইন পুনর্বিবেচনা করবে এবং সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনমত যাচাই করার পর তারা জনগণের মতামতের পূর্ণ মর্যাদা দান করবে।

৩. মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ : ১৫ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে আরও সম্প্রসারিত করার সরকারি উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করা হয় এবং বলা হয় যে, মন্ত্রিসভা আরও সম্প্রসারিত করার অর্থ প্রাদেশিক রাজস্বের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪. জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ : অবিলম্বে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি করা হয়।

৫. পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান দাবি করে প্রস্তাব।

৬. ছাত্র ও রাজবন্দিদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গৃহীত প্রস্তাব।

৭. প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের খালি আসনসমূহে উপ-নির্বাচনের দাবি।

৮. রাজবন্দিদের মুক্তিতে ধন্যবাদ : এ প্রস্তাবে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য সরকার ও মন্ত্রিসভাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

৯. জননিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবি।

১০. সার্টিফিকেট প্রথায় খাজনা আদায় বন্ধের দাবি।

১১. পাটের বাজারে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে পাটচাষীদের ন্যায্যমূল্য দিতে না পারায় মন্ত্রিসভার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন।

১২. বাণিজ্য চুক্তি : (ক) পাট ও সূতার বিনিময়ে যেকোনো দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট সুপারিশ করে প্রস্তাব। (খ) পাকিস্তানের আর্থিক ও শিল্পোন্নয়নের জন্য যেকোনো দেশ হতে সম্মানজনক শর্তে আর্থিক ও শিল্প-সাহায্য গ্রহণ করার সুপারিশ।

১৩. যুক্তফ্রন্টের সমালোচনা : হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রে মুসলিম লীগের সঙ্গে যোগ দিয়ে ২১-দফার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়। এছাড়া ৯৩-ধারার সংযোজন[৪৯] ও করাচিকে ফেডারেল মর্যাদায় না রেখে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তিকরণ এ দুই বিষয়ের প্রতি যুক্তফ্রন্টের সমর্থন দান এবং গণপরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করায় এর সমালোচনা করে প্রস্তাব।

১৪. সামরিক চুক্তি : পাকিস্তান অন্যান্য দেশের সঙ্গে যে-সমস্ত সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, সেগুলি শীঘ্রই ফেডারেল আইন পরিষদে

www.pathagar.com

উত্থাপন করতে হবে। ফেডারেল আইন পরিষদ যে সব চুক্তি অনুমোদন করবে না, সেগুলি বাতিল করে দিতে হবে। সম্মেলনে আরও দাবি করা হয় যে, জরুরি অবস্থায় পাকিস্তান যে-সমস্ত সামরিক ও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে সেগুলি অনুমোদনের জন্য ৩ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় আইন সভায় পেশ করতে হবে।

১৫. বান্দুং সম্মেলন : ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ের এশীয়-আফ্রিকান সম্মেলনে যে মূলনীতি গৃহীত হয়েছে, আওয়ামী লীগ তার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে।

সংশোধিত গঠনতন্ত্র

দলের পূর্ববর্তী গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের আবশ্যকতা দেখা দেওয়ায় ৫ই এপ্রিল ১৯৫৪ আব্দুল হামিদ চৌধুরী এমপিএ-কে আহ্বায়ক করে একটি গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমান কাউন্সিল সভার সময় বিষয় নির্বাচনি কমিটিতে দীর্ঘ ১১টা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর ঐ কমিটি কর্তৃক প্রণীত সংশোধিত গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। এরপর সাব-কমিটির আহ্বায়ক কর্তৃক তা কাউন্সিলে পেশ করা হলে কাউন্সিল সামান্য পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে তা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে।[৫০]

১৯৫৫ সালের কাউন্সিলে দলের অসাম্প্রদায়িকীকরণের ফলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর স্থলে নতুন নাম 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সর্বপাকিস্তান ভিত্তিক বা কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে এর সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা হয়, 'এই প্রতিষ্ঠান ইহার গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচীর স্বীকৃতির ভিত্তিতে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক শাখা হিসাবে গণ্য হইবে।'

নতুন গঠনতন্ত্রে গৃহীত নীতি ও উদ্দেশ্য : (১) গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হবে। কোরান ও সুন্নার মূলনীতির বিরুদ্ধে কোনো আইন রচিত হবে না। এ বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ পূর্বে এভাবে ছিল না। তখন বলা হয়েছিল, এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে 'ইসলামের সত্যিকার ধারণা' ও 'উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ' মানুষের মাঝে প্রচার।[৫১] সম্ভবত দলের অসাম্প্রদায়িক নামকরণ হওয়ায় এর ১ নম্বর নীতি ও উদ্দেশ্য হিসেবে এটি অন্তর্ভুক্ত হয় এ বিবেচনায় যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ দল সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা না পায়। আওয়ামী লীগের বর্তমান গঠনতন্ত্রেও এ নীতি সন্নিবেশিত আছে। (২) পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব, মর্যাদা, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের উভয় অংশে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা। এতে পাকিস্তানের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তার কথা বলা হলেও, আসল লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার জন্য 'পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' অর্জন, যা ছিল দলের প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম লক্ষ্য-আদর্শ। (৩) বাংলা ও উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা, যা পূর্বের গঠনতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট করে এভাবে ছিল না। (৪) জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল পাকিস্তানি নাগরিকের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করা। এটি পূর্বেও ছিল। (৫) সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজনীয় খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ন্যায়সঙ্গত উপার্জনের ব্যবস্থা। এটি পূর্বেও ছিল

www.pathagar.com

এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর '৭২-এর সংবিধানে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। (৬) জনসাধারণের অবস্থার ও জীবন ধারণের মানের উন্নতি বিধান করা এবং পরিশ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা ও ন্যায্য মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা। পূর্বের গঠনতন্ত্রেও এটি ছিল এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধানে তা সন্নিবেশিত হয়। (৭) দারিদ্র্য মোচন, জ্ঞান বিস্তার, সাম্য ও সুবিচার কায়েম করা; উৎপীড়ন ও শোষণ, ঘুষদুর্নীতি বন্ধ করা এবং মানুষের চরিত্র গঠন। দারিদ্র্য মোচন, সাম্য ও সুবিচার কায়েম এ কথা গঠনতন্ত্রে পূর্বে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখানে বর্ণিত কোনো-কোনো অংশ '৭২-এর সংবিধানে স্থান পায়। (৮) পাকিস্তানে সর্বপ্রকার শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। পাকিস্তানি-পর্বে বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ও পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধে এটি ছিল অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, যা '৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটিতে (সমাজতন্ত্র) রূপ পায়। (৯) সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা করা। এটি পূর্বের গঠনতন্ত্রেও ছিল এবং স্বাধীনতা-পরপর্তী '৭২-এর সংবিধানে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত হয়। (১০) বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও জাতির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও তা দৃঢ় করা। পূর্বে মুসলিম দেশ ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কথা বলা ছিল। (১১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন করা। এটি ১৯৫০ সালের খসড়া গঠনতন্ত্রে গুরুত্ব সহকারে দলের বৈদেশিক নীতি হিসেবে গৃহীত হয়। বস্তুত ১০ ও ১১ নং নীতির ওপর ভিত্তি করেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি প্রণীত হয়, যদিও '৭৫-পরবর্তী সময়ে 'মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক' কথাটি সংশোধনী আকারে তাতে যুক্ত হয়। (১২) দেশ শাসন ব্যবস্থায় মিতব্যয়িতা প্রবর্তনের দ্বারা জাতীয় আয়কে গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করা। পূর্বে শামসুল হক প্রণীত 'মূল দাবী' (১৯৪৯), যার ওপর ভিত্তি করে দলের খসড়া ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র রচিত হয় (১৯৫০), তাতেও এটি ছিল, যদিও কিছুটা ভিন্ন আকারে। (১৩) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা এবং স্বল্প ব্যয়ে দ্রুত ন্যায়বিচার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা। দলের পূর্বের খসড়া ম্যানিফেস্টো ও খসড়া গঠনতন্ত্র থেকে এটি যুক্ত করে সন্নিবেশিত হয়। 'বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা' এ দেশের রাজনীতিতে পুরাতন দাবি, যা অবশেষে '৭২-এর সংবিধানে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এর পূর্ণ বাস্তবায়ন এখনও প্রক্রিয়াধীন। (১৪) পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন করা। এটি ছিল মামুলি বা সাধারণধর্মী কথা।

দলের গঠন প্রণালি

সদস্য পদ লাভ : ১৮ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের পূর্ব পাকিস্তানের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক এ প্রতিষ্ঠানের নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি অনুগত থাকার অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষরসহ এক আনা চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে সদস্য হওয়ার বিধান করা হয়। উল্লেখ্য, পুরুষের পাশাপাশি প্রত্যেক নারীও যে সমমর্যাদায় সদস্যলাভ করতে পারবেন, সেটি বুঝানোর জন্য 'স্ত্রী-পুরুষ' এভাবে বলা হয়। সদস্যপদ লাভে চাঁদা প্রদানের বিধান পূর্বে ছিল না, এটি নতুন সংযোজন। তবে প্রত্যেক কাউন্সিলরকে বার্ষিক ২ রুপি চাঁদা দেওয়ার বিধান ছিল।

www.pathagar.com

দলের গঠন বা কাঠামোগত বিন্যাস ছিল এরূপ : ১. সাধারণ, বিশেষ বা নির্বাচনি অধিবেশন, ২. কাউন্সিল, ৩. ওয়ার্কিং কমিটি, ৪. পার্লামেন্টারি পার্টি, ৫. পার্লামেন্টারি বোর্ড, ৬. অনুমোদিত জেলা, সিটি, ওয়ার্ড, মহকুমা, থানা, মিউনিসিপালিটি, ইউনিয়ন বা পঞ্চায়েত আওয়ামী লীগ। পার্লামেন্টারি পার্টি ও পার্লামেন্টারি বোর্ড নতুন সংযোজন, যা পূর্বে ছিল না।

কর্মকর্তাদের পদ : নতুন গঠনতন্ত্রে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, অফিস সেক্রেটারি, প্রচার ও সংগঠন এর বাইরে শ্রম, মহিলা এবং সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি ও স্বেচ্ছাসেবক এই ৩টি বিভাগের প্রত্যেকটির জন্য একটি করে সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা হয়। পূর্বের ৪টির স্থলে ৩টি সহ-সভাপতির পদ (ক্রমধারা অনুসারে) রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কাউন্সিলের দ্বিবার্ষিক সভায় ২ বছরের জন্য এসব কর্মকর্তা নির্বাচিত হবেন।

কাউন্সিল : এর মেয়াদ করা হয় দুই বছর। পূর্বে তা ছিল এক বছর। জেলাসমূহ দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যায় কাউন্সিল সদস্যগণ উক্ত সময়ের জন্য নির্বাচিত হবেন। দ্বিবার্ষিক নির্বাচনি অধিবেশন ব্যতীত বছরে অন্তত একটি কাউন্সিল সভা অবশ্যই আহ্বানের বিধান করা হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি : ১২ জন কর্মকর্তা ও দলের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২৫ জনসহ মোট ৩৭ সদস্য নিয়ে এটি গঠিত। পূর্বে এ সংখ্যা ছিল ৩৫। পুনরায়, পূর্বে কর্মকর্তা ব্যতীত ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩০ জন ছিলেন কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত এবং ৫ জন দলের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত। নতুন গঠনতন্ত্রে কর্মকর্তাদের বাইরে ২৫ জন সদস্য রাখা হয় এবং সকলেই সভাপতি কর্তৃক মনোনীত।

পার্লামেন্টারি বোর্ড : কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে দলের মনোনয়নের জন্য এই প্রথমবার ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হয়। ১১ সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা এ ৪ জন পদাধিকারবলে এবং ৭ জন কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। দলের সভাপতি পদাধিকারবলে এর সভাপতি থাকবেন।

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

দলের গঠনকাঠামোর বাইরে, তবে দল দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত 'আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' নামে একটি বিশেষ সংগঠনের বিধান করা হয়, যার প্রধান উদ্দেশ্য হবে 'নিঃস্বার্থ জনসেবা, রাষ্ট্রের ঐক্য, নিরাপত্তা ও সর্বময় মঙ্গল সাধনের জন্য আওয়ামী লীগ নির্দেশিত কার্যাবলী সম্পন্ন করা।' এর একজন প্রধান অর্গানাইজার ও একজন সহকারী প্রধান অর্গানাইজার থাকবেন, যাঁরা দলের ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম সভায় মনোনীত হবেন। আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সম্পাদক দ্বারা এ বাহিনী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। এর যাবতীয় খরচের দায়িত্ব ছিল দলের।

www.pathagar.com

দলের কর্মকর্তা হওয়ার ক্ষেত্রে নতুন বিধিনিষেধ

নতুন গঠনতন্ত্রের 'বিবিধ' অংশের ৬৬ ধারায় শর্তযুক্ত করে বলা হয় যে, কেউ মন্ত্রী বা সরকারি চাকরি কিংবা অনুরূপ চাকরি বা পদ গ্রহণ করলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, জেলা কমিটি ও মহকুমা কমিটির 'কর্মকর্তা থাকিতে পারিবেন না।' আওয়ামী লীগের কোনো কর্মকর্তা এরূপ কোনো পদ গ্রহণ করলে 'তবে উক্ত পদ প্রাপ্তির ১ মাসের মধ্যে তিনি আওয়ামী লীগ কর্মকর্তার পদ ত্যাগ করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার দায়িত্বভার বুঝাইয়া দিবেন অন্যথায় ১ মাস পরে উক্ত কর্মকর্তার প্রতিষ্ঠানের পদ আপনা-আপনি শূন্য বলিয়া অবশ্যই গণ্য হইবে।'[৫২]

আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী

কাউন্সিলে ১৯৫৩ সালের জুলাই হতে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য দলের আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী পেশ করা হয়। তাতে দেখা যায়, এককালীন দান ও চাঁদা বাবদ মোট আয় ১৪২৪৯ (চৌদ্দ হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ) টাকা আট আনা এবং ব্যয় ১৫০১৪ (পনের হাজার চৌদ্দ) টাকা নয় পাই অর্থাৎ ৭৬৪ (সাত শ চৌষট্টি) টাকা নয় পাই ঘাটতি।[৫৩]

দলের কর্মকর্তা নির্বাচন

কাউন্সিলের শেষদিন আওয়ামী লীগের নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন :[৫৪]

সভাপতি	:	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
সহ-সভাপতি	:	আতাউর রহমান খান
		আবুল মনসুর আহমদ
		খয়রাত হোসেন
সাধারণ সম্পাদক	:	শেখ মুজিবুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	অলি আহাদ
প্রচার সম্পাদক	:	অধ্যাপক আবদুল হাই
শ্রম সম্পাদক	:	আবদুস সামাদ
সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি ও স্বেচ্ছাসেবক সম্পাদক	:	তাজউদ্দীন আহমদ
মহিলা সম্পাদিকা	:	মিসেস সেলিনা বানু এমএলএ
দপ্তর সম্পাদক	:	মোহাম্মদউল্লাহ
কোষাধ্যক্ষ	:	ইয়ার মোহাম্মদ খান।[৫৫]

সদস্য : জহুর আহমেদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম), আব্দুল আজিজ (চট্টগ্রাম), অধ্যাপক আহসাব উদ্দিন আহমদ (চট্টগ্রাম), আব্দুল জব্বার খদ্দর (নোয়াখালী), আবদুল বারী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া (ময়মনসিংহ), হাতেম আলী খান (টাঙ্গাইল), আব্দুল হামিদ চৌধুরী (ফরিদপুর), সৈয়দ আকবর আলী (সিরাজগঞ্জ), শেখ আব্দুল আজিজ (খুলনা), মোমিন উদ্দিন আহমদ (খুলনা), মশিউর রহমান (যশোর), সাদ আহমেদ

www.pathagar.com

(কুষ্টিয়া), জহুর আহমেদ চৌধুরী (রাজশাহী), কাজী গোলাম মাহবুব (বরিশাল), ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (পাবনা), আমজাদ হোসেন (পাবনা), ডা. মযহারুদ্দিন আহমেদ (রংপুর), মওলানা আলতাফ হোসেন (ময়মনসিংহ), রহিমুদ্দিন আহমেদ (দিনাজপুর), আমিনুল হক চৌধুরী (বরিশাল), আকবর হোসেন আখন্দ (বগুড়া), দবির উদ্দিন আহমেদ (নীলফামারী), পীর হাবিবুর রহমান (সিলেট) এবং কামরুদ্দীন আহমেদ (ঢাকা)

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথাক্রমে পুনরায় দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এছাড়া ৩ জন সহ-সভাপতি পদে আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ ও খয়রাত হোসেন পুনরায় নির্বাচিত হন। আবদুস সালাম খান পূর্বের কমিটিতে ৪ জন সহ-সভাপতির মধ্যে ৩ নম্বর সহ-সভাপতি ছিলেন। তবে দল থেকে তাঁর বহিষ্কারের পর ৪টির স্থলে সহ-সভাপতির পদ ৩টি করা হয়। লক্ষণীয় যে, এই প্রথম শ্রম, মহিলা ও সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি ও স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক ৩টি নতুন সম্পাদকীয় পদ সৃষ্টি করা হয়।

আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশন নানাদিক বিবেচনায় খুবই গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। দলের প্রতিষ্ঠাকালীন নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে এ কাউন্সিলে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' করা হয়, যা ছিল এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এই কাউন্সিলে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্থলে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাউন্সিলে দলের গঠনতন্ত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। যেমন দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোনো কর্মকর্তার একই সঙ্গে সরকারের কোনো পদে আসীন হতে না পারা, দলের কাউন্সিল অধিবেশন প্রতিবছরের পরিবর্তে এরপর থেকে দ্বি-বার্ষিক হবে মর্মে বিধান ইত্যাদি। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, কাউন্সিলে বিগত সময় থেকে এ পর্যন্ত দলের আয়-ব্যয় হিসাববিবরণী তুলে ধরা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্য এ কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে প্রকাশ পায় : 'ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে আমরা প্রদেশের সকল ইউনিয়নে এমনকি সকল গ্রামেই আওয়ামী লীগের ঝাণ্ডা উড়াতে সক্ষম হব।' যে বিষয়টি আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণে রাখা আবশ্যক তা হচ্ছে, ১৯৫৫ সালেই দেশবাসীর উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান ছিল, 'আপনারা দলে দলে আওয়ামী লীগে যোগদান করে জাতির মুক্তির পথকে প্রশস্ত করুন।' অর্থাৎ শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধুর চেতনামূলে ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সুদূর-প্রসারী লক্ষ্য।

তথ্যনির্দেশ

১. *আজাদ*, ২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১০

২. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ১৯৮; আরও Najma Chowdhury, *Legislative Process in Bangladesh*, p. 177, note 1; HR Talukdar (ed.), *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*,

www.pathagar.com

Dhaka 1987, p 86; শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৬২; নোট ২৭ পৃ. ২৯১

৩. Najma Chowdhury, *Legislative Process in Bangladesh*, p. 177, note 3; HR Talukdar, *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, p. 45; শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৭৯-২৮০; অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি*, পৃ. ১৯০-১৯১

৪. HR Talukdar, *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, p. 48; Najma Chowdhury. *Legislative Process in Bangladesh*, p. 177

৫. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি* পৃ. ১৯১

৬. শেখ মুজিবুর রহমান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে (২১-২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫) সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট (অতঃপর *সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৫৫)*, ড. আবুল কাসেম, *আওয়ামী লীগ : ঐতিহাসিক দলিল*, পৃ. ৫৯-৭৯। একই রিপোর্টে 'পনের শ কর্মী ও প্রায় চল্লিশ জনের মত পরিষদ সদস্যকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে' বলা হয়। দ্রষ্টব্য *ঐ*, পৃ. ৬৭-৬৮

৭. দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২০৩-২০৪

৮. দ্রষ্টব্য শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৮৬-২৮৮, পৃ. ২৯১; নোট ৩১

৯. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, পৃ. ৫২, এঁরা হলেন : আনোয়ারা খাতুন এমএলএ, খালেক নেওয়াজ খান এমএলএ, খন্দকার মোশতাক আহমদ এমএলএ, আবদুল আউয়াল এমএলএ, আলমাস আলী এমএলএ, হাশিম উদ্দিন খান এমএলএ, জহিরুল হক এমএলএ ও আবুল হোসেন এমএলএ।

১০. আবদুস সালাম খান, সি এন্ড বি ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং হাশিমউদ্দিন খান, জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

১১. দ্রষ্টব্য শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৭৮-২৮৭; HR Talukdar. *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, pp. 46-51, 89-90; Shamsul Huda Harun, *The Making of The Prime Minister : H.S. Suhrawardy in an Anagram Polity* 1947-1958, National University 2001, pp. 173-199

১২. সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্য দ্রষ্টব্য, *আজাদ*, ২২ শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১ ও ৬

১৩. *আজাদ*, ২২শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১ ও ৬; আরও HR Talukdar, *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, pp. 86-87;

১৪. *আজাদ*, ২২শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১ ও ৬

১৫. প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের দ্বারা ১৯৫৫ সালের ২১শে জুন অনুষ্ঠিত পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদ-কাম-আইন পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৩টি আসন লাভ করে। সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার পর (১০ই আগস্ট ১৯৫৫) তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন।

১৬. *আজাদ*, ২১শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১ ও ৬

১৭. চুয়ান্ন সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ফজলুল হক এডভোকেট জেনারেলের পদ থেকে ইস্তফা দেন। তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করবেন মর্মে এ সময়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল। কিন্তু তা না করে তিনি ১৯৫৩ সালের ২৬শে জুলাই তাঁর পুরাতন রাজনৈতিক অনুসারীদের নিয়ে নতুন দল কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠন করেন।

www.pathagar.com

সরকারি মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত কোনো-কোনো নেতা তাঁর এ দলে যোগ দেন। দ্রষ্টব্য শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪৪-২৪৫

১৮. মওলানা আতাহার আলী যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পূর্বে নিজাম-ই-ইসলাম নামে একটি দল গঠন করেন। এক সময়কার প্রগতিশীল নেতা কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ছিলেন এর সেক্রেটারি জেনারেল। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরিক দল হিসেবে নিজাম-ই-ইসলাম থেকে '৫৪ সালের নির্বাচনে ১৯ জন সদস্য পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করলে এ দল থেকে আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী তাতে অন্তর্ভুক্ত হন। দ্রষ্টব্য বইয়ের অধ্যায় : ৩, নোট ২৪

১৯. দ্রষ্টব্য শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৪৪-২৫০; শেখ মুজিবুর রহমান, *সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৫৫*

২০. শেখ মুজিবুর রহমান, *সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৫৫*। দফাগুলি ছিল : (১) রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদ দুটি সর্ব সময়েই পাকিস্তানের উভয় অংশকে ভাগ করে দিতে হবে; (২) পাকিস্তানের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে চলতে হবে; (৩) মাত্র তিনটি বিষয় বাদে পাকিস্তানের উভয় অংশকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে; (৪) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে; (৫) পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু করতে হবে। উল্লেখ্য, এ দফাগুলো ছিল সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে ১৯৫৫ সালের ৭ই জুলাই স্বাক্ষরিত 'মারি চুক্তি'র প্রায় অনুরূপ।

২১. শেখ মুজিবুর রহমান, *সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৫৫*

২২. ১৯৫৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে একই প্রশাসনের অধীনে 'এক ইউনিট'-ভুক্ত করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যেহেতু বাঙালিরা পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, অতএব পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাদের সম্ভাব্য প্রভাব ঐক্যবদ্ধভাবে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক মোকাবেলা করা। দ্রষ্টব্য HR Talukder, *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, p. 91

২৩. শেখ মুজিবুর রহমান, *সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৫৫*

২৪. *ঐ*

২৫. *ঐ*

২৬. *ঐ*

২৭. *ঐ*

২৮. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে (২১-২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫) সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অভিভাষণ (অতঃপর আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে মওলানা ভাসানীর অভিভাষণ ১৯৫৫), আজাদ, ২২শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১, ৫, ৬; পূর্ণাঙ্গ অভিভাষণ (অতঃপর আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর পূর্ণাঙ্গ অভিভাষণ ১৯৫৫), দ্রষ্টব্য ড. আবুল কাশেম, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ : ঐতিহাসিক দলিল, পৃ. ৮০-৯৩

২৯. মওলানা ভাসানী তাঁর অভিভাষণে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আওয়ামী লীগ নীতি ও আদর্শের উপাসক, নীতিভ্রষ্ট হওয়া অপেক্ষা আওয়ামী লীগের সদস্যগণ নিজেদের মৃত্যু অধিক কামনা করে। দ্রষ্টব্য *আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর পূর্ণাঙ্গ অভিভাষণ ১৯৫৫*

www.pathagar.com

৩০. আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে (২১-২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫) সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা (অতঃপর *আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা ১৯৫৫*), *আজাদ*, ২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১, ১০

৩১. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা ১৯৫৫*

৩২. *আজাদ*, ২১শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১

৩৩. *ঐ*

৩৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৫৫*

৩৫. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর পূর্ণাঙ্গ অভিভাষণ ১৯৫৫*

৩৬. কাউন্সিলের (১৯৫৫) দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িকীকরণ প্রস্তাবের ওপর মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা, *আজাদ*, ২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১০

৩৭. আজাদ, ২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১

৩৮. *ঐ*, ২১শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ৬

৩৯. *ঐ*, ২৭শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১। তাদের নোটিশে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছিল : (১) প্রতিষ্ঠানের নাম হইতে 'মোছলেম [মুসলিম] লীগ' শব্দ বাদ দেওয়া; (২) অমুছলমানদের জন্যও প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত রাখা; (৩) নির্বাচন পদ্ধতি হিসাবে যুক্ত নির্বাচনের দাবি মানিয়া লওয়া। এই যুক্ত নির্বাচন নীতির মধ্যে অনৈছলামিক ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্রের নীতি রহিয়াছে এবং (৪) প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনভিপ্রেত লোকদের অনুপ্রবেশ, *আজাদ*, ২৭শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১ ও ৬

৪০. *আজাদ*, ২৭শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১ ও ৬

৪১. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৬০, ৯১-৯৩

৪২. See Harun-or-Rashid. *Foreshadowing of Bangladesh, passim*

৪৩. পাকিস্তানের কট্টর ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী মনে করত, যেহেতু পাকিস্তান দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, তাই নির্বাচন ব্যবস্থাও হবে স্বতন্ত্র, কেননা যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা হলে তা হবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আদর্শের পরিপন্থি। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে সংবিধান প্রণয়নের সময়ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিতর্কের মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি। আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে দলের অসাম্প্রদায়িকীকরণের সময় থেকে (অক্টোবর ১৯৫৫) প্রকাশ্যে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষ অবলম্বন করেন। তখন থেকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এর পক্ষে জনমত গঠন করতে থাকেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬-অক্টোবর ১৯৫৭) তিনি এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে উদ্যোগী হন এবং তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির ফলে ১৯৫৬ সালের ১৪ই অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে 'যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা' অনুমোদন করে আইন পাশ করা সম্ভব হয়। দ্রষ্টব্য HR Talukdar, *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, pp. 52-53, 120-121

৪৪. *আজাদ*, ২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১০

৪৫. *আজাদ*, ২২শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১

৪৬. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর পূর্ণাঙ্গ অভিভাষণ ১৯৫৫*

www.pathagar.com

৪৭. *আজাদ*, ২৪শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১, ৫, ৬

৪৮. তবে একথাও ঠিক যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি, উভয় অংশের মধ্যে অবিশ্বাস দূরীকরণ, আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য হ্রাস, দ্রুত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ইত্যাদির স্বার্থে সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে ১৯৫৫ সালের ৭ই জুলাই উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে 'মারি চুক্তি' সম্পাদিত হয়েছিল, তার প্রথম দফাটিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশকে নিয়ে 'এক ইউনিট' গঠন করা। উল্লেখ্য, মারি চুক্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী উভয়ই স্বাক্ষর করেছিলেন।

৪৯. চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারার পরিবর্তে বিষয়বস্তু প্রায় অপরিবর্তিত রেখে ৯৩ ধারা প্রতিস্থাপন করে আইন পাশ করে।

৫০. শেখ মুজিবুর রহমান, *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী ১৯৫৫* (ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ড. আবুল কাশেম, *আওয়ামী লীগ : ঐতিহাসিক দলিল*, পৃ. ৯৪-১১৫

৫১. *Draft Constitution and Rules of the East Pakistan Awami Muslim League,* দ্রষ্টব্য ড. আবুল কাশেম, *আওয়ামী লীগ : ঐতিহাসিক দলিল*, পৃ. ৩৩

৫২. শেখ মুজিবুর রহমান, *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী*

৫৩. ব্যয়ের মধ্যে ছিল সভা, সফর, প্রচার, অফিস খরচ, কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য, *সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৫৫*

৫৪. *আজাদ*, ২৪শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১, ৫, ৬; আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, পৃ. ৬০। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ পরে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হন

৫৫. *আজাদ* পত্রিকায় মহিবুস সামাদ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন বলে ছাপা হয়। *আজাদ*, ২৪শে অক্টোবর ১৯৫৫, পৃ. ১, ৫, ৬

www.pathagar.com

অধ্যায় : পাঁচ

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৭ : দল থেকে ভাসানীর বিদায়

তৃতীয় কাউন্সিলের (১৯৫৫) এক বছর আট মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের চতুর্থ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করা হয়। দলের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অনুপস্থিতিতে প্রথম সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে ১৩ এবং ১৪ই জুন ১৯৫৭ আরমানিটোলাস্থ নিউ পিকচার হাউজ (সাবিস্তান সিনেমা হল)-এ দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১] এতে সারাদেশ থেকে ৮৫০ জন কাউন্সিলর যোগ দেন। নিখিল-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উভয় দিনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক কাগমারি সম্মেলন[২] (টাঙ্গাইল ৭-৮ই ফেব্রুয়ারি)-এর চার মাস পর এ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিলে রিপোর্ট পেশ করেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যকার বিরোধ এবং তা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনাই ছিল এ সম্মেলনের প্রধান বিষয়।

পটভূমি

১৯৫৫ সালের কাউন্সিল ও বর্তমান কাউন্সিল (১৯৫৭)-এর মধ্যবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং পূর্ব পাকিস্তানে খান আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন, আওয়ামী লীগের মধ্যে উদার পাশ্চাত্যপন্থি বনাম বামপন্থি এ দুই ধারার সৃষ্টি, সোহরাওয়ার্দীর পাশ্চাত্যঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে মওলানা ভাসানী ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে বিরোধ, পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর অবস্থান, পররাষ্ট্রনীতিতে কাউন্সিলে ভোটাভুটির ফল, মওলানা ভাসানী ও অলি আহাদকে ঘিরে আওয়ামী লীগের মধ্যে বামপন্থি উপদল সৃষ্টি, অলি আহাদসহ বামপন্থি উপদলের কয়েকজনকে বহিষ্কার, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি–ন্যাপ গঠন (২৫-২৬ জুলাই ১৯৫৭), সংগঠনের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিত্ব ত্যাগ (১৯৫৭) ইত্যাদি।

আওয়ামী লীগের এ কাউন্সিল অধিবেশন যে-সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, সে-সময় পাকিস্তানের কেন্দ্র ও এর পূর্বাংশের প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান উভয় স্থানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার-এর মন্ত্রিসভার পতন হলে ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়। শ্রী মনোরঞ্জন ধর-এর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস পার্টি ও যুক্তফ্রন্টের সময়কার বামপন্থি গণতন্ত্রী দলের প্রতিনিধিরাও তাঁর এ মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হন। অপরদিকে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী-র মধ্যে

www.pathagar.com

দ্বন্দ্বের ফলে একই বছরের ৮ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ঘটে। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার আশীর্বাদপুষ্ট মুসলিম লীগের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের নিয়ে রাতারাতি গঠিত রিপাবলিকান পার্টি-র সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে ১২ই সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টি-র কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পাকিস্তানের রাজনীতিতে পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র পূর্বের ন্যায় এ সময় ও এর পরে অব্যাহত থাকে। এর ফলে প্রদেশ ও কেন্দ্রে উভয় স্থানে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।[৩]

আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে উদার পাশ্চাত্যপন্থি বনাম বামপন্থি এরূপ দুটি ধারার সৃষ্টি হয়। বস্তুত, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগই ছিল পাকিস্তানে প্রথম কার্যকর প্রধান বিরোধী দল। ঐ সময় কমিউনিস্ট পার্টি বিদ্যমান ছিল বটে, তবে এ নামে রাজনীতি চর্চা খুবই কঠিন ছিল। নব প্রতিষ্ঠিত ও দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা প্রকাশ্য সংগঠন আওয়ামী লীগের প্রতি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বামপন্থি তরুণ নেতা-কর্মীদের উৎসাহ থাকলেও এর নামের সঙ্গে 'মুসলিম' শব্দ যুক্ত থাকায় তাঁদের অনেকে শুরুতে এ দলে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা প্রথমে গণতান্ত্রিক যুবলীগ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭), পরে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ (১৯৫১) এবং যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের প্রাক্কালে হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে গণতন্ত্রী দল (১৯৫৩) গঠন করে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে সচেষ্ট হন। ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ ঐ সংগঠনে তাঁর পদ অব্যাহত রেখে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।[৪] তখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া না হলেও এর অসাম্প্রদায়িকীকরণের বিষয়টি ঐ বছরের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত দলের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে গুরুত্ব সহকারে আলোচনায় আসে, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বামপন্থি গণতন্ত্রী দল নির্বাচনি জোটের শরিক হওয়ার সুবাদে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের এক ধরনের নৈকট্য গড়ে ওঠে। নির্বাচন-পরবর্তী মন্ত্রিসভা গঠনের কিছুদিনের মধ্যে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে ঐ মন্ত্রিসভা বাতিলের পাশাপাশি জুলাই মাসে (১৯৫৪) কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। আওয়ামী লীগ ও বামপন্থিদের ওপর নেমে আসে শাসকগোষ্ঠীর গ্রেপ্তারসহ চরম নির্যাতন। এ রকম পরিস্থিতিতে গণসংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের ভেতরে থেকে বামপন্থিদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের জন্য সুবিধাজনক। উল্লেখ্য, ১৯৫৫ সালের ২১শে জুন পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ-কাম-আইন পরিষদ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে গণতন্ত্রী দলের মোজাফফর আহমদ, নুরুর রহমান প্রমুখ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তাতে পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের সভাপতি মাহমুদ আলী মন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি যুক্তফ্রন্টের শরিক গণতন্ত্রী দল থেকে ৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এভাবে আওয়ামী লীগের ভেতর দলের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে কেন্দ্র করে বামপন্থিদের একটি

www.pathagar.com

উপদল সৃষ্টি হয়। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩শে অক্টোবর আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে অলি আহাদ দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর এ উপদলটি তৎপর হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি (১৯৫৪) বা পাশ্চাত্যঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করার কারণে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরস্থ এ উপদলটি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এর ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। এদিকে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী[৫] তাঁর সাধারণ সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেওয়ার কথা। অলি আহাদ দলের ঐ পদের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।[৬] টাঙ্গাইলের সন্তোষের কাগমারিতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দুদিনব্যাপী বিশেষ কাউন্সিল সভা ও পরের দিন (৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭) আফ্রো-এশীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে দলের অভ্যন্তরীণ এ দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয়। মওলানা ভাসানী ও তাঁর বামপন্থি সমর্থকগণ সোহরাওয়ার্দীর পাশ্চাত্যঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি এবং পূর্ববাংলার খাদ্য সমস্যার সমাধান ও স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁরা গঠনতন্ত্রের নাম করে দলের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐ পদ থেকে সরে দাঁড়ানোরও দাবি তোলেন।

মনে করা হয়, নীতিগত অবস্থান ছাড়াও মওলানা ভাসানী চেতনাগতভাবেই ছিলেন বিরোধী মানসিকতাসম্পন্ন।[৭] সরকারে আওয়ামী লীগ, এমন অবস্থার সঙ্গে তিনি যেন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। অপরদিকে, দলের ওপর বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণ ও কাউন্সিলরদের মধ্যে তাঁর সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দীর ক্ষুরধার যুক্তির[৮] কাছে ভাসানীকেন্দ্রিক বামপন্থি উপদলটি কাগমারি সম্মেলনে কোনোরূপ সুবিধা করতে পারেনি। সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গ্রহণের পাশাপাশি দলের ঐক্যের স্বার্থে সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানী উভয় নেতার প্রতি আস্থা ব্যক্ত করা হয়।[৯] কিন্তু এতে কাজ হয়নি। দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী ও তাঁর অনুসারীরা নিজস্ব দল গঠনের লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৭ই মার্চ (১৯৫৭) মওলানা ভাসানী দলের সাধারণ সম্পাদককে লেখা এক পত্রের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন,[১০] যা অলি আহাদের মাধ্যমে *দৈনিক সংবাদ*-এ ছাপা হয়। ৩০শে মার্চ দলের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অলি আহাদ-কে সংগঠনের মধ্যে 'বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী' হিসেবে চিহ্নিত করে আওয়ামী লীগ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।[১১] মওলানা ভাসানীর পদত্যাগপত্রের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য দলের সাধারণ সম্পাদককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। অলি আহাদের বহিষ্কারের প্রতিবাদে ওয়ার্কিং কমিটির ৯ জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন।[১২] তাঁরা হলেন ইয়ার মোহাম্মদ খান[১৩] (কোষাধ্যক্ষ), অধ্যাপক আবদুল হাই (প্রচার সম্পাদক), আবদুস সামাদ[১৪] (শ্রম সম্পাদক), সেলিনা বানু (মহিলা সম্পাদিকা), দবির উদ্দিন আহমেদ (সদস্য), হাবিবুর রহমান[১৫] (সদস্য), হাতেম আলী খান (সদস্য), আসাবুদ্দীন আহমেদ (সদস্য) ও আকবর হোসেন আকন্দ[১৬] (সদস্য)। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক আবদুল হাই ছাড়া সবাই প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। আবার, ৯ জনের ৪ জনই ছিলেন সম্পাদকীয় পদধারী। এদিকে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

সরকারের গৃহীত নীতির প্রকাশ্য সমালোচনা করতে থাকেন। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। এ ব্যাপারে পত্রিকায় বিবৃতি দেন। নিজ অনুসারীদের নিয়ে জনসভা ও কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেন। খাদ্য সমস্যার সমাধানের দাবিতে তিনি অনশন পালনের ঘোষণা দেন।[১৭] এতৎসত্ত্বেও দলের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও এর প্রধান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর সঙ্গে সমঝোতা এবং দলে ফিরিয়ে আনতে একাধিক নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।[১৮] অবশেষে ২১শে মে অনুষ্ঠিত দলের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পদত্যাগকারী ৯ সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ এবং মওলানা ভাসানীর বিষয়টি কাউন্সিলে উত্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়।[১৯] এরপর ২রা জুন ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী সভায় ৯ সদস্যের শূন্য পদে নতুন সদস্য মনোনীত করা হয়। তাঁরা হলেন :[২০] জসিমুদ্দিন আহমদ (সভাপতি, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ), আমজাদ হোসেন (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ), মজিবর রহমান (সভাপতি, রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ), দেওয়ান মহিউদ্দিন আহমেদ এমপিএ (বগুড়া), রওশন আলী (সাধারণ সম্পাদক, যশোর জেলা আওয়ামী লীগ), শামসুল হক এমপিএ (ঢাকা), আজিজ আহমেদ (নোয়াখালী), মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এমপিএ[২১] ও আব্দুল হামিদ চৌধুরী (অলি আহাদের স্থলে নয়া অর্গানাইজিং সেক্রেটারি)। এ রকম এক পটভূমিতে ১৩ ও ১৪ই জুন ১৯৫৭ দুদিনব্যাপী আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল অধিবেশন

দলের নেতাদের পক্ষ থেকে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সমঝোতার লক্ষ্যে গৃহীত নানা উদ্যোগ সফল না হওয়া সত্ত্বেও ১৩ই জুনের কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ-ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। অধিবেশনের পূর্বের দিন ১২ই জুন রাত ৮টায় দলের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভবনে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়[২২] এবং দীর্ঘ প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তা চলে। সভা চলাকালে একপর্যায়ে আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ মওলানা ভাসানীকে কাউন্সিলে যোগদানে সম্মত করার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রায় এক ঘণ্টা উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। দলের সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদের বহিষ্কার ও দল কর্তৃক ওয়ার্কিং কমিটির ৯ জন সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ দুটিই আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র বিরোধী[২৩] কাজ বলে মওলানা ভাসানী মনে করেন। কারণ অলি আহাদ ছিলেন দলের কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ছিলেন তাঁর (ভাসানীর) মনোনীত। আলোচনাকালে একথা তিনি আবুল মনসুর আহমদকে জানিয়ে দেন। আবুল মনসুর আহমদ ঐ রাতেই পদত্যাগকারী ওয়ার্কিং কমিটির ৯ সদস্যের সঙ্গে আলোচনার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষার পরও তাঁদের কেউ না এলে সে উদ্যোগও নিষ্ফল হয়।[২৪] ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পরের দিনের কাউন্সিল অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপনসহ অন্য কর্মসূচি নির্ধারিত হয়।

www.pathagar.com

১৩ই জুন সকাল সাড়ে ৮টায় আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশন স্থলের চতুর্দিকে পুলিশ প্রহরা বসানো ছিল। কার্ডধারী কাউন্সিলর ব্যতীত অন্য কারো সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রথমে চার মাস পূর্বে কাগমারিতে অনুষ্ঠিত দলের কাউন্সিল অধিবেশনের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বঙ্গবন্ধুর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ[২৫]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মূলত কাগমারির বিশেষ কাউন্সিল থেকে এ পর্যন্ত দলের অভ্যন্তরে ও বাইরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন।

রিপোর্টের প্রথমে বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলরদের সম্মুখে আওয়ামী লীগের অবস্থান পরিষ্কার করেন। তখন কেন্দ্র ও পূর্ব বাংলায় ছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকার। অতএব, পরিবর্তিত অবস্থায় আওয়ামী লীগ যে আর 'সমালোচনাকারী সরকারবিরোধী দল নয়' একথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, একটি 'স্বার্থান্বেষী মহল' গতানুগতিকভাবে এই সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। সরকারের সফলতা-ব্যর্থতা পর্যালোচনার পূর্বে দেশের সার্বিক বাস্তব অবস্থার আলোকে নিজেদের 'আত্মসমালোচনা' অধিকতর প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তাঁর রিপোর্টের ৫টি প্রধান দিক হচ্ছে : খাদ্য সমস্যা, সরকারের সাফল্য, কাশ্মীর ও বৈদেশিক নীতি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংকট ও শৃঙ্খলা।

খাদ্য সমস্যা

খাদ্য সমস্যাকে দেশের প্রধানতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর রিপোর্টে বলেন, পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ২১ লক্ষ এবং এদের খাদ্য চাহিদা ৮১ লক্ষ ২৪ হাজার টন। স্বাভাবিক অবস্থায় বছরে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ৩ লক্ষ ১ হাজার টন। তবে চলতি বছর দেশে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে তিন গুণের কাছাকাছি খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। খাদ্য ঘাটতির জন্য তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জমির উৎপাদন শক্তির ক্রমাবনতি, সেচ ব্যবস্থার অভাব, মওজুদকারীদের অতিরিক্ত মুনাফার লোভকে দায়ী করেন। ভারত ও সারা বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান খাদ্য সমস্যার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু তাঁর রিপোর্টে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা নিয়ে অনেক প্রচেষ্টা চালিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে রেশনিং, খয়রাতি সাহায্য ও লঙ্গরখানার মাধ্যমে কীভাবে তা বণ্টন করে জনগণের এ সমস্যা মোকাবেলার চেষ্টা করছে, তার বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি এও বলেন যে, প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করতে গিয়ে সরকারের ঋণের বোঝা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকারের সাফল্য

প্রাদেশিক সরকারের সাফল্য প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু তাঁর রিপোর্টে শিল্প কর্পোরেশন, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন, ফিল্ম কর্পোরেশ প্রতিষ্ঠা, কারা সংস্কার, দুর্নীতি দমন প্রভৃতি তুলে

www.pathagar.com

ধরেন। উল্লেখ্য, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকারের দুই বছরের শাসনকালে আরও যেসব সাফল্য অর্জিত হয় তার মধ্যে ছিল : ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা, ৭টি শূন্য আসনে যথাসময়ে উপনির্বাচন, ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের পরিবারসমূহকে আর্থিক সাহায্য, ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি, বাংলা একাডেমি থেকে বাংলা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশের জন্য প্রথম অর্থ বরাদ্দ, সরকারি উদ্যোগে ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন, ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস কারখানা ও সাভার ডেয়ারি ফার্ম স্থাপন, পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য প্রথম 'প্লানিং বোর্ড' গঠন, 'থ্রি ইয়ার্স ফেজ অব দি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান' (১৯৫৫-৬০) তৈরি, প্রথম শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন, স্থায়ী শিল্প ট্রাইব্যুনাল গঠন, শ্রমিক সংগঠনগুলোর জন্য ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রথা চালু, কক্সবাজারে প্রথম পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ, ঢাকা-আরিচা, নগরবাড়ী-রাজশাহী ও ঢাকা-চট্টগ্রাম যোগাযোগ সড়ক নির্মাণ, আলিয়া মাদ্রাসার স্থায়ী ভবন নির্মাণ, ময়মনসিংহে পশু চিকিৎসা কলেজ স্থাপন, ঢাকায় রমনা গ্রিন নামে বোটানিক্যাল গার্ডেন নির্মাণ, ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন গঠন, কৃষিঋণের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল, আবাদি জমিতে জলসেচের জন্য কৃষকদের কাছে সর্বপ্রথম ১০০০ পাওয়ার পাম্প সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার জন্য ওয়াটার এ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ওয়াপদা) গঠন, সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী 'ক্লোজড ডোর অপারেশন' ইত্যাদি।[২৬]

কাশ্মীর ও বৈদেশিক নীতি

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর রিপোর্টে প্রথমে বৈদেশিক নীতি ও বৈদেশিক সম্পর্কের মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, বৈদেশিক নীতির মূলে থাকে জাতীয় স্বার্থ। অবস্থাভেদে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটতে পারে, তবে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় না। তিনি লর্ড পামারস্টোন-এর বিখ্যাত উক্তি 'We have got no permanent friend, we have got no permanent enemy but we have got permanent interests' সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন। পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে তিনি যা বলেন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যেহেতু কাশ্মীর হচ্ছে বৈদেশিক ক্ষেত্রে দেশের এক নম্বর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, সেহেতু পাকিস্তানের বৈদেশিক সম্পর্কও তা বিবেচনায় রেখে নির্ধারিত হবে সেটিই স্বাভাবিক। কাশ্মীর সমস্যার ন্যায়সংগত সমাধানের প্রতি অধিক সংখ্যক রাষ্ট্রের সমর্থন লাভকে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর রিপোর্টে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এ সাফল্যের জন্য সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য যা-ই হোক না কেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি সর্বদা স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে ছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং দলের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা র‍্যাডিক্যাল বামপন্থি উপদলটিকে মোকাবেলা করতে গিয়ে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে তিনি ভিন্ন ঐ অবস্থান গ্রহণ করে থাকতে পারেন।

www.pathagar.com

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

বঙ্গবন্ধু তাঁর রিপোর্টে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে 'জনগণের প্রাণের দাবী' উল্লেখ করে বলেন, 'এ দাবী আমাদের আদায় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব না।' দেশের 'সার্বভৌমত্ব বজায়' রেখে পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সুস্পষ্ট ঘোষণার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, এজন্য শাসনতন্ত্র পরিবর্তন আবশ্যক এবং তার জন্য পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কেননা শাসনতন্ত্র পরিবর্তনে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন দরকার, যা ঐ সময় তাঁদের ছিল না।

প্রাতিষ্ঠানিক সংকট ও শৃঙ্খলা

সাম্প্রতিকালে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব-বিভেদ ও সংগঠনের শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক রিপোর্টে বিশদভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, 'গুটিকতক লোক ছদ্মবেশে আজ আওয়ামী লীগে প্রবেশ করিয়া উহার ধ্বংস সাধনে' লিপ্ত। এদের 'গণতন্ত্রে ...বিশ্বাস নাই, [এরা] কোনো এক বিশেষ আদর্শবাদে পুরোপুরি আস্থাশীল এবং ...দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিতে চায়।' এরা প্রকাশ্যে নিজেদের দলের নামে কার্যকলাপ চালাতে পারে না, তাই 'প্রথমে চেষ্টা করে কোন না কোন জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মী হিসাবে প্রবেশ করিতে এবং কোন এক দুর্বল মুহূর্তে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে দখল করিতে। কিন্তু ইহাতে অপারগ হইলে তখন ইহারা চরম পন্থা গ্রহণ করে অর্থাৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধনে তৎপর হয়।' এই তাত্ত্বিক বক্তব্য রাখার পর আওয়ামী লীগের আদর্শ পরিপন্থি এসব লোকের ব্যাপারে কাউন্সিলরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, এই সব ছদ্মবেশী শত্রুর হাত হইতে আমাদের প্রতিষ্ঠান ও দেশকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা আপনারা সজাগ থাকিবেন।' এ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত অলি আহাদ ও তাঁর অনুসারীদের নাম উল্লেখ না করলেও দলের অভ্যন্তরে তাঁদের কার্যকলাপের প্রতি ইঙ্গিত রেখেই যে তাঁর উপর্যুক্ত বক্তব্য ও মন্তব্য, তা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা না।

রিপোর্টের এ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু অলি আহাদের নাম উচ্চারণপূর্বক কেন ও কী অভিযোগে তাঁকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কাউন্সিলরদের বলেন :

> অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে আমাকে আজ বলিতে হইতেছে যে, আমাদের ভূতপূর্ব সহকর্মী ও প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক সম্পাদক মি. অলি আহাদ আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনৈক্য, দলাদলি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া এক মারাত্মক খেলায় মত্ত হইয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি দুই দুইটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিয়া গভীর চিন্তা-ভাবনার পর প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষা ও উহার মধ্যে ঐক্য পুনঃস্থাপনের মানসে প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কার করিয়াছে। ইহার ফলে দেখা গেল যে, এই প্রতিষ্ঠানকে পুরাপুরিভাবে বানচাল করিয়া দিবার জন্য তিনি বিরতিহীন চেষ্টা চালাইলেন।[২৭]

www.pathagar.com

অতঃপর অলি আহাদের বহিষ্কারের প্রতিবাদে সংগঠনের ৬ জন বিভাগীয় সম্পাদকের মধ্যে ৪ জন[২৮] ও ওয়ার্কিং কমিটির ৫ জন মোট ৯ জন সদস্যের পদত্যাগ, 'প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকে রক্ষা করিবার' স্বার্থে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বের অংশ হিসেবে কীভাবে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ওয়ার্কিং কমিটির এক বিশেষ সভা আহ্বান করে কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে গঠনতন্ত্রের ৩৭(খ) ধারা বলে বিভাগীয় সম্পাদক ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের শূন্য পদ পূরণের ব্যবস্থা করা হয়, সে বিষয়টি বঙ্গবন্ধু তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন। কাউন্সিলের প্রথম দিনের অধিবেশনেই অলি আহাদের বহিষ্কার ও ওয়ার্কিং কমিটিতে মনোনয়ন দানের বিষয়টি অনুমোদিত হয়।

রিপোর্টের শেষাংশে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকারে বঙ্গবন্ধুর যোগদান[২৯] এবং পরে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ইত্যাদি বিষয় সবিস্তার তিনি কাউন্সিলরদের নিকট তুলে ধরেন, যার অনেক তথ্যই এখন পর্যন্ত অজানা। তিনি বলেন :[৩০]

> সর্ব্বশেষে আমার নিজের দুই একটি কথা বলিয়া যাই। আপনারা সবাই অবহিত আছেন যে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও আওয়ামী লীগের দুই প্রধানের নির্দ্দেশে আমি মন্ত্রিসভায় যোগদান করি। কর্ম্মী হিসাবে আপনাদের পাশে থাকিয়া কাজ করা যেমন আমার জীবনের অন্যতম ব্রত, তেমনি নেতাদের নির্দ্দেশও আমার কাছে অনতিক্রমণীয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্রের ৬৬নং ধারাকে মর্য্যাদা দিতে যাইয়া আমি মন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সাধারণ সম্পাদকের পদ হইতে এস্তেফা দেই। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী আমাকে পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। আর কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির প্রস্তাবক্রমে এবং সর্ব্বসম্মতভাবে আমাকে ৭ই জুন মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিতে বলা হয়। আমি অবশ্য ১লা জুন পদত্যাগপত্র পেশ করি। তারপর পাকিস্তানের উজীরে আজমের [প্রধানমন্ত্রী] নির্দ্দেশক্রমে ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের উজীরে আলার [মুখ্যমন্ত্রী] অনুরোধে আমাকে আজও মন্ত্রিত্বের কাজ চালাইয়া যাইতে হইতেছে। আজ এই সভায় তাঁহাদের নিকট আমার আরজ, তাঁহারা যেন আমাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করার সুযোগ দেন ও আমার পদত্যাগপত্র অচিরেই গ্রহণ করেন।

বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, বঙ্গবন্ধু নিজের ইচ্ছায় মন্ত্রী হননি, দলের দুই শীর্ষনেতা অর্থাৎ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর 'নির্দেশে' তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। দলের গঠনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে মন্ত্রী হওয়ার পরপর তিনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। তবে দলের সিদ্ধান্তক্রমে তিনি পরবর্তী কাউন্সিল পর্যন্ত সংগঠনের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে সম্মত হন। কিন্তু কাগমারি সম্মেলনে (৭-৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭) তাঁকে ৭ই জুনের মধ্যে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বলা হলে তিনি এর পূর্বেই ১লা জুন মন্ত্রী হিসেবে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। কিন্তু তাঁর ঐ পদত্যাগপত্র তখন গৃহীত না হওয়ায় এবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে বঙ্গবন্ধুকে আরও কিছুদিন মন্ত্রিসভায় থেকে যেতে হয়। অবশেষে তাঁর চীন সফর সম্পন্ন করে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর পদত্যাগপত্রটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।[৩১] তবে ১লা জুন পদত্যাগপত্র পেশ করার

www.pathagar.com

পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বর্ধিত সময়ের জন্য তাঁর মন্ত্রিসভায় থাকাটা ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দলের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন বা সংশোধন এনে বঙ্গবন্ধু একই সঙ্গে দলের জেনারেল সেক্রেটারি ও সরকারের মন্ত্রী থাকতে পারতেন। আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে তা অনায়াসেই পররাষ্ট্রনীতির মতো পাস করানো যেত। কিন্তু তা করা থেকে তিনি বিরত থাকেন। এ ঘটনা থেকে অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন, সোহরাওয়ার্দীর ভাষায়, 'star organiser'।[৩২] তাঁর কাছে সংগঠনই ছিল রাজনীতির মূল শক্তি। শ্রেষ্ঠ সংগঠক হিসেবে তিনি ভালো করেই জানতেন যে, শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন ব্যতীত কী সরকার কী আন্দোলন কী রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন, কোনোটিই সম্ভব নয়। তাই সংগঠন ও কর্মীদের তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। আর তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'কর্মী হিসাবে আপনাদের পাশে থাকিয়া কাজ করা... আমার জীবনের অন্যতম ব্রত।' আওয়ামী লীগের তিন সহ-সভাপতি যথা আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ ও খয়রাত হোসেন এঁরা যখন মন্ত্রিত্ব বজায় রেখে সংগঠনের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর উল্টোটিই করলেন, অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে সংগঠনের হাল ধরলেন। রাজনীতির ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল।

মওলানা ভাসানীর বক্তব্য

কাউন্সিল অধিবেশন শুরুর পূর্বের দিন অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, মওলানা ভাসানী কাউন্সিলে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হলে তাঁকে পররাষ্ট্রনীতির ওপর প্রথম বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করা হবে।[৩৩] প্রথম দিনের সকালের অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশের পর ভাসানী সমর্থক মহিউদ্দীন আহমদ[৩৪] (বরিশাল) যখন রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তে আকস্মিকভাবে মওলানা ভাসানী হাসপাতাল থেকে অধিবেশন স্থলে এসে উপস্থিত হন এবং মহিউদ্দীন আহমদের বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে তিনি কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে সোহরাওয়ার্দীর পাশ্চাত্যঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা করে সর্বপ্রকার সামরিক জোটে যোগদান ও সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। তিনি জোটনিরপেক্ষ নীতির পক্ষে তাঁর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে দেশে ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বৃদ্ধি, সরকারের খাদ্য নীতির ব্যর্থতা, ধান-চালের চোরাচালান বন্ধে সরকারের অক্ষমতা ইত্যাদি উল্লেখ করে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনকালীন গৃহীত ২১-দফা কর্মসূচির 'অধিকাংশই' তখনকার আওয়ামী লীগ সরকার পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।[৩৫] বক্তব্য শেষ করেই মওলানা ভাসানী পুনরায় হাসপাতালে ফিরে যান।

কাউন্সিলে সোহরাওয়ার্দীর বক্তব্য : পররাষ্ট্রনীতি পাস

মওলানা ভাসানীর বক্তব্যের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কাউন্সিলে বক্তব্য রাখতে ওঠেন, যদিও ততক্ষণে মওলানা ভাসানী সভাস্থল ত্যাগ করেছেন। দীর্ঘ ৪৫ মিনিটের

www.pathagar.com

বক্তৃতায় সোহরাওয়ার্দী তাঁর পররাষ্ট্রনীতি ও দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সবিস্তার তুলে ধরেন। পাকিস্তানকে শক্তিশালী ও বিপদমুক্ত করতে এবং এর সংহতি বজায় রাখতেই তিনি তাঁর বর্তমান পাশ্চাত্যঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছেন মর্মে কাউন্সিলকে অবহিত করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, রাজনীতি হচ্ছে শক্তির খেলা এবং এখানে দুর্বলের স্থান নেই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে একথা সত্যি। তাঁর মতে, ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক বিবেচনায় পাকিস্তানের জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক। অপরদিকে, জোটনিরপেক্ষ নীতির সমর্থকদের 'পাকিস্তানের দুশমন' আখ্যায়িত করে এর ফলে পাকিস্তান দুর্বল বা শক্তিহীন হয়ে পড়বে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, এর অর্থ হবে, 'পাকিস্তানকে অন্যের হাতে তুলিয়া [দেওয়ার]' সামিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের প্রতি ইঙ্গিত করে নিরপেক্ষ নীতির দুর্বলতা ও তাঁর পররাষ্ট্রনীতির যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন :[৩৬]

> যখন আমাদের খালের পানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে, কাশ্মীর আমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইতেছে, তিস্তা নদীর পানি শুকাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে, তখন আমরা চোখ বন্ধ করিয়া নিরপেক্ষ নীতির উপর ভরসা করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারি না।

বক্তব্যের শেষে জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির সমর্থকদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে সোহরাওয়ার্দী বলেন, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে তাঁর পররাষ্ট্রনীতির ফলে পাকিস্তান ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, তাহলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তৎক্ষণাৎ ইস্তফা দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। কাউন্সিল কর্তৃক তাঁর পররাষ্ট্রনীতি গৃহীত না হলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন একথাও ঘোষণা করেন। সোহরাওয়ার্দী বক্তৃতা শেষ করলে কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে তাঁর পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে নানা ধ্বনি ওঠে। অতঃপর সোহরাওয়ার্দী তাঁর পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে একটি প্রস্তাব কাউন্সিলের সামনে পেশ করলে 'তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে' উপস্থিত ৮০০ কাউন্সিলরের ভেতর ৭৭৫ জন এর পক্ষে এবং ২৫ জন বিপক্ষে, এভাবে বিপুল ভোটের ব্যবধানে তা গৃহীত হয়। ভোট গণনার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলরবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ', 'আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ', 'পররাষ্ট্রনীতি জিন্দাবাদ' ইত্যাদি ধ্বনি দ্বারা তাঁদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।[৩৭] সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রস্তাবটি কাউন্সিলে পেশের পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক রিপোর্টটি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করলে 'বিপুল ভোটাধিক্যে' তা গৃহীত হয়।

কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাব

আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে ১৩ই জুন বিকেল সাড়ে ৩টায় পুনরায় কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অধিবেশন পরের দিন শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়। ১৪ই জুন কাউন্সিলের দ্বিতীয় ও শেষদিন যথাসময়ে তাঁর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয় এবং তা প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে চলে। এ অধিবেশনে অনেক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :[৩৮]

www.pathagar.com

১. পররাষ্ট্রনীতি : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন তজ্জন্য তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন।

২. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন : ২১-দফা অনুযায়ী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি পুনর্ব্যক্ত এবং উক্ত দাবি পূরণের লক্ষ্যে শাসনতন্ত্র সংশোধন করার জন্য কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রতি আহ্বান। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩. কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধিতে প্রাদেশিক সরকারের প্রশংসা : স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে ২১-দফার একটি গুরুত্বপূর্ণ দফা কার্যকর করায় প্রাদেশিক সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

৪. যুবলীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ : যুবলীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করে আওয়ামী লীগের কোনো সদস্য একই সঙ্গে যুবলীগের সদস্য হতে পারবেন না মর্মে সিদ্ধান্ত। আওয়ামী লীগের যেসব সদস্য এখনো যুবলীগেরও সদস্য, কাউন্সিল কর্তৃক অবিলম্বে তাঁদেরকে যুবলীগ হতে পদত্যাগের নির্দেশ দান। ৩৯ জন সদস্য প্রস্তাবের বিপক্ষে ও অবশিষ্ট সদস্যগণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদান করেন।

৫. কাশ্মীরে গণভোট : জাতিসংঘের উদ্যোগে কাশ্মীরে নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণের ব্যাপারে কাশ্মীরীদের জন্মগত অধিকারের প্রতি কাউন্সিলের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে কাশ্মীর সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অবিলম্বে কার্যকর করার দাবি। এ ব্যাপারে বিশ্বজনমতের 'বিপুল সমর্থন' লাভে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তজ্জন্য কাউন্সিলের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন।

৬. কাশ্মীরের জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে সংহতি : কাশ্মীরকে মুক্ত করার জন্য কাশ্মীরবাসী কঠিন প্রতিকূলতার মধ্যেও যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তজ্জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে তাদের বীরোচিত সংগ্রামের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সংহতি প্রকাশ এবং সর্বপ্রকার সাহায্য ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৭. দলের বিভিন্ন ইউনিটের নির্বাচন : যেহেতু ১৯৫৮ সনের মার্চ মাসের প্রথমভাগে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা[৩৯] এবং যেহেতু তার প্রস্তুতির জন্য আওয়ামী লীগের সকল নেতা-কর্মীকে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে হবে, সেহেতু মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম ঘোষিত সিডিউল অনুযায়ী সম্পন্ন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই সাধারণ নির্বাচনের পরে কোনো এক সময় এসব ইউনিটের নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণের জন্য কাউন্সিল কর্তৃক ওয়ার্কিং কমিটিকে ক্ষমতা অর্পণ, তবে ইউনিয়ন ও থানার নির্বাচন যথারীতি পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আটজন এবং অবশিষ্ট সকলে এর সমর্থনে ভোট দেন।

www.pathagar.com

৮. খাদ্য সমস্যা মোকাবেলার জন্য প্রাদেশিক সরকারের প্রশংসা : আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে খাদ্য সমস্যার মোকাবেলায় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করে কাউন্সিলে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং এলাকায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে সরকারের প্রতি অনুরোধ।

৯. মওলানা ভাসানীর পদত্যাগপত্র : মওলানা ভাসানীকে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ। দলের জেনারেল সেক্রেটারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রস্তাব করলে কাউন্সিলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৪০]

১০. মন্ত্রিসভা হতে সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগ : সিদ্ধান্ত হয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আসন্ন চীন সফর[৪১] হতে প্রত্যাবর্তন করার পর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী দলের ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির জন্য সময় নির্ধারণ করবেন।

১১. গঠনতন্ত্র সংশোধন : কাউন্সিলের এই অধিবেশনে আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্রের কতিপয় ধারার সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা না করার সিদ্ধান্ত।

উল্লেখ্য, কাউন্সিলের অধিকাংশ প্রস্তাব দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল হামিদ চৌধুরী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক উত্থাপিত ও সমর্থিত হয়। মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতেই এসব প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন[৪২]

কাউন্সিলে ১১-সদস্য বিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠিত হয়। এর সদস্যরা হলেন : মোজাফফর আহমদ এমপি (চট্টগ্রাম), রহিমুদ্দীন আহমদ এমপি (দিনাজপুর), জহিরউদ্দীন এমপি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী), আবুল মনসুর আহমদ এমপি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী), সাদ আহমদ (কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি), দিলদার আহমদ এমপি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) ও মোহাম্মদ সিকান্দার (নোয়াখালী)। এঁরা সবাই কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত। পদাধিকার বলে সদস্য : ১। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা, ২। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা, ৩। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট, ৪। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি।

তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

কাউন্সিল কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্টের শূন্য পদে তিনজন নির্বাচিত হন। তাঁরা হলেন : মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, মওলানা আলতাফ হোসেন ও মহিবুস সামাদ।

পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার সম্বন্ধে মওলানা ভাসানীর প্রতিক্রিয়া

কাউন্সিলে মওলানা ভাসানীকে সভাপতির পদ থেকে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে যে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে সম্বন্ধে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি 'হ্যাঁ বা না' সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে বলেন :[৪৩]

www.pathagar.com

> আমি বর্তমানে অসুস্থ ...আমি কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিব এবং পরে দুই মাসকাল প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করিয়া বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক, আর্থিক ও অন্যান্য পরিস্থিতি পর্য্যালোচনার পর আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অনুরোধ সম্পর্কে বিবেচনা করিব।

একই সাক্ষাৎকারে, তাঁর কথায়, কাউন্সিলের প্রথম দিনের কার্যসূচিতে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়টি না থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুপস্থিতিতে এবং তাঁর সঙ্গে কোনোরূপ আলোচনা না করে এ ব্যাপারে প্রস্তাব পাস, ওয়ার্কিং কমিটির ৯ সদস্যের পদত্যাগ করার পর ঐ পদত্যাগপত্র গ্রহণ ও তদস্থলে নতুন সদস্য নিয়োগ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ব সিদ্ধান্ত কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন, তাঁকে অবহিত না করে কাউন্সিলে পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন, ৩ জন সহ-সভাপতি নির্বাচন ইত্যাদি উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সকল কাজই যখন সভাপতির সহিত পরামর্শ না করিয়া করা হয় ..., তখন আর সভাপতি পদে আমার থাকার দরকার কী?'[৪৪] তিনি পাকিস্তানের জন্য জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ না করাকে 'অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের ব্যাপার' বলে মন্তব্য করেন। আওয়ামী লীগ সরকার ২১-দফা দাবির 'অধিকাংশই' কার্যে পরিণত না করায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাছাড়া 'ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি বন্ধের পরিবর্তে আরও বাড়িয়েছে' এবং এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করার তিনি অভিযোগ করেন।

মওলানা ভাসানীর এ প্রতিক্রিয়াটি ছিল রাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত। আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিল যেসব কার্য সম্পাদন করেছে, তা গঠনতন্ত্রের মধ্যে থেকেই বৈধভাবে করেছে। অপরদিকে, ২১-দফার সংখ্যা বিচারে অনেক দাবি তখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি বটে, তবে নানা টানাপোড়েনের মধ্যে মাত্র দুবছর সময় আর প্রাদেশিক সরকারের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকার ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণাসহ আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা পূর্বে উল্লিখিত, তার গুরুত্ব কিছুতেই কম ছিল না।

বস্তুত, আওয়ামী লীগের কাগমারি সম্মেলন (৭-৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭) থেকেই দলের অভ্যন্তরে ইতোমধ্যে মওলানা ভাসানীকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বামপন্থি উপদলটির মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন নিজেদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন গঠনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের এক মাস ১১দিন পর ২৫ ও ২৬শে জুলাই ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ভাসানীর আহ্বানে নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, খান আবদুল গাফফার খান, জি এম সৈয়দ, মাহমুদুল হক ওসমানী (সাধারণ সম্পাদক, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ) প্রমুখ বামপন্থি নেতা উপস্থিত হন। এ সম্মেলনে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং মাহমুদুল হক ওসমানীকে সাধারণ সম্পাদক করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নতুন রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠিত হয়।[৪৫] অলি আহাদকে করা হয় ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক।[৪৬] পূর্ব বাংলার বামপন্থিদের 'গণতন্ত্রী দল' এবং পশ্চিম পাকিস্তানের 'ন্যাশনাল পার্টি' সহ আরও কয়েকটি প্রগতিশীল সংগঠন এ দলের সঙ্গে একীভূত হয়।[৪৭]

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা নির্বাচন[৪৮]

১৩ ও ১৪ই জুন অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক শূন্য পদে ৯ জন সদস্যের পূর্ব-মনোনয়ন অনুমোদন, ১১-সদস্যের পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন ও ৩ জন সহ-সভাপতি নির্বাচন ব্যতীত পূর্বের কমিটি অপরিবর্তিত রাখা হয়। মওলানা ভাসানীর আনুষ্ঠানিকভাবে দল গঠনের পর তাঁর স্থলে নবনির্বাচিত প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দলের ৩ সহ-সভাপতি ও সিনিয়র নেতার মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কারণে তাঁদের ঐ শূন্য পদে নতুন ৩ জনকে নির্বাচিত করতে হয়।

কাউন্সিলের শেষদিন আওয়ামী লীগের নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন :

সভাপতি		মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী/ মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
সহ-সভাপতি	:	মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ মওলানা আলতাফ হোসেন মহিবুস সামাদ
সাধারণ সম্পাদক	:	শেখ মুজিবুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	আবদুল হামিদ চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক	:	অধ্যাপক হাফেজ হাবিবুর রহমান
শ্রম সম্পাদক	:	জহুর আহমেদ চৌধুরী
সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি ও স্বেচ্ছাসেবক সম্পাদক	:	তাজউদ্দীন আহমদ
মহিলা সম্পাদিকা	:	মিসেস মেহেরুন্নেসা খাতুন
দপ্তর সম্পাদক	:	মোহাম্মদউল্লাহ
কোষাধ্যক্ষ	:	

সদস্য : আব্দুল আজিজ (চট্টগ্রাম), আব্দুল জব্বার খদ্দর (নোয়াখালী), আবদুল বারী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া (ময়মনসিংহ), সৈয়দ আকবর আলী (সিরাজগঞ্জ), শেখ আব্দুল আজিজ (খুলনা), মোমিন উদ্দিন আহমদ (খুলনা), মশিউর রহমান (যশোর), সাদ আহমেদ (কুষ্টিয়া), জহুর আহমেদ চৌধুরী (রাজশাহী), কাজী গোলাম মাহবুব (বরিশাল), ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (পাবনা), আমজাদ হোসেন (পাবনা), ডা. মযহারুদ্দিন আহমেদ (রংপুর), রহিমুদ্দিন আহমেদ (দিনাজপুর), আমিনুল হক চৌধুরী (বরিশাল), কামরুদ্দীন আহমেদ (ঢাকা), জসিমুদ্দিন আহমদ (সভাপতি, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ), আমজাদ হোসেন (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ), মজিবর রহমান (সভাপতি, রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ), দেওয়ান মহিউদ্দিন আহমেদ (বগুড়া), রওশন আলী (সাধারণ সম্পাদক, যশোর জেলা আওয়ামী লীগ), শামসুল হক (ঢাকা), আজিজ আহমেদ (নোয়াখালী)।

আওয়ামী লীগের কাগমারি বিশেষ সম্মেলনে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, দলের আলোচ্য কাউন্সিলে তা চূড়ান্ত রূপ নেয়।

www.pathagar.com

এর অনিবার্য পরিণতি হলো মওলানা ভাসানী ও তাঁর অনুসারীদের আওয়ামী লীগ ছেড়ে নতুন দল গঠন। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নটি ছিল মূলত উপলক্ষ্য। বস্তুত, দলের মধ্যে ১৯৫৩ সালে অলি আহাদের অন্তর্ভুক্তির পর মওলানা ভাসানীকে ঘিরে একটি বামপন্থি উপদল সৃষ্টি হয়েছিল। পরিস্থিতি এমনি পর্যায়ে গড়ায় যে, ঐক্যবদ্ধ থাকা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এর মধ্যেও দলের সভাপতি মওলানা ভাসানীকে স্বপদে বহাল রাখার নানা চেষ্টা নেওয়া হয়।

পুরান ঢাকার অত্যন্ত প্রভাবশালী, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ (ব্যক্তিগতভাবে দলের অর্থ যোগানদাতা) ও একই সঙ্গে ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি ইয়ার মোহাম্মদ খানের দলত্যাগ ছিল বড়ো ক্ষতি। উপরন্তু ৫৪ সালে আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্রী দল থেকে যুক্তফ্রন্ট দ্বারা মনোনীত হয়ে নির্বাচিত ২৫ জনের মতো প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মওলানা ভাসানীর নবগঠিত দলের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। ঠিক এমনই এক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রিত্ব ছেড়ে শক্ত হাতে আওয়ামী লীগের হাল ধরতে সংগঠনের কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তথ্যনির্দেশ

১. দ্রষ্টব্য *আজাদ*, ১৩, ১৪ ও ১৫ ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ১। মওলানা ভাসানী সে সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তবে কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁর যোগদান না করার মূল কারণ ছিল সোহরাওয়ার্দীসহ দলের নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মতবিরোধ।

২. এটি ছিল বিশেষ সম্মেলন। বিস্তারিত, সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমী ১৯৯৪, পৃ. ১৩৫-১৫১; অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি*, পৃ. ২২০-২২৬

৩. ১৯৫৬-১৯৫৮ এ সময়ে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় দুই বছর আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন থাকে বটে, তবে একই সময়ের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিনের জন্য ঐ সরকারকে দুই বার ক্ষমতা হারাতে এবং পুনরায় সরকার গঠন করতে হয় (৩১শে মার্চ ১৯৫৮ ক্ষমতা হারানো ১লা এপ্রিল সরকার গঠন, ১৯শে জুন পদত্যাগ ২২শে আগস্ট সরকার গঠন)। ৭ই অক্টোবর ১৯৫৮ জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারি হলে সরকারের চূড়ান্ত পতন ঘটে। অপরদিকে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় ইস্কান্দার মীর্জার ইঙ্গনে রিপাবলিকান পার্টি সোহরাওয়ার্দীর ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে ১১ই অক্টোবর ১৯৫৭ কেন্দ্রে ১৩ মাসের আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে।

৪. ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হলে সাম্প্রদায়িক নাম থাকার কারণে অলি আহাদ সে সময়ে ঐ সংগঠনে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। দ্রষ্টব্য, শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ৮৯

www.pathagar.com

৫. দ্রষ্টব্য, শেখ মুজিবুর রহমান, *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী ১৯৫৫*। নতুন এ গঠনতন্ত্রে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দল ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখার বিধান করা হয়।

৬. Najma Chowdhury, *Legislative Process in Bangladesh,* p. 194

৭. ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭৬-এ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মওলানা ভাসানী কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হননি। ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দল 'ভোটের আগে ভাত চাই', এ বক্তব্য দিয়ে ঐ নির্বাচন বর্জন করে। উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালের ১৩-১৪ই জুনের আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়, 'মওলানা ভাসানী কোন গঠনমূলক সমালোচনা বা প্রস্তাবে সক্ষম নন, কেবল ধ্বংসাত্মক সমালোচনা করেন'। *আজাদ*, ১৬ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ৪

৮. কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বিরোধ ও বিশ্ব রাজনীতির গতি-প্রকৃতি বিবেচনায় পাকিস্তানের জন্য বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের দুর্বলতা তুলে ধরতে গিয়ে কাগমারি সম্মেলন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী তাঁর বহুল আলোচিত জিরো+জিরো+জিরো = জিরো, এ তত্ত্ব দিয়েছিলেন।

৯. Najma Chowdhury, *Legislative Process in Bangladesh,* p. 194

১০. পদত্যাগ পত্রটি দ্রষ্টব্য, অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি*, পৃ. ২২৭

১১. *আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে জেনারেল সেক্রেটারির রিপোর্ট ১৯৫৭*; আরও Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh,* p. 195; আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, পৃ. ৮৪। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন তাঁর বিরুদ্ধে স্থায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না সে ব্যাপারে ১৫ দিনের মধ্যে তাঁকে কারণ দর্শাতে বলা হয়।

১২. *The Pakistan Observer*, 3 June 1957, p. 1, 8

১৩. তিনি দলের কোষাধ্যক্ষ ছাড়াও ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

১৪. তিনি হলেন আবদুস সামাদ আজাদ (সিলেট)। ষাটের দশকের শেষের দিকে তিনি পুনরায় আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর নামের সঙ্গে 'আজাদ' যুক্ত হয়, যা তখন থেকে নামের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। তিনি ১৯৫১ সালে গঠিত বামপন্থি যুব সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের কার্যকর কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৫. তিনি সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

১৬. তিনি বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

১৭. বিস্তারিত, আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, পৃ. ৮২-৮৬

১৮. *ঐ*

১৯. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে জেনারেল সেক্রেটারির রিপোর্ট ১৯৫৭;* আরও, আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, পৃ. ৮৬

www.pathagar.com

২০. *ঐ*, আজাদ, ৪ঠা জুন ১৯৫৭, পৃ. ১, ৬

২১. তিনি ছিলেন ১৯২২ সালের সলঙ্গা (সিরাজগঞ্জ) কৃষক বিদ্রোহের নেতা। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ৪৮ ও ৫২-র ভাষা-আন্দোলনে তিনি আইন পরিষদের ভেতরে ও বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিস্তারিত, হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পুনর্পাঠ*, ইউপিএল ২০১৩, পৃ. ৯৫-৯৬

২২. এ সম্বন্ধে *আজাদ* পত্রিকার মন্তব্য 'কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কাজের জন্য প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভবন ব্যবহার এই প্রথম।' *ঐ*, ১৩ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ৬

২৩. মওলানা ভাসানীর এ অভিযোগ সঠিক নয়। দলের গঠনতন্ত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্বন্ধে বলা হয় [গঠনতন্ত্র ৫৯(ক)], 'আওয়ামী লীগের নীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, গঠনতন্ত্র, নিয়মাবলী বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্য, পূর্বপাক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল, ওয়ার্কিং কমিটি বা পার্লামেন্টারি বোর্ড বা পার্লামেন্টারি পার্টির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পূর্বপাক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।'

[গঠনতন্ত্র ৫৯(ঙ)] 'শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া উপযুক্ত কারণ দর্শাইবার জন্য সুযোগদানের উদ্দেশ্যে সাধারণ সম্পাদক পোষ্টাল রেজিষ্ট্রেশন যোগে নোটিশ দিতে বাধ্য থাকিবেন।'

শূন্য পদে মনোনয়নদান সম্পর্কে যা বলা হয় [গঠনতন্ত্র ৩৭(খ)], 'পূর্বপাক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল, ওয়ার্কিং কমিটি বা পূর্ব পাকিস্তান হইতে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সদস্যপদ বা অন্য কোন কমিটি বা পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্যপদ বা পূর্বপাক আওয়ামী লীগের কোন কর্মকর্তার পদ শূন্য হইলে কো-অপশন বা মনোনয়ন দ্বারা পূরণ করা।' *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী ১৯৫৫*

২৪. *আজাদ*, ১৩ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ১, ৬

২৫. দ্রষ্টব্য *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে জেনারেল সেক্রেটারির রিপোর্ট ১৯৫৭*; আরও, *আজাদ*, ১৪ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ২

২৬. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, পৃ. ১০০-১০১; হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২০৯-২১০; *আজাদ*, ১৪ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ২

২৭. দ্রষ্টব্য *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে জেনারেল সেক্রেটারির রিপোর্ট ১৯৫৭*

২৮. *ঐ*

২৯. প্রথমে বঙ্গবন্ধুসহ ৪ জন সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এরপর ১৯শে সেপ্টেম্বর আরও ৭ জনকে যুক্ত করে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হয়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন বিষয়ের দায়িত্বে।

৩০. দ্রষ্টব্য *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে জেনারেল সেক্রেটারির রিপোর্ট ১৯৫৭*

৩১. এ ব্যাপারে কাউন্সিলে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা ছিল এরূপ, 'প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা হইতে জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের পদত্যাগপত্রের বিষয়টি তাঁহার আসন্ন চীন সফর হইতে

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত মুলতবী রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান চীন হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে পর উজীরে আলা [মুখ্যমন্ত্রী] ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রস্তাবটি পুনর্বিবেচনার জন্য সময় নির্ধারণ করিবেন।' *আজাদ*, ১৫ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ৫

৩২. HR Talukdar , *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, p. 117

৩৩. *আজাদ*, ১৬ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ১

৩৪. তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের মধ্যে উপদলীয় কোন্দলের কারণে বহিষ্কৃত ও গ্রেফতার হন। ১৯৫১-১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একত্রে কারাগারে ছিলেন। মুক্তিলাভের পর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পূর্বে বামপন্থী নেতা-কর্মীদের নিয়ে গঠিত গণতন্ত্রী দলে যোগদান করেন এবং যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে গিয়ে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হলে (জুলাই ১৯৫৭) তিনি এর যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিস্তারিত হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পুনর্পাঠ*, পৃ. ৯৯-১০২

৩৫. *আজাদ*, ১৪ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ১

৩৬. *ঐ*, পৃ. ৬

৩৭. *ঐ*

৩৮. *ঐ*, ১৫ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ১, ৫

৩৯. ১৯৫৬ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাঁর প্রাথমিক চিন্তাভাবনা ছিল। তবে ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে তা অনুষ্ঠিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে সোহরাওয়ার্দীর সরকারের পতনের পরও আই আই চন্দ্রীগড় সরকার ও তাঁর পরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত রিপাবলিকান পার্টির সংসদীয় নেতা মালিক ফিরোজ খান নুন-এর নেতৃত্বে গঠিত সরকার সকলেই সে লক্ষ্যে এক প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। HR Talukdar . *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, p. 122

৪০. উল্লেখ্য, প্রথম দিনের কাউন্সিল অধিবেশনের পর মওলানা ভাসানীকে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আবুল মনসুর আহমদ ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে যান। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করতে অসমর্থ হন। *আজাদ*, ১৪ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ৬

৪১. *আজাদ*, ১৫ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ১, ৫। উল্লেখ্য, ২৪শে জুন থেকে ১৩ই জুলাই ১৯৫৭ বঙ্গবন্ধু চীনে সরকারি সফর করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন পরিচয় (১৯৫৫-১৯৭৫)', পৃ. ২৯৪

৪২. *ঐ*

www.pathagar.com

৪৩. দ্রষ্টব্য 'পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের প্রশ্ন দুই মাস পরে বিবেচনা করিব,' *আজাদ*, ১৬ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ১, ৪

৪৪. *ঐ*

৪৫. দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ১৭৮; অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি*, পৃ. ২৩২-২৩৩; Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971*, Dhaka 1990, pp. 23-43

৪৬. মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*, অখণ্ড সংস্করণ, ঢাকা ২০১৫, পৃ. ২১২

৪৭. গণতন্ত্রী দলের সভাপতি হাজী মোহাম্মদ দানেশ নবগঠিত ন্যাপের সর্ব-পাকিস্তান ও প্রাদেশিক উভয় কমিটির সহ-সভাপতি, অপরদিকে গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলী প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম*, পৃ. ২১১-২১২

৪৮. *আজাদ*, ১৫ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ১, ৫

www.pathagar.com

অধ্যায় : ছয়

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৪ : দলের পুনরুজ্জীবন

১৯৫৭ সালের কাউন্সিল অধিবেশনের ছয় বছর সাত মাস পর ১৯৬৪ সালের ৬-৮ই মার্চ আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী পরবর্তী কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দুবছরের মধ্যে কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও দেশের উদ্ভূত বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৪ সালের কাউন্সিল অধিবেশন ছিল দলের পঞ্চম নিয়মিত কাউন্সিল।[১] দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে ঢাকার গ্রীন রোডস্থ আমবাগানে[২] এটি অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এমএনএ। ৯৪৪ জন কাউন্সিলর ও ডেলিগেটস, পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৭ জন নেতা[৩] এবং আওয়ামী লীগের ১২ জন এমএনএ এতে যোগদান করেন।[৪] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিলে তাঁর রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন। এ কাউন্সিলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, ১৯৫৮ সালের মার্শাল ল ঘোষণার সাড়ে পাঁচ বছর পর বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে এ কাউন্সিলের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটে। একে কেন্দ্র করে দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে দুটি বিপরীত ধারার সৃষ্টি হয়।

পটভূমি

আওয়ামী লীগের ১৯৫৭ সালের কাউন্সিল থেকে আলোচ্য কাউন্সিল (১৯৬৪) পর্যন্ত মাঝের সময় ছিল খুবই ঘটনাবহুল। উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ হচ্ছে পাকিস্তানের সেনা-আমলা কেন্দ্রিক শাসকবর্গের মধ্যে চরম ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ১৯৫৯ সালে প্রতিশ্রুত জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পিকারের অপ্রীতিকর ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যু (১৯৫৮), জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার সামরিক আইন জারি (৭ই অক্টোবর ১৯৫৮), ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুবের ক্ষমতা দখল (২৭শে অক্টোবর ১৯৫৮), পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ বাতিল, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তার (১১ই অক্টোবর ১৯৫৮), ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার গ্রেপ্তার (সেপ্টেম্বর ১৯৫৮), জনপ্রতিনিধিদের অযোগ্য ঘোষণার 'এবডো' আইন পাশ (৭ই আগস্ট ১৯৫৯), আইয়ুবের 'মৌলিক গণতন্ত্র' আদেশ (২৬শে অক্টোবর ১৯৫৯), জেনারেল আইয়ুবের আস্থা ভোট (১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬০), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তার (৩০শে জানুয়ারি ১৯৬২), বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার (৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বিক্ষোভ, জেনারেল আইয়ুব কর্তৃক গঠিত শরীফ

www.pathagar.com

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট (১৯৬২), আইয়ুবের নতুন শাসনতন্ত্র (১লা মার্চ ১৯৬২), মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন (যথাক্রমে ২৮শে এপ্রিল ও ৬ই মে ১৯৬২), আইয়ুবের সামরিক আইন প্রত্যাহার (৮ই জুন ১৯৬২), 'নয় নেতার বিবৃতি' (২৪শে জুন ১৯৬২), আইয়ুবের 'রাজনৈতিক দলবিধি' (১৫ই জুলাই ১৯৬২), সোহরাওয়ার্দীর কারামুক্তি (১৯শে আগস্ট ১৯৬২), সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আইয়ুব-বিরোধী মঞ্চ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) গঠন, আইয়ুব সমর্থিত মুসলিম লীগ (কনভেনশন) গঠন (৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২), বৈরুতে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু (৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৩) ইত্যাদি।

১৯৫৭ সালের ১১ই অক্টোবর কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন হলে মুসলিম লীগ সংসদীয় নেতা আই আই চুন্দ্রীগড় রিপাবালিকান পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেন। তাঁর সরকার দুমাসের কম সময় (১৮ই অক্টোবর-১১ই ডিসেম্বর ১৯৫৭) স্থায়ী হয়। এরপর ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে রিপাবলিকান পার্টির সংসদীয় দলের নেতা মালিক ফিরোজ খান নুন সরকার গঠন করেন। দেশে যথাশীঘ্র সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার শর্তে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান না করে বাইরে থেকে এ সরকারের প্রতি সমর্থন দান করে। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ঐ নির্বাচন সম্পন্ন হবে বলে স্থির করা হয়। এদিকে ১৯৫৮ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী দলীয় কৃষক-শ্রমিক পার্টির সদস্যদের মধ্যে এক অপ্রীতিকর ঘটনায় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মারাত্মকভাবে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনদিন পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এমনই এক অবস্থায় ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। সাধারণভাবে রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বকে এ অবস্থার জন্য দায়ী করা হলেও প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার ক্ষমতালিপ্সা ও তা চরিতার্থ করতে কূটকৌশলের আশ্রয়, নির্বাচনের ফলে সামরিক-বেসামরিক আমলা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব হারাবার ভীতি ইত্যাদি এ অবস্থা সৃষ্টির মূলে কাজ করে।

সামরিক শাসন জারির সঙ্গে-সঙ্গে ৫৬ সালের সংবিধান বাতিল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বরখাস্ত, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ বাতিল এবং সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ১১ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার এবং সে অবস্থায় একের পর এক তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা আবুল মনসুর আহমদ, সীমান্ত প্রদেশের আবদুল গফফার খানসহ অনেকেই গ্রেফতার হন। এদিকে সামরিক শাসন জারির পরপর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা তাঁর ক্ষমতা আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীতে পদোন্নতি ও কৌশলগত পদে রদবদল করতে উদ্যত হলে তাঁর সামরিক শাসন জারির বিশ দিনের মধ্যে প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান এক পাল্টা

www.pathagar.com

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। শুরু হয় আইয়ুবের এক দশকের শাসন।

জেনারেল আইয়ুবের ক্ষমতা দখলের পর ১৯৬২ সালের জুন পর্যন্ত তিন বছর আট মাস একটানা সামরিক শাসন চলে। রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের ওপর নেমে আসে স্টিমরোলার। আইয়ুব খান তাঁর শাসনকে পাকাপোক্ত করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে কয়েকটি হলো : এবডো (Elective Bodies Disqualification Order) পাস করে (৭ই আগস্ট ১৯৫৯) জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে রাজনীতি ও নির্বাচন থেকে বিরত রাখা,[৫] 'মৌলিক গণতন্ত্র' (২৬শে অক্টোবর ১৯৫৯) নামে ওপর থেকে নিয়ন্ত্রিত, স্তরভিত্তিক ও পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন, ১৯৬০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর দ্বারা আস্থা ভোটের আয়োজন ও শতকরা ৯৫.৬ ভাগ ভোট লাভ, ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্র ধারণাভিত্তিক নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন (যা ছিল কার্যত প্রকৃত গণতন্ত্রবিরোধী, এক ব্যক্তি-নির্ভর, কেন্দ্রীভূত ও পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা-আমলা নিয়ন্ত্রিত শাসন প্রতিষ্ঠার একটি ব্যবস্থা), মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে ১৯৬২ সালের ২৮শে এপ্রিল ও ৬ই মে যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের অনুগত সংসদ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।[৬]

এ পর্বে আইয়ুবের সামরিক শাসনের সবচেয়ে বেশি আক্রমণ আসে পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃবৃন্দের ওপর। আইয়ুবের পূর্বসূরী জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক সামরিক আইন জারির পরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। একনাগাড়ে দুবছর দুমাস তেরদিন কারাগারে বন্দি থাকার পর ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬০ তিনি মুক্তি পান।[৭] ১৯৬২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে এবার সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর (৮ই জুন) ১৮ই জুন তিনি মুক্তিলাভ করেন।[৮] পূর্বে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত জনপ্রিয় *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক ও মালিক, বিশিষ্ট কলাম লেখক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার করে সামরিক আদালতে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগের প্রধান ও প্রবীণ নেতা, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করে কারাবন্দি করা হয়। প্রতিবাদে মার্শাল ল উপেক্ষা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। ক্রমে তা জেলা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। এর কয়েক মাস পর আইয়ুব কর্তৃক গঠিত শরিফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে (১৯৬২ সালের মধ্যবর্তী সময়) চলমান ছাত্র আন্দোলনে তা ঘৃতাহুতি দেয়। ছাত্রসমাজ রিপোর্টকে গণবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল, শিক্ষা সঙ্কোচনমূলক ও ব্যয়বহুল আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে হতাহতের ঘটনা ঘটে। আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।[৯]

www.pathagar.com

এদিকে ৮ই জুন (১৯৬২) আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় বটে, তবে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর বিধিনিষেধ অব্যাহত থাকে। এমতাবস্থায়, ২৪শে জুন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের ৯ জন বিশিষ্ট নেতা রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র, জনগণের ভোটে নির্বাচন, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি দাবিতে একটি যৌথ বিবৃতি দেন, যা 'নয় নেতার বিবৃতি' নামে খ্যাত।[১০] ১৫ই জুলাই আইয়ুব সরকার রাজনৈতিক দলবিধির (Political Parties Regulation) আওতায় কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে রাজনৈতিক দল গঠন বা পুনরুজ্জীবনের অনুমতি প্রদান করে। 'নয় নেতার বিবৃতি'-র মাধ্যমে আইয়ুব-বিরোধী সম্মিলিত আন্দোলনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ১৯শে আগস্ট সোহরাওয়ার্দীর মুক্তি লাভের পর তা বাস্তবে রূপলাভ করে। ২৫শে সেপ্টেম্বর তাঁর নেতৃত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত ৫টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে আইয়ুব-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বার্থে স্ব-স্ব রাজনৈতিক দল পুনরুজ্জীবিত না করে, রাজনৈতিক মোর্চা অর্থাৎ 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (এনডিএফ) গঠিত হয়। 'নয় নেতার বিবৃতি'র আলোকে 'গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র' কায়েম ছিল এর অভিন্ন লক্ষ্য। শুরু হয় পাকিস্তানের উভয় অংশের বিভিন্ন শহরে নেতৃবৃন্দের একের পর এক জনসভা। এতে লাখো জনতার সমাবেশ ঘটে। দেশজুড়ে সৃষ্টি হয় গণজাগরণ। এর মোকাবেলায় সরকার নানা নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সোহরাওয়ার্দীসহ এবডোভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক দল, ফ্রন্ট ও কোনোরূপ রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরওপ করা হয়। অপরদিকে ১৯৬২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর আইয়ুব সমর্থিত মুসলিম লীগ (কনভেনশন) গঠিত হয়। এর দেখাদেখি ২৭শে নভেম্বর এনডিএফ-এর সঙ্গে যুক্ত মুসলিম লীগের আইয়ুব-বিরোধী নেতৃবৃন্দ এক কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) গঠন করেন। এঁদের অনুসরণ করে এনডিএফ-এর শরিক দল জামায়াতে-ই-ইসলামী ও নিজাম-ই-ইসলামী পুনরুজ্জীবিত হয়। এনডিএফ-এর মূল নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ওপর একদিকে নতুন করে রাজনৈতিক বিধিনিষেধ, অপরদিকে ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশে গমন করেন। সার্বিক এ অবস্থা এনডিএফ-এর কর্মকাণ্ডের ওপর বড়ো ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৈরুতে (লেবানন) সোহরাওয়ার্দীর জীবনাবসান ঘটে। এনডিএফ-এর জন্য তা ছিল মৃত্যুতুল্য আঘাত।

আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত

আইয়ুব-বিরোধী রাজনৈতিক জোট এনডিএফ-এ আওয়ামী লীগ ছিল প্রধান শরিক দল। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ন্যূনতম দাবিতে এ জোটের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন শহরে বড়ো-বড়ো সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সত্যি, তবে এনডিএফ আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে, জোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যে চলছিল

www.pathagar.com

টানাপোড়েন, অবিশ্বাস ও দোদুল্যমানতা। একটি সুদৃঢ়, শক্তিশালী ও গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ব্যতীত ঢিলেঢালা মঞ্চ বা জোটের মাধ্যমে কোনো সফল আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়, এটি ছিল বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় বিশ্বাস। নেতার (সোহরাওয়ার্দী) কারণে বঙ্গবন্ধু দল পুনরুজ্জীবিত না করে এনডিএফ-এর মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে সম্মত হলেন বটে, তবে শুরু থেকেই এর সাফল্য সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান ছিলেন। ক্রমশই তিনি দলের পুনরুজ্জীবনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে থাকেন। দলের মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের ভাবনাও ছিল তাই। এ ব্যাপারে তিনি নেতার সম্মতি লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৯৬৩ সালের ৭ই এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পূর্বতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন জেলার প্রেসিডেন্ট ও সম্পাদকবৃন্দ এবং অন্য নেতৃবৃন্দের একটি যৌথসভা ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অধিকাংশ নেতাই দলের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে মত দেন এবং চিকিৎসা শেষে সোহরাওয়ার্দীর প্রত্যাবর্তন ও তাঁর সম্মতিতে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।[১১] একই বছর ৭ই ডিসেম্বর দলের পুনরুজ্জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সিনিয়র নেতা আতাউর রহমান খানের বাসভবনে ওয়ার্কিং কমিটির অপর এক সভার আয়োজন করা হয়। ধারণা করা হয়েছিল, এ সময়ের মধ্যে চিকিৎসা শেষে সোহরাওয়ার্দী সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসবেন, অথবা বঙ্গবন্ধু বৈরুতে গিয়ে তাঁর সম্মতি লাভের চেষ্টা করবেন। কিন্তু ৫ই ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী পরলোক গমন করলে ঐ সভা আর হয়নি। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সম্মুখে আর কোনো দ্বিধা থাকল না। এমতাবস্থায়, ১৯৬৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসভবনে নতুন করে সভা আহ্বান করা হয়। ৯ই জানুয়ারি দলের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু এ মর্মে নোটিশ ইস্যু করেন। সভায় যোগদানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির পূর্বতন সকল সদস্য, ইতোমধ্যে পুনর্গঠিত দলের জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঐ সভায় অন্যান্যের মধ্যে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির ২৩ জন এবং ১৭টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ১৬টির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাজউদ্দীন আহমদ এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং যশোরের মশিউর রহমান তা সমর্থন করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, চরম হতাশা থেকে দেশকে উদ্ধার, দলীয় কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা পালন, জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েমের সংগ্রামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করার জন্য আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন একান্ত আবশ্যক। সভা দুদিন ধরে চলে। একই সভায় ছয় সপ্তাহের মধ্যে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ও প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়।[১২]

পুনরুজ্জীবন প্রশ্নে মতানৈক্য

আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে দুটি বিপরীত ধারার সৃষ্টি হয়। একটি পুনরুজ্জীবনের পক্ষে এবং অপরটি পুনরুজ্জীবন না করে

www.pathagar.com

এনডিএফ-এর পক্ষে। স্বাভাবিকভাবেই, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন প্রথম ধারার মূল নেতা ও পুনরুজ্জীবনের উদ্যোক্তা। তাঁর সমর্থনে আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল মালেক উকিল, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, শেখ আবদুল আজিজ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, হাফেজ হাবিবুর রহমান, বেগম রোকাইয়া আনোয়ার, আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে, দ্বিতীয় ধারা বা এনডিএফ-পন্থি গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন দলের সিনিয়র নেতা আতাউর রহমান খান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন– আবুল মনসুর আহমদ, নুরুর রহমান, খয়রাত হোসেন, এ কে রফিকুল হোসেন, আবদুল হামিদ চৌধুরী, আবদুল জব্বার খদ্দর, জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগকে 'দুর্ভাগ্যজনক' অভিহিত করে এর বিরোধিতা এবং এনডিএফ-এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে আতাউর রহমান খান ও তাঁর সহযোগীরা পত্রিকায় বিবৃতি দেন।[১৩] ৭ই মার্চ (১৯৬৪) আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন পূর্ব পাকিস্তান এনডিএফ-এর আহ্বায়ক নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে তেজগাঁ ইন্দিরা রোডের এনডিএফ অফিসে এক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নেতৃবৃন্দ 'জাতীয় স্বার্থের খাতিরে বৃহত্তর ঐক্য' সৃষ্টির পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে এ ব্যাপারে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।[১৪]

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৬ই মার্চের কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বের দিন দলের অফিসে পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ও নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উভয় প্রদেশ থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সমর্থক কয়েকজন সদস্য[১৫] বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে যোগ দেন। সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, অন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজনদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এরপর পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জহিরুদ্দিন সংগঠনের রিপোর্ট পেশ করেন। ১২ জন সদস্য রিপোর্টের ওপর আলোচনা করেন। সভার এক প্রস্তাবে ৫ই মার্চ (১৯৬৪) হতে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত বলে ঘোষণা করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন সংক্রান্ত পূর্ব সিদ্ধান্তকে অনুমোদন দেওয়া হয়।[১৬]

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন

৬ই মার্চ শুক্রবার বিকেলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশন গ্রীন রোডের আমবাগানে শুরু হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে কাউন্সিলর ও ডেলিগেটবৃন্দ ছাড়াও পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্যগণ ও জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সদস্যবৃন্দ[১৭] বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে

www.pathagar.com

উপস্থিত ছিলেন। *দৈনিক ইত্তেফাকের* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াও কিছুক্ষণের জন্য দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কাউন্সিলের উদ্বোধক ছিলেন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এমএনএ।

বহুবর্ণের বিভিন্ন পোস্টারে অধিবেশন প্যান্ডেল সজ্জিত করা হয়। এসব পোস্টারে 'একনায়কত্ববাদ ধ্বংস হোক', 'মৌলিক অধিকার দিতে হবে', 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে', 'শোষণ নীতি বন্ধ কর', 'পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম কর', 'নৌবাহিনীর প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে চাই', 'শিক্ষার সংকোচন নীতি চলবে না', 'জনসংখ্যার ভিত্তিতে সৈন্যবাহিনীতে লোক নিয়োগ করতে হবে', 'পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে', 'ট্যাক্সের বোঝা কমাও', 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিতে হবে' ইত্যাদি দাবি তুলে ধরা হয়।[১৮] অনুষ্ঠানে দুজন শিল্পী উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন।[১৯] উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে নেতৃবৃন্দ কাউন্সিলর ও ডেলিগেটসহ নীরব শোভাযাত্রা সহকারে সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলার মাজারে যান এবং ফাতেহা পাঠ করেন।

অধিবেশনের শুরুতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে বিভাগ-পূর্ব ভারত থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, পাকিস্তান রাষ্ট্রে বিরোধী দল গঠন, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠা ও পুনরুদ্ধার প্রভৃতি আন্দোলনে তাঁর অসামান্য অবদান ও ভূমিকার কথা তুলে ধরে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[২০] প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ। এছাড়া, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মানকী শরিফের পীর সাহেব, মিয়া ইফতেখার উদ্দীন, বিচারপতি এম আর কায়ানী, মোহম্মদ আলী (বগুড়া), মৌলভী তমুজুদ্দীন খান প্রমুখের স্মরণেও শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এরপর নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন :

> জনসাধারণের মৌলিক অধিকার পুনরুদ্ধার এবং গঠনতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য দেশে আজ সুসংগঠিত, সুসংহত ও শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং সেই জন্যই আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে।[২১]

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'একটি বিশেষ দলের সহিত (মুসলিম লীগ) গত ২০ বছর জড়িত থাকার স্মৃতি পিছনে ফেলিয়া আজ পরিস্থিতি এবং দেশে বিদ্যমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে আওয়ামী লীগে যোগদান করিতে হইতেছে।' ... 'তিনি বিশ্বাস করেন যে, দেশ রাজনৈতিক দলের চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান এবং এই কথা বিবেচনা করিয়াই তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছেন।' আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে শাহ আজিজ বলেন, 'তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতে শুধু সরকারের বিরোধিতা করায়ই নয়, পুরাপুরি দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত শক্তিও অর্জন করিবে এবং আওয়ামী লীগের মধ্য দিয়াই পূর্ণ গণতন্ত্র, আইন পরিষদের সার্বভৌমত্ব, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের মৌলিক অধিকার অর্জন করা সম্ভব হইবে।' এনডিএফ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ইন্তেকালের

www.pathagar.com

পর বা দেশে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে এনডিএফ কর্তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে এবং প্রকৃত এনডিএফ একটি 'নিষ্ক্রিয়তার ঐক্যজোটে' পর্যবসিত হয়।' পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানিদের ক্ষোভ-অসন্তোষ সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'গুটি কয়েক স্বার্থান্বেষী বুর্জোয়া এবং পাতি-বুর্জোয়াদের বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াসের প্রক্রিয়াতেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে।'[২২]

লক্ষণীয় যে, পূর্ব বাংলার জন্য 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' বা পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা, আওয়ামী লীগের এরূপ আদর্শ কিংবা মৌলিক দাবির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নয়, এনডিএফ বা অন্য কোনো দলের রাজনৈতিক সম্ভাবনা না থাকায় 'দেশে বিদ্যমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে' শাহ আজিজুর রহমান আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। যোগদান কালে 'দেশ রাজনৈতিক দলের চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান' তাঁর এ বক্তব্য তাঁর মানস বুঝার ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। 'পরিস্থিতি'র কারণে তিনি ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করলেও (যদিও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি) শাহ আজিজ ছিলেন একজন পাকা পাকিস্তানি অর্থাৎ অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী। আর সে কারণে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে জাতিসংঘে এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

শাহ আজিজুর রহমান ছাড়াও অনুষ্ঠানে গণতান্ত্রিক যুবলীগ (১৯৫১) ও গণতন্ত্রী দলের (১৯৫৩) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খাজা আহমদ[২৩] (ফেনী) আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। যোগদানের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বর্তমানে দেশে সুসংগঠিত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক চেতনাকে লুপ্ত করার যে চেষ্টা চালাইতেছে, উহাকে রোধ করিবার জন্য একটিমাত্র সুসংহত রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন। আর আওয়ামী লীগই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সারা পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।'[২৪] তিনি সকল গণতান্ত্রিক কর্মীকে আওয়ামী লীগে যোগদানেরও আহ্বান জানান।

আইয়ুব সরকারের সাবেক কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী (১৯৫৮-১৫ই এপ্রিল ১৯৬২) ও প্রাক্তন বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীমও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, 'পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ষোড়শ বর্ষে দেশ ও জাতিকে একনায়কত্বের দিকে আগাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে আর, এই একনায়কত্বই হইতেছে অরাজকতা এবং এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে।'[২৫]

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক রিপোর্ট[২৬]

কাউন্সিলের প্রথম দিনের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁর এ রাজনৈতিক রিপোর্টে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কাউন্সিল অনুষ্ঠানের কারণ ব্যাখ্যা, কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়কে 'যুগসন্ধিক্ষণ' হিসেবে অভিহিত করা, পাকিস্তানের রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র, জাতীয় নির্বাচনের শর্তে সরকারে যোগ না দিয়েও মালিক ফিরোজ খান নুনের সরকারের প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন,

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের বিজয়ের সম্ভাবনা থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচন বানচাল, পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পটভূমি, পাকিস্তানের রাজনীতি অস্থিতিশীল করতে জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার ভূমিকা, তাঁর অপসারণ ও আইয়ুবের ক্ষমতা দখল, সামরিক শাসন জারির পর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ওপর নেমে আসা গ্রেপ্তার-নির্যাতনসহ 'অত্যাচারের স্টিমরোলার', হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু, তাঁর নীতি আদর্শ ও অবদান, শুরু থেকে আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ইতিহাস, ষোলো বছরের মধ্যে কেন্দ্রে মাত্র তেরো মাস এবং প্রদেশে দেড় বছরের কিছু বেশি সময়ের জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার, স্বল্প সময় ও নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের 'রেকর্ড'যোগ্য সাফল্য ও এর বিবরণ, আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতি, গণতন্ত্রের সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা, আইয়ুবের 'মৌলিক গণতন্ত্র' ও জনগণের ভোটাধিকার হরণ, ৬২-র আইয়ুবি শাসনতন্ত্র, একে 'প্রহসন', 'আবার একটি ফন্দি' ও 'দেশকে আরেকটি ধোঁকা' দেওয়া বলে অভিহিতকরণ, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে শাসকগোষ্ঠীর বিষোদ্‌গার, আইয়ুব সরকার কর্তৃক 'এবডো ও প্রোডা'[২৭] আইনের আওতায় বহু জনপ্রিয় নেতাকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা, একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুতি, সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তার, বঙ্গবন্ধুর নিজের গ্রেপ্তার ও মুক্তি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূচনা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দাবিতে 'নয় নেতার বিবৃতি', গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবিতে এনডিএফ গঠন ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে এনডিএফ-এর ওপর এর প্রভাব, এনডিএফ ভুক্ত কতিপয় রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন, দাবি আদায়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা, আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের আবশ্যকতা, এ লক্ষ্যে ৭ই এপ্রিল ১৯৬৩ ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে দলের ওয়ার্কিং কমিটি ও জেলার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের সভা, দলের পুরাতন সহকর্মীদের আওয়ামী লীগে ফিরে আসার আহ্বান, পূর্ব বাংলার অনগ্রসরতা, পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চলের সম্পদ পশ্চিম অঞ্চলে চলে যাওয়া, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পশ্চিম পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য ও জাতীয় আয়ের সিংহভাগ ব্যয়, দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে 'বিরাট বৈষম্য ও ব্যবধান সৃষ্টি', এসব বিষয় দেশবাসীর সম্মুখে সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তুলে ধরা ইত্যাদি বিষয় গুরত্ব পায়।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার অযাচিত হস্তক্ষেপ ও কূটকৌশলের আশ্রয় কীভাবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সামরিক শাসনের পটভূমি রচনা করেছিল, সে সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু তাঁর রিপোর্টে বলেন :

> ...১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর হঠাৎ শাসনতন্ত্র নস্যাৎ করে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তন করা হোল। যে ইস্কান্দার মীর্জা রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে বসে ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক দল গঠনে ও তাঁদের কাজে অন্যায়ভাবে সর্বদা হস্তক্ষেপ করে দেশে স্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে বাধা দিতেন, যার প্রভাবে দেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, যিনি সবসময় অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে আজ একজনকে, কাল

www.pathagar.com

> অপরজনকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাতেন, সেই ইস্কান্দার মীর্জাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবের দোহাই এবং শাহেদ আলী সাহেবের মৃত্যুর জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে দায়ী করে দেশের ওপর সামরিক শাসন চাপিয়ে দেন।[২৮]

জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক ইস্কান্দার মীর্জার অপসারণ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন, '... আর সামরিক শাসন জারির পর মীর্জা সাহেবের অন্যায় আচরণের পিছনে যেসব সামরিক অফিসার ছিলেন তাঁরা সামরিক শাসন জারির কয়েকদিনের ভিতরেই তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসন দিতে বাধ্য হন। কারণ, মীর্জা সাহেব যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়ে আসছিলেন, সেই হস্তক্ষেপ পরে এদের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হয়– এই ভয়ে এঁরা এই পথের কন্টক অপসারণ করেন। এটা সর্বকাল ও যুগের নিয়ম যে, যে অন্যায় পথ কেউ অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে সেই অন্যায় পথেই সে নিজেও একদিন অপরের শিকারে পরিণত হবে।'[২৯]

পাকিস্তানে বিরোধী দলের ওপর শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন-নিপীড়নমূলক আচরণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর রিপোর্টে জনকল্যাণ, সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও শিষ্টাচার তৈরির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আবশ্যকতা এবং গণতন্ত্রহীন পরিবেশে বিরূপ অবস্থার সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে বলেন :

> দুঃখের বিষয়, গণতন্ত্রের মূলনীতি যেদেশ থেকে যখন তখন মুষ্টিমেয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন মহলের ইঙ্গিতে নির্বাসন দেওয়া হয়, যেদেশে কথায় কথায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা ও কর্মীবৃন্দকে জেলে আটক করা হয়, সেদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করা একটা বিরাট কাজ, একটা কঠোর কাজ। আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে জনকল্যাণকর ও সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।[৩০]

১৬ বছরের মধ্যে মাত্র দেড় বছরের সামান্য বেশি সময় প্রদেশে এবং তেরো মাস কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার পরিচালনার সুযোগ লাভ করে। বাকি পুরো সময় কাটে বিরোধী রাজনীতিতে। শুরু থেকেই অনেক প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তির মধ্যে দলকে ঐ রাজনীতি করতে হয়। বিরোধী দলে থেকেও আওয়ামী লীগের অনেক রাজনৈতিক সাফল্য রয়েছে। এসব কাউন্সিলরদের সম্মুখে তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সাফল্য হিসেবে তাঁর রিপোর্টে উদাহরণস্বরূপ দুটি বিষয়ের অবতারণা করেন– রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রতি সর্বপ্রথম সর্বমহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এর সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধুর কথায় :

> আওয়ামী লীগের ইতিহাস আপনাদের সংগ্রামের ইতিহাস...গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে জনকল্যাণকর ও সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পরিতাপের বিষয় আজ পর্যন্ত এর কোনটাই সম্ভব হয়নি। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের এতদিনের সংগ্রামে বিফল হয়েছি। উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদের সামনে মাত্র দু'একটি বিষয়ের অবতারণা করব। দেশ বিভাগের পর যখন দেশ একনায়কত্বের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, যখন তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের সমালোচনা করলে "Opposition কা ছের কুচাল দেয়েঙ্গে" বলা হত, তখন সর্বপ্রথম আমরা এদেশে বিরোধী দল সৃষ্টি করি। ...আপনাদের দ্বারা এদেশে আওয়ামী লীগ

www.pathagar.com

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এদেশে আজ বহু রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ এবং জনসাধারণ সরকার ও সরকারী দলের সমালোচনা করছে এবং এ সমালোচনা করার যে তাদের অধিকার আছে এটা একটা স্বীকৃত বিষয় হলেও এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনাদের ও আপনাদের প্রতিষ্ঠানের অবদান সবচেয়ে বেশী। এ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, এ অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কত সংগ্রাম, কত ত্যাগ আপনাদেরকে করতে হয়েছে—আপনাদের দুঃখ-দুদর্শা আর লাঞ্ছনার সে করুণ কাহিনী লেখা থাকবে পাকিস্তানের অতীত ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। আওয়ামী লীগই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার নেতা ও কর্মীবৃন্দ সর্বপ্রথমে দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে ও তার বাইরে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ ও এখানকার দরিদ্র কৃষকের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রাকে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও ধনী সম্প্রদায়ের স্বার্থে পশ্চিমাঞ্চলে ব্যয় হয়ে আসছে এবং বৈদেশিক ঋণ ও কেন্দ্র কর্তৃক অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় যে প্রায় সবই পশ্চিমাঞ্চলে করে আসছে যার ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাট বৈষম্য ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে– একথাও দেশবাসীকে সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ শুনিয়েছিল। এই সব কথা বলার জন্য আপনারা কত জেল-জুলুম ও অত্যাচার ভোগ করেছেন। কিন্তু আজ এসব অন্যায়ের প্রতিকার এমন জোরাল গণদাবীতে পরিণত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সামরিক সরকার ও বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষও আজ বাধ্য হয়ে অন্ততঃ কাজে না হলেও মুখে আমাদের এসব অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।[৩১]

পাকিস্তানি শাসন-শোষণ ও আঞ্চলিক বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম আর সেজন্য দৃঢ় ভিত্তিসম্পন্ন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল থাকার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেই যে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ, তা তিনি কাউন্সিলরদের সম্মুখে এভাবে তুলে ধরেন :

...অবিচারের একটা সীমা আছে। কিন্তু আমাদের উপর [পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা] যে অবিচার করা হচ্ছে তার নমুনা দুনিয়ার ইতিহাসে নেই। কাজেই আমাদের সম্মুখে দীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন আছে। ...ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, একটি সংগঠিত সরকারী শক্তি, যার পিছনে রয়েছে দেশের সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, তার সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হতে হলে জাতীয় ফ্রন্ট বা প্লাটফরমের পেছনেও সুসংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যক। ... শুধু বিবৃতি ও প্রচার কার্যের দ্বারা প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাসীনদের নিকট থেকে কোন দাবী আদায় করা সম্ভব নয়। আমরা সক্রিয় কর্মপন্থায় বিশ্বাসী। শুধু কতিপয় নেতার একতায় যে দেশের মুক্তি আসতে পারে এ নীতিতে বিশ্বাস করি না। গণদাবী আদায় করতে হলে শুধু কতিপয় নেতার তথাকথিত একতা নয়, জনগণের একতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর সেই জনগণের একতা শুধু সক্রিয় ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের একতার মধ্য দিয়েই সম্ভব নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে। ...এইসব [কারণেই] ...আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত ...।[৩২]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন : জেলা প্রতিনিধিদের বক্তব্য উপস্থাপন

৭ই মার্চ সকাল ৯টায় কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ-এর সভাপতিত্বে শুরু হয়। এ অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তানের দুজন সহ মোট ২২ জন প্রতিনিধি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা, সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, ভবিষ্যৎ করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এসব প্রতিনিধি হলেন[৩৩]: সাবেক মন্ত্রী মনসুর আলী (পাবনা), সৈয়দ নজরুল ইসলাম (সভাপতি, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ), এস ডব্লিউ লকিতুল্লা (আহ্বায়ক, বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি), প্রাক্তন এমপিএ রহিমুদ্দীন (সভাপতি, দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগ), এডভোকেট সাদ আহমদ (সাধারণ সম্পাদক, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগ), বেগম রোকাইয়া আনোয়ার এমএনএ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, আবদুল মালেক উকিল এমপিএ (সভাপতি, নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ), রওশন আলী (সাধারণ সম্পাদক, যশোর জেলা আওয়ামী লীগ), সাবেক এমপিএ মুজিবর রহমান (সভাপতি, রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ), শেখ আবদুল আজিজ (সভাপতি, খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ), প্রাক্তন পলিটিক্যাল সেক্রেটারি শামসুল হক (সভাপতি, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ), এ কে মুজিবর রহমান (সাধারণ সম্পাদক, বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ), শামসুদ্দিন মোল্লা (সাধারণ সম্পাদক, ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ), বজলুর রহমান (সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ), সিরাজুল ইসলাম (সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ), সৈয়দ ইসলামুদ্দীন (সিলেট), সুবোধ মিত্র (যশোর), লুৎফর রহমান (সহসম্পাদক, রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ) এবং এডভোকেট দলিলুর রহমান (কুমিল্লা)। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিদ্বয় হলেন সৈয়দ মঞ্জুরুল হক (সাধারণ সম্পাদক, করাচী আওয়ামী লীগ) ও এডভোকেট মালিক হামিদ সরফরাজ (লাহোর আওয়ামী লীগ)

বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধি ও অন্যান্য বক্তার বক্তব্যের ওপর নিজের চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। অধিবেশনে কাউন্সিলের বিবেচনার্থে প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য একটি সাবজেক্ট কমিটি গঠন করা হয়।

নেতৃত্ব নির্বাচন

কাউন্সিলে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ দলের সভাপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সিনিয়র সহ-সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৩৪]

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচন

৭ই মার্চ আওয়ামী লীগের সম্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের ১১ জন সদস্যের এক সভায় নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এমএনএ-কে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত করা হয়। এও সিদ্ধান্ত হয় যে, আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি একটি পৃথক ব্লক হিসেবে আসন গ্রহণ করবে এবং সংসদে সম্মিলিত বিরোধী দলের 'পাক পিপলস গ্রুপ'-এর অংশ হিসেবে কাজ করবে।[৩৫]

www.pathagar.com

সমাপ্তি অধিবেশন : প্রস্তাব গ্রহণ

৮ই মার্চ তৃতীয় দিনে ছিল কাউন্সিলের সমাপ্তি অধিবেশন। সকাল ৯টায় মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। এতে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ২৫শে জানুয়ারি (১৯৬৪) তাঁর ধানমন্ডি বাসভবনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটি ও জেলা প্রতিনিধিদের সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। এ সংক্রান্ত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, দল পুনরুজ্জীবন-বিরোধী নীতির ভিত্তিতে যে এনডিএফ গঠিত হয়েছিল, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ফলে এর প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র লুপ্ত হয়েছে এবং এনডিএফ এখন নিরর্থক হয়ে পড়েছে। আওয়ামী লীগ সম্মেলন বিশ্বাস করে যে, গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ আদায় করার জন্য সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন; কাজেই সম্মেলন পুনরুজ্জীবিত রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা গ্রহণের ব্যাপারে কার্যকর পরিষদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদককে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করছে।[৩৬]

কাউন্সিলে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৩৭] এতে দেখা যায় যে, মূল প্রস্তাবের কোনোটি আবার বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করা আছে। সে অনুযায়ী প্রস্তাবের সংখ্যা ২৬-এর অধিক হবে। যাহোক, কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :[৩৮]

১. প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার; জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসহ সকল প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা;

২. পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রাধান্যের স্বীকৃতিসহ পূর্ণগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন;

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা দান;

৪. পাকিস্তানের দুই অংশের সমান উন্নয়ন এবং দুই অংশের মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসন;

৫. আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের দেশরক্ষা ক্ষমতা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এই অঞ্চল সৈন্যবল ও সরঞ্জামের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হতে পারে;

৬. ফেডারেল কাঠামোর ভেতর পার্লামেন্টারি সরকার ব্যবস্থা কায়েম;

৭. রাজনৈতিক দল গঠন, জনসভা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা; সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার; মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা;

৮. নিরাপত্তা আইন, সীমান্ত অপরাধ আইন, রাজনৈতিক দল আইন এবং এবডো, প্রোডা আইন বাতিল;

৯. বেআইনীভাবে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক বন্দি, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদান;

১০. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথকীকরণ;

১১. একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন করতে সক্ষম বলে ধীরে-ধীরে তা প্রবর্তন;

www.pathagar.com

১২. পাকিস্তানের এক অংশ থেকে অপর অংশের দূরত্বের ফলে এক স্থান হতে জনশক্তি ও মূলধন স্থানান্তর প্রায় অসম্ভব বলে উভয় প্রদেশের জন্য পৃথক বা 'দুই অর্থনীতির' শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি দান এবং এর ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ;

১৩. করাচি হতে ইসলামাবাদে কেন্দ্রীয় রাজধানী সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ; করাচি রাজধানী উন্নয়নের পক্ষে অনুপযুক্ত হলে সে-ক্ষেত্রে ঢাকায় কেন্দ্রীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের পুনর্দাবি;

১৪. দেশ ও বিশ্ব শান্তির স্বার্থে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ;

১৫. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, জীবনযাত্রার ব্যয়-বৃদ্ধি, অত্যধিক ট্যাক্সের বোঝা, পাটসহ অর্থকরী ফসলের নিম্নমূল্য প্রভৃতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ; কৃষক যাতে অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় তার নিশ্চয়তা; দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার বিধান;

১৬. জমির ওপর স্বত্বের দলিল তৈরির আইন সংশোধন;

১৭. শ্রমিকদের ধর্মঘটের ওপর বিধিনিষেধ আরওপের প্রতিবাদ ও বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবি;

১৮. সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার সুপারি ও নারিকেল চাষিদের বিনা সুদে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দান;

১৯. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের পুনরাবৃত্তি রোধে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পরিকল্পনা কার্যকর করা;

২০. বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে যমুনা নদীর পশ্চিম তীর বরাবর রংপুর হতে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ;

২১. উত্তরবঙ্গের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাহাদুরাবাদের নিকট যমুনা নদীর ওপর পুল বা নদীর মধ্য দিয়ে টানেল নির্মাণ;

২২. অবিলম্বে পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও নিম্ন বেতনভোগী সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা;

২৩. অবিলম্বে প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতনের স্কেল এবং মাধ্যমিক স্কুল ও বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধি;

২৪. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওপর সরকারি কঠোর নিয়ন্ত্রণে ক্ষোভ প্রকাশ এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি;

২৫. মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার;

২৬. সালিশী আদালত বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ নীতির পরিপন্থি হওয়ায় এবং একশ্রেণির গ্রামীণ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ায় অবিলম্বে সালিশী আদালত অর্ডিন্যান্স বাতিল;

২৭. কাশ্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সমর্থন এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবি;

www.pathagar.com

২৮. ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীব্র নিন্দা; উভয় দেশে দাঙ্গা-বিপন্ন আশ্রিতদের সরকার কর্তৃক পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দান; ভারতের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা সৃষ্টিকারী দুর্বৃত্তদের কঠোর হস্তে দমন ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবি; সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানের আশ্বাস এবং ভারতের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে দেশত্যাগী না হওয়ার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান;

২৯. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক নিখোঁজ হওয়ায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ এবং তাঁর সন্ধান ও মানসিক চিকিৎসার জন্য কমিটি গঠনের দাবি।

কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে প্রথমবারের মতো এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। আগে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' বা 'আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার' এরূপ বলা ছিল। কিন্তু এবারের কাউন্সিলে দুই অঞ্চলের জন্য পৃথক বা 'দুই অর্থনীতির' স্বীকৃতির দাবিতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিষয়টিও এবারের কাউন্সিলের প্রস্তাবে অগ্রাধিকার পায় এবং এ ব্যাপারে কী করণীয় তাও নির্দিষ্ট করে বলার চেষ্টা করা হয়। পূর্বে ভারী শিল্প, কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণের কথা বলা হলেও এবারের কাউন্সিলে 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি'র পক্ষে স্পষ্ট করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্বের 'জোটনিরপেক্ষ' পররাষ্ট্রনীতি থেকে সরে এসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পাশ্চাত্যঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করায় ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী ও তাঁর অনুসারীরা আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' নামে পৃথক দল গঠন করেছিলেন। তখন পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে জোরালো অবস্থান নেন। ১৯৬৪ সালে সোহরাওয়ার্দীর অবর্তমানে বঙ্গবন্ধু তাঁর চিরাচরিত বিশ্বাস অনুযায়ী 'স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি'র নামে কার্যত পূর্বের অবস্থানে ফিরে এসেছেন, বলা যায়। এবারের কাউন্সিল প্রস্তাবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, যমুনা নদীর ওপর সেতু বা নদীর মধ্য দিয়ে টানেল নির্মাণের সুপারিশ। উল্লেখ্য, ৩৫ বছর পরে স্বাধীন বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেতু' নামে যমুনা নদীর ওপর তা নির্মিত হয়।

পূর্ব বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ, সর্বক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, সেনা-আমলা শাসন ও কর্তৃত্ব, প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন, গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে ৬০-এর দশকের শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ও কৌশল পুনর্নির্ধারণে মনস্থির করেন, যা ঘটনা পরম্পরায় স্পষ্ট। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোই যে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার বা জাতীয় মুক্তির অন্তরায়, এটি বঙ্গবন্ধুর মতো আর কেউ ঐ সময়ে বুঝতে সক্ষম হননি। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন, দলের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক রিপোর্ট, কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব, কাউন্সিল

www.pathagar.com

উপলক্ষ্যে প্যান্ডেলের বিভিন্ন স্থানে সাঁটা পোস্টারের বক্তব্য, এসব তখন আওয়ামী লীগ ও দেশের সামগ্রিক রাজনীতিতে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হওয়ার ইঙ্গিতবাহী ছিল।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১,২,৫, ৮; *ঐ*, ৮ই মার্চ ১৯৬৪ পৃ. ১, ৮; *ঐ*, ৯ই মার্চ ১৯৬৪ পৃ. ১, ৫, ৬; *আজাদ*, ৯ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১, ৮

২. *ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১, ৮; *ঐ*, ৯ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১; নূহ-উল-আলম লেনিন, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, পৃ. ৪৮-এ কাউন্সিলের স্থান হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণ বলে উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক নয়।

৩. মঞ্জুরুল হক (সাধারণ সম্পাদক, করাচী আওয়ামী লীগ), কে এ তিরমিজি (যুগ্ম-সম্পাদক, করাচী আওয়ামী লীগ), এডভোকেট মালিক হামিদ সরফরাজ, হাজী সোলায়মান আদমজী, এডভোকেট আমানুল্লা কাদরী, এডভোকেট আরশাদ চৌধুরী এবং শফিউল আলম। *ইত্তেফাক*, ৬ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ৮

৪. বেগম রোকাইয়া আনোয়ার, সৈয়দ হোসেন মনসুর, আবদুর রশিদ, লুৎফর রহমান খান, কামরুজ্জামান, আমজাদ হোসেন, সাইদুজ্জামান, আহমদ আলী মন্ডল, ডা. গোলাম মাওলা প্রমুখ। *ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ৮

৫. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ মোট ৭৮ জন রাজনীতিকের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করা হয়।

৬. দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২১৫-২৩১

৭. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন পরিচয়', পৃ. ২৯৪-২৯৫

৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৯৪-২৯৫

৯. দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২২৮-২৩৩

১০. *ঐ*, পৃ. ২৩৩-২৩৫

১১. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ১৯৬৪*, *ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ২, ৫

১২. Shyamoli Ghosh, *Awami League*, p. 63-68

১৩. *The Pakistan Observer*, 26 January 1964; আরও Shyamoli Ghosh, *Awami League*, p. 82

১৪. *ইত্তেফাক*, ৮ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১

১৫. এ অধ্যায়ের নোট ৪ দ্রষ্টব্য

১৬. *ইত্তেফাক*, ৮ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১

১৭. *ঐ*, পৃ. ৮

১৮. *ঐ*, পৃ. ৮

১৯. নিনা খান (ঢাকা) ও ননী দত্ত (চট্টগ্রাম)

২০. প্রস্তাবে বলা হয়, 'এই সভা গভীর শ্রদ্ধার সহিত পাকিস্তান সৃষ্টি ও পাকিস্তানে গণতন্ত্র এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মরহুম সোহরাওয়ার্দীর গৌরবময় অবদানের কথা স্মরণ করিতেছে। তাঁহার দৃঢ়সংকল্প, দুর্জয় সাহস এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই বিরাট

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধকতার মুখেও গঠনতান্ত্রিক বিরোধীদলের মাধ্যমে দেশে সত্যিকার গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করিয়া যে সংগ্রামের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, উহা ভবিষ্যৎ বংশধরদের মনে চির জাগরূক থাকিবে। এই সভা পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, আওয়ামী লীগের স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার মহান নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার আত্মার মাগফেরাত কামনা করিতেছে।' *ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১

২১. *ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১

২২. *ঐ*, পৃ. ১, ৮

২৩. তিনি গণতান্ত্রিক যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি এবং গণতন্ত্রী দলের কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন।

২৪. *ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ৮

২৫. *ঐ*, পৃ. ১

২৬. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ১৯৬৪*

২৭. Public and Representative Officer Disqualification Act, 1949

২৮. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ১৯৬৪*

২৯. *ঐ*

৩০. *ঐ*

৩১. *ঐ*

৩২. *ঐ*

৩৩. *ইত্তেফাক*, ৮ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ ৮; আরও *আজাদ*, ৮ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ ১, ৮

৩৪. *আজাদ*, ৩০শে মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১, ৮; তোফায়েল আহমেদ, 'সে সময়ের দুঃসহ স্মৃতি', *সমকাল*, ৩রা নভেম্বর ২০১৬, পৃ. ৯; হারুন-অর-রশিদ, *বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পুনর্পাঠ*, পৃ. ১২৪। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যসহ বাকি কর্মকর্তাদের তালিকা প্রাথমিক কোনো উৎস থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। লেখক-সাংবাদিক আবু আল সাঈদ তাঁর *আওয়ামী লীগের ইতিহাস* বইয়ে (পৃ. ১১৭) বেশ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোন তথ্যসূত্রে তা প্রাপ্ত এবং কারা সহ-সভাপতি ও কারা সদস্য তা সুনির্দিষ্ট করেননি। ফলে এ তালিকার সঠিকত্ব প্রশ্নাতীত নয়। বর্তমান গ্রন্থের লেখক বাংলাদেশে প্রাপ্ত সকল তথ্য-উৎস খুঁজে দেখেছেন। যা হোক দেশের বাইরের বা ভিন্ন কোনো উৎস থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলে, তা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করে এ অসম্পূর্ণতা পূরণ করা হবে।

৩৫. *ইত্তেফাক*, ৮ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ৮

৩৬. *ঐ*, ৯ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১,৫, ৬

৩৭. *আজাদ*, শিরোনামে লিখেছে '২৩টি প্রস্তাব গৃহীত', প্রতিবেদনে বলেছে '...প্রভৃতি প্রবর্তনের দাবী জানাইয়া মোট ৩৭টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে'; *ঐ*, ৯ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১

৩৮. সংকলিত সূত্র : *ইত্তেফাক*, ৯ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১, ৫, ৬; *আজাদ*, ৯ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১, ৮।

www.pathagar.com

অধ্যায় : সাত

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৬ : 'আমাদের বাঁচার দাবী' ৬-দফা

আগের কাউন্সিল থেকে দুই বছর পর ১৯৬৬ সালের ১৮-২০শে মার্চ ঢাকার মতিঝিলস্থ ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] দলের সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ 'অসুস্থ' থাকায়[২] এতে সভাপতিত্ব করেন সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। উদ্বোধন করেন ঢাকা হাইকোর্ট বারের সভাপতি আবদুস সালাম খান। কাউন্সিলের উদ্বোধনী সংগীত ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি', যা এখন আমাদের জাতীয় সংগীত।[৩] সারাদেশ থেকে ১৪৪৩ জন কাউন্সিলর ও ডেলিগেটস এতে যোগ দেন।[৪] করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতি মঞ্জুরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক কে এ তিরমিজিও যোগ দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের এ কাউন্সিল ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দলের নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচি, তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা সম্বন্ধে বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য রাখেন। এ কাউন্সিলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, আওয়ামী লীগ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর 'আমাদের বাঁচার দাবী' ৬-দফা দলের কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ এবং বঙ্গবন্ধুর দলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া।

পটভূমি

আলোচ্য কাউন্সিলের পূর্ববর্তী সময়ের প্রধান ঘটনাবলি ছিল আইয়ুব ও ফাতেমা জিন্নাহর মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (২রা জানুয়ারি ১৯৬৫), ফাতেমা জিন্নাহর সমর্থনে সম্মিলিত বিরোধী দল বা কপ গঠন, ১৭ দিনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫) ও যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে তাসখন্দ চুক্তি (১০ই জানুয়ারি ১৯৬৬), নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের আহ্বানে লাহোরে বিরোধী দলের কনভেনশন (৫-৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬), কনভেনশনের সাবজেক্ট কমিটিতে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচি পেশের ব্যর্থ চেষ্টা, কনভেনশনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কচ্ছেদ, ঢাকার বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের কাছে বঙ্গবন্ধুর সর্বপ্রথম ৬-দফা'র ব্যাখ্যা (১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬), আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক ৬-দফা গ্রহণ (২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬) ইত্যাদি।

১৯৫৮ সাল থেকে তিন বছর আট মাস একটানা সামরিক আইন শেষে ঐ আইন তুলে নিয়ে পাকিস্তানি শাসক জেনারেল আইয়ুব খান তাঁর তথাকথিত 'মৌলিক গণতন্ত্র' ধারণার ওপর ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের আওতায় নতুন এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করেন বটে, তবে তা ছিল সেনা-আমলা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রহীন এক ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করে আসছিল, যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এমনই এক অবস্থায় ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি আইয়ুব খান

www.pathagar.com

নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দেন। নির্বাচনে ভোটার ছিল ৮০,০০০ (আশি হাজার) 'মৌলিক গণতন্ত্রী'। এতৎসত্ত্বেও নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দল মিলে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party) বা 'কপ' গঠন করে আইয়ুবের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নী ফাতেমা জিন্নাহ-কে সমর্থন দেয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা এবং সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর প্রধান নির্বাচনি কর্মসূচি, যা ছিল বিরোধী দলেরও প্রধান দাবি। ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে বিপুল জনসমর্থন সত্ত্বেও তিনি হেরে যান শুধু একটি কারণে, আর তা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন ব্যবস্থা, যেখানে জনসমর্থন ছিল মূল্যহীন। তবুও ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রীদের শতকরা ৪৬.৬০ ভাগ ভোট লাভ করেছিলেন।[৫] রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের জন্য এ থেকে শিক্ষণীয় হলো– 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে যত জনপ্রিয় প্রার্থীই হোন না কেন, আইয়ুবের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। এ অভিজ্ঞতা বাঙালিদের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে একমাত্র আপসহীন দল আওয়ামী লীগ ও দলের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধুকে ভিন্ন ও কঠোর রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

অপর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, ১৯৬৫ সালে ১৭ দিনের (৬-২২শে সেপ্টেম্বর) ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। কাশ্মীর নিয়ে দুদেশের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে। প্রথমে যুদ্ধবিরতি, অতঃপর ১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারি অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র উজবেকিস্তান (বর্তমানে স্বাধীন দেশ)-এর রাজধানী 'তাসখন্দে' ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা 'তাসখন্দ চুক্তি' নামে পরিচিত।[৬] পাক-ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ চুক্তি নিয়ে পাকিস্তানের উভয় অংশে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ভারতের নিকট থেকে সুস্পষ্ট কোনো অঙ্গীকার আদায় না করে পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থ তথা ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের দাবি ও কাশ্মীরে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের লড়াইকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন মর্মে একটি ধারণা বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সর্বমহলে বদ্ধমূল হয়।

অপরদিকে, বাঙালিদের প্রতিক্রিয়ার কারণ ছিল ভিন্ন। ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত ও বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। এতদিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বলে আসছিল পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। এ কথা বলে তারা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশেষ করে সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের নিয়োগদান কিংবা বাঙালিদের নেতৃত্বাধীনে সেনা ইউনিট গঠন কৌশলে এড়িয়ে যায়। কিন্তু ১৭ দিনের যুদ্ধে দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিধান দূরে থাকুক, পশ্চিম রণাঙ্গনেই পাকিস্তান নিদারুণভাবে পরাজয় বরণ করেছে। এ সময় বাঙালিদের মধ্যে চরম নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়।[৭] এ-রকম এক অবস্থায় যুদ্ধোত্তর সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানসহ পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু প্রভাবশালী বিরোধী দলীয় নেতা ১৯৬৬

www.pathagar.com

সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে পাকিস্তানের উভয় অংশের বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের এক জাতীয় সম্মেলন/কনভেনশন আহ্বান করেন। কনভেনশনে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ বাঙালিদের ন্যায্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে এর সাবজেক্ট কমিটির বিবেচনার্থে ৬-দফা দাবিনামা সম্বলিত একটি কর্মসূচি পেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু সাবজেক্ট কমিটিতেই তাঁর ঐ কর্মসূচি পেশের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি,[৮] কনভেনশনে আলোচনা তো পরের কথা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু কনভেনশনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে যোগদান না করে তাঁর প্রতিনিধি দল নিয়ে ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার পুরাতন তেজগাঁ বিমান বন্দরে ফিরে আসেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের নিকট পুরো লাহোর সম্মেলনের সঙ্গে তাঁর দলের সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে এর কারণ ব্যাখ্যা এবং তাঁর ৬-দফা কর্মসূচির প্রধান-প্রধান দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।[৯]

এরপর বঙ্গবন্ধু ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তাঁর ধানমন্ডিস্থ ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাসভবনে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, দলের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং জেলা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে এক বর্ধিত সভা আহ্বান করেন। দীর্ঘ ১৫ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা শেষে সভায় বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করা হয় এবং ১৮-২০শে মার্চ তিনদিন দলের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। একই সভায় ৬-দফার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ পুস্তিকা প্রকাশ করে তা দেশবাসীর মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১০] এজন্য ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।[১১]

কাউন্সিল অধিবেশন

১৮ই মার্চ ১৯৬৬ অপরাহ্নে মতিঝিলের ইডেন হোটেলে সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়।এ উপলক্ষ্যে সভামণ্ডপের পথ, ফটক, অধিবেশন স্থল সর্বত্র অসংখ্য ফেস্টুন, প্লাকার্ড, প্রচারপত্রে ভরে গিয়েছিল। এসব ফেস্টুন, প্লাকার্ডের বক্তব্য ছিল খুবই প্রণিধানযোগ্য। যেমন,

> '৬-দফা আমাদের বাঁচার দাবী,' 'লাহোর-প্রস্তাবের বাস্তবায়নেই শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ে উঠবে,' 'গণতন্ত্র ফিরিয়ে দাও', 'সোনার দেশ আজ শ্মশান কেন?', 'অর্থ পাচার বন্ধ কর', 'দমননীতি বন্ধ কর', 'জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজস্ব বণ্টন চাই', 'একূল ভেঙ্গে ওকূল গড়া আর নয়', 'মৃত্যুমুখী জনতাকে বাঁচাও', 'জনসংখ্যার ভিত্তিতে সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগ কর', 'বিমানবাহিনীর প্রধান কার্যালয় পূর্ব পাকিস্তানে চাই', 'নৌ-দফতরের প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে চাই', 'দুই অর্থনীতি কায়েম কর', 'সংগ্রামী জনতা এক হও', 'সংগ্রামই আনবে মুক্তি', 'শোষণনীতি বন্ধ কর', 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই', 'দেশ রক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে', '৬-দফা আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হউন', '৬-দফা গণমুক্তির মহাসনদ', 'সংগ্রাম চলবে অবিরাম', 'মীরজাফরদের রুখিয়া দাঁড়াও' ইত্যাদি।[১২]

কাউন্সিল অধিবেশনের শুরুতে ছিল উদ্বোধনী সংগীত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। এটি পরিবেশন করেন জাহেদুর রহিম।

www.pathagar.com

এরপর আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য আজিজ আহমদ, ঝিনাইদহ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অতঃপর শুরু হয় উদ্বোধনী ভাষণ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে রিপোর্ট পেশ, বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অন্যদের বক্তব্য প্রদান।[১৩] বঙ্গবন্ধুর পক্ষে রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন প্রচার সম্পাদক হাফেজ হাবিবুর রহমান।

আবদুস সালাম খানের উদ্বোধনী ভাষণ

উদ্বোধক আবদুস সালাম খান তাঁর ভাষণে বলেন :

> এদেশে গণ আন্দোলনের বাণী আওয়ামী লীগের মুখ দিয়াই প্রথম উচ্চারিত হইয়াছে, সংগ্রামের শপথ আওয়ামী লীগই এদেশে প্রথম গ্রহণ করিয়াছে। তাই ভাবীকালেও আওয়ামী লীগকেই এদেশের সংগ্রামের নেতৃত্ব দান করিতে হইবে, আওয়ামী লীগের কর্মীদেরকেই ভাবী সংগ্রামে সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পূর্বে অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম করা সমীচীন কিনা এ প্রশ্নে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেন :

> এই প্রশ্নে সহজ ও সরল জবাব হইল এই যে, মৌলিক বিষয় বিলম্বের অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাস ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, সামরিক বাহিনী আর অস্ত্রের সাহায্যে যারা ক্ষমতা দখল করে তাদের উৎখাত করার দুইটি পন্থা আছে। প্রথমটি অস্ত্রবলে আর দ্বিতীয়টি জনতার বলে। অস্ত্রবলে উৎখাতের প্রশ্ন আমাদের ক্ষেত্রে আসে না। জনতার বলে বলীয়ান হইয়াই আমাদের সংগ্রামে সার্থকতা অর্জন করিতে হইবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোন স্বৈরাচারী সরকারই জনতাকে দাবাইয়া রাখিয়া দীর্ঘদিন ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে নাই।

৬-দফার তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> রাজনীতি ক্ষেত্রে ৬-দফাই শেষ কথা নয়। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই ৬-দফা রাজনৈতিক আক্রোশ মিটাইবার বা ভাবাবেগ প্রকাশের জন্য প্রণীত হয় নাই। গভীর দেশাত্মবোধ ও দেশে বৃহত্তর ঐক্য গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে তা প্রণয়ন করা হইয়াছে। তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ও অবিচারের পাহাড়কে সমতল করার প্রয়াসী হইয়া যদি কোন মহল আলোচনায় আগাইয়া আসে তাকে আওয়ামী লীগ স্বাগতম জানাইবে।[১৪]

আবদুস সালাম খানের বক্তব্যের শেষাংশে 'রাজনীতি ক্ষেত্রে ৬-দফা শেষ কথা নয়', 'যদি কোন মহল আলোচনায় আগাইয়া আসে তাকে আওয়ামী লীগ স্বাগতম জানাইবে' এসব উক্তি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এ কারণে যে, এর মাধ্যমে ৬-দফা প্রশ্নে তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার প্রকাশ ঘটে। তিনি ৬-দফাকে দেখেছেন 'দরকষাকষির বিষয়' (bargaining counter) হিসেবে, যা ছিল বঙ্গবন্ধু ও অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[১৫]

বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচি

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি[১৬] কী ছিল, সংক্ষিপ্ত আকারে দেখা যাক।

www.pathagar.com

দফা-১ : লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্যসহ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা-২ : বৈদেশিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষা ছাড়া সকল বিষয় অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশের হাতে ন্যস্ত থাকবে। উল্লিখিত দুটি বিষয় ন্যস্ত থাকবে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে।

দফা-৩ : পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলের জন্য পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। অথবা সমগ্র দেশে একটি মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, তবে সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার রোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য একটি ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে কার্যকরী ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দফা-৪ : অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে। তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এর একটি অংশ পাবে।

দফা-৫ : পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পৃথক হিসাব রাখা হবে। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা স্ব-স্ব অঞ্চলের বা অঙ্গরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আঞ্চলিক সরকার বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং যে-কোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

দফা-৬ : নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ প্যারামিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে।

কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচি বিশ্লেষণ

কাউন্সিলের প্রথম দিন উদ্বোধনী পর্ব শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞার আলোকে' ক্ষুরধার যুক্তি আর সহজ-সরল ব্যাখ্যা দিয়ে কাউন্সিলরদের উদ্দেশে তাঁর নতুন এ কর্মসূচি সম্বন্ধে দীর্ঘ লিখিত বিশ্লেষণধর্মী এক বক্তব্য উপস্থাপন করেন,[১৭] যা পরবর্তী দুদিন *ইত্তেফাক* পত্রিকায় 'দেশপ্রেমিক কে? ৬-দফার সমালোচকরা? –ওরা তো বহুরূপী' এবং 'পশ্চিম পাকিস্তানকে আমরা কি দিয়েছি আর কি দিতাম' এ শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[১৮] বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের প্রধান দিকগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১নং দফা

বঙ্গবন্ধু বলেন, 'লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবী' করে 'আমি কোনও নুতন দাবী তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরনো দাবীরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র।' এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি, ৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচির মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের কথা অন্তর্ভুক্ত থাকা (দফা ১৯) ও গণম্যান্ডেট লাভ ইত্যাদি উদ্ধৃত করেন। আর ৬-দফার ১নং দফার অপর দাবি 'পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, সর্বজনীন ভোটে সরাসরি

www.pathagar.com

নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্ব' এ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর জিজ্ঞাসা : এতে 'যে দাবী করা হইয়াছে তাহাতে আপত্তির কারণ কি?' প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার, পরোক্ষ নির্বাচন ও ক্ষমতাহীন আইনসভা ভালো, না তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ভালো, সে বিষয়ে বিচারের ভার জনগণের ওপর ছেড়ে দেওয়ার সুপারিশ করে আহ্বানের সুরে বলেন, 'তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।'

২নং দফা

এ দফায় বর্ণিত ফেডারেল সরকারের হাতে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এ দুটি ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের হাতে ন্যস্ত করার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি বিশ্বের বড় বড় ফেডারেল ব্যবস্থা ও ১৯৪৬ সালের ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার প্রতি লক্ষ্য রেখেই, যা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই প্রথমে গ্রহণ করেছিল,[১৯] এরূপ প্রস্তাব করেছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্র বা ফেডারেল সরকারের হাতে না দেওয়ার যুক্তি হিসেবে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করেন। একই প্রস্তাবের ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলে 'স্টেট' বলা সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ইহাতে কায়েমী স্বার্থ- শোষকেরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি 'ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেট' বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি।...ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেট' বলা হইয়া থাকে।' ২নং দফার প্রস্তাবের সমালোচকদের সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর মন্তব্য ছিল : 'সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।'

৩নং দফা

এ দফায় মুদ্রা ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে যে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি তবে সেক্ষেত্রে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংকের ব্যবস্থা। এর মূল উদ্দেশ্য, পূর্ব পকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে 'ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল' বা মুদ্রা পাচার বন্ধ করা। পাকিস্তানের বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হেডকোয়ার্টার্স পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ার কারণে 'প্রতিমিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম চলিতেছে' উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, '...এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশ হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে।' ফলে 'পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই।' ঐসব কারণেই তাঁর ভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থার প্রস্তাব এবং তা গ্রহণ করা ছাড়া 'পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই।' বঙ্গবন্ধু মুদ্রা সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন[২০] ও দক্ষিণ আফ্রিকার নজির তুলে ধরেন।

www.pathagar.com

৪নং দফা

এতে সর্বপ্রকার ট্যাক্স-খাজনা আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে এবং কেন্দ্র এভাবে আদায়কৃত রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ পাবে এ মর্মে যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তাতে কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল ও 'শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে' বলে বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন। তিনি তাঁর এ প্রস্তাবের পক্ষে এবং 'পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ খণ্ডন করে বিভিন্ন দেশের ফেডারেশন এবং পুনরায় ভারতে ১৯৪৬ সালের ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন প্লানের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রস্তাবে 'কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মতো যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে,' অতএব কেন্দ্রীয় সরকার 'খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত' হবে না, 'অনাহারে মারা' যাবে না। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুযায়ী 'সিঙ্গল ট্যাক্সেশন নীতি' কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য 'অনেক' সুবিধাজনক হবে, তাও তিনি ব্যাখ্যা করেন।

৫নং দফা

এ দফার সুপারিশ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন, এতে আঞ্চলিক সরকারের বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি, ট্রেড মিশন স্থাপন, আমদানি-রপ্তানির অধিকার এবং দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক-পৃথক হিসাব রাখার যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা পাকিস্তানের ১৮ বছরের 'অর্থনৈতিক ইতিহাস'-এর দিকে লক্ষ্য রেখে 'পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য' করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান ও এখানকার পাটচাষীদের বঞ্চনার প্রসঙ্গ তুলে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে, অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না।' পাট ব্যবসার 'জাতীয়করণ' এবং পাট রপ্তানিকে 'সরকারী আয়ত্তে' আনার পুরাতন দাবির পুনরুল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীদের [দ্বারা] পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।'

৬নং দফা

এ দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষাবাহিনী গঠন সংক্রান্ত সুপারিশ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্টের ২১-দফায় 'পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রকারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোর্য়াটার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবী' ছিল উল্লেখ করে বলেন, 'এ দাবী অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়', 'পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে'—পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের বক্তব্যের অসারত্ব ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়?' এরপর কাউন্সিলরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবী করিতে হইবে কেন?' অতঃপর বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 'উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন,' 'অস্ত্র কারাখানা স্থাপন' এবং নৌবাহিনীর দপ্তর এখানে সরিয়ে নিয়ে আসার দাবি পুনর্ব্যক্ত করে প্রশ্ন রাখেন, অন্তর্বর্তীকালীন

www.pathagar.com

ব্যবস্থা হিসেবে 'অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন?'

বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলরদের সম্মুখে তাঁর ৬-দফা কর্মসূচির দফাওয়ারি বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্যের প্রারম্ভে বলেন :

> আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবীরূপে ৬-দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি... আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবীতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৯৪ ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয় এ কথা উল্লেখ করে দেশের রাজধানী, তিন সশস্ত্র বাহিনীর হেড কোয়ার্টার্স, সকল রাষ্ট্রীয়, সরকারি ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশি দূতাবাস ইত্যাদি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় দিনদিন আঞ্চলিক বৈষম্য কীভাবে বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে, তার বিশদ বিবরণ তিনি কাউন্সিলে তুলে ধরেন। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বাংলাকে একক রাষ্ট্র ভাষার দাবি না করে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের ৬ জন সদস্যকে Constituent Assembly-তে নির্বাচন, বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও (শতকরা ৫৬ ভাগ) পশ্চিম পাকিস্তানিদের মন হতে মেজরিটি ভীতি দূর করে সমতাবোধ সৃষ্টির জন্য সর্ববিষয়ে তাদের সমতা বিধানের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তাদের (বাঙালিদের) সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তারা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, সে প্রসঙ্গও বঙ্গবন্ধু উত্থাপন করেন।

৬-দফা 'পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী,' 'পাকিস্তান ধ্বংসকারী,' 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি' এরূপ সমালোচনাকারীদের 'শোষক', 'কায়েমী স্বার্থান্বেষী', 'জনগণের দুশমন', 'বহুরূপী' আখ্যায়িত করে বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলরদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, ভাষা-আন্দোলন, ২১-দফা, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা, ছাত্রদের স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষা লাভ, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করা ইত্যাদি 'সকল প্রকার দাবীর মধ্যেই এই শোষকদের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।'

বক্তব্যের শেষে কাউন্সিলরদের উদ্দেশে এক মর্মস্পর্শী ভাষায় বঙ্গবন্ধু বলেন :

> আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা দাবীতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তি-তর্ক সহকারে দেখাইলাম, ...তথাপি কায়েমী স্বার্থবাদীরা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এনজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়।... দেশবাসীর মনে আছে আমাদের নয়ন-মণি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে।

www.pathagar.com

> অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে-সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই-বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবীর জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না।[২১]

কাউন্সিলে ৬-দফা কর্মসূচির ওপর বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যটি পুস্তিকা আকারে ইতোমধ্যে প্রকাশ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফাওয়ারী সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম।'[২২] আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে এরূপ আরও পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হবে জানিয়ে বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলর ও দলের কর্মীদের ৬-দফা দাবির তাৎপর্য ও অপরিহার্যতা দেশময় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদেরকে প্রচারকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যোগ্য উত্তরসূরি উল্লেখ করে বলেন, 'মুজিব প্রণীত আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীর... [মধ্য দিয়ে] জনতার কাফেলা মনজিলের দিকে আগাইয়া যাইবে।'[২৩]

বিষয় নির্বাচনি কমিটি গঠন

আওয়ামী লীগের প্রথম দিনের এ কাউন্সিল সভায় সকল জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ওয়ার্কিং কমিটির সকল কর্মকর্তা ও সদস্য, বি এম ইলিয়াস ও মুজিবর রহমান (বগুড়া), মসিহুর রহমান (যশোর), মনসুর আলী (পাবনা) এবং আবদুস সালাম খান-কে অন্তর্ভুক্ত করে বিষয় নির্বাচনি কমিটি গঠন করা হয়।[২৪]

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন : জেলা কমিটির রিপোর্ট পেশ, প্রস্তাব গ্রহণ ও কর্মকর্তা নির্বাচন

দ্বিতীয় দিন ১৯শে মার্চ দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে আটটায় একটি, অপরটি বিকেল সাড়ে তিনটায়। সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সকালের অধিবেশনে জেলা কমিটির প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের নিজ-নিজ জেলার সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। এসব প্রতিনিধি হলেন,[২৫] মনসুর আলী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ, জহুর আহমদ চৌধুরী, ডা. আসহাবুল হক, শেখ আবদুল আজিজ, এম আর সিদ্দিকী, রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া, মুজিবর রহমান, নুরুল হক এমপিএ, আবদুল মমিন তালুকদার, শেখ রহিমুদ্দিন, শামসুদ্দিন মোল্লা, নুরুল হক (রংপুর), এম এ আজিজ, রওশন আলী, এ কে মুজিবর রহমান, আবদুর রহমান খান, নুরুল ইসলাম এবং ইদ্রিস (প্রাক্তন সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ)। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জহিরুদ্দীনও বক্তব্য রাখেন। মফস্বলের এসব নেতা এবং আওয়ামী লীগ কর্মীরা 'দেশ ও দশের স্বার্থে' যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত বলে

www.pathagar.com

উল্লেখ করেন। তাঁরা রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও দলীয় কার্যক্রম থাকার ওপর গুরুত্ব আরওপ করেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে দল থেকে পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[২৬]

গঠনতন্ত্র ও ম্যানিফেস্টো অনুমোদন

বিকেলের অধিবেশনে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র সংশোধনী সাব-কমিটির সুপারিশসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সাব-কমিটির আহ্বায়ক মসিহুর রহমান এ সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন।[২৭]

ম্যানিফেস্টো সাব-কমিটির আহ্বায়ক হাফেজ হাবিবুর রহমান ৬-দফা ভিত্তিক রচিত আওয়ামী লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টো কাউন্সিলে পেশ করেন। অন্যান্য বিষয়ের ওপর আলোচনার পর তা গৃহীত হয়। এর ফলে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা আওয়ামী লীগের কর্মসূচি হিসেবে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন লাভ করে। ম্যানিফেস্টোতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথাও বলা হয়।[২৮] গঠনতন্ত্র সংশোধন ও নতুন ম্যানিফেস্টো অনুমোদন ছাড়াও কাউন্সিলে বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এসব প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাহাউদ্দিন চৌধুরী এবং সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন বি এম ইলিয়াস (বগুড়া)।

কর্মকর্তা নির্বাচন

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পরবর্তী দুই বছরের জন্য আওয়ামী লীগের নতুন কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। কর্মকর্তাদের নাম প্রস্তাব করেন মসিহুর রহমান (যশোর) এবং সমর্থন করেন মনসুর আলী (পাবনা)। বিপুল করতালির মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্যানেল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নতুন কর্মকর্তারা হলেন :[২৯]

সভাপতি	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সহ-সভাপতি	:	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
	:	হাফেজ হাবিবুর রহমান
	:	মুজিবর রহমান (রাজশাহী)
সাধারণ সম্পাদক	:	তাজউদ্দীন আহমদ
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	মিজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ
শ্রম সম্পাদক	:	জহুর আহমদ চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক	:	আবদুল মোমেন
মহিলা সম্পাদক	:	মিসেস আমেনা বেগম
অফিস সম্পাদক	:	মোহাম্মদউল্লাহ
সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	কে এম ওবায়দুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ	:	নুরুল ইসলাম চৌধুরী

www.pathagar.com

পরে সভাপতি যে ২৫ জনকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করেন, তাঁরা হলেন :[৩০] মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, এডভোকেট জহিরুদ্দীন (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী), এম এম সামাদ, এডভোকেট আবদুর রহমান খান (প্রাক্তন মন্ত্রী), এডভোকেট খন্দকার মোশতাক আহমদ, এম এ আজীজ, নূরুল হক এমপিএ, এডভোকেট মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, মো. শামসুল হক, এডভোকেট শেখ আবদুল আজীজ, এডভোকেট মমিনুদ্দিন আহমদ, এডভোকেট সাদ আহমদ, এম এ রশিদ (প্রাক্তন এমএনএ), এডভোকেট রহিমুদ্দিন আহমদ, এডভোকেট এম রওশন আলী, আমজাদ হোসেন (প্রাক্তন এমএনএ), রফিকুদ্দিন ভূঁইয়া, এ কে মুজিবুর রহমান, এডভোকেট এস ডব্লিউ লকিতুল্লাহ, প্রফেসর ইউসুফ আলী এমএনএ, মতিয়ুর রহমান, এডভোকেট গাজী গোলাম মুস্তফা, আবদুল মমিন তালুকদার, এডভোকেট জালাল উদ্দিন আহমদ খান ও আবদুর রশিদ (প্রাক্তন এমপিএ)।

এছাড়া জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি নেতা শাহ আজিজুর রহমান ও প্রাদেশিক পরিষদের নেতা জনাব আবদুল মালেক (উকিল) পদাধিকার বলে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সম্পাদক (তখন তিনি কারাবন্দি)। দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক (টাঙ্গাইল)-এর মানসিক সমস্যা দেখা দিলে ১৯৫২ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু দলের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তী বছর (১৯৫৩) আওয়ামী লীগের প্রথম নিয়মিত কাউন্সিলে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ১৫ বছর এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে দায়িত্ব পালনের পর এবারকার কাউন্সিলে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের জন্য এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ এঁদেরও বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বের অগ্রভাগে তুলে নিয়ে আসছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদকে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন ও পরীক্ষিত নেতাদের বসানো কোনোভাবেই উদ্দেশ্যহীন ছিল না। বস্তুত, বঙ্গবন্ধু এক কঠিন সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে এসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর সেই সংগ্রামের রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল ৬-দফা।

লক্ষণীয় যে, ৬-দফা কর্মসূচি ১৯৬৬ সালে এসে সুনির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধু ও অন্য বাঙালি নেতারা পাকিস্তানি রাজনীতিক ও সেনা-আমলা কর্তৃত্বাধীন শাসন, শোষণ, বৈষম্য, জাতি-নিপীড়নের পটভূমিতে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সেই ধারাবাহিকতায় তা রচিত। ১৯৬৪ সালের আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যেই দুই অর্থনীতি, ফেডারেল ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় সরকার, সর্বজনীন ভোটাধিকার, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদিসহ ৬-দফার বেশকিছু দাবি মূর্ত হয়ে ওঠে। তবে ৫০-এর দশকের শেষ ও ৬০-এর দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক সে সময় পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে তার প্রতিকারে যে 'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব' (Two Economy Theory)[৩১] হাজির করেন, চূড়ান্তভাবে ৬-দফা

www.pathagar.com

প্রণয়নে এর প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না। ৬-দফা প্রশ্নে ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান ১৭ দিনের যুদ্ধের গুরুত্ব হলো এই যে, ঐ ঘটনা যতদূর না এ কর্মসূচি প্রণয়নে, তার চেয়ে অধিক এটিকে রাজনীতির অগ্রভাগে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বঙ্গবন্ধুর নীতি নির্ধারণী ভাষণ : 'শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য'

সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শ, ৬-দফা ভিত্তিক সংগ্রাম, সংগঠনে কর্মীদের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে এক নীতি-নির্ধারণী ও দিকনির্দেশনাপূর্ণ ভাষণ রাখেন, যা ছিল খুবই গুরত্বপূর্ণ। আওয়ামী লীগ কোন ধরনের সমাজ বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, সে সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> সমগ্র দেশে একটি শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য হাসেলের জন্যই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৬-দফা প্রণয়ন করিয়াছে এবং সমাজতন্ত্রবাদী কমসূচি গ্রহণ করিয়াছে।[৩২]

এটি ঠিক, ৬-দফা কর্মসূচির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা ছিল না, তবে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে গৃহীত নতুন ম্যানিফেস্টোতে তা গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩৩] বঙ্গবন্ধু সম্ভবত এখানে তারই ইঙ্গিত করেছেন। শামসুল হক রচিত আওয়ামী লীগের প্রথম খসড়া ম্যানিফেস্টো বাদ দিলে 'শোষণহীন সমাজ' প্রতিষ্ঠা বা 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি'র কথা এত স্পষ্টভাবে পূর্বে উচ্চারিত বা দলের ম্যানিফেস্টোতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[৩৪] তবে চেতনাগতভাবে এর প্রকাশ যে শুরু থেকেই ছিল তা নানাভাবে লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফাকে যুক্ত করার একটি প্রধান কারণ হতে পারে এই যে, ঐ সময় ৬-দফা ভিত্তিক আন্দোলনই ছিল দলের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

৬-দফার সংগ্রাম যে বিপদ-সংকুল হবে এবং এ সংগ্রামে সাফল্য রাতারাতি আসবে না, সে সম্বন্ধে কাউন্সিলর ও দলের কর্মীদের সতর্ক করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আওয়ামী লীগ কর্মীদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ৬-দফার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আজ যে সংগ্রামের পথে পা বাড়াইয়াছে, সে পথ কণ্টকাকীর্ণ এবং এই পথে সাফল্য অর্জন সময় সাপেক্ষ।' এর পরপরই বঙ্গবন্ধু বলেন, '৬-দফার প্রশ্নে কোন আপোষ নাই। রাজনীতিতেও কোন সংক্ষিপ্ত পথ নাই।'[৩৫]

৬-দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলনে সাফল্য, সে ক্ষেত্রে কর্মীদের ভূমিকা, দলে কর্মীদের গুরুত্ব, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ইত্যাদি সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> নির্দিষ্ট আদর্শ ও সেই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের ঐক্যেই আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগ নেতার দল নয় – এ প্রতিষ্ঠান কর্মীদের প্রতিষ্ঠান।...এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মী আমার কাছে সহোদর ভাই-এর মত।...এদেশে আওয়ামী লীগ সব সংগ্রামেরই বাণী প্রথম বহন করিয়াছে। সংগ্রামের পথে তাহারা নির্যাতন ভোগ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সংগ্রাম তাহাদের ব্যর্থ

www.pathagar.com

হয় নাই। ৬-দফার সংগ্রামও ব্যর্থ হইবে না। ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা এ সংগ্রামকেও আমরা সার্থক করিয়া তুলিব। ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদেরই।[৩৬]

কাউন্সিলের তৃতীয় দিন : উন্মুক্ত অধিবেশন ও জনসভা

কাউন্সিলের শেষের দিন জনসভা অনুষ্ঠান আওয়ামী লীগের প্রায় রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। এবারের কাউন্সিলের তৃতীয় দিন ২০শে মার্চ পল্টনে জনসভার আয়োজন করা হয়। একে অভিহিত করা হয় 'উন্মুক্ত অধিবেশন' হিসেবে। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের নবনির্বাচিত সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ঝড়-বৃষ্টিসহ চরম বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে বিকেল সোয়া ৪টায় জনসভা শুরু হয়।[৩৭] হাজার-হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। বৈরী আবহাওয়ার কারণে একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জহিরুদ্দীন সভায় বক্তৃতা করেন। ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য শ্রবণ করে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণে[৩৮] পাকিস্তান-আন্দোলনে বাঙালিদের অবদান, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য পূর্ব বাংলার আসন ছেড়ে দেওয়া, পাকিস্তানের অর্থনীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ, পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করা সত্ত্বেও বিগত ১৮ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকারে পরিণত করা, এরূপ অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতিক্রিয়া কী হতো নিজের কাছে সে প্রশ্ন,[৩৯] ৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা ও বাঙালিদের অসহায়ত্ববোধ, পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিধান সম্বন্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এতদিনের বক্তব্যের অসারত্ব, ৬-দফা কর্মসূচির গুরুত্ব, 'শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে' ৬-দফা ভিত্তিক গণআন্দোলন গড়ে তোলার নির্দেশনা, নেতাকর্মীদের ওপর সরকারি নির্যাতন নেমে আসলে 'স্বেচ্ছায় কারাবরণ'-এর ঘোষণা ইত্যাদি তুলে ধরার পর ৬-দফার সংগ্রামে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন :

> ...নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ৫ কোটি মানুষের চোখে-মুখে আজ যে বিরাট জিজ্ঞাসা, কুসুমাস্তীর্ণ পথে সে জিজ্ঞাসার জবাব মিলিবে না– এ জিজ্ঞাসার জবাব পাইতে হইলে জেল-জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতনকে আশীর্বাদ বলিয়া বরণ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গনের জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সাড়ে ৫ কোটি মানুষের ভাগ্য ও দেশের দুই অংশের বৃহত্তর ঐক্য ও সংহতির জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতির এই বাণী লইয়া আপনারা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানাইয়া দিন, দেশের জন্য, দশের জন্য, অনাগতকালের ভাবী বংশধরদের জন্য সবকিছু জানিয়া-শুনিয়াই আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা এবার সর্বস্ব পণ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পথে ৬-দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে।[৪০]

www.pathagar.com

ঝড়-বৃষ্টির কারণে জনসভা একদিকে যেমন সংক্ষিপ্ত করতে হয়, অপরদিকে বারবার সভার কার্য পরিচালনা বিঘ্নিত হয়। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে হয়। সভাপতির সভা সমাপ্তি ঘোষণার কিছু সময় পর ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলে জনতার অনুরোধে পুনরায় সভা আরম্ভ করতে হয় এবং শীঘ্রই এখানে আওয়ামী লীগের জনসভার আয়োজন করা হবে সভাপতির এ আশ্বাসের পর জনগণ তৃপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ 'অতৃপ্ত শ্রোতামণ্ডলীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ-সিক্ত পরিবেশে ৬-দফার প্রবক্তাদের যাত্রা শুরু' এ শিরোনামে ঘটনার ওপর একটি চমৎকার রিপোর্ট ছাপা হয়।[৪১] জনগণের মধ্যে অতি দ্রুত ৬-দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা যে ছড়িয়ে পড়ছিল, এ ঘটনা তারই প্রমাণ।

আলোচ্য কাউন্সিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, তাতে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের জন্য যেমন, তেমনি পাকিস্তানি রাজনীতিতেও এটি ছিল টার্নিং পয়েন্ট। বস্তুত ৬-দফা ছিল 'আমাদের বাঁচার দাবী' তথা বাঙালির জাতীয় মুক্তির মহাসনদ। এই ৬-দফা'র পথ ধরেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মাত্র ৫ বছরের মধ্যে আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ১৮ই মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮; *ঐ*, ১৯শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮; *ঐ* ২০শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ১৯শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮; আরও, হারুন-অর-রশিদ, *'আমাদের বাঁচার দাবী': ৬-দফা'র ৫০ বছর*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০১৬, পৃ. ১২০-১৪২

২. দলের সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে কাউন্সিল অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর অনুপস্থিতির প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক। ৬-দফা কর্মসূচির প্রশ্নে তাঁর ভিন্নমত ছিল। তিনি একে কঠোর কর্মসূচি বলে মনে করতেন। সরকারি নির্যাতন-নিষ্পেষণ ছাড়াও এর সাফল্য সম্পর্কে ঐ সময়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। এসব কারণে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বে ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ তারিখে অনুষ্ঠিত দলের ওয়ার্কিং কমিটির যে সভায় ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করা হয়, সে সভাতেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। দেখুন, হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পৃ. ৫১, নোট ১৩।

৩. *ইত্তেফাক*, ২৯শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮; হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পৃ. ৪১

৪. *ইত্তেফাক*, ১৯শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ১৯শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১

৫. বিস্তারিত হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২৪৭-২৫০

৬. হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পৃ. ৩৬-৩৭

৭. *ঐ*, পৃ. ৩৭

৮. *ঐ*, পৃ. ৩৭, আরও পৃ. ৫০ নোট ৫। উল্লেখ্য, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, যিনি এ কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন, তখন পর্যন্ত তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনী কাউন্সিল

www.pathagar.com

অধিবেশনের উদ্বোধক ছিলেন। অন্য নেতৃবৃন্দের বিরোধিতার পাশাপাশি ৬-দফার ব্যাপারে তাঁর ভিন্নমত থাকায় আলোচ্য কনভেনশনের সাবজেক্ট কমিটিতে এটি উত্থাপন করতে বঙ্গবন্ধুর অনুমতি না পাওয়ার সেটিও অন্যতম কারণ ছিল।

৯. হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পৃ. ৩৭; আরও, বই-এর পরিশিষ্ট: দুই, পৃ. ৮৮-৯১

১০. দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, পৃ. ৮; *ঐ*, ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, পৃ. ১; *ঐ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, পৃ. ১,৮; ঐ, ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, পৃ. ১,৮

১১. এর সদস্যরা ছিলেন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুস সালাম খান, জহিরুদ্দীন, তাজউদ্দীন আহমদ, হাফেজ হাবিবুর রহমান এবং মজিবর রহমান (সভাপতি, রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ) *ইত্তেফাক*, ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, পৃ. ১,৮

১২. দ্রষ্টব্য 'ন্যায্য দাবীর এক জীবন্ত প্রতীক', *ইত্তেফাক*, ১৯শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১,৮; আরও, হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পৃ. ৪১

১৩. করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতি মঞ্জুরুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক কে এ তিরমিজি উদ্বোধনী সভায় বক্তৃতা করেন।

১৪. আবদুস সালাম খানের উদ্বোধনী ভাষণ, দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পরিশিষ্ট : পাঁচ, পৃ. ১১১-১১২; *ইত্তেফাক*, ১৯শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১,৮

১৫. আইয়ুবের সামরিক শাসন, মৌলিক গণতন্ত্র-এর নামে বিরাজনীতিকরণ প্রচেষ্টা এবং আইয়ুব বিরোধী জোট এনডিএফ (National Democratic Front) অকার্যকর হয়ে পড়ার কারণে ৬০-এর দশকের এ পর্যায়ে তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে পুনরায় সংশ্লিষ্ট হন। তবে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁর নতুন এ সংশ্লিষ্টতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, যা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাবে।

১৬. দ্রষ্টব্য শেখ মুজিবুর রহমান, 'আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা কর্মসূচী' (৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬), হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৮-৭১)*, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২, পৃ. ২৫৯-২৬৯; হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পৃ. ৩৫-৩৬

১৭. বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার ওপর বিশ্লেষণধর্মী পুরো বক্তব্য দ্রষ্টব্য, হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফার ৫০ বছর*, পরিশিষ্ট : তিন, পৃ. ৯২-১০৬

১৮. *ইত্তেফাক*, ১৯শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৪, ৮; ঐ, ২০শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ৪, ৫

১৯. কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি ক্যাবিনেট মিশন প্লানের প্রদেশসমূহের A B C এই তিনটি অঞ্চলে compulsory grouping সম্বন্ধে নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করে যে, কোনো প্রদেশের জন্য এটি আবশ্যিক হবে না এবং প্রত্যেক প্রদেশের এ ব্যাপারে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ থাকবে। এর পরপর জিন্নাহ তাঁর পূর্বের সম্মতি প্রত্যাহার করে নেন। ফলে একটি শিথিল কনফেডারেল ব্যবস্থাধীনে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ ও অবিভক্ত রাখার শেষ প্রচেষ্টা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যায়। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Harun-or-Rashid, *Foreshadowing of Bangladesh*, p. 240, notes 74,75,76, pp. 297-299

২০. সোভিয়েট ইউনিয়নের উদাহরণ টেনে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, সেদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দপ্তর নেই।

২১. দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পরিশিষ্ট : তিন, পৃ. ১০৫-১০৬

২২. *ঐ*, পৃ. ৯৪

www.pathagar.com

২৩. তাঁহার বক্তব্য দ্রষ্টব্য, হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পরিশিষ্ট : পাঁচ, পৃ. ১১২-১১৩; *ইত্তেফাক*, ১৯শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮

২৪. *ইত্তেফাক*, ১৯শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮

২৫. *ঐ*

২৬. *ঐ*

২৭. সংশোধিত গঠনতন্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

২৮. *ইত্তেফাক*, ২০শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮

২৯. *ঐ*; *সংবাদ*, ২০শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮

৩০. *ইত্তেফাক*, ৫ই এপ্রিল, ১৯৬৬, পৃ. ১,৮ ; গঠনতন্ত্র অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৬

৩১. এঁরা হলেন– অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন প্রমুখ। 'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব' সম্পর্কে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, 'Concept of Two Economies : First Encounter with the Pakistani Establishment', Nurul Islam, *Making of A Nation Bangladesh : An Economist Tale*, UPL 2003, Chapter 2, pp. 23-25; also Rehman Sobhan, *From Two Economies To Two Nations : My Journey to Bangladesh*, Dhaka 2015, pp. 3-38

৩২. সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ১৯৬৬, হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পরিশিষ্ট : ছয়, পৃ. ১১৫; *ইত্তেফাক*, ২০শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮

৩৩. *ইত্তেফাক*, ২০শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮

৩৪. ১৯৬৪ সালে কাউন্সিলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের বিষয়টি প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু এবার তা দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে ম্যানিফেস্টোতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩৫. সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ১৯৬৬।

৩৬. *ঐ*

৩৭. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ২১শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮

৩৮. বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দ্রষ্টব্য, *ঐ*; হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পরিশিষ্ট : সাত, পৃ. ১১৮-১২০

৩৯. বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে নিজেই এর উত্তর দিয়ে বলেন, '৬-দফার মত দাবী লইয়া সংগ্রাম করিত পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইয়েরা'। *ঐ*

৪০. পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ 'সর্বস্ব পণ করিয়াই আমরা আজ আন্দোলনের এ কণ্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াইয়াছি', *ইত্তেফাক*, ২১শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮; হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পরিশিষ্ট : সাত, পৃ. ১১৮-১১৯

৪১. 'অতৃপ্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ-সিক্ত পরিবেশে ৬-দফার প্রবক্তাদের যাত্রা শুরু', *ইত্তেফাক*, ২১শে মার্চ ১৯৬৬, পৃ. ১, ৮; হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পরিশিষ্ট : আট, পৃ. ১২১-১২২

www.pathagar.com

অধ্যায় : আট

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৮ : বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা

১৯৬৬ সালের কাউন্সিল অধিবেশনের দুবছর পর ১৯৬৮ সালের ১৯ ও ২০শে অক্টোবর মতিঝিলস্থ হোটেল ইডেনে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক নিয়মিত কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।[১] এতে সভাপতিত্ব করেন দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধু তখন আগরতলা মামলায় কারাবন্দি। সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদও তখন কারাগারে। কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী। কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধক ছিলেন ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। এতে সারাদেশ থেকে ১৪৫৩ জন কাউন্সিলর ও ডেলিগেটস যোগ দেন।[২] উদ্বোধনী অধিবেশনে বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে মস্কোপন্থি ন্যাপ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক মহিউদ্দীন আহমেদ এবং পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ এর যুগ্ম-সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ কাউন্সিল অধিবেশন নানা কারণে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পটভূমি

পূর্ববর্তী কাউন্সিল (১৯৬৬) থেকে বর্তমান কাউন্সিল (১৯৬৮) পর্যন্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচি নিয়ে প্রচার অভিযান, ৬-দফা'র বিরুদ্ধে আইয়ুবের প্রতিক্রিয়া ও এটিকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করা, ৬-দফা প্রচারকালে ৩ মাসে বঙ্গবন্ধুকে ৮ বার গ্রেপ্তার, ৮ই মে ১৯৬৬ বঙ্গবন্ধুকে চূড়ান্তভাবে গ্রেপ্তার, ৭ই জুনের (১৯৬৬) হরতাল, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার গ্রেপ্তার ও নিউ নেশন প্রেস বাজেয়াপ্তকরণ (১৯৬৬), সারাদেশে ৯,৩৩০ জন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার, আইয়ুব-বিরোধী নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) গঠন, আওয়ামী লীগের ৬-দফা বনাম পিডিএম-এর ৮-দফা, পিডিএম প্রশ্নে আওয়ামী লীগে বিভাজন ও কতিপয় নেতার বহিষ্কার, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের স্থলে এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পুনর্গঠন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভাঙন (১৯৬৭), প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রতি ন্যাপ-ভাসানীর সমর্থন, বঙ্গবন্ধু ও অন্যদের বিরুদ্ধে আইয়ুব সরকারের আগরতলা মামলা (১৯৬৮) ও মামলার বিচার শুরু, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আইয়ুব সরকারের নতুন ষড়যন্ত্র ইত্যাদি।

১৯৬৬ সালের ১৮-২০শে মার্চের কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বেই ২০শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভায় বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচি পেশ করা হলে সভা এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। এর পরপর বঙ্গবন্ধু তাঁর নতুন এ কর্মসূচি নিয়ে জনগণের দরবারে হাজির হন। ঐ কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি একের পর

www.pathagar.com

এক বেশ কয়েকটি জনসভায় ৬-দফা কর্মসূচি তুলে ধরেন।[৩] এরপর কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁর ৬-দফা কর্মসূচি দলের কর্মসূচি হিসেবে অনুমোদিত ও গৃহীত হলে এবার শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা ভিত্তিক দ্বিতীয় পর্যায়ের গণসংযোগ। এসব জনসভায় বঙ্গবন্ধু ৬-দফাকে বাঙালির মুক্তির 'মহাসনদ' বা 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর দাবিসমূহ বাস্তবায়িত করতে তিনি যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেন।[৪] অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ৬-দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়, যা আইয়ুব সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় জেনারেল আইয়ুব ৬-দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী', 'ধ্বংসাত্মক', 'বিদেশি মদদপুষ্ট', 'বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং এর প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের 'এক নম্বর দুশমন' হিসেবে চিহ্নিত করে ৬-দফা পন্থিদের দমনে 'অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ' ও 'গৃহযুদ্ধের' হুমকি দেন। শীঘ্রই নেমে আসে সরকারি নিপীড়ন। ৬-দফা প্রচারে বঙ্গবন্ধু তিন মাসের অধিক সময় পেলেন না। তাও এ সময় তাঁকে আটবার গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রতিবার তিনি জামিনে মুক্তি পান। সর্বশেষ ৮ই মে ১৯৬৬ তাঁকে চূড়ান্তভাবে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয় এবং প্রায় তিন বছর তিনি একনাগাড়ে কারারুদ্ধ থাকেন। একই তারিখ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ, সহ-সভাপতি মুজিবর রহমান (রাজশাহী), শ্রম সম্পাদক জহুর আহমদ চৌধুরীসহ দলের শীর্ষস্থানীয় ছয় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৫] ৭ই জুন আওয়ামী লীগ ৬-দফা দাবি আদায় ও বঙ্গবন্ধুসহ গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মোকাবেলায় সরকার কঠোর অবস্থান নেয়। এতৎসত্ত্বেও সর্বত্র সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে হাজার-হাজার মানুষ হরতালের সমর্থনে রাজপথে নেমে আসে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় শিল্প অঞ্চলের শ্রমিকরা। এক গণঅভ্যুত্থান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পুলিশ ও ইপিআর-এর গুলিতে ঢাকা, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জে সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী ১১ জন মানুষ নিহত হন। তাঁদের মধ্যে তেজগাঁও শিল্প এলাকার শ্রমিক মনু মিয়া ও আবুল হোসেন ছিলেন। ৭ই জুনের এই ঘটনা ছিল ৬-দফা আন্দোলনে এক টার্নিং পয়েন্ট। এরপর সারাদেশে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ওপর নেমে আসে সরকারের নির্যাতনের স্টিমরোলার। ১৬ই জুন ৬-দফা কর্মসূচির একনিষ্ঠ সমর্থক, দৈনিক *ইত্তেফাক* সম্পাদক ও 'মোসাফির' ছদ্মনামে বহুল জনপ্রিয় কলাম লেখক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিন *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর নিউ নেশন প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৬, ১৭ ও ১৮ই জুন আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। একে নেতৃবৃন্দ '৬-দফা বাস্তবায়নে আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচি' বলে আখ্যায়িত করেন। ২২শে জুন ১৯৬৬ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, যিনি ঐ সময়ে একই সঙ্গে দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৬ সালের শুধু সেপ্টেম্বর মাসেই বিভিন্ন দফায় সারাদেশে আওয়ামী লীগের ৯,৩৩০ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৬]

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়বরণ এবং যুদ্ধশেষে ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত 'তাসখন্দ চুক্তি' প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ভাবমূর্তি ম্লান করে দেয়। তার প্রবর্তিত 'মৌলিক গণতন্ত্রের' নামে ওপর থেকে সেনা-আমলা নিয়ন্ত্রিত

www.pathagar.com

ব্যবস্থাধীনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের নির্বাসন বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে পূর্বেই ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করে। এর ওপর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর চরম আঞ্চলিক বৈষম্য এখানকার জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সর্বজনীন ভোটাধিকারভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিরোধীদলীয় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মোর্চা এনডিএফ গঠিত হলেও সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তা দ্রুত নিরর্থক হয়ে পড়ে। এসব পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। পাকিস্তানি শাসন-শোষণের দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতা শেষে এ থেকে বাঙালির সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'আমাদের বাঁচার দাবী' ৬-দফা নামে এক কঠোর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টিকারী কর্মসূচি ঘোষণা করেন, যা এ বই-এর সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ যখন নতুন এই কর্মসূচি নিয়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে সর্বস্ব নিয়োজিত করেন, তখন এনডিএফ-এর সাবেক নেতৃবৃন্দের মধ্যে নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে নতুন করে আইয়ুব-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৬-দফা ভিত্তিক আন্দোলন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ যখন কারাবন্দি[৭] এবং সারাদেশের নেতা-কর্মীদের ওপর যখন চলছিল সরকারের গ্রেপ্তার, নির্যাতন-নিপীড়ন, সে অবস্থায় দলের সাবেক এনডিএফ-পন্থি, পুনরুজ্জীবন-বিরোধী সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ন্যূনতম কর্মসূচিভিত্তিক আইয়ুব-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দাবি তোলেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯৬৭ সালের ১৯ ও ২০শে মে দুদিনব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভায় আবদুস সালাম খান এ মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করলে কমিটির বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ বিশেষ করে জেলা ও মহকুমা শাখার নেতৃবৃন্দ ঐ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা ৬-দফার ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে সালাম খানের প্রস্তাব আর পাস করানো যায়নি। ওয়ার্কিং কমিটির একই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিষয়টি দলের বিশেষ কাউন্সিল সভা ডেকে সেখানে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হবে।[৮]

এদিকে ১৯৬৭ সালের ৩০শে এপ্রিল উপরে উল্লিখিত সাবেক এনডিএফ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানকে সভাপতি করে সাবেক এনডিএফ অনুসারী পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (নসরুল্লাহ), মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), জামায়াতে ইসলামী, নেজাম-ই ইসলামী এদের অন্তর্ভুক্ত করে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট-পিডিএম গঠিত হয়।[৯] পিডিএম একটি ৮-দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাতে ফেডারেল ব্যবস্থাধীনে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা, যোগাযোগ ও বাণিজ্য ফেডারেল সরকারের হাতে রেখে বাকি সব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও সামরিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা, নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর এবং সশস্ত্র বাহিনীর তিন বিভাগে পূর্ব পাকিস্তান থেকে

www.pathagar.com

'প্রয়োজনীয় সংখ্যক' লোক নিয়োগ ইত্যাদি দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়।[১০] লক্ষণীয়, পাকিস্তানি শাসকদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম আঞ্চলিক বৈষম্য এবং সে কারণে এখানকার জনগণের মধ্যে সৃষ্ট ক্ষোভ এতই তীব্র ছিল যে, পিডিএম নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত তা উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই উল্লিখিত কর্মসূচির ভিত্তিতে 'পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা হইবে' এ কথা তাঁরা তাঁদের ৮-দফা দাবিনামায় অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হন।[১১] তবে পিডিএম নেতৃবৃন্দ ছিলেন সমন্বয়বাদী। তাঁরা এক পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সমস্যার সমাধান দেখতেন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন ও ১৯৫৬ সালের আদলে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ৬-দফায় ফেডারেল সরকারের হাতে যেসব বিষয় ন্যস্ত করার কথা বলা হয় (প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক), এর মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, কর বা শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা, বৈদেশিক বাণিজ্য, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্যারা-মিলিটারি বাহিনী গঠন ইত্যাদি বিবেচনায় আওয়ামী লীগের এ কর্মসূচির সঙ্গে পিডিএম-এর ৮-দফা কর্মসূচির পার্থক্য খুবই স্পষ্ট ছিল।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি (১৯ ও ২০শে মে ১৯৬৭) ৬-দফা কর্মসূচির বাইরে আবদুস সালাম খানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তাব অনুমোদন না করলেও দলের প্রবীণ নেতৃত্ব থেমে থাকেনি। পিডিএম গঠিত হওয়ার পর ওয়ার্কিং কমিটির এরূপ ১৩ জন সদস্য[১২] এতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি মনোনয়ন বিবেচনার্থে দলের ওয়ার্কিং কমিটির রিকুইজিশন সভা আহ্বানের দাবি করেন। এসবকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়।[১৩] তবে দলের তরুণ নেতৃত্ব, মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মী-সমর্থক ও ছাত্ররা ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও ৬-দফা'র প্রতি একনিষ্ঠ। ১৯শে আগস্ট ১৯৬৭ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে দলের বিশেষ কাউন্সিল সভা হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৯৫০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৮৮৬ জন উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা আলোচনা শেষে ঐ সভায় ৬-দফা কর্মসূচির বাইরে পিডিএম-এ যোগদান না করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপরদিকে, দলের ১৩ জন রিকুইজিশনপন্থীকে '৬-দফা'র বিরুদ্ধে 'চক্রান্তকারী', 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁদের সাসপেন্ড করা হয় এবং 'কেন বহিষ্কার করা হবে না' এ মর্মে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৪]

এর প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভার তিনদিন পর (২৩শে আগস্ট ১৯৬৭) নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি বাতিল করে তদ্স্থলে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে সভাপতি ও মুজিবর রহমানকে সেক্রেটারি করে ২৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। ঐ সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক (তখন আমেনা বেগম)[১৫] এঁদের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারির অপর এক সিদ্ধান্ত হয়।[১৬] এভাবে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বে পিডিএম-পন্থী আওয়ামী লীগ নেতারা সংগঠনের ওপর নিজেদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিষ্ফল চেষ্টা করেন।[১৭] পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ২৭শে আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরি সভায়

www.pathagar.com

নসরুল্লাহ খানের গৃহীত পদক্ষেপকে অসাংবিধানিক ও অগঠনতান্ত্রিক চিহ্নিত করে তাঁকে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে তদ্স্থলে আওয়ামী লীগের ৬-দফা-পন্থী অন্যতম নেতা ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি অর্গানাইজিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়।[১৮] ১৮ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে ২৪ জন করে মোট ৪৮ জন সদস্য নিয়ে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নতুন অর্গানাইজিং কমিটি ঘোষণা করা হয়।[১৯] এ এইচ এম কামারুজ্জামান ছিলেন এর আহ্বায়ক।

এ সময়ে পিডিএম-এর বাইরে আওয়ামী লীগ ছাড়া মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ছিল উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল। তবে চিনঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির কারণে আইয়ুব সরকারের প্রতি এ দলের সমর্থন, ৬-দফা'র প্রশ্নে 'পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গৃহীত কোনো প্রচেষ্টায় [তাহার দল] শরীক হইবে না' এই মর্মে মওলানা ভাসানীর ঘোষণা[২০] ইত্যাদি কারণে দলের পূর্বের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পায়। সে সময় সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্ব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদ ঘটে। ফলে দ্বি-ধারায় বিভক্ত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্য থেকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ-বৈষম্য এবং এর প্রতিকারে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচির প্রকৃতি ব্যাখ্যা ও এ ব্যাপারে রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ, প্রধানত এই দুই বিষয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থানের কারণে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ন্যাপে ভাঙন দেখা দেয়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ থেকে বের হয়ে এসে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে মস্কোপন্থি নামে পরিচিত পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি– ন্যাপ (মোজাফফর)। একই আদর্শ ও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সর্ব-পাকিস্তান পর্যায়ে সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল ওয়ালী খান-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় ন্যাপ (ওয়ালী)।

এদিকে কেন্দ্র থেকে মফস্বল পর্যন্ত সারাদেশে ৬-দফা সমর্থক অসংখ্য আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীর জেল-জুলুম-গ্রেপ্তার সত্ত্বেও ৬-দফা'র জনপ্রিয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগই ছিল আইয়ুব সরকারের জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ। শুধু সরকারের জন্যই নয়, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ৬-দফা কর্মসূচির আসল উদ্দেশ্য পাকিস্তানের অস্তিত্বমূলে কুঠারাঘাত হানা। তাই ৬-দফাপন্থিদের বিরুদ্ধে তাঁর 'অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ' করার পূর্ব-হুমকি অনুযায়ী এর প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জন[২১] সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্য, সিএসপি অফিসার ও ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ডিসেম্বর ১৯৬৭-জানুয়ারি ১৯৬৮ এ সময়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে এক মামলা দায়ের করা হয়, যার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। সে সময়ে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে সর্বাধিক পরিচিত ঐ মামলায় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে দেশের পশ্চিম অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগটি ছিল এরূপ : কোনো এক সেনাবাহিনী দিবসে পূর্ব পাকিস্তানে কমান্ডো

www.pathagar.com

স্টাইলে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি অফিসারদের বন্দি বা হত্যা এবং সেনা ছাউনি দখল করে তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।[২২] এছাড়া অভিযুক্তরা নিজেদের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন এবং বিভিন্ন সময়ে একাধিক স্থানে গোপন বৈঠকে মিলিত হন। অভিযুক্তদের কেউ-কেউ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভারতের সহায়তা লাভে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় গমন করেন এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে বন্দি হওয়ার পূর্বে তিনি মামলায় অভিযুক্ত দুই নম্বর আসামি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও অন্যদের সঙ্গে একই লক্ষ্যে একাধিক গোপন বৈঠকে মিলিত হন এবং প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৩]

১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের বিচারের জন্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এস এ রহমানকে প্রধান করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন।[২৪] ১৯শে জুন থেকে ঢাকা কুর্মিটোলা সেনানীবাসে এ বিচারকার্য শুরু হয়। এভাবে আইয়ুব সরকার ৬-দফাভিত্তিক আন্দোলন দমনে একদিকে যেমন চরম নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, অপরদিকে তাঁর ক্ষমতা দখলের এক দশক পূর্তিতে 'উন্নয়নের এক দশক' (Decade of Development) নাম দিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয়ে সরকারিভাবে পাকিস্তানের উভয় অংশে জাঁকজমকপূর্ণ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রায় কাছাকাছি সময়ে (এপ্রিল ১৯৬৮) পাকিস্তান প্লানিং কমিশনের প্রধান অর্থনীতিবিদ মাহবুবুল হক এ তথ্য প্রকাশ করেন যে, পাকিস্তানের শতকরা ৬৬ ভাগ শিল্প, ৭৯ ভাগ বীমা এবং ৮০ ভাগ ব্যাংক সম্পদ মাত্র ২২টি পরিবারের হাতে (যাদের ১টি বাদে বাকি সব পশ্চিম পাকিস্তানি) কেন্দ্রীভূত। এর দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, সম্পদ পাচার ও চরম আঞ্চলিক বৈষম্য সম্বন্ধে আওয়ামী লীগের এতদিনের অভিযোগ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। বাঙালিদের নিকট আইয়ুব সরকারের 'উন্নয়নের দশক' ছিল কার্যত আঞ্চলিক বৈষম্যের উন্নয়ন। উপরন্তু এ সময়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এর অংশ হিসেবে গৃহীত হয় নানা পদক্ষেপ, যেমন রোমান হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উর্দু এবং আরবি শব্দ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এসবের সংস্কার ও ইসলামীকরণ, বাংলা ও উর্দু মিশিয়ে একটি তথাকথিত জাতীয় ভাষা বা লিঙ্গুয়া-ফ্রাঙ্কা সৃষ্টির উদ্যোগ ইত্যাদি।[২৫] এর পূর্বে আইয়ুব সরকার কর্তৃক রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্র সংগীত ও কবিতা প্রচার বন্ধ এবং পশ্চিম বাংলা (ভারত) থেকে বই ও চলচ্চিত্র আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়। এসব ঘৃণ্য ও জাতিবিদ্বেষী তৎপরতা বাঙালিদের নতুন করে বিক্ষুব্ধ করে। সার্বিক অবস্থায় আইয়ুব সরকার ও পাকিস্তানের প্রতি বাঙালিদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও গণঅসন্তোষ দেখা দেয়। এমনই এক সামগ্রিক পটভূমিতে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ সালের আওয়ামী লীগের কাউন্সিল।

কাউন্সিল অধিবেশন

১৯৬৮ সালের ১৯শে অক্টোবর সকাল ১০টায় হোটেল ইডেনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দলের সহ-সভাপতি (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি) সৈয়দ নজরুল ইসলাম। রাজনৈতিক

www.pathagar.com

রিপোর্ট পেশ করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ। সম্মেলন উদ্বোধন করেন *ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ন্যাপের মহিউদ্দীন আহমদ ও পীর হাবিবুর রহমান।

কাউন্সিল উপলক্ষ্যে তৈরি প্যান্ডেলটিতে অসংখ্য পোস্টার শোভা পায়। এসব পোস্টার '৬-দফা জিন্দাবাদ', 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ', 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার দিতে হবে', 'গণতন্ত্র কায়েম কর', 'একনায়কত্ব চলবে না', 'জরুরী আইন বাতিল কর', 'বন্যার স্থায়ী সমাধান চাই', 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' প্রভৃতি দাবি ও বক্তব্য লেখা ছিল।[২৬] প্যান্ডেলের সম্মুখভাগে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতি টাঙানো ছিল। সম্মেলন চলাকালে কাউন্সিলর ও ডেলিগেটগণ 'নির্বাচন বর্জন কর',[২৭] 'সংগ্রামে মুক্তি', প্রভৃতি শ্লোগান দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সন্দ্বীপের শফি মিয়াসহ কয়েকজন শিল্পী গণসংগীত পরিবেশন করেন। এরপর মওলানা আকরম খাঁ এবং আওয়ামী লীগের পরলোকগত নেতা-কর্মীদের স্মরণে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া অসুস্থ থাকায় তাঁর লিখিত উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করে শোনান অনুষ্ঠানের সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।[২৮] এ ভাষণে যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয় তা হচ্ছে, আইয়ুবের একদশক পূর্তি উদ্‌যাপনের বিরূপ প্রভাব, 'উন্নয়নের দশকে' দেশের ৮০ ভাগ সম্পদ ২০টি পরিবারের[২৯] হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া, জনগণের ওপর করের বোঝা ও বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি, দুর্নীতির প্রসার, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সরকারের ৯টি মামলা, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, পাকিস্তানের শুরুর দিকে রাজনৈতিক শাসন আমলেও বিরোধীদের ওপর নির্যাতন, 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যবস্থায় জনগণের প্রকৃত ভোটাধিকার হরণ, 'প্রতিনিধি' নির্বাচনের এ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা, *ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রতি হয়রানি ও নিবর্তনমূলক আচরণ, আরবি হরফে বাংলা লেখা বা 'লিঙ্গুয়া-ফ্রাঙ্কার' নামে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি, পাকিস্তানে 'চরমপন্থা' উদ্ভবের কারণ, পাকিস্তানে দুই অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ও অবিশ্বাসের কারণে 'একের রক্ত যেন অপরের কাম্য', 'কনফ্রন্টেশনের' পরিবেশে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়া, জাতীয় সংহতি বা অস্তিত্ব বিপন্ন হলে এর দায়-দায়িত্ব 'সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী' প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের 'একক স্কন্ধে' বর্তানো, গণতন্ত্রই হচ্ছে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ ইত্যাদি।[৩০]

ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী কাউন্সিলে পেশকৃত তাঁর রাজনৈতিক রিপোর্টে সরকারি দমননীতি ও গ্রেপ্তার, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার, ৭ই জুন (১৯৬৬)-পরবর্তী ব্যাপক ধরপাকড়, ১৪৪ ধারা জারি, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, *ইত্তেফাক* প্রেস বাজেয়াপ্তকরণ, 'ষড়যন্ত্র মামলায়' দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জড়িত করা, সাধারণ সম্পাদক এবং দলের অন্যান্য কর্মকর্তা, নেতা ও কর্মীর দেশরক্ষা আইনে একটানা আটক থাকা, পিডিএম গঠনের প্রশ্নে কিছু নেতার দলত্যাগ সত্ত্বেও গত দুই বছর দলের কর্মসূচির 'প্রচার অভিযান' অব্যাহত থাকা, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অন্যান্য দলের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনে সংগঠনের নীতিগত সম্মতি, দলত্যাগী আওয়ামী লীগ নেতাদের দলে ফিরিয়ে আনার

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা, খাদ্য সমস্যার অবনতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বৈদেশিক দেনা বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি, বন্যা ও অভাবক্লিষ্ট অর্ধভুক্ত দেশবাসীর চরম দুরবস্থার মধ্যেও আইয়ুব সরকারের 'রাজকীয় জৌলুসে' তথাকথিত উন্নয়ন দশক উদ্‌যাপন, সংখ্যালঘু ও মহাজের সমস্যা, 'শত্রু সম্পত্তির' নামে অর্জিত সম্পত্তির অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন।[৩১]

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ[৩২]

সভাপতির ভাষণে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিরোধীদলীয় ঐক্য, আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ৬-দফা কর্মসূচি, শক্তিশালী সংগঠন, 'মৌলিক গণতন্ত্র' মার্কা নির্বাচন পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, সরকারের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র, ধর্মান্ধতা, নৈতিকতার অধঃপতন, আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্রনীতি, জাতীয় পরিষদে আসন বণ্টন, কৃষকদের ওপর খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা, সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ, সরকারি পয়সা কন্ট্রাক্ট ও লাইন্সের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরে 'একদল টাউট ও উঠন্ত ধনিক দুর্নীতিপরায়ণ' সৃষ্টি, গণআন্দোলন ও এর বিভিন্ন রূপ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বিরোধী দলের সঙ্গে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান ও এর আবশ্যকতা তুলে ধরে এ সম্পর্কে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, 'গণ-আন্দোলনের জন্যই আওয়ামী লীগ ঐক্য কামনা করে, অন্য কোনো প্রয়োজনে নয়।' আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ও ৬-দফা প্রসঙ্গে বলেন, '৬-দফা আওয়ামী লীগের পরিপূর্ণ ম্যানিফেস্টো নয়। ইহা ম্যানিফেস্টোর একটি প্রধান অংশমাত্র।' এ প্রসঙ্গে তিনি আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' কায়েমের কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করেন। তবে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে দলের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা আওয়ামী লীগ জনগণের অধিকার হরণ করিয়া বিশেষ পার্টি তথা একশ্রেণীর ব্যুরোক্রেটিক ডিক্টেটরশীপ-এর প্রবর্তন করিতে চায় না।'

সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে কাউন্সিলরদের সম্মুখে ৬-দফা কর্মসূচির বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। আওয়ামী লীগের এ কর্মসূচি প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, '১৯৬৫-এর বেদনাদায়ক পাক-ভারত যুদ্ধ-সৃষ্ট পরিস্থিতির অভিজ্ঞতাই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে ৬-দফার আকারে আরওও সুনির্দিষ্ট রূপ প্রদান করে।' ৬-দফা কর্মসূচির ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা তিনি পূর্ণ গণতন্ত্র, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, একটি সত্যিকারের ফেডারেল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পূর্ব পাকিস্তান তথা সমগ্র পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির একটি দলিল বোঝেন। অন্য কথায়, তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, 'ভৌগোলিক দিক হইতে বিচ্ছিন্ন দুই দিকে দুটি অঞ্চলকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়া উভয়ের সম্মতিতে একটি সত্যিকারের ফেডারেল স্টেট... সৃষ্টি করাই ৬-দফা কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য।' ৬-দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে পূর্ব পাকিস্তানের কী লাভ হবে, সে সম্বন্ধে বলেন, 'একচেটিয়া পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর পণ্যদ্রব্যের বাজার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবহার করা আর চলিবে না এবং পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন কাঁচামাল রপ্তানি মারফত অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাৎ করিয়া বর্তমানে যে একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে উহার ভিত্তিমূল ধসিয়া পড়িবে।' তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মুষ্টিমেয় ২২টি শিল্পপতি

www.pathagar.com

পরিবারের হাতে দেশের প্রায় সকল সম্পদ যেভাবে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে, এর অবসান ঘটবে। ৬-দফা অনুযায়ী কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন এবং উভয়ের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় ন্যস্ত থাকবে বলে এতে রয়েছে, তা তিনি তাঁর ব্যাখ্যাকালে উল্লেখ করেন এবং এর ফলে 'পূর্ব পাকিস্তান [যে] বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে না' সে সম্বন্ধে কানাডা ও অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের উদাহরণ টেনে বলেন 'বরং ৬-দফা কর্মসূচি শক্তিশালী কেন্দ্রের বদলে শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে।' তিনি এও বলেন যে, 'আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব পাকিস্তানকে লইয়া চিন্তা করিতেছে না বলিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিলের দাবী ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।' তিনি জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে আসন বণ্টনের দাবি পুনরায় উত্থাপন করেন। তিনি ৬-দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও 'ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী' রাজনৈতিক দলের 'অপপ্রচার ও যুদ্ধংদেহি' মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন এবং 'অতীতে কতিপয় বামপন্থি নেতার ভুল ব্যাখ্যার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।' এভাবে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ও ৬-দফা তুলে ধরে তিনি কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বলেন, 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৬-দফা'র আশু রূপায়ণ আওয়ামী লীগ কর্তব্য বলিয়া মনে করে।'

তিনি পাকিস্তানে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য বিস্তার সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা 'বর্তমানের একনায়কত্ববাদী... ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য পরিণাম।' আইয়ুবের 'মৌলিক গণতন্ত্র'কে 'ভুয়া গণতন্ত্র' আখ্যায়িত করে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার হরণের জন্য শোষক শ্রেণির স্বার্থকে তিনি দায়ী করেন। বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থায় 'ক্ষমতাসীন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব নয়', অতএব 'এই ব্যবস্থার অবসানের জন্য' তিনি গণআন্দোলন সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরওপ করে আন্দোলনের চারটি পন্থা, যথা ১. সভা-সমিতি ও মিছিল, ২. হরতাল, ৩. অসহযোগ আন্দোলন, ৪. আইন অমান্য আন্দোলন-এর কথা উল্লেখ করেন। তিনি এও বলেন যে, এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রথমোক্ত দুটি পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

আওয়ামী লীগের 'নতুন পররাষ্ট্রনীতি' সম্পর্কে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে বলেন, 'পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোকে আজ জোটবিহীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং সকল যুদ্ধজোট হইতে পাকিস্তানের বাহির হইয়া আসার দাবীকে ইহার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।'

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আইয়ুব সরকারের নতুন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাহারা পূর্ব পাকিস্তানের বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিবার প্রচেষ্টা চালাইতেছে, তাহারা জাতীয় সংহতির মূলে আঘাত করিতেছে।' নয়া এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, 'তাহাদের বুঝা উচিত রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। লিংগুয়া ফ্রাঙ্কার নামে অথবা সংহতির নামে বাংলা ভাষার ওপর নতুন কোনো আঘাত আমরা সহ্য করিব না।'

প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন

দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন বিকেলে শুরু হয় এবং রাত ৯টা পর্যন্ত চলে। এ অধিবেশনে বিভিন্ন জেলা কমিটির সম্পাদকবৃন্দ স্ব-স্ব জেলার সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন।

www.pathagar.com

অতঃপর ঐ রিপোর্ট এবং সাধারণ সম্পাদকের রাজনৈতিক রিপোর্টের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। রাত ৯টা পর্যন্ত আলোচনা চলে। শেষে বিষয় নির্বাচনি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন : প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মকর্তা নির্বাচন, জনসভা

২০শে অক্টোবর সকালে সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে কাউন্সিলের দ্বিতীয় ও শেষদিনের অধিবেশন শুরু হয়। দীর্ঘ আলোচনা শেষে বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৩৩] উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

১. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা : আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা পুনর্ব্যক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবি। সিনিয়র নেতৃবৃন্দের ৮-দফাভিত্তিক পিডিএম-এ যোগ দেওয়ায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি দলের আস্থা পুনর্ব্যক্ত জরুরি ছিল। গৃহীত এ প্রস্তাব দ্বারা একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি কাউন্সিলের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত হয়।

২. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন : মৌলিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থাধীনে ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা প্রশ্নে গৃহীত প্রস্তাব। অধিকাংশ কাউন্সিলরই ছিলেন নির্বাচন বর্জনের পক্ষে। অপর একটি অংশ, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত সিনিয়র নেতৃবৃন্দ অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে আলাপ করে এ ব্যাপারে পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। কাউন্সিলে উভয় মতামত ব্যক্ত করা হলে তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক এ এইচ এম কামারুজ্জামান এমএনএ, খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ আবদুল আজিজ, চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগ সভাপতি জহুর আহমদ চৌধুরী, নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক নুরুল হক এমপিএ, আবদুল মালেক উকিল এমপিএ ও আমেনা বেগম অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ আজিজ এ কাউন্সিলেই নির্বাচন বর্জনের পক্ষে জোড়ালো অবস্থান নেন এবং সে-মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁকে সমর্থন করেন মহিলা সম্পাদিকা ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আমেনা বেগম। অন্যরা অন্যান্য দলের সঙ্গে আলাপ করে পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রণের পক্ষে ছিলেন। দ্বিতীয় মতের অনুসারীদের মধ্যে কেউ-কেউ তখন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। এক পর্যায়ে দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সভার সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। অবশেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমন একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সকল যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আরও কিছু সময়ের জন্য ধরে রাখা হয়। এর ফলে এম এ আজিজ তাঁর 'এই কাউন্সিলেই নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ' প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। এরপর কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে বলা হয়,

www.pathagar.com

'যেহেতু সমগ্র পাকিস্তানে জরুরি আইন বলবৎ রাখা হইয়াছে, যেহেতু মৌলিক গণতন্ত্রে জনগণের ভোটাধিকার নাই, যেহেতু জনসাধারণের বাক্-ব্যক্তি স্বাধীনতা রুদ্ধ করা হইয়াছে, জেল-জুলুম ও চরম নির্যাতনে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের নাজেহাল করা হইতেছে, সেহেতু দেশে কোন স্বাধীন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে না এবং এই নির্বাচনের ফলাফলে জনমত প্রতিফলিত হইতে পারে না, [সেহেতু] উপরোক্ত অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া এবং অন্যান্য বিরোধীদলের সহিত এই ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করিয়া জানুয়ারী মাসের মধ্যেই আগামী নির্বাচন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটির এক বিশেষ বর্ধিত সভার প্রতি প্রদান করা হইতেছে। এই সভায় প্রাদেশিক কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও জেলা ও মহকুমাসমূহের সভাপতি ও সম্পাদকগণ উপস্থিত থাকিবেন।'

প্রস্তাবটি দলের বিষয় নির্বাচনি কমিটির পক্ষে এ এইচ এম কামারুজ্জামান এমএনএ উত্থাপন করেন এবং এডভোকেট নুরুল হক এমপিএ সমর্থন করেন।

৩. যৌথ আন্দোলন : সকল বিরোধী দলের প্রতি জনগণের জরুরি দাবি-দাওয়াভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ 'সত্যিকারের গণ-আন্দোলন' গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে গৃহীত প্রস্তাব। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল সভায়ও এরূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

৪. রাজবন্দিদের মুক্তি : আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল, শ্রমিক, ছাত্র ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দের বিনাশর্তে আশু মুক্তি দাবি করে প্রস্তাব গ্রহণ।

৫. রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা : বন্যা উপদ্রুত রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা, বন্যার্তদের জন্য পর্যাপ্ত সাহায্য প্রদান এবং এখানকার যাবতীয় ঋণ ও খাজনা মওকুফ দাবি করে গৃহীত প্রস্তাব।

৬. অন্যান্য প্রস্তাব : জরুরি অবস্থার অবসান, দমননীতির আবসান, সকল নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কায়েম, ইত্তেফাক বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার, শিক্ষা সংকোচন নীতির অবসান, বেসরকারি কলেজসমূহের প্রাদেশিকীকরণের নীতি প্রত্যাহার, সকল ছাত্রের জন্য স্বল্প ব্যয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা, আইএলও সনদ অনুযায়ী সকল শ্রম আইন প্রণয়ন, সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিশ্চিত করা, বন্যা সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনাপূর্বক দ্রুত বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, মোহাজের সম্পত্তি এওয়াজ হস্তান্তর (এক্সচেঞ্জ) রেজিস্ট্রীকরণ, মোহাজেরদের পুনর্বাসন, উপদ্রুত ব্যক্তি অর্ডিন্যান্স বাতিল, শত্রু সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় তুলে দেওয়ার পরিবর্তে সরকারি মালিকানায় আনয়ন, ইপিআইডিসি, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুঁজিপতিদের হাতে না দিয়ে মিল শ্রমিকদের যৌথ মালিকানায় হস্তান্তর ইত্যাদি দাবি করে প্রস্তাব গ্রহণ।

www.pathagar.com

দলের কর্মকর্তা নির্বাচন

কাউন্সিলের দ্বিতীয় তথা শেষদিনের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন :[৩৪]

সভাপতি	:	শেখ মুজিবুর রহমান
সহ-সভাপতি	:	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
		ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
		খন্দকার মোশতাক আহমদ
সাধারণ সম্পাদক	:	তাজউদ্দীন আহমদ
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	মিজানুর রহমান চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক	:	এডভোকেট আবদুল মোমেন
শ্রম সম্পাদক	:	জহুর আহমদ চৌধুরী
কৃষি সম্পাদক	:	সোহরাব হোসেন
দপ্তর সম্পাদক	:	মোহাম্মদউল্লাহ
মহিলা সম্পাদিকা	:	মিসেস আমেনা বেগম
সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	কে এম ওবায়দুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ	:	মুহিবুস সামাদ

এই ১৩ জন কর্মকর্তা ছাড়াও ওয়ার্কিং কমিটিতে আরও ২৬ জন সদস্য ছিলেন, যারা দলের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদ বন্দি থাকা অবস্থায় দ্বিতীয়বারের মতো দলের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রচার সম্পাদক এডভোকেট আবদুল মোমেন এবং সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক কে এম ওবায়দুর রহমান এঁরা দুজনও তখন কারাবন্দি। কৃষি সম্পাদকের পদটি এই প্রথম সৃষ্টি করা হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির বাকি সদস্যগণ গঠনতন্ত্র মোতাবেক সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন।[৩৫]

নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন আওয়ামী লীগ ও এর প্রাদেশিক পরিষদের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা আবদুল মালেক উকিল এমপিএ। এছাড়াও সভায় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের জন্য দলের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হয়।

জনসভা

কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় ও সমাপ্তির দিন বিকেল ৩টায় পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে এতে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, আবদুল মালেক উকিল এমপিএ, নুরুল হক এমপিএ, রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, জহুর আহমদ চৌধুরী ও সিন্ধু প্রদেশের কৃষক নেতা ফয়েজ মোহাম্মদ। জনসভায় প্রচুর লোকসমাগম ঘটে। নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার সময় জনতার মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি ওঠে : 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', 'প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার দিতে হবে', 'জরুরী অবস্থার অবসান

www.pathagar.com

চাই', 'বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চাই', '৬-দফা জিন্দাবাদ', 'বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ কর' প্রভৃতি।[৩৬]

সভাপতির ভাষণে সৈয়দ নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যের অধিকাংশই নতুন করে উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করে রাখার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'এই দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দকে দেশের মানুষের মঙ্গলের চেষ্টা করিবার জন্য কারারুদ্ধ করা হইয়াছে।' ৬-দফা'র বিরুদ্ধে সরকার ও বিরোধী দলের কোনো কোনো মহল কর্তৃক একে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি' হিসেবে আখ্যায়িত ও সেভাবে এর অপপ্রচার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচি শক্তিশালী কেন্দ্রের উপর আঘাত হানিতে চায় ঠিকই কিন্তু এই কর্মসূচীর মাধ্যমে উভয় প্রদেশের জনগণের মধ্যে শক্তিশালী ঐক্য গড়িয়া তুলিতে চায়।' ৬-দফা কর্মসূচিকে 'শান্তিপূর্ণভাবে অধিকার আদায়ের কর্মসূচী' আখ্যায়িত করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, "ইহার মধ্যে 'অস্ত্রের ভাষা' ও 'গৃহযুদ্ধের' কোনো হুমকি নাই।"[৩৭] পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার, পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ দেশের পশ্চিম অংশে ব্যয়, ২২টি পুঁজিপতি পরিবারের হাতে অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিতগত হওয়া, দেশের দুই অংশের মধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্য, 'লিংগুয়া-ফ্রাঙ্কার' নামে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে নতুন করে আইয়ুব সরকারের চক্রান্ত, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় তাঁর বক্তৃতায় গুরুত্ব সহকারে স্থান পায়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> আওয়ামী লীগ সংগ্রামের জন্য যেকোনো দলের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে চায়। তবে মূলনীতি বিসর্জন করিয়া এই ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব নয়... "কাগজী ঐক্য" বা নির্বাচনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়া কোনো লাভ নাই। জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ ইস্যুর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইতে তাঁহার দল রাজি আছে।[৩৮]

জনসভা শেষে নেতৃবৃন্দ শোভাযাত্রাসহকারে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের পূর্ণ আস্থা পুনর্ব্যক্ত করা খুবই জরুরি ছিল। বঙ্গবন্ধু তখন দীর্ঘ সময়ের জন্য কারাবন্দি। আইয়ুব সরকার আওয়ামী লীগকে দুর্বল করার নানা প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে সেটিই ছিল স্বাভাবিক। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নামে দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের অনেকে ঐ সময় নতুন জোট পিডিএম-এ যোগ দেন, যা ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। পূর্ব বিরূপ অভিজ্ঞতার কারণে এতদিন জোটবদ্ধ আন্দোলনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অবস্থান ছিল খুবই অনড় ও নেতিবাচক। কিন্তু ৬-দফা'র আন্দোলন করতে গিয়ে সারাদেশে সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের নির্মম নির্যাতন-গ্রেপ্তার বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে রাষ্ট্রদ্রোহী আগরতলা মামলা দায়ের করার পর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দলের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। তবে আওয়ামী লীগ কোনো অবস্থাতেই ৬-দফা কর্মসূচি স্থগিত রেখে বা এর পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে যে সম্মত ছিল না, তা এ কাউন্সিল থেকেও স্পষ্ট হয়।

অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ৬-দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যাকালে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যতই এ সম্বন্ধে একটি ফেডারেল ব্যবস্থাধীনে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি

www.pathagar.com

সুদৃঢ় করবে মর্মে কৌশলী অবস্থান গ্রহণ করুন না কেন, এ কর্মসূচির মূলে ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তির প্রশ্ন। তাই বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এ সর্বোচ্চ পর্বে বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রয়োজন ছিল যত বেশি সংখ্যক সাবেক নেতৃবৃন্দকে দলে টানা ও ধরে রাখা। সম্ভবত সে কারণে, পূর্বে যারা দলের পুনরুজ্জীবনবিরোধী (১৯৬৪) কিংবা এনডিএফ (১৯৬২) বা পিডিএম (১৯৬৭)-পন্থি ছিলেন, তাদের কাউকে-কাউকে মূল দলে পুনরায় স্থান দেওয়া হয়।[৩৯]

তথ্যনির্দেশ

১. *সংবাদ*, ১৯শে অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ. ১; *ঐ*, ২০শে অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ. ১, ১২; *আজাদ*, ২০শে অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ. ১, ৬;

২. *সংবাদ*, ২০শে অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ. ১

৩. হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পৃ. ৩৯-৪১

৪. *ঐ*, পৃ. ৪৩-৪৭

৫. অন্যরা হলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, মুজিবর রহমান (রাজশাহী) ও এম এ আজিজ (চট্টগ্রাম)। *ইত্তেফাক*, ১০ই মে ১৯৬৬, পৃ. ১

৬. আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, পৃ. ১৪৬। বিস্তারিত, হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পৃ. ৪৭-৪৮

৭. ৭ই জুন ১৯৬৬'র ৬-দফা দিবসের আগে পরে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির ১২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৮ জনই গ্রেপ্তার হন। তাঁরা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (সভাপতি), মুজিবর রহমান (রাজশাহী; সহ-সভাপতি), তাজউদ্দীন আহমদ (সাধারণ সম্পাদক), মিজানুর রহমান চৌধুরী (সাংগঠনিক সম্পাদক), জহুর আহমদ চৌধুরী (শ্রম সম্পাদক), আবদুল মোমেন (প্রচার সম্পাদক), কে এম ওবায়দুর রহমান (সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক) এবং নুরুল ইসলাম চৌধুরী (কোষাধ্যক্ষ)। ২রা জুন ১৯৬৬, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শামসুল হক গ্রেপ্তার হন। *ইত্তেফাক*, ১০ই মে ১৯৬৬, পৃ. ১; ঐ, ৩রা জুন ১৯৬৬, পৃ. ১; ঐ; ৪ঠা জুন ১৯৬৬, পৃ. ১; আরও দ্রষ্টব্য আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধুর জবানবন্দি, পৃ. ৩৫৯-৩৬৩ (স্বাধীনতা, খণ্ড ২)

৮. *আজাদ*, ২১শে মে ১৯৬৭, পৃ. ১, ৮

৯. হাসান হাফিজুর রহমান, *স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ২৮৮

১০. ৮-দফা কর্মসূচি দ্রষ্টব্য, *ঐ*, পৃ. ২৮৪-২৮৭

১১. *ঐ*

১২. এঁরা হলেন আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমানে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য), নুরুল ইসলাম চৌধুরী (কোষাধ্যক্ষ), জহিরুদ্দীন (নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী), মুজিবর রহমান (রাজশাহী; সহ-সভাপতি), আব্দুর রহমান খান (ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন মন্ত্রী), এম এ রশিদ (ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন এমপিএ), এম রওশন আলী (ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য), মমিনুদ্দিন আহমদ (ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য), এস ডব্লিউ লকিত উল্লাহ (ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য), সাদ আহমদ (ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য), রহিমুদ্দিন আহমদ (ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য), জালাল উদ্দীন খান (ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য), মতিউর রহমান (ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য)। এছাড়া আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সহ-সভাপতি আবদুস সালাম

www.pathagar.com

খানকেও শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়। *দৈনিক পাকিস্তান*, ২০শে আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ৮; *আজাদ*, *২৪শে আগস্ট* ১৯৬৭, পৃ. ১, ৮

১৩. *আজাদ*, ১৭ই আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ১; *ঐ*, ১৮ই আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ১, ৮; *ঐ*, ১৯শে আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ১

১৪. কাউন্সিল সম্বন্ধে বিস্তারিত, *আজাদ*, ২০শে আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ১, ৮; *ঐ*, ২১শে আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ১, ৮, ২৪শে আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ১, ৮। সাময়িকভাবে বহিষ্কৃতদের নিকট থেকে কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রাপ্তির পর তাঁদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ আজিজকে নিয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। *আজাদ*, ২০শে আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ১। পাকিস্তান জাতীয় আইন পরিষদে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি দলের নেতা হিসেবে শাহ আজিজুর রহমান ওয়ার্কিং কমিটি ও কাউন্সিলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ বিশেষ কাউন্সিলে অনুপস্থিত ছিলেন। *আজাদ*, ২০শে আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ৮

১৫. ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী গ্রেফতার হলে মহিলা সম্পাদক আমেনা বেগম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পরে মিজানুর রহমান চৌধুরী মুক্তিলাভ করলে পুনরায় তিনি ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত দলের নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন।

১৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪শে আগস্ট ১৯৬৮, পৃ. ১; *আজাদ*, ২৪শে আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ১,৮। আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিলের একদিন পর অর্থাৎ ২০শে আগস্ট ১৯৬৭ নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পিডিএম-পন্থিদের এক সভায় আবদুস সালাম খানকে সভাপতি এবং জামাত-ই-ইসলামী'র পূর্ব পাকিস্তানের আমীর গোলাম আজমকে সাধারণ সম্পাদক করে পিডিএম-এর পূর্বাঞ্চলীয় কমিটি গঠন করা হয়। *দৈনিক পাকিস্তান*, ২১শে আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ১

১৭. নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান পিডিএম-এর কমিটি গঠন এবং তাতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত তৎপরতা চালাতে একাধারে ১৭ দিন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করেন। *আজাদ*, ২৪শে আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ১। পিডিএম-পন্থি আওয়ামী লীগ নেতারা ১৫ই সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের একটি বিশেষ পাল্টা কাউন্সিল অধিবেশন ইডেন হোটেলে আয়োজন করেন। মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে দুই শতের মতো 'লোক' উপস্থিত ছিলেন বলে পত্রিকায় প্রকাশ। 'পূর্ব নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্বে দুইদফা কোরান তেলাওয়াতের পর' শুরু হওয়া পাল্টা এ কাউন্সিলের উদ্বোধক ছিলেন সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা ও পিডিএম পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি আবদুস সালাম খান। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে তাঁরা তাঁদের আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও, তা কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। *আজাদ*, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭, পৃ. ১, ১২; *আজাদ*, ১৭ই আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ৮; ঐ, ১৮ই আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ৮; Shyamali Ghosh, *Awami League*, p. 139

১৮. দ্রষ্টব্য *আজাদ*, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭, পৃ. ১; সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে, ১৯৬৪ সালে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এড-হক কমিটি গঠন করা হয়েছিল কিন্তু ঐ কমিটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন, গঠনতন্ত্র

www.pathagar.com

প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ, কর্মকর্তা নির্বাচন ইত্যাদি কোনো কিছুই এ পর্যন্ত করতে পারেনি। *আজাদ*, ঐ; আরও ঐ, ২১শে আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ১, ৮

১৯. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৭, পৃ. ১

২০. *ইত্তেফাক*, ৯ই এপ্রিল ১৯৬৭, পৃ. ১, ৮

২১. ৩৫ জনের নাম দ্রষ্টব্য, কর্নেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা ২০১২, পরিশিষ্ট ঘ, পৃ. ১৫৫-১৭৪; আরও, হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২৬৮

২২. বিস্তারিত, The State V. Sheikh Mujibur Rahman and Others, হাসান হাফিজুর রহমান, *স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৩০৩-৩২৮; সাহিদা বেগম, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন*, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ১৬০-১৮৭; কর্নেল শওকত আলী, *সত্য মামলা আগরতলা*; আরও, হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২৬৬-২৭১

২৩. ঐ

২৪. অন্য দুজন হলেন বিচারপতি মুজিবুর রহমান খান ও বিচারপতি মুকসুদুল হাকিম।

২৫. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২৫৩-২৫৪; *আজাদ*, ২০শে অক্টোবর ১৯৬৭, পৃ. ১, ৬; *আজাদ*, ২১শে অক্টোবর ১৯৬৭, পৃ. ১, ৬

২৬. *সংবাদ*, ২০শে অক্টোবর ১৯৬৭, পৃ. ১

২৭. ঐ

২৮. ঐ

২৯. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া তাঁর ভাষণে পাকিস্তানের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া পরিবারের সংখ্যা ২০টি বলে উল্লেখ করেন। এ সংখ্যা হবে ২২টি।

৩০. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সম্পূর্ণ ভাষণ দ্রষ্টব্য *সংবাদ*, ২১শে অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ. ৪

৩১. ঐ, ২০শে অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ. ১, ১২; *আজাদ*, ২০শে অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ. ১, ৬

৩২. ঐ

৩৩. ঐ

৩৪. ঐ

৩৫. দলের নির্বাচিত সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন আগরতলা মামলায় ক্যান্টনমেন্টে বিচারের সম্মুখীন। আলোচ্য কাউন্সিল থেকে ৪ মাস পর উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে তিনি মুক্তি পান। গঠনতন্ত্রের ধারা অনুযায়ী কাউন্সিল সমাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের (২৬ জন) দলের সভাপতির মনোনীত করা কথা। বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভের পর তিনি ঐ মনোনয়ন আদৌ দিয়েছিলেন কি-না, তা জানা সম্ভব হয়নি।

৩৬. *সংবাদ*, ২১শে অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃ. ১; *আজাদ*, ২১শে অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ. ৬

৩৭. *আজাদ*, ২১শে অক্টোবর ১৯৬৮, পৃ. ৬

৩৮. ঐ

৩৯. যেমন খন্দকার মোশতাক আহমদ ও জহুর আহমদ চৌধুরী ১৯৬৬ সালে এবং মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন।

www.pathagar.com

অধ্যায় : নয়

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭০ : জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি

১৯৬৮ সাল থেকে এক বছর সাত মাস ও কয়েকদিন পর ১৯৭০ সালের ৪-৫ই জুন মতিঝিলের ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] এতে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর কারামুক্তির পর এটি ছিল প্রথম কাউন্সিল। ১৯৬৮ সালের কাউন্সিল অধিবেশনের সময় তিনি আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে বিচারের সম্মুখীন ছিলেন। এই প্রথমবার অন্য কেউ কাউন্সিলের উদ্বোধক ছিলেন না। বঙ্গবন্ধু নিজেই সভাপতি হিসেবে এর উদ্বোধন করেন। কাউন্সিলে রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি নিরাপত্তা আইনে বন্দি থাকায় ১৯৬৮ সালের কাউন্সিলে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী ঐ রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। এবারের কাউন্সিল অধিবেশনে ১১৩৮ জন কাউন্সিলর যোগ দেন।[২] পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ থেকে সেখানকার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বেশ কয়েকজন এতে উপস্থিত ছিলেন।[৩] ১৯৭০ সালের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে অনুষ্ঠিত দলের এ কাউন্সিল অধিবেশন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পটভূমি

১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালের কাউন্সিলের মধ্যবর্তী সময়ের প্রধান ঘটনাবলি হচ্ছে তথাকথিত আগরতলা রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলায় সামরিক ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধু ও অন্য অভিযুক্তদের বিচার (১৯৬৮-১৯৬৯), ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য, আইয়ুবের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের ১১-দফাভিত্তিক কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন (জানুয়ারি ১৯৬৯), পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খানের গ্রেপ্তার (১৯৬৮), ৮টি রাজনৈতিক দল নিয়ে আইয়ুব-বিরোধী ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন, পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদের মৃত্যু (২০শে জানুয়ারি ১৯৬৯), নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউরের মৃত্যু (২৪শে জানুয়ারি ১৯৬৯), বন্দি অবস্থায় আগরতলা মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হকের নিহত হওয়া (১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহার শাহাদত বরণ (১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯), ঊনসত্তরের আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থান ও আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুর নিঃশর্ত মুক্তি (২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা ও 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা (২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯), আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠক (২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯), জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ

www.pathagar.com

(২৫শে মার্চ ১৯৬৯), ৬২-র আইয়ুবী শাসনতন্ত্র বাতিল, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা ভেঙে দেওয়া, রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর আরওপিত বিধিনিষেধ ১লা মার্চ ১৯৭০ থেকে তুলে নেওয়া, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামো আদেশ (এলএফও) জারি (৩০শে মার্চ ১৯৭০), জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা (যথাক্রমে ৭ ও ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০) ইত্যাদি।

১৯৬৬ সাল থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাবন্দি ছিলেন। প্রথমে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের অধীনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৬৮ সালের শুরুতে বন্দি অবস্থায় তাঁকে ১ নম্বর আসামি করে আগরতলা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করা হয়, যা পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় আইয়ুব সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ও অভিযুক্ত অন্যদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র পন্থায় বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন করার গভীর 'ষড়যন্ত্রে' লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছিল। মামলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, আওয়ামী লীগের ৬-দফাভিত্তিক আন্দোলন নস্যাৎ করে চিরদিনের জন্য বাঙালিদের পদানত করে রাখা। আইয়ুব সরকারের এ আসল উদ্দেশ্য বুঝতে বাঙালিদের সামান্যতম সময়ও লাগেনি। তারা এটিকে দেখেছে বাঙালি স্বার্থের বিরুদ্ধে আইয়ুব সরকার তথা পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র হিসেবে। আর সে কারণেই বাঙালির স্বার্থের একমাত্র মুখপাত্র ও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামের আপসহীন সৈনিক বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় শেষ মুহূর্তে ঐ মামলায় শুধু অভিযুক্তই দেখানো হয়নি, তাঁকে ১ নম্বর আসামিও করা হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারকার্য শুরু হওয়া থেকে শেষদিন পর্যন্ত চাঞ্চল্যকর এ মামলার প্রতিদিনের বিবরণী দৈনিক পত্রপত্রিকাসমূহ ও সকল গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার হয়। এ থেকেও জনগণ অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে পারে। বিশেষ করে ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে বঙ্গবন্ধুর লিখিত বক্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য ও তা একটি মূল্যবান দলিল।[৪] বঙ্গবন্ধু নিজেকে সম্পূর্ণ 'নির্দোষ' দাবি করে তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমাকে প্রতিহিংসাবশতঃ মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে।'[৫] তিনি আরও বলেন, 'কেবল মাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত ... করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া' এটি করা হয়েছে। এর প্রকৃত কারণ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর ব্যাখ্যা, 'ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকুরীর সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।' বঙ্গবন্ধু এরপর বলেন, 'দেশের জন্য আমি যাহাই ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে।'[৬]

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠার অপেক্ষায় ছিল। কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সারাদেশে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা ও অসংখ্য কর্মী যখন আইয়ুবের কারাগারে নিক্ষিপ্ত এবং চারিদিকে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজমান, ঠিক এমনই সময়ে বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব সংগ্রামী ছাত্র সমাজের স্কন্ধে গিয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ,

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন ও মতিয়া উভয় গ্রুপ), সরকারি ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের দোলন গ্রুপ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ১১-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ুব-বিরোধী মঞ্চ, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে।[৭] ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি ও ছাত্রলীগের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

ছাত্র সমাজের ১১-দফা কর্মসূচির মধ্যে শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বিষয় এবং ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, শ্রমিক, কৃষক সকলের দাবিদাওয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এর বিশেষ গুরুত্ব হলো, ৩ নম্বর দফায় আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচির পুরোটাই এবং সর্বশেষ দফায় সকল রাজবন্দির মুক্তি, বিশেষ করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনীতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার' এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮]

সংগ্রামী ছাত্রসমাজের ডাকে প্রদেশব্যাপী শুরু হয় ১১-দফা ভিত্তিক দুর্বার আন্দোলন। আইয়ুবের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির[৯] প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খানকে গ্রেপ্তার করা হলে পশ্চিম পাকিস্তানেও নভেম্বর ১৯৬৯ থেকে আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়।

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তিই ছিল এ সময় আওয়ামী লীগের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। একই সময় পিডিএম-ভুক্ত ও এর বাইরের রাজনৈতিক দলগুলোও আইয়ুবের বিরোধিতায় নড়েচড়ে বসছিল। সংগ্রামী ছাত্রসমাজের নামে পূর্ব পাকিস্তানে যখন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, প্রায় একই সময় ১৯৬৯ সালের ৮ই জানুয়ারি ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৬-দফাপন্থী), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি–ন্যাপ (মোজাফফর), নিজাম-ই-ইসলামী, জমিয়ত-উল-উলামা-ই-ইসলাম, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (মমতাজ দৌলতানা), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, জামায়াত-ই-ইসলামী, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (নসরুল্লাহ খান) এ ৮টি রাজনৈতিক দল ও গ্রুপের নেতৃবৃন্দ ৮-দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন করেন।[১০] ডাক-এর ৮ দফা দাবিনামার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন, অবিলম্বে জরুরি আইন প্রত্যাহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে সময়ের বিচারে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল '(ঙ) খান আবদুল ওয়ালী খান, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক [বন্দির মুক্তি], রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত সব গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার'-এর দাবি।[১১]

এভাবে আন্দোলন একটি সর্বজনীন রূপ লাভ করে। অন্যদিকে, আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালের বিচারকার্য যতই অগ্রসর হচ্ছিল, বাঙালিরা ততই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। পূর্ব বাংলার আপামর জনতা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন, কার্ফু ভঙ্গ এবং পুলিশ, ইপিআর, সেনাবাহিনী উপেক্ষা করে রাস্তায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। চতুর্দিক প্রকম্পিত করে গগনবিদারী ধ্বনি ওঠে : 'জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো',

www.pathagar.com

'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' ইত্যাদি। ১৯৬৯ সালের ২০শে জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ)-এর মৃত্যু, ২৪শে জানুয়ারি পুলিশের বুলেটে নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউরের মৃত্যু, ১৫ই ফেব্রুয়ারি বন্দি অবস্থায় ঢাকার সেনানিবাসে আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হকের গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ইপিআর-এর গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহার শাহাদত বরণ ইত্যাদি মর্মান্তিক ঘটনা সমগ্র পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। এমনিভাবে সংঘটিত হয় আইয়ুব-বিরোধী উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তিদান ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হন। পরের দিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুকে ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। ঐ সভায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও ডাকসু-র সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ কর্তৃক ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১২]

এদিকে শেষ ভরসা হিসেবে আইয়ুব খান ২৮শে ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে দেশের উদ্ভূত রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বিরোধী দলসমূহের কিছু মৌলিক দাবি যেমন, সংসদীয় গণতন্ত্র, সর্বজনীন ভোটাধিকার ইত্যাদি মেনে নিতে সম্মত হলেও ৬-দফা দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানান। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু ৬-দফার প্রশ্নে অনড় অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। এমনই এক পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান এবং ২৫শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬২ সালের 'আইয়ুবী শাসনতন্ত্র' বাতিল এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে যথাশীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি হতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়। ১লা মার্চ এক আদেশবলে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে দিয়ে পূর্বতন প্রদেশগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ৩০শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কতিপয় শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপসহ 'আইনগত কাঠামো আদেশ' বা এলএফও (Legal Framework Order) জারি করেন।[১৩] এর মূল বিধানসমূহ ছিল : সর্বজনীন ভোটাধিকার, এক ব্যক্তি একভোট নীতি, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টন, জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ৩১৩ নির্ধারণ

www.pathagar.com

(পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬২+৭ মহিলা = ১৬৯টি আসন; পশ্চিম পাকিস্তানের চার প্রদেশে মোট ১৩৮+৬ মহিলা = ১৪৪টি আসন), আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব রক্ষা, কেন্দ্রের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রেখে প্রত্যেক প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের জন্য সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি। রক্ষাকবচ হিসেবে প্রেসিডেন্ট তাঁর হাতে দুটি চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখেন, যথা (১) নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের সময়সীমা ১২০ দিন ধার্য (ধারা ২৫) করা। ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া এবং নতুন নির্বাচনের আয়োজন; (২) গণপ্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্রপতির চূড়ান্ত অনুমোদনের আবশ্যকতা (ধারা ২৭)।[১৪]

প্রথমে ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ এবং ২২শে অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হলেও পরে তা যথাক্রমে ৭ই ও ১৭ই ডিসেম্বর পুনঃনির্ধারিত হয়।[১৫] এভাবে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ৭০-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনের পটভূমিতে আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল অধিবেশন

৪ঠা জুন বিকেল ৩টায় হোটেল ইডেনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ১১৩৮ জন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দুদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এর পূর্বের দিন দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ বৈঠকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা ছাড়াও ১৯টি জেলা ও ৪টি সিটি শাখা কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।[১৬] আওয়ামী লীগের এ কাউন্সিল অধিবেশনের পাশাপাশি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অর্গানাইজিং কমিটির সভা ও এর কাউন্সিল অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক আওয়ামী লীগ নেতা তখন ঢাকায় উপস্থিত। বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে এঁদের কেউ কেউ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তাঁদের মধ্যে কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, মালিক হামিদ সরফরাজ, খলিল আহমদ তিরমিজী, মোহাম্মদ খান রইসানী, বি এ সলিমী ও মাস্টার খান গুল-এর নাম উল্লেখযোগ্য। কাউন্সিল অধিবেশনে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের অগ্রনায়ক তোফায়েল আহমদ ও শেরে বাংলার পুত্র এ কে ফয়জুল হককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।[১৭] কাউন্সিল উপলক্ষে নানাবিধ স্লোগান-সম্বলিত পোস্টার সভামণ্ডপের চতুর্দিকে শোভা পায়। অধিবেশনের শুরুতে গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সভাপতি কর্তৃক ২৫ জন কাউন্সিলরকে কো-অপ্ট করা হয়। তাঁদের মধ্যে দলের সাবেক সভাপতি ও পরে পিডিএম-এ যোগদানকারী মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান, সৈয়দ আবদুস সুলতান এবং ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৮] উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কর্মসূচির মধ্যে ছিল শোকপ্রস্তাব গ্রহণ, অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য, সাধারণ সম্পাদকের রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ এবং সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ। যাঁদের

www.pathagar.com

মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাঁরা হলেন, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ প্রমুখ। এছাড়া আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানকালে সার্জেন্ট জহুরুল হক, ড. শামসুজ্জোহা, আসাদুজ্জামান, মতিউরসহ এ পর্যন্ত জনগণের অধিকার আন্দোলনে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে কাউন্সিলে তাঁদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং এভাবে ৮২ জন শহিদের একটি তালিকা কাউন্সিলে পাঠ করে শোনান।[১৯] অতঃপর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর রাজনৈতিক রিপোর্টে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কোনো ঐক্যজোটে যাবে না। আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। নির্বাচনে যেহেতু জনগণের পছন্দের দল ও প্রার্থী বাছাই করার সুযোগ থাকবে, সেহেতু এ কারণেও জোটবদ্ধ নির্বাচনের আবশ্যকতা থাকবে না। তবে আন্দোলনের প্রয়োজনে ঐক্যের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে তিনি বলেন, '...দেশের রাজনৈতিক ধারা যদি গণতান্ত্রিক পথে না আগায়, তাহলে আমাদের আন্দোলনের পথে আগাইয়া যাইতে হইবে এবং সে পথে চলিতে গিয়া দেশের অন্যান্য গণতন্ত্রকামী মানুষের সুযোগ ও সাহচর্যকে আমরা স্বাগত জানাইব।'[২০]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ[২১]

কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৮০ মিনিটের এক দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তাঁর এ বক্তব্য ছিল খুবই গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে তিনি তাঁর এ বক্তব্য রাখেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আওয়ামী লীগের গাইড ও আদর্শ হিসেবে উল্লেখ, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার স্মৃতিচারণ ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, আওয়ামী লীগের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস, দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আওয়ামী লীগের শত শত নেতাকর্মীর ত্যাগ-তিতিক্ষা আর জেল-জুলুম নির্যাতন সহ্য করা ও রক্তদান, এ সংগ্রামে ছাত্র-যুবক-মেহনতি মানুষের অবদান, ছাত্রলীগের সংগ্রামী ভূমিকা ও সেজন্য এটিকে 'এদেশের গণসংগ্রামের জনক' বলে অভিহিত করা, পাকিস্তানের ২৩ বছরে বাঙালিদের আত্মত্যাগ, বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর 'বল্‌গাহীন শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য', ২২ পরিবারের শোষণ, সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি, 'গরীব আরও গরীব' এবং 'ধনী আরও ধনী' হওয়ার কথা, 'সোনার এই দেশের আজ অন্তহীন হাহাকার ও নিঃসীম দুঃখের ভাগাড়ে পরিণত' হওয়া, তাঁর ৬-দফা কর্মসূচিকে 'শোষণের অবসান ঘটানোরই হাতিয়ার' হিসেবে আখ্যায়িত করা, ১৯৬৬ সালে লাহোরের বিরোধী দলের কনভেনশনে মওদুদী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এঁদের ৬-দফার বিরোধিতা, শতকরা ৯০

www.pathagar.com

ভাগ মুসলমানের দেশে মওদুদীর জামায়াত-ই-ইসলামীর 'ইসলামী বিপ্লবের' ধুয়ার মুখোশ উন্মোচন, ৬-দফার বিরুদ্ধে আইয়ুব খানের 'গৃহযুদ্ধ' ও 'অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের' হুমকি, ৬-দফার বিরুদ্ধে কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচারের কঠোর জবাব দান, 'ছয় দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নয়—পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও' এরূপ উক্তি, আওয়ামী লীগের সংগ্রাম 'পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়, শোষক, জায়গীরদার ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধেই' এ কথা ঘোষণা, 'দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য স্বায়ত্তশাসন, সুখ-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং শোষণবিহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্যই ছয়-দফা' এভাবে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা, তাঁর বিরুদ্ধে আইয়ুব সরকারের আগরতলা মামলা দায়ের করার কারণ এবং এরপরও দল কিভাবে টিকে থাকল তার ব্যাখ্যা, পিডিএম নেতা নুরুল আমিনের কঠোর সমালোচনা, তাঁর (বঙ্গবন্ধু) দীর্ঘ কারাবন্দি থাকাকালীন নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, আতাউর রহমান খান ও আবদুস সালাম খান এঁদের আওয়ামী লীগ ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র, দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগমের স্বেচ্ছায় দলত্যাগ ও সে সম্বন্ধে মন্তব্য, আইয়ুব সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব ও বঙ্গবন্ধুর তা প্রত্যাখ্যান, আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, গণতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে আওয়ামী লীগের বিশ্বাসের কথা, আইয়ুবের রাউন্ডটেবিল কনফারেন্স ও এর ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পটভূমি, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, আওয়ামী লীগ ও এর ৬-দফা প্রশ্নে নির্বাচনের বিশেষ তাৎপর্য, নির্বাচনে দলীয় নেতা-কর্মীদের করণীয় ও সর্বোচ্চ ঐক্য বজায় রাখার তাগিদ, দলাদলির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি,[২২] প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এলএফও-এর ২৫ ও ২৭ নম্বর ধারার সমালোচনা ও তা প্রত্যাহারের দাবি, এলএফও সত্ত্বেও নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত, আওয়ামী লীগের জন্য নির্বাচন হবে ৬-দফা প্রশ্নে 'গণভোটের শামিল' একথা ঘোষণা, পাকিস্তানে 'ষড়যন্ত্রের রাজনীতির' বিবরণ ও 'ষড়যন্ত্রের আজো শেষ হয় নাই' উল্লেখ করা, আদমজী জুট মিল বন্ধ ঘোষণা, আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ কর্মীদের গ্রেপ্তার-হয়রানি-নির্যাতনকে নির্বাচন বানচালের 'কারসাজি' বলে অভিহিত করা, নির্বাচন বানচালের যে-কোনো ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি ইত্যাদি।

আওয়ামী লীগের লক্ষ্য-আদর্শ, দীর্ঘ সংগ্রাম ও নেতাকর্মীদের ত্যাগের ইতিহাস কাউন্সিলরদের সামনে তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আওয়ামী লীগ নেতা, নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যের অভিসারী। ...আওয়ামী লীগের ইতিহাস– বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ত্যাগ, তিতিক্ষা, আর জেল-জুলুম-নির্যাতন বরণের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়াইয়া আছে বহু রক্তের দাগ।' তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) ও অন্যান্য নেতার কারামুক্তি এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের 'রক্তের ডাক যেন আপনারা ভুলিয়া না যান' এ আহ্বান জানিয়ে কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> ভুলিবেন না, এদেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কত ভাই আমাদের রক্ত দিয়েছে, কত বোন বিধবা হইয়াছে, কত মায়ের কোল শূন্য হইয়াছে, কত মানুষের সোনার সংসার ছারখার হইয়াছে। যে বন্ধুরা বুকের রক্ত ঢালিয়া কারাগার বা

www.pathagar.com

> সামরিক ছাউনির বন্দীনিবাস হইতে আমাদের ফিরাইয়া আনিয়াছে, দেশের দাবী আদায়ের জন্য বাংলার শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জের পথঘাট রক্তে রঞ্জিত করিয়াছে, তাহাদেরে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। তাহাদের রক্তের সঙ্গে কেহ যেন বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সাহস না পায়।[২৩]

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে দলীয় নমিনেশন লাভ, এমপি-মন্ত্রী হওয়া এবং এ নিয়ে সৃষ্ট দলাদলির প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'দলাদলির ফ্যাশন বরদাশত করিবার মত সময় আমাদের নাই। মন্ত্রী, এমএনএ বা এমপিএ হওয়ার খাহেশে [খায়েশে] যদি কেহ আওয়ামী লীগে থাকিয়া থাকেন, তবে এখনও সময় আছে, সসম্মানে তাঁহারা আওয়ামী লীগ ত্যাগ করিয়া অন্য দলে যোগ দিতে পারেন। যাঁহারা আগাম প্রচার করিতেছেন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন তাঁর জন্য অবধারিত, মনোনয়নকালে এই প্রচারের জন্যই তাঁহাকে অযোগ্য গণ্য করা হইবে।' বঙ্গবন্ধু নির্বাচনকে দেখেছিলেন তাঁর অভীষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছার আন্দোলনেরই অংশ হিসেবে। তাই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যোগদানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'ক্ষমতা দখল নয়, বরং শোষিত-বঞ্চিত দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবে।' তিনি পুনরায় বলেন, 'ক্ষমতা চাহিলে বহুবার তা পদতলে লুটাইয়া পড়িত। কিন্তু আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ক্ষমতার নিরাপদ আশ্রয় নয়– গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার বন্ধুর পথপ্রান্তের গন্তব্যস্থল।' একই প্রসঙ্গে তিনি দলের নেতাকর্মীদের সর্তক করে দিয়ে বলেন :

> যদি মনে করেন ক্ষমতায় যাইবেন, তাহা ভুলও হইতে পারে, জনগণের যেসব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমার ভাইয়েরা বোনেরা অকালে জীবন বিলাইয়া দিয়েছে, উহা আদায় না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন হোক বা না হোক আওয়ামী লীগকে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।[২৪]

৬-দফা কর্মসূচি গ্রহণের পর শুধু গ্রেপ্তারই নয়, এক পর্যায়ে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আইয়ুব সরকারের আগরতলা মামলা দায়ের, সারাদেশে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন ইত্যাদির মাধ্যমে দলকে ধ্বংস করার চেষ্টা এরূপ চরম প্রতিকূল এবং বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যেও দলের নেতাকর্মীদের সাহসী ভূমিকার কারণে আওয়ামী লীগের টিকে থাকার প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> ৬-দফা দাবী যখন দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছিল, তখন আমার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়– চেষ্টা করা হয় আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার। এধরনের ষড়যন্ত্র মামলা যে দলের প্রধানের বিরুদ্ধে দাঁড় করান হয়, সাধারণতঃ সে দল টেকে না। কিন্তু আওয়ামী লীগের সংগ্রামী কর্মীরা আওয়ামী লীগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।[২৫]

বঙ্গবন্ধুর কারাগারে বন্দি থাকাকালীন নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের উদ্যোগে দলের কিছু নেতাকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নামে ভাগিয়ে নিয়ে আওয়ামী লীগকে ভাগ করার চেষ্টা এবং তা ব্যর্থ হওয়া সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি যখন কারাগারে, সেই সুযোগে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান যুক্তফ্রন্ট [পিডিএম] গঠনের নামে আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি এবং আমাকে ডিসমিস করিয়া নতুন পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন করেন।

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি জানিতেন না নেতা নেওয়া যায়, কর্মী নেওয়া যায় না, তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রক্তের।' আওয়ামী লীগের জন্য আসন্ন জাতীয় নির্বাচন হবে তাঁর ৬-দফা কর্মসূচির ওপর রেফারেন্ডাম এবং তেমনটি বিচারে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> জনগণ ৬-দফা চায় কি না চায়, আগামী নির্বাচন [হবে] সেই প্রশ্নে গণভোটের শামিল। বাংলার মানুষ যদি ৬-দফার পক্ষে ভোট দেয়, আমরা বিশ্ববাসীকে দেখাইয়া দিব কি করিয়া দাবী আদায় করিতে হয়।[২৬]

ইয়াহিয়া খানের 'আইনগত কাঠামো আদেশ' বা এলএফও-তে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে ন্যস্ত রাখার বিধানকে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ইহাতে পরিষদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করার মাধ্যমে জনগণের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। জনগণই দেশের মালিক। সুতরাং জনগণেরই নির্বাচিত পরিষদ হইবে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন– ইহার সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কাহারো নাই।'[২৭] কাউন্সিলরদের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু '৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রদান' ও 'শোষকদের নির্মূল' এ দুটোকে দলের ঐ মুহূর্তের প্রধান কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন। পাকিস্তানের দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তা অব্যাহত থাকার প্রসঙ্গ তুলে নির্বাচন বানচালের যে কোনো কারসাজির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সেই কুচক্রীমহলের ষড়যন্ত্রের আজও শেষ হয় নাই ... ১৯৫৪ সালের ঘটনা আমরা আজও বিস্মৃত হই নাই। অতএব, নির্বাচন বানচালের কোন কারসাজি এদেশের মানুষ আর বরদাশত করিবেন না।' তিনি এও ঘোষণা করেন, 'নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে আমরা বিশ্বাসী একথা যেমন সত্য, তেমনি প্রতিপক্ষ যদি অনিয়মতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকেন, তাহা হইলে জনগণের অনিয়মতান্ত্রিক পথে নামিবার অধিকার আছে।' নির্বাচন বানচাল প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'এবার যদি নির্বাচন না হয়, তা হইলে পাকিস্তানে আর কখনো নির্বাচন হইবে না।' ৬ই জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ঐ কাউন্সিলেও তাঁর ভাষণে ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 'শেষ সুযোগ' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। নির্বাচনের সঙ্গে দেশের অস্তিত্বের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'যদি এ চেষ্টা বাধাগ্রস্থ হয়, যদি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া দাঁড়াইতে পারে। একটি গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা ছাড়া পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল একত্রে থাকতে পারে না। তাই যারা গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করতে চায়, তাদের উপলব্ধি করা উচিত, গণতন্ত্র হত্যার মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের ধ্বংস ডাকিয়া আনিতেছেন।'[২৮] তিনি নির্বাচন বানচাল ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পুনরায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তাঁর একই ভাষণে বলেন :

> আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত এবং শহীদের রক্তের মর্যাদা সমুন্নত রাখার শপথ গ্রহণ করিতেছি। আমাদের আরব্ধ পথে যদি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে,

www.pathagar.com

> আমরা তাহাদের প্রতিহত করিব এবং সেদিন আমাদের আজিকার এই গণ-আন্দোলন বিপ্লবেরই রূপ পরিগ্রহ করিবে। আমরা সেজন্যও সম্পূর্ণ প্রস্তুত।[২৯]

কাউন্সিলে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু তাঁর একই ভাষণে ঘোষণা করেন, '৭ কোটি বাঙালীকে দাবাইয়া রাখার সাধ্য কাহারও নাই।'[৩০] স্মর্তব্য, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ মুক্তির মন্ত্রে উদ্দীপ্ত রেসকোর্সের জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ করে ঘোষণা করেছিলেন, '৭ কোটি বাঙালীকে আর দাবায়া রাখতে পারবা না।'

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের পরের দিন ৬ই জুন হোটেল ইডেনে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এর পূর্বে ৩রা জুন আওয়ামী লীগ অফিসে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ অর্গানাইজিং কমিটির বৈঠক দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।[৩১] ঐ বৈঠকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়াদি ছাড়াও দলের খসড়া ম্যানিফেস্টো সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে বিষয়টি চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে ১৩-সদস্যবিশিষ্ট একটি গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি গঠন করা হয়। একদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মোট ২০০ কাউন্সিলর যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ৪ জন নারীসহ ৯৪ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। অধিবেশনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম কামারুজ্জামান রিপোর্ট পেশ করেন। কাউন্সিলে সাব-কমিটি কর্তৃক প্রণীত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। এছাড়া প্রত্যেক প্রদেশের জন্য আলাদা নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়। সর্বশেষে নবনির্বাচিত সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিলে বক্তব্য রাখেন।[৩২]

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত কর্মসূচি

৪-৫ই জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দুদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের শেষের দিন এবং ৬ই জুন একই স্থানে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রথম জাতীয় কাউন্সিলে দলের গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল :[৩৩]

১. সাম্যবাদী অর্থনীতি প্রবর্তন (ভূমিকা অংশ) : ক) একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, জমিদারি, জায়গিরদারি, সরদারির বিলোপ সাধন করে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাম্যবাদী অর্থনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে মানুষের মর্যাদায় সমুন্নত করা; খ) ন্যায়পরায়ণতার আলোকে মানুষে-মানুষে এবং অঞ্চলে-অঞ্চলে সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নয়া শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির মাধ্যমে দেশে বিপ্লব সাধনই হবে আওয়ামী লীগের কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

২. ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনা : ভূমিকায় উল্লিখিত লক্ষ্যে পাকিস্তানের ফেডারেল সরকার বা কেন্দ্র ও ফেডারেটিং ইউনিটস বা প্রদেশসমূহের মধ্যে

www.pathagar.com

৬-দফা ভিত্তিক ক্ষমতা ও কার্যাবলি বন্টনের মাধ্যমে দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। ফেডারেশনের সকল ইউনিটকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

৩. রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সরকার পদ্ধতি : রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং সরকার পদ্ধতি হবে পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় পদ্ধতির।

৪. সর্বজনীন ভোটাধিকার : ফেডারেল আইনসভা ও ইউনিটসমূহের আইনসভার নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হওয়া।

৫. ফেডারেল আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব : ফেডারেল ইউনিটস বা প্রদেশসমূহের জনসংখ্যার ভিত্তিতে ফেডারেল আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের বিধান।

৬. ফেডারেল সার্ভিস গঠন ও লোকসংখ্যার ভিত্তিতে নিয়োগদান : পাকিস্তানের বিদ্যমান কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস বিলোপ করে ফেডারেশনের আওতাধীন বিষয়সমূহের জন্য ফেডারেল সার্ভিস গঠন করা এবং পাকিস্তানের সকল অংশ হতে লোকসংখ্যার ভিত্তিতে ঐ সার্ভিসে নিয়োগদান।

৭. ইউনিটসমূহের জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী : ফেডারেল ইউনিটসমূহের নিজস্ব নিরাপত্তা বিধানের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার সম্পূরক হিসেবে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের অধিকার।

৮. চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর : পাকিস্তান নৌবাহিনীর সদর দপ্তর ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ করাচি হতে চট্টগ্রামে স্থানান্তর।

৯. আইনের শাসন : আইনের চোখে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক সমান বলে গণ্য হবে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও জন্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে। বৈষম্যমূলক সকল আইন বাতিল হবে। নির্বিচারে গ্রেপ্তার, আটকের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক নিরাপত্তার বিধান।

১০. সংখ্যালঘুদের অধিকার : সংখ্যালঘুদের নিজ-নিজ ধর্ম, আচার-আচরণ, প্রচার এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণের পূর্ণ স্বাধীনতা।

১১. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা। বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা শাসনতান্ত্রিকভাবে নিশ্চিত করা।

১২. রাষ্ট্র কর্তৃক মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা : প্রতি নাগরিকের মৌলিক অধিকার যথা—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ও কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

১৩. বাক স্বাধীনতা : বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি ও যাতায়াতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। জাতীয় জরুরি অবস্থার অজুহাতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ বন্ধ করা।

১৪. গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা : ঔপনিবেশিক সরকারের প্রবর্তিত সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করা।

১৫. জেলা পর্যায়ে শাসনব্যবস্থা : জেলা পর্যায়ের শাসনব্যবস্থা নির্বাচিত পরিষদের ওপর ন্যস্ত করা।

www.pathagar.com

১৬. মহকুমা সম্পর্কে পরিকল্পনা : মহকুমাসমূহকে জেলায় রূপান্তরিত করা।

১৭. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধ : দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি দমনে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তত্ত্বাবধায়নের ব্যবস্থা করা।

১৮. কোরান ও সুন্নার পরিপন্থি কোনো আইন নয় : কোরান ও সুন্নার পরিপন্থি পাকিস্তানে যাতে কোনো আইন পাস না হতে পারে, তজ্জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধান রাখার ব্যবস্থা।

দলের নেতৃত্ব নির্বাচন

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

৫ই জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের সমাপ্তি অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে পরবর্তী দুই বছরের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ নির্বাচিত হন :[৩৪]

সভাপতি	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সহ-সভাপতি	:	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
		ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
		খন্দকার মোশতাক আহমদ
সাধারণ সম্পাদক	:	তাজউদ্দীন আহমদ
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	মিজানুর রহমান চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক	:	আবদুল মোমিন
দপ্তর সম্পাদক	:	মোহাম্মদউল্লাহ
শ্রম সম্পাদক	:	জহুর আহমেদ চৌধুরী
কৃষি সম্পাদক	:	সোহরাব হোসেন
সমাজসেবা ও সংস্কৃতি সম্পাদক	:	কে এম ওবায়দুর রহমান
মহিলা সম্পাদিকা	:	বেগম বদরুন্নেসা আহমদ
কোষাধ্যক্ষ	:	মোহাম্মদ মহসীন

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির বাকি ২৬ সদস্য সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন।[৩৫] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীন আহমদ তৃতীয়বারের মতো যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মহিলা সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষ এ দুজন প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হন। অন্যরা ছিলেন পুনঃনির্বাচিত। নির্বাচন সংক্রান্ত এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং সমর্থন করেন খন্দকার মোশতাক আহমদ।

একই কাউন্সিলে ১০-সদস্যবিশিষ্ট একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হয়, যা ছিল নিম্নরূপ :[৩৬]

সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ, সদস্য আবদুল মালেক উকিল (সাবেক প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা), সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার

www.pathagar.com

মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এম এ আজিজ ও গৌরচন্দ্র বালা। প্রথম ৩ জন পদাধিকার বলে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন।

নেতৃত্ব নির্বাচন ছাড়াও কাউন্সিলের সমাপ্তি অধিবেশনে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১০৬ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাঁদের নাম প্রস্তাব করেন এ এইচ এম কামারুজ্জামান এবং সমর্থন করেন গাজী গোলাম মোস্তফা।

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ৬ই জুনের কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে পরবর্তী দুই বছরের জন্য সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচিত হন। তাঁদের নাম ও পদবি নিম্নরূপ :[৩৭]

সভাপতি	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সহ-সভাপতি	:	কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ
		মাস্টার খান গুল
		বরকত আলী সালমী, বার-এট-ল
সাধারণ সম্পাদক	:	এ এইচ এম কামারুজ্জামান
যুগ্ম সম্পাদক	:	মোহাম্মদ খান রইসানী
		মোহাম্মদ শামসুল হক
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	সৈয়দ খলিল আহমদ তিরমিজী
প্রচার সম্পাদক	:	আবদুল মান্নান
শ্রম সম্পাদক	:	মালিক ফররুখশিয়ার আওয়ান
সমাজসেবা ও সংস্কৃতি সম্পাদক	:	মুস্তাফা সারওয়ার
দপ্তর সম্পাদক	:	শফিউল আলম
কৃষি সম্পাদক	:	সৈয়দ এমদাদ মোহাম্মদ শাহ
কোষাধ্যক্ষ	:	অধ্যাপক হামিদুর রহমান
মহিলা সম্পাদিকা	:	বেগম নুরজাহান মুর্শীদ

বঙ্গবন্ধু ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নাম প্রস্তাব করেন শেখ মজুরুল হক এবং সমর্থন করেন মালিক হামিদ সরফরাজ। সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়।

কাউন্সিল-উত্তর রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধু[৩৮]

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল শেষে পরের দিন ৭ই জুন রেসকোর্স ময়দানে কাউন্সিল-উত্তর আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভার সভাপতি ও প্রধান বক্তা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান.। ভারী বর্ষণ সত্ত্বেও জনসভা 'এক মহাজনসমুদ্রে' পরিণত হয়। কলেবরে তা একই স্থানে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে আগরতলা মামলা থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধুকে দেওয়া সংবর্ধনা সভাকেও ম্লান করে দেয়।[৩৯] সমাজের সর্বস্তরের লক্ষ-লক্ষ মানুষের পাশাপাশি অসংখ্য

www.pathagar.com

নারী ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী বৃষ্টিস্নাত অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য শ্রবণ করে। শুরুতে ডাকসু-র তৎকালীন সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন, জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান এবং আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান আব্দুর রাজ্জাক বঙ্গবন্ধুকে মাল্যভূষিত করেন। অতঃপর ৬-দফার প্রতীকস্বরূপ বঙ্গবন্ধু ৬টি কবুতর শূন্যে উড়িয়ে দেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। বঙ্গবন্ধু সভায় ৮০ মিনিটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ভাষণ রাখেন। এটি ছিল কার্যত তাঁর প্রথম নির্বাচনি জনসভা। তাঁর ভাষণের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ ছিল : আনুষ্ঠানিকভাবে 'নির্বাচনি অভিযান' শুরু ঘোষণা, ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার অঙ্গীকার, গত ২২ বছরের অত্যাচার-শোষণ-বঞ্চনার বিবরণ, ৬-দফার ওপর সুস্পষ্ট ম্যান্ডেট দিয়ে এর সঠিক জবাব দেওয়ার আহ্বান, মওদুদীর জামায়াত-ই-ইসলামীসহ ৬-দফার বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা, 'জয় বাংলা' স্লোগানের সমালোচকদের যথোপযুক্ত জবাব দিয়ে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা, পাকিস্তানের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দিয়ে তাঁর কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা, নির্বাচন বানচালের যে কোনো ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি পুনর্ব্যক্ত করে এর ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ, নির্বাচনকে ভোটারদের জন্য 'বিরাট পরীক্ষা' হিসেবে উল্লেখ, আপসের রাস্তায় নয় 'শহীদদের রক্তের বিনিময়েই' ভোটাধিকার অর্জনের কথা, উত্তরবঙ্গের জনগণের অভাব-অভিযোগ দূর এবং প্রদেশের রাজধানীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ সাধনের জন্য 'অবিলম্বে যমুনার উপর পুল' নির্মাণ, রূপপুর আণবিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু এবং জামালপুরের কয়লা উত্তোলনের দাবি, বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর পুল নির্মাণ করে ঢাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ, শত উসকানির মুখেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান, টেলিভিশনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, মওলানা ভাসানীর প্রতি 'নির্বাচনি যুদ্ধে' অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান, 'কায়েমি স্বার্থান্বেষীদের 'শোষণের চাবী ভাঙ্গার' অঙ্গীকার, অন্তবর্তীকালীন সরকার হওয়ায় ইয়াহিয়া খানের সরকার কর্তৃক ৪র্থ পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অধিকার চ্যালেঞ্জ ও নির্বাচনের পর নতুন সরকার তা বাতিল করে তাদের প্রতিশ্রুত নয়া সমাজব্যবস্থার আলোকে তা নতুনভাবে প্রণয়ন করবে মর্মে ঘোষণা, পাটচাষিদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে আওয়ামী লীগের নীতি অনুযায়ী পাটকে জাতীয়করণের কথা পুনরুল্লেখ, ইয়াহিয়ার প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, আখচাষিদের আখের ন্যায্য মূল্য প্রদান ও তাদের ওপর আরওপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবি, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূল অঞ্চলের ১০ লক্ষ লবণচাষির বিপন্ন জীবনের করুণ চিত্র তুলে ধরে করাচির লবণ চালানোর জন্য বাংলায় উৎপন্ন লবণের ওপর ধার্যকৃত শুল্ক অবিলম্বে প্রত্যাহার, সুপরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলের বনভূমি 'সুন্দরবন ধ্বংস' করার অভিযোগ এনে তা রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ, শ্রমিকদের শিল্পের মালিকানায় শরিক করা, ব্যাংক-বিমা ও শিল্প জাতীয়করণে আওয়ামী লীগের নীতির পুনরুল্লেখ, 'ইয়াহিয়ার এলএফও'র দুটি অগণতান্ত্রিক ধারা প্রত্যাহারের আহ্বান, অবিলম্বে আদমজী মিল খুলে দেওয়ার দাবি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় 'মওদুদী জামায়াত' (জামায়াত-ই-ইসলামী)-এর কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি ভাল করেই জানতেন যে, ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভোটারদের বিভ্রান্ত, সম্ভব হলে আওয়ামী লীগ বিদ্বেষী করার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে শাসক-শোষক ও কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর স্বার্থে তাদেরই আর্থিক আনুকূল্যে অচিরেই জামায়াত 'ইসলাম'-এর নামে মনগড়া 'ফতোয়া'সহ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নির্বাচনি মাঠে নামবে। ইতোমধ্যে জামায়াত আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি এবং বাঙালির জাতীয় জাগরণ ও মুক্তিসংগ্রামের প্রধান ধ্বনি 'জয় বাংলা'র বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে লক্ষ লক্ষ বই ছাপিয়ে বাংলার গ্রাম-গঞ্জ-শহর সর্বত্র বিতরণ করে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালে 'যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা' প্রবর্তন, ১৯৬৫ সালে আইয়ুব বনাম ফাতেমা জিন্নাহ'র প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ইত্যাদি সময়ে মওদুদী জামায়াতের 'বিবি তালাক', 'ইসলাম বরবাদ', 'গায়ের ইসলামী কাজ' এসব ফতোয়ার কথা উল্লেখ করে এদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, "... মজলুম মানুষ যখন ইনসাফ চাহিয়া আগাইয়া আসে, তখনই তোমাদের 'ইসলাম' বিপন্ন হয়।" তিনি মওদুদী জামায়াতের এদেশীয় অনুসারীদের সম্বন্ধে সর্তক থাকার আহ্বান জানিয়ে জনগণের উদ্দেশে বলেন, 'আর বাংলার মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া এইসব মীরজাফর আর উমীচাঁদরা শোষকদের পয়সা খাইয়া অতীতের নিয়মে বাংলার সর্বনাশ করার জন্য আজ আবার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে।'[৪০] এদের 'জয় বাংলা' স্লোগানের সমালোচনার জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাংলা ও বাঙালির পরাজয় ঘটাইয়া শোষকের যাঁতাকল যারা অব্যাহত রাখিতে চান, কেবল তারাই 'জয় বাংলা' স্লোগানে আপত্তি করিতে পারেন।' তিনি এ স্লোগানের ব্যাখ্যায় বলেন, "যুদ্ধে জয় বলিতে যাহা বুঝায়, 'জয় বাংলাও' সেই অর্থ বহন করে।... দেশের বারো কোটি মানুষকে শোষণমুক্ত করার জন্য 'জয় বাংলা', 'জয় সিন্ধু', 'জয় পাঞ্জাব', 'জয় বেলুচিস্তান'...।" অতঃপর বঙ্গবন্ধুর জিজ্ঞাসা, 'অতএব জয় কথাতে এত আপত্তি কেন?'[৪১]

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য 'বিরাট পরীক্ষা' হিসেবে চিহ্নিত করে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের জনসমুদ্রের নিকট প্রশ্ন রাখেন, 'আপনারা মানুষের মত বাঁচিতে চান কি না? পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক আপনারা হইতে চান কি না? আপনারা দেশে কৃষক-মজুরের রাজ কায়েম করিতে চান কি না? ৬-দফার ভিত্তিতে আপনারা স্বায়ত্তশাসন কায়েম করিতে চান কি না?' তাহলে তাঁর ৬-দফা কর্মসূচির পক্ষে গণরায় দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আগামী নির্বাচনে আপনাদের [এসব বিষয়ে] সঠিক জবাব দিতে হইবে।'[৪২]

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে একথা বলে জনসভায় ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর হুঁশিয়ারি, 'আগুন নিয়ে খেলা করিবেন না। ষড়যন্ত্র বরদাশত করিতে আমরা রাজী নই– প্রয়োজনবোধে মৃত্যুকে বুক পাতিয়া নিব কিন্তু ষড়যন্ত্রের কাছে নতিস্বীকার করিব না।' ষড়যন্ত্র করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টার কঠিন পরিণতি এবং একই সঙ্গে এ ধরনের ষড়যন্ত্র যে আর বাংলার মাটিতে কার্যকর করা যাবে না, সে সম্বন্ধে জনগণকে আশ্বস্ত করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'যদি কেহ ষড়যন্ত্র করিয়া নির্বাচন বানচালের মাধ্যমে একনায়কত্ব কায়েম করিতে চায়, তাহাকে আইয়ুব, মোনেমের চাইতেও ভয়াবহ পরিণতির মোকাবিলা করিতে হইবে। যে দেশের মানুষ

www.pathagar.com

অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত দিতে শিখিয়াছে, সেখানে আর যাই চলুক একনায়কত্ব চলিতে পারে না।'[৪৩]

'আনুষ্ঠানিকভাবে আজ হইতে আমি আমার দলের নির্বাচনী অভিযান শুরু করিলাম' একথা ঘোষণা করে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বাংলার স্বার্থ-বিরোধীদের প্রত্যাখান, ৬-দফার পক্ষে গণরায় দিয়ে এদেশের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের স্বাধিকারের স্বপ্নকে ধারণ, এ পর্যন্ত যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করা এবং লক্ষ্য অর্জনে আর জনগণ নয়, প্রয়োজনে এবার তিনিই প্রথম রক্ত দেবেন, জনসভায় দীপ্ত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু এসব কথা বলেন। তাঁর ভাষায় :

> এদেশের আপামর মানুষের স্বাধিকারের দাবীতে সংগ্রাম করিতে গিয়া '৬৬-র ৭ই জুনে মনু মিয়ারা শহীদ হইয়াছেন, যেমন করিয়া বিগত ২৩ বৎসরে শহীদ হইয়াছেন আরও অনেকে, কিন্তু স্বাধিকার তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। এইসব বীর শহীদানের অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করার জন্য আরও যদি রক্তের প্রয়োজন হয়, আমি জানি, বাংলার ছাত্র-যুবক-মেহনতী মানুষ তাহাতে তৈয়ার। তবে এবার আর শহীদ নয়, আপনাদিগকে এবার গাজী হইতে হইবে। আর রক্তের ডাক নয়, এদেশের আপামর মানুষের কাছে এবার আমার একটিই মাত্র আবেদন: জেল-জুলুম, বে-ইমানী আর বে-ইনসাফীর অবসান ঘটাইয়া যদি মানুষের মত বাঁচিতে চান, তবে আগামী নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে ধোঁকাবাজ আর মীর জাফরদের খতম করিয়া ৬-দফার উপর সুস্পষ্ট ম্যান্ডেট দিন, আমি আপনাদের দাবী আদায় করিয়া আনিব। আর রক্তের যদি প্রয়োজন হয়ই তবে সর্বাগ্রে আমিই রক্ত দিব, তারপর আপনাদেরকে ডাকিব।[৪৪]

১৯৭০ সালের কাউন্সিল অধিবেশন ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রে আওয়ামী লীগের সর্বশেষ কাউন্সিল। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের পূর্বে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ছিল, ষড়যন্ত্র করে নির্বাচন বানচাল করা হলে পাকিস্তানে আর নির্বাচন হবে না। নির্বাচন হলো, তবে এটিই শেষ নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু সেটিও জানতেন। বস্তুত, পাকিস্তান যে ঐক্যবদ্ধ বা অখণ্ডিত থাকবে না, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচি গ্রহণের সময় থেকে তা স্পষ্ট হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু সে লক্ষ্যেই 'স্টেপ বাই স্টেপ' অগ্রসর হয়েছেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনকালে তাঁর কৌশল ও অবস্থান ছিল, নির্বাচন যাতে শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, তা নিশ্চিত করা, ৬-দফার ওপর 'গণ-ম্যান্ডেট' লাভ এবং নিজের বাঙালিদের একমাত্র বৈধ ও স্বীকৃত 'মুখপাত্র' হিসেবে আবির্ভূত হওয়া। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। সে-কারণে এলএফও-র খড়্গ থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রথম দিন থেকেই নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে বঙ্গবন্ধু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে বারবার শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের কথা বলেছিলেন। তাঁর এ বক্তব্যের ভিত্তিও ছিল। আওয়ামী লীগের এত বড় বিজয় ঘটবে সেটি পূর্বে নিশ্চিত হতে পারলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী হয়তো নির্বাচন বানচালের পথেই অগ্রসর হতো। অবশ্য ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর নির্বাচন না দিয়ে তাদের জন্য এ সময়ে বিকল্প বা ভিন্ন পথ খুব একটা ছিল বলে মনে হয় না। যাহোক, প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

পর থেকেই বাঙালিদের মোকাবেলায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যে ষড়যন্ত্র ও বিভিন্ন সময়ে পেশিশক্তির প্রয়োগের পথ বেছে নেয়, ৭০-এর নির্বাচন-উত্তর সে পথেই তারা অগ্রসর হয়। ফলে ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ও কাউন্সিল-উত্তর জনসভায় বঙ্গবন্ধুর সে-ঘোষণা অর্থাৎ পরিস্থিতি 'বিপ্লবেই রূপ' পরিগ্রহ করবে, সেটিই বাস্তবে ঘটলো এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে তা হলো। সংঘটিত হলো বাংলাদেশ বিপ্লব ১৯৭১। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭০ সালের ৭ই জুনের রেসকোর্স ময়দানের জনসভার ভাষণই যেন ৯ মাস সময়ের ব্যবধানে ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙালির চূড়ান্ত মুক্তিসংগ্রামে দিকনির্দেশনা লাভ করল।

তথ্যনির্দেশ

১. *ইত্তেফাক*, ৪ঠা জুন ১৯৭০, পৃ. ১; *ঐ*, ৫ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ১০
২. *ঐ*, ৫ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ১০
৩. *ঐ*
৪. দ্রষ্টব্য 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শেখ মুজিবের জবানবন্দি', হাসান হাফিজুর রহমান, *স্বাধীনতা যুদ্ধ : দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৩৫৯-৩৬৩
৫. *ঐ*, পৃ. ৩৬৩
৬. *ঐ*, পৃ. ৩৬২-৩৬৩
৭. হাসান হাফিজুর রহমান, *স্বাধীনতা যুদ্ধ : দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৪০৫-৪০৮; হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২৭১
৮. দ্রষ্টব্য '১১-দফার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান', হাসান হাফিজুর রহমান, *স্বাধীনতা যুদ্ধ : দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৪০৫-৪০৮; হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২৭১-২৭২
৯. ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
১০. হাসান হাফিজুর রহমান, *স্বাধীনতা যুদ্ধ : দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৪০০-৪০১; হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২৭৩
১১. *ঐ*
১২. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২৭৩-২৭৪
১৩. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২৭৮-২৭৯; হাসান হাফিজুর রহমান, *স্বাধীনতা যুদ্ধ : দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৫০২-৫১০
১৪. দ্রষ্টব্য 'আইনগত কাঠামো আদেশ', ধারা ২৫ ও ২৭, হাসান হাফিজুর রহমান, *স্বাধীনতা যুদ্ধ : দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৫০৯-৫১০
১৫. ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও ব্যাপক প্রাণহানির কারণে এসব এলাকার নির্বাচন পিছিয়ে ১৭ই জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।
১৬. *ইত্তেফাক*, ৪ঠা জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ১০
১৭. *ঐ*, ৫ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১০
১৮. *ঐ*, ৫ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১

www.pathagar.com

১৯. শহীদের নামের তালিকা দ্রষ্টব্য, *ইত্তেফাক*, ৭ই জুন ১৯৭০, পৃ. ৬

২০. *ঐ*, পৃ. ১, ৫

২১. দ্রষ্টব্য 'দাবী আদায়ের জন্য যারা প্রাণ দিলেন তাদের রক্তের ডাক যেন আমরা ভুলিয়া না যাই', কাউন্সিলরদের প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধানের উদাত্ত আহ্বান, *ইত্তেফাক*, ৫ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ১০; 'ক্ষমতা দখল নয়–দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবে', *ঐ*, ৬ই জুন ১৯৭০, পৃ. ৬; কাউন্সিল সভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণের জন্য, পরিশিষ্ট : সাত

২২. এ সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'প্রতিষ্ঠান বড় হইলে আত্মকলহ দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আত্মকলহ মীমাংসার জন্য যদি দলীয় সম্পাদককে ব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে তাহা দুর্ভাগ্যজনক। দলের অভ্যন্তরে মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে কিন্তু সে মতদ্বৈধতা যদি স্বার্থের হলাহলের রূপ পরিগ্রহ করে, তবে তা দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শোভনও নয়, সুন্দরও নয়।' 'কাউন্সিলরদের প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধানের উদাত্ত আহ্বান,' *ইত্তেফাক*, ৫ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ১০

২৩. 'কাউন্সিলরদের প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধানের উদাত্ত আহ্বান,' *ইত্তেফাক*, ৫ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১; পরিশিষ্ট : আট

২৪. *ঐ*, পৃ. ১০; পরিশিষ্ট : আট

২৫. 'ক্ষমতা দখল নয়– দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবে', *ঐ*, ৬ই জুন ১৯৭০, পৃ. ৬; পরিশিষ্ট : সাত

২৬. *ঐ*

২৭. *ঐ*

২৮. নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, *ইত্তেফাক*, ৭ই জুন ১৯৭০, পৃ. ৮

২৯. *ঐ*, পৃ. ১

৩০. *ইত্তেফাক*, ৫ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১০

৩১. *ঐ*, ৪ঠা জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ১০;

৩২. *ইত্তেফাক*, ৭ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ৮

৩৩. *ঐ*; ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কতিপয় বিষয় ছিল :

১) আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন : ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য। অতএব 'ছয়-দফা' ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

২) জনগণের সার্বভৌমত্ব : আওয়ামী লীগ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, জনগণই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৭ ও ১১ অনুচ্ছেদে এ কথাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩) সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাস : সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই শোষণ, বৈষম্য, অবিচার ও দুর্দশার হাত হতে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব বলে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। লক্ষণীয় যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্যতম 'সমাজতন্ত্র'।

www.pathagar.com

৪) শিল্প, ব্যাংক, বিমা জাতীয়করণ : মূল, ভারী ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি জাতীয়করণ করার অঙ্গীকার, যা স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক কার্যকর করা হয়।

৫) কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা : সমবায় পদ্ধতিতে দেশে যৌথ চাষাবাদের প্রচলন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ।

৬) শিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা। দারিদ্র্যতম নাগরিকদের সন্তানদেরও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ থাকা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যাপ্ত সংখ্যক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে 'কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সাধন'। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পূর্ণ 'স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে বাস্তব স্বীকৃতি প্রদান'।

৭) বৈদেশিক নীতি ও সম্পর্ক : আওয়ামী লীগ জাতিসংঘ সনদের পূর্ণ সমর্থক। এ দল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাস করে। সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশবাদ এবং একনায়কত্বমূলক শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের প্রতি আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ সমর্থন থাকবে। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদ এ নীতির আলোকে প্রণীত হয়। তবে এতে 'একনায়কত্বমূলক শাসন'-এর স্থলে 'বর্ণবৈষম্যবাদ' শব্দ প্রতিস্থাপিত। দ্রষ্টব্য তাজউদ্দীন আহমদ, *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ : নীতি ও কর্মসূচীর ঘোষণা (ম্যানিফেস্টো)*, গ্লোরী প্রিন্টার্স, ঢাকা, আগস্ট ১৯৬৯

৩৪. *ইত্তেফাক*, ৬ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ১০

৩৫. সভাপতি কর্তৃক এদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল কি-না এবং হয়ে থাকলে সে তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

৩৬. *ইত্তেফাক*, ৬ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ১০; পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আইনসভার আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতাও পদাধিকার বলে বোর্ডের সদস্য। পদটি শূন্য ছিল। অন্যথায় পার্লামেন্টারি বোর্ড হওয়ার কথা ১১ সদস্যবিশিষ্ট। দ্রষ্টব্য তাজউদ্দীন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলি– ১৯৬৯ (পুস্তিকা), গ্লোরী প্রিন্টার্স, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৯

৩৭. *ঐ*, ৭ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ৮

৩৮. রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, *ইত্তেফাক*, ৮ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ১০; *ঐ*, ৯ই জুন ১৯৭০ পৃ. ৫, ৬,৭

৩৯. এ সম্বন্ধে *ইত্তেফাক*-এর ভাষ্য : '৬৯-এর প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের মুখে সামরিক ছাউনীর বন্দী নিবাস হইতে মুক্তি পাইয়া পরদিবসে রেসকোর্স ময়দানের ১০ লক্ষ লোকের যে জনসভায় শেখ মুজিব বক্তৃতা করেন, গতকল্যকার সমাবেশ তাহার কলেবরকেও ম্লান করিয়া দেয়।' *ইত্তেফাক*, ৮ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১

৪০. রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, *ইত্তেফাক*, ৯ই জুন ১৯৭০, পৃ. ৫, ৬, ৭

৪১. *ঐ*

৪২. রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, *ইত্তেফাক*, ৯ই জুন ১৯৭০, পৃ. ৭

৪৩. *ঐ*, পৃ. ৬

৪৪. *ঐ*, ৮ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১

www.pathagar.com

অধ্যায় : দশ

স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম কাউন্সিল ১৯৭২ : দেশ গড়ার সংগ্রাম

১৯৭০ সালের পর ১৯৭২ সালের ৭-৮ই এপ্রিল দুদিনব্যাপী আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] এটি ছিল স্বাধীনতা-উত্তর দলের প্রথম কাউন্সিল। রাজধানী ঢাকা শহরের কাকরাইলস্থ আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে নির্মিত প্যান্ডেলে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশে এটি অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এতে সভাপতিত্ব ও এর উদ্বোধন করেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রথম বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন। স্বাধীনতার পরপর অনুষ্ঠিত এ কাউন্সিল আওয়ামী লীগ ও দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পটভূমি

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়, নির্বাচনের ফলাফল নস্যাৎ করতে ভুট্টোর সহযোগিতায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তার ষড়যন্ত্র, 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালিদের ওপর গণহত্যা শুরু (২৫শে মার্চ ১৯৭১), পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা (২৬শে মার্চ ১৯৭১), বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠন (১০ই এপ্রিল ১৯৭১), ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, ১ কোটি মানুষের ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ, পাকিস্তানপন্থি জামায়াত-মুসলিম লীগ ও অন্য দলের রাজাকার আলবদর আলশামস ইত্যাদি বাহিনী গঠন এবং পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও বাঙালি হত্যায় শামিল হওয়া, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালির শহিদ হওয়া, ২ লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রম হারানো, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, স্বাধীনতার পরও অসংখ্য মানুষের হাতে অবৈধ অস্ত্র–এমনই এক পটভূমিতে আয়োজিত হয় আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচির পক্ষে গণম্যান্ডেট লাভ করে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি (১৬২টি এলাকাভিত্তিক+৭টি মহিলাদের জন্য) আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন (১৬০+৭) ও শতকরা ৭২.৫৭ ভাগ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করে। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি নির্বাচনে ৮৮টি আসন (৮৩টি এলাকা ভিত্তিক+৫টি মহিলা) ও শতকরা ৪২.২ ভাগ ভোট লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয় হয়।[২] তবে আওয়ামী লীগ ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি কোনো দলই দেশের

www.pathagar.com

অপর অংশে কোনো আসন লাভ করতে সমর্থ হয়নি। নির্বাচনের এ ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিভক্তিকে স্পষ্ট করে তোলে। নির্বাচনের পরপর বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, ৬-দফা এখন জনগণের সম্পত্তি এবং এর ওপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হবে। নির্বাচনের কয়েকদিনের মধ্যে (৩রা জানুয়ারি ১৯৭১) তিনি আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের রেসকোর্স ময়দানে শপথ বাক্য পাঠ করান এবং উল্লেখ করেন যে, ৬-দফার দাঁড়ি, কমাসহ কোনো কিছুই পরিবর্তন করা হবে না। শুরু হয় পাকিস্তানের রাজনীতির সেই পুরানো খেলা–নির্বাচনের ফল ও গণতন্ত্র নস্যাৎ-এর ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রে ভুট্টো ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার সঙ্গে হাত মেলান। কার্যত এ ছিল বাঙালিদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা শাসক হোক, কিছুতেই তারা তা মেনে নিতে পারছিল না। তাই পাকিস্তানের শুরু থেকেই তারা এ ব্যাপারে ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি নানা উপায়, ফন্দি অবলম্বন করতে থাকে।

এ-রকম অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কোনোরূপ পূর্ব আলাপ ছাড়াই ৩রা মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন, যা ২-২৫শে মার্চ পর্যন্ত চলে। এখানে পাকিস্তানি শাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ সবাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলে। তিনিই হয়ে ওঠেন পূর্ব পাকিস্তানের কার্যত সরকার প্রধান।[৩] এরই মধ্যে ইয়াহিয়া ও ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। ঐ আলোচনা ছিল নিতান্ত লোক-দেখানো ও কালক্ষেপণের কৌশল। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের ওপর সামরিক আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ। মাঝে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সৈন্য এখানে নিয়ে এসে মোতায়েন করা হয়। বঙ্গবন্ধুও ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার এ হীন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা শুরুর পূর্বেই ৭ই মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসমুদ্রে তিনি ভাষণ রাখেন, ৭ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ। এ ছিল এক ক্রান্তিকালে মুক্তিকামী বাঙালি জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণ। ১৮ মিনিটের এ ভাষণে পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসন-শোষণ ও বাঙালিদের বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরে এ থেকে জাতীয় মুক্তির চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন :

> ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাআল্লাহ।... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

এদিকে সকল সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় নির্বিচার গণহত্যা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে বন্দি করে রাখা হয়। গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি ওয়্যারলেস বার্তার মাধ্যমে সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু

www.pathagar.com

হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালির ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১০ই এপ্রিল আওয়ামী লীগের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিবৃন্দের পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণা' দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য সৈয়দ নজরুল ইসলামেকে উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি), আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় পরিষদ সদস্য তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং অপর তিনজনকে[৪] অন্তর্ভুক্ত করে ৬-সদস্যবিশিষ্ট প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়, যা 'মুজিবনগর সরকার' নামে সর্বাধিক পরিচিত।

মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, এর জনগণ ও মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সরকার বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দেয়। শেষের দিকে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে ভারত সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সর্বদিক বিচারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ। তাই বিশ্ব সম্প্রদায়, গণমাধ্যম ও বিশ্বজনমত এর প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে অধুনাবিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘ ও এর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত দেশসমূহের সমর্থনও বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি নানাভাবে বিশেষ করে কূটনৈতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সংগ্রামে সহায়তা করে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন ও চীন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল দেশের সর্বস্তরের জনগণের যুদ্ধ। জামায়াত, মুসলিম লীগ ও এরূপ কিছু পাকিস্তানপন্থি দল ছিল এর ব্যতিক্রম। এসব দলের নেতা-কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে। তথাকথিত শান্তি কমিটি, রাজাকার বাহিনী, আলবদর, আলশামস ইত্যাদি গঠন করে তারা হানাদারদের গণহত্যায় শামিল হয়। লক্ষ লক্ষ ঘর-বাড়ি আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে। মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে এ দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও কৃতী সন্তানদের বেছে বেছে নিয়ে বধ্যভূমিতে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করে। এভাবে এরা সংঘটিত করে মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম যুদ্ধাপরাধ।

বাংলাদেশের ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ ছিল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ—১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট জেনারেল নিয়াজীর নেতৃত্বে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যার সফল সমাপ্তি ঘটে এবং বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়। এ যুদ্ধে ৩০ লক্ষ লোক শহিদ হন। ২ লক্ষাধিক মা-বোন সম্ভ্রম হারান। ১ কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে। দেশের অভ্যন্তরে বাস্তুচ্যুতির সংখ্যা কয়েক কোটি। অনেক মুক্তিযোদ্ধা চিরতরের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেন। প্রায় সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমুদ্রবন্দর হয় ধ্বংস না হয় সম্পূর্ণ ব্যবহার-অনুপযোগী হয়ে পড়ে। স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, খাদ্যগুদাম, হাটবাজার, ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভের অবস্থা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। খাদ্য গুদাম অবশিষ্ট ছিল, তাতে মজুত বলতে কিছুই ছিল না।

www.pathagar.com

এক কথায়, সমগ্র বাংলাদেশ ও এর অর্থনীতি এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। জাতিসংঘের এক হিসাব মতে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণই ছিল প্রায় ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী পর্যন্ত করা হয়েছিল। অপরদিকে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। মুক্তিযুদ্ধকালে ব্যবহৃত অস্ত্র সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। সংক্ষেপে, এসব অস্ত্র উদ্ধার, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন, ১ কোটি শরণার্থী, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত, সম্ভ্রমহারানো নারী—এদের পুনর্বাসন, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণ, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা মোকাবেলা, অর্থনীতি সচল করা ইত্যাদি ছিল মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বড় চ্যালেঞ্জ। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকাঠামো তখন ছিল না বললেই চলে। এসব প্রায় শূন্য থেকে গড়ে তুলতে হয়। এমনই এক পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের তিন সপ্তাহ পর ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে ফাঁসির আদেশ মাথায় নিয়ে বন্দি থাকা অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এর ২ মাস ৬ দিন পর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন।

কাউন্সিল অধিবেশন

৭ই এপ্রিল ১৯৭২ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ১৪০০ কাউন্সিলর, ২ হাজার ৬ শত ডেলিগেটস ও বহু অতিথির উপস্থিতিতে কাকরাইলে নির্মিত প্যান্ডেলে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়।[৫] এ উপলক্ষে তৈরি মঞ্চটি নানাভাবে সজ্জিত করা হয়। মঞ্চের পশ্চাতে একটি বৃহদাকার রক্তিম সূর্য, সাদা শাপলা, শান্তির কপোত এবং একটি নৌকা শোভা পায়। এছাড়া মঞ্চে শিল্পীর হাতে আঁকা বঙ্গবন্ধুর একটি বিরাট প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। অতিথিদের সারিতে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ (সভাপতি, ন্যাপ), কমরেড আবদুস সালাম ওরফে বারিন দত্ত (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি) ও যুগোশ্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক ঐক্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক।[৬] দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। শিল্পী ছিলেন আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ ও অন্যরা। অধিবেশনের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং স্বাধীনতার সংগ্রামে যেসব ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, নারী, দলের নেতা, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি শহিদ হয়েছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৭] এরপর দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন।

তাজউদ্দীন আহমদ-এর রিপোর্ট

কাউন্সিলে তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলির বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে : ১৯৭০ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত দলের বিগত কাউন্সিলের পটভূমি, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত, ঐ নির্বাচনকে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের জন্য ৬-দফার ওপর 'গণভোট' হিসেবে পরিগণিত করা, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা, ৭০-এর নভেম্বরে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ ও ইয়াহিয়া সরকারের ঔদাসীন্য, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয়, ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনা সম্বন্ধে ঢাকায় ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো আলোচনা, বঙ্গবন্ধুর আহ্বান উপেক্ষা করে ভুট্টোর পরামর্শ অনুযায়ী ৩রা মার্চ ঢাকায় ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান, ভুট্টোর আকস্মিকভাবে পরিষদ বর্জনের হুমকি, ৬-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আওয়ামী লীগের ৩০ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন ও এর কাজের অগ্রগতি, এ বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে ১লা মার্চ পূর্বাণী হোটেলে কমিটির বৈঠক এবং একই সময়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ স্থগিত ঘোষণা, ইয়াহিয়া খানের এ ঘোষণার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও ধর্মঘট পালন, বঙ্গবন্ধুর শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের আহ্বান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল আহসানকে অপসারণ, ৩রা মার্চ ছাত্রদের আয়োজিত পল্টনের জনসভা থেকে বঙ্গবন্ধুর 'শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের' কর্মসূচি ঘোষণা, অসহযোগ আন্দোলনকালে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতো পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত হওয়া, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে ৬ই মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান, একইদিন জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা, হাইকোর্টের বিচারপতির তাকে শপথ পড়াতে অসম্মতি, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও 'এবারের সংগ্রাম [আমাদের] মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণা, ১৬-২৪শে মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন দফায় ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো ও তাঁদের সহযোগী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা, আলোচনায় যেসব বিষয়ে মতৈক্য হয় তার উল্লেখ,[৯] ১৯শে মার্চ জয়দেবপুরে পাকিস্তানি সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে জনতার প্রথম প্রতিরোধ ও হতাহতের ঘটনা, স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুর ওপর ছাত্র সমাজের অব্যাহত চাপ, ২৩শে মার্চ স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগ ও আহ্বানে সর্বত্র স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, দায়িত্বশীল দল হিসেবে আওয়ামী লীগের 'অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ', সোয়াত জাহাজ থেকে জোর করে পাকিস্তানি সেনাদের অস্ত্র খালাসের চেষ্টা, ২৫শে মার্চ অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান রচনার জন্য সরকার ও আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের মধ্যে চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠানের পূর্ব সিদ্ধান্ত, আলোচনার কোনোরূপ সমাপ্তি ঘোষণা না করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার রাতে গোপনে ঢাকা ত্যাগ, ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের ঘাতক সেনাদের আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, বস্তি ও সাধারণ মানুষের ওপর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার, ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ২৬শে মার্চ রাতের ভাষণে আওয়ামী লীগকে বেআইনি ঘোষণা, কুর্মিটোলা সেনানিবাস, পিলখানা ইপিআর সদর দপ্তর ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে সশস্ত্র বাঙালি সৈনিক ও সদস্যদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক বেতার মারফত বঙ্গবন্ধুর পক্ষে 'স্বাধীনতার ঘোষণার প্রচার', বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা

www.pathagar.com

ঘোষণার কথা জেনে বাংলার সর্বত্র মানুষের 'দুর্জয় প্রতিরোধ' গড়ে তোলা, তিনদিনে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ করতলগত করার পাকিস্তানি সামরিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়া, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর (তাজউদ্দীন আহমদ) বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা, বাংলাদেশকে কয়েকটি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য দায়িত্ব অর্পণ, ১৮ই এপ্রিল কর্ণেল এম এ জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ, বেসামরিক তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট পত্র প্রেরণ, ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের প্রকাশ্য সভায় শপথ গ্রহণ, বুদাপেস্ট আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন ও জাতিসংঘে প্রতিনিধি প্রেরণ, জনমত সৃষ্টি ও অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে প্রবাসী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তরুণ ও ছাত্র সমাজের বিপুল সংখ্যায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের বিশেষ ভূমিকা, পাকিস্তানি অধিকৃত এলাকার লোকজনদের চরম ঝুঁকি নিয়েও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিশেষ ভূমিকা, বিশ্বমতকে 'বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে' টিক্কা খানের বদলে একজন বেসামরিক ব্যক্তিকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে নিয়োগ, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সদস্যপদ বাতিল করে তদস্থলে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে 'বশংবদ ব্যক্তিদেরকে' সদস্য করা, একটি তাঁবেদার মন্ত্রিসভা গঠন, মুক্তিযোদ্ধা ও সশস্ত্র বাহিনীর একের পর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল শত্রুমুক্ত করা, দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মুজিবনগর সরকারের পরামর্শ কমিটি গঠন (৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১), আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাপ্তাহিক *জয়বাংলা* পত্রিকা প্রকাশ ও পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনবার (৫-৬ই জুলাই, ২০-২১শে অক্টোবর ও ২৭-২৮শে অক্টোবর) আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা ও এসব সভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মুক্ত অঞ্চলে বেসামরিক প্রশাসন, আওয়ামী লীগের মুষ্টিমেয় সদস্যের চরম বিশ্বাসঘাতকতা, পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে আবেদন এবং এ ব্যাপারে জনমত গঠন, বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর বিচার অনুষ্ঠানের প্রতিবাদে বিভিন্ন দূতাবাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদলিপি প্রেরণ, বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার ব্যাপারে ভারত ও অধুনাবিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের কার্যকর ভূমিকা পালন, এক কোটি শরণার্থীর আশ্রয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও নেতাদের কাছে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের ব্যাখ্যা, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নৈতিক সমর্থন ও 'উপকরণগত সাহায্য' যোগান ইত্যাদি ব্যাপারে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সরকারের নিকট থেকে 'সবচেয়ে বেশি সাহায্য লাভ', ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি (৯ই আগস্ট ১৯৭১), বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়নের তিনবার ভেটো প্রয়োগ, সমাজতান্ত্রিক দেশ, কানাডা, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সহযোগিতা দান, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির হতাশাব্যঞ্জক ভূমিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে সমর্থন ও অস্ত্র সাহায্য প্রদান, মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ পর্যায়ে জাতিসংঘে চীনের বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

www.pathagar.com

বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ, বাংলাদেশের অনুকূলে প্রচারণায় বিশ্ব গণমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী, জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা, যুদ্ধের শেষদিকে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ ও ভারতের সরাসরি যুদ্ধে যুক্ত হওয়া, ভারত সরকার কর্তৃক স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি, ভারতীয় সৈন্যদের 'মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে রক্তদান করে' বাংলাদেশকে শত্রু মুক্ত করা, ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়া, এর পূর্ব-মুহূর্তে 'সামরিক চক্রের সাহায্যকারী ফ্যাসিস্ট বদরবাহিনীর হাতে' বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে নিহত হওয়া, ২২শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন, পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশে আগমন, ১২ই জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের পুনর্গঠন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর রাষ্ট্রপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ, বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে ১৭-১৮ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মন্ত্রীদের আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা পদে না থাকার সিদ্ধান্ত, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নতুন সাংগঠনিক কমিটি গঠন করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ, ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন, নতুন রাষ্ট্র ও এর সরকারের সম্মুখে নানা সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ, দেশের পুনর্গঠন, আওয়ামী লীগের বিঘোষিত নীতি অনুযায়ী অর্থনীতির নবরূপায়ণ, 'সামজতন্ত্রই আমাদের লক্ষ্য। আর এই সমাজতন্ত্র কোনো লোক-দেখানো ব্যাপার হবে না, এ হবে সত্যিকার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' এ ঘোষণা প্রদান, ব্যাংক, বিমা, পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃহত্তর অংশের জাতীয়করণ, কৃষিযোগ্য জমি ও শহরের সম্পত্তির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, বেতনের ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য দূর, কল্যাণকর শ্রমনীতি, গণমুখী শিক্ষা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে অভিযান, নতুন সমাজ গঠন, বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সহায়তায় পুনর্বাসন ও খাদ্য আমদানি, পাকিস্তান থেকে সকল বাঙালিকে ফিরিয়ে আনা, 'আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করতে পারে' এমন কোনো সাহায্য গ্রহণ না করা, 'গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ ও যুদ্ধজোটের' বাইরে থাকার পররাষ্ট্রনীতি, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সকল মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে একাত্মতা, 'অর্থনৈতিক মুক্তি' ও 'সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম'-কে আওয়ামী লীগের গুরু দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিতকরণ, জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে নিম্নতম পর্যায় থেকে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে নতুন করে গড়ে তোলা, মানুষের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করা, 'দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে সহনশীলতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে' মর্মে বক্তব্য, অর্থপূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, 'অর্থনৈতিক মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব প্রতিরোধ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে' দায়িত্ব পালনে দেশপ্রেমিক সকল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির প্রতি আহ্বান, 'বাংলাদেশকে আমরা সত্যিকার সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে পারব' এ আশাবাদ ব্যক্ত করা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ[১০]

কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত খোলামেলা ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন, যা সদ্য স্বাধীন দেশ ও আওয়ামী লীগ দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে কাউন্সিলরদের উদ্দেশে মূল আহ্বান ছিল : 'দেশ গড়ার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন।' অন্য যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ রাখেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে : জাতীয়তাবাদের আদর্শ, সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন, দেশ গড়ার কঠিন সংগ্রাম, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি, কর্মীদের লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থাকার আহ্বান, নেতা-কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের প্রতি দেশ গড়ার কাজে আত্মবিসর্জনের উপদেশ, দলীয় কর্মীদের 'অবিলম্বে গ্রামে গিয়ে দুঃখী মানুষের পাশে থেকে তাদের সেবা করার' আহ্বান, এমপিদের 'সেক্রেটারিয়েটে বেশি ঘোরাঘুরি' না করার আহ্বান, আওয়ামী লীগকে নতুন করে গড়ে তোলা, দলীয় কর্মী ও নেতাদের আত্মকলহ-কোন্দল পরিহার এবং 'আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ভুলত্রুটি সংশোধন করতে' উপদেশ, দল ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক, বিরোধী দলে থাকা ও সরকারে থাকার মধ্যে পার্থক্য, ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, দলের নেতা-কর্মী ও জাতীয় পরিষদ সদস্যদেরকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সতর্ক করা, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো', শোষণহীন সমাজ কায়েমের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান, আওয়ামী লীগ সরকারের চার মূল নীতি, গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার, স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্য যেসব দল ও সংগঠন সহযোগিতা করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের দেশে ফিরিয়ে আনা, খুনি, লুটেরা ও নারী ধর্ষণকারী পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচারের অঙ্গীকার, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান ও ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর প্রতি আহ্বান, রাজাকারদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মী ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান, সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা, জমির সর্বোচ্চ সিলিং একশত বিঘায় নির্ধারণ, প্রত্যেক ইউনিয়নে ন্যায্য মূল্যের সমবায় দোকান খোলা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস না করা হলে ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স বাতিল, অবৈধভাবে দখলকৃত গাড়ি ও বাড়ি ফেরত দানের নির্দেশ অন্যথায় জেলে যেতে হবে বলে হুঁশিয়ারি, প্রত্যেক মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন ইত্যাদি।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। জাতীয়তাবাদের মূলনীতি ও একে ভবিষ্যতেও ধারণ করার আবশ্যকতা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, 'জাতীয়তাবাদ আমাদের আদর্শ। ইহা স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্র এবং এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি।... আমাদের এই জাতীয়তাবোধ জিয়াইয়া রাখিতে হইবে।'[১১] তাঁর সরকারের মূলনীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে বলেন, '... সরকারের মূলনীতি ও স্তম্ভ হইল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। এই নীতির ভিত্তিতেই আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালিত হইবে।'[১২] উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর এ নীতি ও আদর্শই স্বাধীন

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ৭২-এর সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল, 'সরকারের পররাষ্ট্রনীতি হইল স্বাধীন, সক্রিয় নিরপেক্ষতা, সকলের সহিত বন্ধুত্ব, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ এবং যুদ্ধচুক্তিবিরোধী। বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সর্বদা সাহায্য করিবে।'[১৩] বঙ্গবন্ধুর এ নীতিগত ঘোষণা ৭২-এর সংবিধানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত হয়। নতুন রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করার আহ্বান জানানোর পর তাদের সতর্ক করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তাহাদের মানসিকতার পরিবর্তন করিতে হইবে। আমলাতন্ত্রীদের মনোভাব পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা এ সুযোগ গ্রহণ করিয়া মানসিকতা পরিবর্তনপূর্বক এদেশের মানুষের সেবক হিসাবে কাজ করিতে ব্যর্থ হইলে হুক্কার খোল-কলিকা সবই বদলাইতে হইবে।'[১৪] গণপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে খোলামেলা কথা বলতেও বঙ্গবন্ধু দ্বিধা করেননি, 'আপনারা তিন চার লক্ষ লোকের প্রতিনিধি। আপনাদের অগাধ সম্মান। আপনারা সেই সম্মান রাখার চেষ্টা করবেন– সেক্রেটারিয়েটে বেশী ঘোরাঘুরি করবেন না।...শহরে আপনাদের দেখতে চাই না, আপনারা জনগণের প্রতিনিধি সে কথা মনে রেখে কাজ করবেন।'[১৫] বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের 'স্বাধীনতা অর্জন করা কষ্টকর, কিন্তু রক্ষা করা আরও কষ্টকর'[১৬] একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের চেয়েও 'অধিক ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব' নিয়ে দেশগড়া ও মানুষের সার্বিক মঙ্গলের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম, দেশবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম।'[১৭] বঙ্গবন্ধু এও বলেন, 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।' শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্যই আওয়ামী লীগের জন্ম। এ লক্ষ্য থেকে কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না।'[১৮] উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের বাংলাদেশে একসময় বামপন্থি হিসেবে পরিচিত দলগুলোর অনেকেই যখন শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আদর্শ থেকে সরে এসেছে, তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঐ আদর্শকে ধারণ করে শোষিত, বঞ্চিত, অসহায় তথা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের ২৪ বছরের মধ্যে ১৯৫৬-১৯৫৮ এ সময়ে দেড় বছরের মতো পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সরকার এবং ১৯৫৬-১৯৫৭ এ সময়ে একবছর এক মাস পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন ছাড়া বাকি সকল সময় আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থেকে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের ভার এবার আওয়ামী লীগের স্কন্ধে। নিঃসন্দেহে এ ছিল কঠিন দায়িত্ব। বিরোধী দলের ভূমিকা এবং সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন এ দুয়ের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, সে সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধু খুবই সচেতন ছিলেন। বিষয়টি আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যখন তিনি নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'বিরোধী দলে থেকে সংগ্রাম করা এক কথা কিন্তু ক্ষমতায় থেকে জাতিকে দেশ গঠনের পথে

www.pathagar.com

পরিচালনা করা সম্পূর্ণ আলাদা দায়িত্ব।'[১৯] অনুরূপভাবে দল ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, 'এই সরকার আওয়ামী লীগের সরকার। ইহা সরকারের আওয়ামী লীগ নহে।' বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে সর্বদা দল বা সংগঠনের গুরুত্বকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। তাঁর এ বক্তব্য দ্বারাও তিনি মূলত সরকার থেকে দলের স্বাতন্ত্র্য ও সরকারের ওপর দলের প্রাধান্যের কথাই বুঝাতে চেয়েছেন।

কাউন্সিলে গৃহীত দলের নতুন ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি

কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তির দিন আওয়ামী লীগের নতুন ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি গৃহীত হয়। এটি পেশ করেন ড. কামাল হোসেন। এর প্রধান দিকসমূহ ছিল নিম্নরূপ:[২০]

১. ঘোষণাপত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ইপিআর সদস্য অংশগ্রহণ করেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এতে আরও বলা হয় যে, একযুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং দেশ গঠনের সংগ্রাম শুরু হয়েছে। কুটিরশিল্প, কল-কারখানা চালু, বেকার ও বুভুক্ষু জনতার পুনর্বাসন এবং শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছিল, অনুরূপভাবে দেশগড়ার সংগ্রামেও তারা আওয়ামী লীগের পাশে দাঁড়াবে, ঘোষণাপত্রে এ আশাবাদ ব্যক্ত।

২. শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি : জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র—এ চারটি আদর্শই হবে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি।

৩. নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ : প্রত্যেক নাগরিকের জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদাসমূহ যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং যুক্তিসংগত বেতন মজুরির দায়িত্ব হবে রাষ্ট্রের।

৪. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা : ঔপনিবেশিক শাসন আমলের প্রশাসন ব্যবস্থার স্থলে গতিশীল গণমুখি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৫. নিরক্ষরতা দূরীকরণ : এ জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬. উচ্চ শিক্ষার বিস্তার : উচ্চ শিক্ষার চাহিদা মেটাতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

৭. বেতন বৈষম্য দূর : সাবেক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক চাকরির বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ।

৮. নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য প্রশিক্ষণ : সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা আওয়ামী লীগের পুরানো নীতি। নতুন এ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা লাভ ও তা গড়ে তুলতে দলের কর্মী এবং সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

৯. মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা : এটি আওয়ামী লীগের পুরানো নীতি। এটি কার্যকর করতে প্রচেষ্টা গ্রহণ। জেলার শাসনভার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর ন্যস্ত করা।

১০. অর্থনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আত্মনির্ভরশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ।

www.pathagar.com

১১. জাতীয়করণ ও সরকারি নীতি : গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলোকে জাতীয়করণ করে সরকারি পরিচালনাধীনে আনা। প্রয়োজন মোতাবেক অন্য শিল্প ইউনিটগুলোকেও জাতীয়করণ করা।

১২. আয়কর ব্যবস্থা : এর মৌলিক পরিবর্তন সাধন।

১৩. কর ও জমির খাজনা মওকুফ : সকল বকেয়া কর ও কৃষকদের ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ।

১৪. প্রত্যেক ইউনিয়নে ন্যায্যমূল্যের দোকান : প্রতিটি ইউনিয়নে সমবায় ভিত্তিতে একটি করে ন্যায্যমূল্যের দোকান স্থাপন এবং সেখান থেকে চাল, গম, তেল ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা।

১৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর : বাধ্যতামূলকভাবে আয় সীমিতকরণের জন্য নতুন করনীতি প্রবর্তন। বিলাসদ্রব্য ও বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ বন্ধ।

১৬. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা : পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, গ্রামীণ কুটির শিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধন করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

১৭. শিল্পের উন্নয়ন : নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ও মৌলিক দ্রব্যের জন্য শিল্পের উন্নতি সাধন। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে, বিশেষ করে তাঁত শিল্পকে সমবায়ের মাধ্যমে কাঁচামাল সরবরাহ ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা।

১৮. কৃষি ব্যবস্থা : প্রত্যেক পরিবারের জন্য একশ বিঘা পর্যন্ত জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ। কৃষকরাই যাতে জমির প্রকৃত মালিক হতে পারে তার ব্যবস্থা। সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে থানা ও ইউনিয়ন ভিত্তিতে কৃষি ভান্ডার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা। কৃষি ব্যবস্থার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ।

১৯. কৃষিজাত দ্রব্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন : আওয়ামী লীগের কর্মসূচি অনুযায়ী পাট, আখ, তামাক, চা, বনজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, মৎস্য চাষ, ফলের চাষ, গৃহপালিত পশু ও ডেয়ারি ফার্ম, বিদ্যুৎ শক্তি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা, নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির উন্নতি বিধানে বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

২০. শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যবস্থা : শ্রমিকদের উপযুক্ত বাসস্থান, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা, অসুস্থ শ্রমিকের বাৎসরিক এক মাসের বেতনসহ ছুটির সুবিধা ও ন্যায্যমূল্যের দোকান হতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা।

২১. মহিলাদের মর্যাদা ও অধিকার : মহিলাদের পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার প্রদান।

২২. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ : অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থান ও কল্যাণের ব্যবস্থা।

২৩. ভাষা নীতি : ভাষা ও সাহিত্যকর্মকে গণমুখী করে তোলা।

২৪. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা : প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

২৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সেতু নির্মাণ : যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণে গুরুত্বারোপ। এছাড়া কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদীসমূহের ওপরও সেতু নির্মাণ করা।

২৬. শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও নিরস্ত্রীকরণ নীতি : 'সকলের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব এবং কারও প্রতি বৈরী মনোভাব নয়' এ মূল নীতির ভিত্তিতে সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ ও 'পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণে'র জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা।

কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাব

আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের শেষ দিনের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বিভিন্ন বিষয়ে কতগুলো প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলো হলো :[২১]

১. শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন : সকল শহিদ ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা।

২. বীরাঙ্গনাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁদের পুনর্বাসন : মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে বন্দি অবস্থায় দখলদার সৈন্য ও তাদের এদেশীয় দোসরদের দ্বারা পাশবিক নির্যাতনের শিকার সম্ভ্রম হারানো নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও তাঁদের সম্মানজনক সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।

৩. জাতীয় পুনর্গঠনে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মনিয়োগ : সরকারের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে জাতীয় পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আত্মনিয়োগের আহ্বান।

৪. সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা : বর্তমানের শোষণ, অবিচার, দুর্নীতি, কালোবাজারি এবং অন্যান্য সামাজিক অপরাধের মূলোচ্ছেদ করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠনের সংগ্রাম অব্যাহত রাখা।

৫. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি : বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আশাবাদ।

৬. ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা : ঔপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ এবং শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বের যে-কোনো অঞ্চলের জনগণের সংগ্রামের প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন ও সহানুভূতি এবং যে-কোনো জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের সমর্থন।

৭. বাংলাদেশ-ভারত ও ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি : বাংলাদেশ-ভারত ও ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির (যথাক্রমে ১৯শে মার্চ ১৯৭২ ও ৯ই আগস্ট ১৯৭১) প্রতি অভিনন্দন এবং এ চুক্তি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ও দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে মর্মে আশাবাদ।

www.pathagar.com

৮. বিশ্বের জনমত ও সংবাদপত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা : সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বের যে সমস্ত দেশ, জনগণ এবং সংবাদপত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন দান করেছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এ ক্ষেত্রে ভারতের জনগণ, সরকার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। বাংলাদেশ, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সম্বন্ধে আশাবাদ।

৯. পাকিস্তানে আটক ও অবস্থানরত বাঙালিদের দেশে ফেরত আনা : পাকিস্তানে আটক ও অবস্থানরত বাঙালিদের প্রতি সে দেশের সরকারের বিরূপ আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাদের অবিলম্বে ফেরত দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আবেদন। এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রতি আহ্বান।

১০. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার : বাংলাদেশে বিভিন্ন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জোর দাবি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্ন ও পাকিস্তানে আটক নিরীহ বাঙালিদের স্বদেশে ফেরত দানের প্রশ্নকে এক করে না দেখার আহ্বান।

১১. রাজাকার ও দালালদের বিচার : স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যে সমস্ত রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং শান্তি কমিটির সদস্য দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের শাস্তি প্রদানের জোর দাবি।

১২. দুষ্কৃতিকারী ও চরমপন্থিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ : যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারী, দালাল, চরমপন্থি এবং তথাকথিত অতিপ্রগতিবাদী সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান।

দলের নয়া গঠনতন্ত্র

দলের পুরানো গঠনতন্ত্রের মূল কাঠামো ঠিক রেখে পরিবর্তিত সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য, চেতনা ও আদর্শ বিবেচনায় রেখে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে সংগঠনের জন্য ৫৬ অনুচ্ছেদ যুক্ত নতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। নতুন এ গঠনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে :[২২]

১. দলের নাম পরিবর্তন : আনুষ্ঠানিকভাবে দলের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ' নাম গ্রহণ।

২. সদস্য পদ : আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়স্ক বাংলাদেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর ও দ্বি-বার্ষিক ২৫ পয়সা চাঁদা প্রদান করে সদস্য পদ লাভের যোগ্য হবেন।

৩. নতুন আদর্শ সংযোজন : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এ চারটি মূল আদর্শকে গঠনতন্ত্রে সংযোজন।

www.pathagar.com

৪. শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম : শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমকে আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করে তা সংশোধিত গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা।

৫. দল ও সংগঠনের মধ্যে প্রভেদ বজায় রাখা : আওয়ামী লীগের পুরানো গঠনতন্ত্রের দল ও সংগঠনের মধ্যে প্রভেদ রক্ষার বিধান নতুন গঠনতন্ত্রেও অপরিবর্তিত রাখা (অনুচ্ছেদ ৫১)। এর অর্থ দাঁড়ায়, একই সঙ্গে দলের পদ ও সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণে বিধি-নিষেধ আরোপ।

নির্বাচন

বঙ্গবন্ধুর সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচিত হওয়া[২৩]

আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের শেষের দিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চতুর্থবারের মতো সর্বসম্মতিক্রমে দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। বিষয় নির্বাচনি কমিটির পক্ষে এ মর্মে বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন কাউন্সিলে প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। বঙ্গবন্ধু কিছুতেই সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের গুরু দায়িত্ব তাঁকে গ্রহণ করতে হওয়ায় এরপর আওয়ামী লীগের সভাপতির পদের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে তাঁর সময় থাকার কথা নয়। উপরন্তু, দল ও সরকারের মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করার গঠনতান্ত্রিক বিধান ১৯৫৫ সাল থেকে চলে আসছিল।[২৪] স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দলের প্রথম ওয়ার্কিং কমিটির সভায়ও তা অটুট রাখার সিদ্ধান্ত হয়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে পদে না থেকেও আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠিত ও সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর দলকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দানের কথা ঘোষণা করে তাঁকে সভাপতির পদ থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য কাউন্সিলরদের প্রতি আহ্বান সত্ত্বেও, তা কাউন্সিলের মতকে পাল্টাতে পারেনি। কাউন্সিলের অভিমত ছিল, 'জাতীয় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে' দলের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব অপরিহার্য। অতঃপর কাউন্সিলের বিশেষ অনুরোধে আওয়ামী লীগের পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত তিনি সভাপতি পদ গ্রহণে সম্মত হন। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা ও বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ধারায় কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন হবে না মর্মে কাউন্সিল অভিমত ব্যক্ত করে।

বঙ্গবন্ধুর ওপর সাংগঠনিক কমিটি গঠনের দায়িত্ব অর্পণ

একই কাউন্সিল অধিবেশনে অপর এক প্রস্তাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্য একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠনের পূর্ণ ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর ওপর অর্পণ করা হয়। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠিত করার জন্য কাউন্সিল অধিবেশনের কয়েক দিনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিল কর্তৃক তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ববলে ৪৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন। কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিম্নরূপ :[২৫]

সভাপতি	:	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সহ-সভাপতি	:	কোরবান আলী

www.pathagar.com

		জহিরুল কাইয়ুম
		মো. আব্দুর রহিম
সাধারণ সম্পাদক		জিল্লুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাবেক বাহিনী প্রধান	:	আব্দুর রাজ্জাক
প্রচার সম্পাদক	:	সরদার আমজাদ হোসেন
সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	মুস্তাফা সারওয়ার
দপ্তর সম্পাদক	:	আনওয়ার চৌধুরী
কৃষি সম্পাদক	:	আব্দুর রউফ
শ্রম সম্পাদক	:	রুহুল আমিন ভূঁইয়া
মহিলা সম্পাদিকা	:	বেগম সাজেদা চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ	:	আবদুল মোমিন

সদস্যবৃন্দ : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ফণীভূষণ মজুমদার, জহুর আহমেদ চৌধুরী, দেওয়ান ফরিদ গাজী, রফিকউদ্দীন ভূইয়া, শামসুদ্দীন মোল্লা, রওশন আলী, গাজী গোলাম মোস্তফা, মইনুদ্দিন আহমেদ, নূরুল হক, এ কে মুজিবর রহমান, নুরুল ইসলাম মঞ্জু, সালাউদ্দিন ইউসুফ, আবদুল মমিন তালুকদার, আবুল কাশেম, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে এম ওবায়দুর রহমান, আজিজুর রহমান আক্কাস, আবদুল হান্নান, শেখ ফজলুল হক মনি, লুৎফর রহমান (রংপুর), আবদুল মান্নান (শ্রমিক লীগ), তোফায়েল আহমেদ, শামসুর রহমান খান, ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল, রাফিয়া আখতার ডলি।

স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল খুবই গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তখন দেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি দলের পুনর্গঠনও আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। যে কারণে দলের ওয়ার্কিং কমিটির পরিবর্তে ৪৪ সদস্যবিশিষ্ট অর্গানাইজিং বা সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শুরু করে যে আওয়ামী লীগকে বঙ্গবন্ধু তিলে-তিলে গড়ে তুলেছেন, সংগঠনের কর্মীদের বলতেন 'আমার সহোদর' এবং যে সংগঠনের জন্য ১৯৫৭ সালে মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত ত্যাগ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি, বঙ্গবন্ধু আলোচ্য কাউন্সিলে সেই দলের সভাপতির পদ থেকে নিজেকে অব্যাহতিদানের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। দেশ ও দল উভয়ের প্রয়োজনেই তাঁকে নিজ ইচ্ছার বিপরীতে কাউন্সিলরদের বিশেষ অনুরোধে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য হলেও আওয়ামী লীগ প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর মনের অভিব্যক্তি কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের মধ্যেই ফুটে ওঠে, 'প্রধানমন্ত্রীর পদ তাঁর কাছে কিছুই নয়। কারণ, জনসাধারণ তাঁকে বঙ্গবন্ধু ও জাতির পিতা হিসেবে অভিহিত করে।'[২৬]

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. *ইত্তেফাক*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১, ৭, ৮; *আজাদ*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১, ৮

২. ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩১০টি আসনের (৩০০ এলাকাভিত্তিক+১০টি মহিলা) মধ্যে ২৯৮টি আসন (২৮৮+১০) আসন ও শতকরা ৮৯ ভাগ ভোট লাভ করে।

৩. বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি পরিণত হয় বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের অনুরূপ। লন্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক *Evening Standard* পত্রিকার ভাষায় :

'Sheikh Mujibur Rahman now appears to be the real boss of East Pakistan, with the complete support of the population ...Rahman's home in Dhanmondi, already known as Number 10 Downing Street in imitation of the British Prime Minister's residence has been besieged by bureaucrats, politicians, bankers, industrialists and poeple from all walks of life.' *Evening Standard*, London, 12 March 1971, p. 10

৪. এঁরা হলেন ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান ও খন্দকার মোশতাক আহমদ।

৫. *ইত্তেফাক*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১

৬. *আজাদ*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১, ৮

৭. *ইত্তেফাক*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৮

৮. সিমিন হোসেন রিমি (সম্পাদিত), *তাজউদ্দীন আহমদ : ইতিহাসের পাতা থেকে*, প্রতিভাস, ২০০০, পৃ. ২১৯-২৩০

৯. সেগুলো হলো : ১) '১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অনুসরণে প্রেসিডেন্টের ঘোষণাবলে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নিয়ে বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে।' ২) 'জেনারেল ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকবেন ও কেন্দ্রীয় সরকার তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।' ৩) 'প্রদেশসমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে।' ৪) 'জাতীয় পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যেরা প্রথমে পৃথকভাবে মিলিত হবেন, পরে পরিষদের পূর্ণ অর্থাৎ যুক্ত অধিবেশনে সংবিধানের চূড়ান্ত রূপদান করা হবে।' *সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ-এর রিপোর্ট*

১০. বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দ্রষ্টব্য, *ইত্তেফাক*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১, ৭, ৮; *আজাদ*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১, ৭, ৮

১১. *ইত্তেফাক*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৭

১২. *ঐ*

১৩. *ঐ*

১৪. *ঐ*

১৫. *আজাদ*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৭

১৬. *ঐ*

১৭. *ইত্তেফাক*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১

www.pathagar.com

১৮. *আজাদ*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১

১৯. *ঐ*

২০. *ইত্তেফাক*, ১০ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৩; আরও দ্রষ্টব্য জিল্লুর রহমান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঘোষণাপত্র (ম্যানিফেস্টো), ১৯৭২, বুক প্রমোশন প্রেস, ঢাকা ১৯৭২

২১. *ঐ*

২২. দ্রষ্টব্য জিল্লুর রহমান, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র*, ১৯৭২, পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা ১৯৭২; আরও *আজাদ*, ৯ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১

২৩. *ঐ*, পৃ. ১, ৬

২৪. এতে বলা হয়েছিল দলের কোনো কর্মকর্তা একই সঙ্গে মন্ত্রিসভা বা রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

২৫. *আজাদ*, ১৮ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১, ৮

২৬. *আজাদ*, ১০ই এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৯

www.pathagar.com

অধ্যায় : এগারো

সংকট-সন্ধিক্ষণে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৪ : স্বাধীনতা-বিরোধী ও 'ভুয়া বিপ্লবীদের' ষড়যন্ত্র নস্যাৎ এবং 'সোনার বাংলা' গড়ার অঙ্গীকার

১৯৭৪ সালের ১৮-২০শে জানুয়ারি দলের কাকরাইলস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] এটি ছিল সংগঠনের দশম নিয়মিত ও স্বাধীনতা-উত্তর দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশন। এতে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কাউন্সিলে রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন দলের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন গাজী গোলাম মোস্তফা। কাউন্সিলর, ডেলিগেটস, অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও একাধিক বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধি[২] ও কূটনীতিকবৃন্দ এতে যোগ দেন। কাউন্সিল উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু, দলের সাধারণ সম্পাদক ও অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যানের বাণী,[৩] এক মাস পূর্বে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে (১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৩) জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ 'এক যুদ্ধের শেষ আর এক যুদ্ধের শুরু',[৪] সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুস্তাফা সারওয়ার-এর 'পঁচিশ বছরের সংগ্রাম : আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু', ড. নীলিমা ইব্রাহিম-এর 'আবহমান বঙ্গ সংস্কৃতি' ইত্যাদি লেখা নিয়ে পত্রিকায় একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।[৫] দেশের রাজনীতির এক সংকট-সন্ধিক্ষণে এ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রধান দিক হচ্ছে, ২৫ বছর পর এই প্রথম দলের নেতৃত্ব থেকে বঙ্গবন্ধুর বিদায় গ্রহণ। কাউন্সিলে দলের গঠনতন্ত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়।

পটভূমি

১৯৭৪ সালের কাউন্সিলের পূর্বে আওয়ামী লীগ সরকারের সম্মুখে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন-পুনর্বাসন, ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের সে দেশে ফেরত পাঠানো (মার্চ ১৯৭২), পাকিস্তানে আটকেপড়া কয়েক লক্ষ বাঙালিকে দেশে ফেরত আনা, শূন্য অবস্থা থেকে সর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য বৈদেশিক স্বীকৃতি অর্জন, যুদ্ধাপরাধী ও দালালদের বিচার, চীনপন্থি গোপন সংগঠনের সশস্ত্র তৎপরতা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজনৈতিক দল জাসদ (৩১শে অক্টোবর ১৯৭২)-এর হঠকারী কর্মকাণ্ড মোকাবিলা, আরব-ইসরাইল যুদ্ধ (১৯৭৩) ও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে ছিল সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন (১২ই জানুয়ারি ১৯৭২), নতুন রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন (১৯৭২), সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, জাতীয় সংসদ নির্বাচন (৭ই মার্চ ১৯৭৩), ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭২),

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩ পাশ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ত্রি-দলীয় ঐক্যজোট গঠন (১৯৭৩), ২৫ বছর মেয়াদি ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতা চুক্তি (১৯শে মার্চ ১৯৭২) ইত্যাদি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ যে সর্বক্ষেত্রে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল তা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। যুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর নতুন রাষ্ট্রের পুনর্গঠন-পুনর্বাসনের দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের ওপর এসে বর্তায়। দেশজুড়ে আওয়ামী লীগের মতো সংগঠন ও বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী নেতৃত্বের কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাথমিক কঠিন চ্যালেঞ্জসমূহ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, ভৈরব ব্রিজসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতু মেরামত ও পুনর্নির্মাণ, নতুন ফেরি, রেলওয়ে ওয়াগন ও যাত্রীবাহী বগি, বাস, নৌযান ক্রয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম ও চালনা সমুদ্র বন্দরের মাইন অপসারণ ইত্যাদির মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয়। তিন মাসের মধ্যে ব্যাংক, বিমা, বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। ভারতে আশ্রয় নেওয়া ১ কোটি শরণার্থীকে দক্ষতার সঙ্গে পুনর্বাসিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের পরিবার-পরিজনদের আর্থিক সহায়তাদান, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ-বিদেশে চিকিৎসার ব্যবস্থা, নির্যাতিত মা-বোনদের পুনর্বাসন এবং পাকিস্তানে আটকেপড়া কয়েক লক্ষ বাঙালিকে দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীসহ সদ্য স্বাধীন দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হয়। কুমিল্লায় দেশের প্রথম সামরিক একাডেমি স্থাপন করা হয়। পুলিশ, বিডিআর (বর্তমান বিজিবি), আনসার, বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক, গণমুখী ও যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল করে গণতান্ত্রিক আদেশ ১৯৭৩-এর আওতায় স্বায়ত্তশাসন প্রদান, ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ ও কয়েক লক্ষ শিক্ষককে সরকারি মর্যাদা এবং ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। জাতীয় জীবনের সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রচলনের নির্দেশ দেওয়া হয়।[৮] মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের সে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কমনওয়েলথ (১৯৭২), জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন (১৯৭৩), ইসলামি সম্মেলন সংস্থা–ওআইসি (১৯৭৪)-সহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য শতাধিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যারা হত্যা, খুন, অগ্নিসংযোগ, নারীনির্যাতন ইত্যাদির মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত করেছে, তাদের বিচারের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ (বিচার) ট্রাইব্যুনাল আইন পাশ করা হয়।

পাকিস্তানি শাসন-পর্বের পুরো সময় বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামকালে পূর্ব বাংলার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির পাশাপাশি শাসনতান্ত্রিক শাসন ও সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করেন। এ ছিল তাঁর দৃঢ়

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বিশ্বাস। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসার একদিন পর ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি তিনি সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার স্থলে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধু হলেন নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী, অপরদিকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী হলেন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের ১০ মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালে তিনি জাতিকে একটি সংবিধান দিতে সক্ষম হন, যা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে বিবেচিত। উল্লেখ্য, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রথম সংবিধান রচনা করতে দীর্ঘ ৯ বছর সময় নেয়, তাও আবার সেই সংবিধানে মাত্র ২ বছর ৬ মাস কার্যকর ছিল। ৭২-এর সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত চার মূল আদর্শ যথা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়। ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় (অনুচ্ছেদ ৩৮)। পুনরায়, অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রথম সাধারণ নির্বাচন (যা ছিল একই সঙ্গে শেষ নির্বাচন) অনুষ্ঠানে যেখানে ২৩ বছর সময় নেয়, সেখানে বঙ্গবন্ধুর দেশে প্রত্যাবর্তন ও নতুন সরকার গঠনের মাত্র ১৫ মাসের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন[৭] ও প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭৩.১৭ ভাগ পেয়ে দেশ পরিচালনায় বিপুল গণম্যান্ডেট লাভ করে। এ সবই ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের সাফল্য বা অর্জন।

এতৎসত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু সরকারকে একই সঙ্গে চরম প্রতিকূল বা বৈরী অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিলেও এরপরও মুক্তিযুদ্ধকালে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র অনেকের কাছে থেকে যায়। সশস্ত্র ডাকাতি, লুটতরাজ, ছিনতাই, পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর দখলের মতো সমাজ-বিরোধী কর্ম চলতে থাকে। খাদ্য সংকট, বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে তা মোকাবেলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, আন্তর্জাতিক রাজনীতির মারপ্যাঁচের মধ্যে পড়ে সে প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়া, আরব-ইসরাইল যুদ্ধ (১৯৭৩) ও আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, কালো বাজারি-মজুদদারি ইত্যাদি পরিস্থিতি মোকাবেলা স্বাভাবিক অবস্থায়ও যেকোনো সরকারের জন্য ছিল খুবই কঠিন। এসবের ওপরে ছিল রাজনৈতিক সংকট এবং তা-ই ছিল সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

স্বাধীনতার পর বাম নামধারী চীনপন্থি কিছু গোপন সংগঠন যেমন সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি, আব্দুল হকের (যশোর) পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট), মোহাম্মদ তোয়াহা, আলাউদ্দিন, সুখেন্দু দস্তিদার, আব্দুল মতিন, টিপু বিশ্বাস, অহিদুর রহমান প্রমুখের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'অসমাপ্ত বিপ্লব' এবং বঙ্গবন্ধু সরকারকে রুশ-ভারত কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া 'অবৈধ সরকার' বলে গোপনে প্রচারণা চালাতে থাকে। এদের কেউ কেউ দেশ যে স্বাধীন হয়েছে, তা-ই স্বীকার করতে চায়নি।[৮] এরা সংসদীয় রাজনীতিতে

www.pathagar.com

আদৌ বিশ্বাসী ছিল না। এরা সে-সময়ে ভারতের পশ্চিম বাংলা জুড়ে চারু মজুমদারের নকশালবাড়ী আন্দোলন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টিসহ সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা দখলের অতি উগ্র রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করে গোপন তৎপরতা চালাতে থাকে। থানা, পুলিশ ফাঁড়ি, বাজার ও ব্যাংক লুট, পাটের গুদামে আগুন, রেল লাইনের স্লিপার উপড়ে ফেলা, শ্রেণি-শত্রু খতমের নামে মানুষ হত্যা, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, সংসদ সদস্যদের হত্যা[৯] ইত্যাদির মাধ্যমে তারা কার্যত সরকারের বিরুদ্ধে একটি অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৯৭৩ সালে ৫ মাসেই এদের হাতে ৬০টি থানা আক্রান্ত ও সকল অস্ত্র লুট হয়ে যায়।[১০]

মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী দেশি-বিদেশি শক্তি ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ঠেকাতে ব্যর্থ হয় বটে, তবে স্বাধীনতার পরও তাদের বাংলাদেশ-বিরোধী তৎপরতা অব্যাহত থাকে। তারা নতুন এ রাষ্ট্র এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

তবে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের সাড়ে দশ মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর 'শ্রেণী সংগ্রাম', 'সামাজিক বিপ্লব' ইত্যাদি রোমাঞ্চকর স্লোগান আর 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খান-পন্থী একটি অংশের নেতৃত্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জাসদ নামে নতুন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা[১১] ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং ও বিব্রতকর। দলটি উগ্র রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ ও চরম ভারত-বিরোধিতার মাধ্যমে দেশে দ্রুত নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে এর মুখপাত্র *দৈনিক গণকণ্ঠ* ছিল একটি বড় হাতিয়ার। জাসদ-এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে যেমন সিরাজুল আলম খান[১২], আ স ম আব্দুর রব[১৩], শাজাহান সিরাজ,[১৪] কাজী আরেফ আহমেদ[১৫], নুরে আলম জিকু[১৬], মীর্জা সুলতান রাজা[১৭], হাসানুল হক ইনু[১৮], মনিরুল ইসলাম মনি ওরফে মার্শাল মনি[১৯], শরীফ নুরুল আম্বিয়া[২০], খোন্দকার আব্দুল মালেক শহীদুল্লাহ[২১], রুহুল আমিন ভূঁইয়া[২২], মোহাম্মদ শাজাহান[২৩] প্রমুখ আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের রাজনৈতিক ধারা থেকে উঠে আসেন। এঁরা এবং নেতৃস্থানীয় এঁদের অন্য সকলে মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।[২৪] মতাদর্শগতভাবে 'সমাজতন্ত্র' ছিল তখন বিশ্বজুড়ে খুবই আকর্ষণীয়, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের ছাত্র-তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ মানুষের প্রত্যাশা যেমন আকাশচুম্বী করে তোলে, তেমনি যুব সম্প্রদায়ের চেতনামূলে র‍্যাডিক্যালাইজেশন ঘটায়। ফলে জাসদ দ্রুত দেশের ছাত্র-তরুণ সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী সাম্প্রদায়িক দলসমূহ নিষিদ্ধ থাকায় এদের কর্মী-সমর্থকদের অনেকে সরকার-বিরোধিতায় জাসদের ব্যানারে সমবেত হয়। আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের রাজনৈতিক ধারা এবং মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের কারণেই তখন একমাত্র তাদের পক্ষেই সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছিল। অন্যথায়, বঙ্গবন্ধুর পাহাড়সম জনপ্রিয়তার মুখে ঐ সময় কোনো বিরোধী দল গঠন সহজ ছিল না। যাহোক, জাসদের হঠকারী রাজনীতি ও চরম ভারত-বিরোধিতা একদিকে যেমন অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, অপরদিকে তেমনি রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াতে বিশেষ ভূমিকা

www.pathagar.com

পালন করে, যা দলটির নিজের, জাতির, বঙ্গবন্ধু সরকারের, সর্বোপরি কোমলমতি ছাত্র-তরুণ সম্প্রদায়ের, সবার মারাত্মক অনিষ্ট ডেকে আনে। মুখ্যত জাসদের ব্যক্তি-আক্রোশমূলক হঠকারী ও ভুল রাজনীতির কারণে প্রতিশ্রুতিশীল একটি তরুণ প্রজন্ম প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অথচ বঙ্গবন্ধু সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ও আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকে জাসদ নেতৃত্বের পক্ষে দেশ ও জাতির কল্যাণে অনেক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিল, যেমনটি তাঁরা বর্তমানে (২০১৬) করছেন। একই সময়ে, পৃথকভাবে হলেও, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী), এর মুখপাত্র 'হক কথা' ভারত ও বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরোধিতায় বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার অভিযানে লিপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, জাসদ, ন্যাপ (ভাসানী) ও উগ্রপন্থি অন্যরা ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ বঙ্গবন্ধু ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে স্বাক্ষরিত ১২-দফা ২৫ বছর মেয়াদি বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তিকে 'গোপন চুক্তি', 'গোলামীর চুক্তি', 'দেশ বিক্রির চুক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রচারণা চালায়। অথচ এটি ছিল দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি স্বাভাবিক চুক্তি এবং উল্লিখিত অভিযোগের কোনো কিছুই এতে ছিল না।[২৫]

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটতে থাকে। বঙ্গবন্ধু সরকার স্বাধীনতার পরে গঠিত 'রক্ষী বাহিনী' নামে পরিচিত জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। এটি ঠিক, প্রথম দিকে সরকারের অবস্থান ছিল অনেকটা নমনীয়। '৭২-এর সংবিধানে প্রথমে জরুরি অবস্থা ঘোষণার কোনো বিধান পর্যন্ত রাখা হয়নি। ১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী আইন পাস করে তা এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাজনৈতিকভাবে একই বছর একই মাসে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) ও কমিউনিস্ট পার্টি মিলে ত্রি-দলীয় গণঐক্যজোট গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে দালাল আইনে অভিযুক্ত ও আটককৃতদের মধ্যে যারা লঘু অপরাধে অপরাধী, তাদের প্রতি সরকারের তরফ থেকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এমনই এক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশন

১৯৭৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি ছিল আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের প্রথম দিন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে বিকেল ৩টায় কাকরাইলস্থ দলের কেন্দ্রীয় অফিসের সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নির্মিত প্যান্ডেলে ১৫৬৬ জন কাউন্সিলর, সমসংখ্যক ডেলিগেটস, আমন্ত্রিত অতিথি, বিদেশি প্রতিনিধি ও কূটনীতিকদের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর জাতীয় পতাকা এবং সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানের দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। পতাকা উত্তোলনকালে জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' পরিবেশন করা হয়।[২৬] উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কার্যসূচির মধ্যে ছিল অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান, দলের সাধারণ সম্পাদক এবং উদ্বোধক ও সভার সভাপতি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। ত্রি-দলীয় গণঐক্যজোটের

www.pathagar.com

শরিক ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কমরেড মনি সিংহ এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফা তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে দেশের অভ্যন্তরীণ সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য সাম্রাজ্যবাদ, 'পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী শক্তি' ও 'বিভ্রান্ত চীনা নেতৃত্ব' এবং তাদের এদেশীয় 'অনুচরদের' দায়ী করে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনা নিয়ে দেশপ্রেমিক সকলকে এদের মোকাবেলা করার আহ্বান জানান। তিনি 'ক্ষুধা, নিরক্ষরতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে' দেশকে মুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিদেশি প্রতিনিধিবৃন্দের যোগদানের ফলে 'পারস্পরিক বন্ধুত্ব, শান্তি ও সহযোগিতার বন্ধন' আরও দৃঢ়তর হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।[২৭]

অধ্যাপক মোজাফফর ও কমরেড মণি সিং-এর শুভেচ্ছা বক্তব্য

ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে উগ্রপন্থিদের সমালোচনা করে বলেন যে, বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে তারা এর অপব্যবহার করছে, অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ চালাচ্ছে। তিনি এও মন্তব্য করেন যে, 'ফ্রি স্টাইলে গণতন্ত্র চলে না।' ত্রি-দলীয় জোটে তাঁর দলের যোগদান সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুকে আমরা সমর্থন করি, কারণ বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রের এবং গরীবের বন্ধু। ইহা ছাড়া তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও শোষকের শত্রু।'[২৮]

ত্রি-দলীয় ঐক্যজোটের আর এক শরিক বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কমরেড মণি সিং তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'যাহারা আইয়ুবের সহিত দালালি করিয়াছিল আজ তাহারা বিপ্লবী বনিয়া গিয়াছে।' তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী 'একমাত্র' দল হিসেবে উল্লেখ করে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আসুন আমরা সকলে সকল বিভেদ ভুলিয়া বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সোনার বাংলা গড়ার কাজে আগাইয়া যাই।'[২৯]

জিল্লুর রহমানের সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান কাউন্সিলে তাঁর রিপোর্টে যেসব বিষয় তুলে ধরেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : আওয়ামী লীগ সরকারের দুবছরে গৃহীত বিভিন্ন গঠনমূলক পদক্ষেপ ও জনহিতকর কার্যের বিবরণ, গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা আন্দোলনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ৬৫ হাজার আওয়ামী লীগ কর্মীর নিহত হওয়া, ১৭ হাজার কর্মীর বাড়িঘর লুণ্ঠন ও জ্বালিয়ে দেওয়া, সাংগঠনিকভাবে মহকুমাগুলোকে জেলার মর্যাদাদান, সাংগঠনিক জেলার সংখ্যা ১৯ থেকে ৫৯-এ উন্নীতকরণ, খাদ্য পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্য, পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালিদের দেশে ফেরত আনা, লুটতরাজ ও গুপ্ত হত্যা, গণ-বিরোধী চক্র কর্তৃক 'ঘোলা জলে মাছ শিকার করিয়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অপচেষ্টা চালানো', এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান, স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি, গণতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্র, কল-কারখানা, ক্ষেত-খামারে উৎপাদন বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র সম্প্রসারণবাদের স্থানীয় এজেন্টদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

দেশপ্রেমিক সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শনের আলোকে চার মূলনীতি যথা—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, বঙ্গবন্ধুর এ আদর্শকে 'বাংগালী জাতির প্রাণশক্তির উৎস' হিসেবে বর্ণনা, 'কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলা গড়ার কাজে' সকলের অংশগ্রহণের আহ্বান। জিল্লুর রহমান তাঁর একই রিপোর্টে উগ্রপন্থিদের বিরুদ্ধে নতুন লড়াইয়ের সংকল্প ব্যক্ত করে ঘোষণা করেন :[৩০]

> আজ আমাদের এই কাউন্সিল সভায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে যে, ২৪ বছর পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুদের সাথে লড়াই করে আমরা যেভাবে আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে এক মুহূর্তের জন্য এতটুকু ম্লান হতে দেইনি বরং ইতিহাসের গৌরবময় গাথা রচনা করেছি, তেমনি জাতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, ঘাটে-মাঠে, কলে-কারখানায় জাতীয় মতাদর্শ বিরুদ্ধ শক্তির [বিরুদ্ধে] লড়াই শুরু করবো।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ[৩১]

কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধক ও একই সঙ্গে এর সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে দেড় ঘণ্টাব্যাপী অত্যন্ত গুরুত্ব ও দিকনির্দেশনাপূর্ণ এক ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এ ভাষণের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে : 'স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মুক্তির সংগ্রাম এখনও বাকী', অর্থনৈতিক মুক্তিই আনতে পারে সত্যিকার মুক্তি, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার নতুন সংগ্রাম, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো', চার রাষ্ট্রীয় স্তম্ভ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা নির্ভুল ও একে 'বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে', 'মানুষ মরিতে পারে, কিন্তু নীতি ও আদর্শের মৃত্যু নাই', 'বিদেশ হইতে ভিক্ষা আনিয়া দেশ চালানো যাইবে না', উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ, কৃষক-শ্রমিক-মজুর নয় শিক্ষিতরাই দেশের চোরাকারবার ও অন্যবিধ সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত, শিক্ষিতরাই হঠকারী কার্যে পারদর্শী, দলীয় কর্মীদের প্রতি ঘুষখোর আর দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান, 'শুধু আইন ও শক্তি দিয়া দুর্নীতি দমন করা যায় না', দুর্নীতি দমনে প্রয়োজন জনমত সৃষ্টি, 'লক্ষ লক্ষ বঙ্গ-সন্তানের রক্ত দিয়া অর্জিত স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য দেশে-বিদেশে ষড়যন্ত্র', 'দীর্ঘ দুই বৎসর বৈদেশিক দালালদের অস্ত্র দিয়া বিপ্লব করার হুমকি সহ্য', ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করায় 'বঙ্গবন্ধু এইবার কঠোর হইবে', অস্ত্র জমাদানের আহ্বানে আওয়ামী লীগ কর্মীরা সাড়া দিলেও অন্যদের গোপনে অস্ত্র রেখে দেওয়া, 'রাতে একজন ঘুমাইয়াছে, তাহাকে গুলি করিয়া মারিলে বিপ্লব হয় না', 'জনগণকে উপেক্ষা করিয়া দুই-দশটা লোককে হত্যা করিলে কিছুই অর্জিত হয় না', তথাকথিত এসব বিপ্লবীর 'কোনো নীতি নাই, আদর্শ নাই'– 'তাহারা সব ডাকাত', মাওবাদী বলে যারা রাতে টেলিফোনে হুমকি দেয় তাদের 'আমি বলি তোমরা চোরবাদী', পাঁচ বছর পর দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, ভোটে জিতে আসতে পারলে 'তবে আওয়ামী লীগ গদি ছাড়িয়া দিবে', 'অগণতান্ত্রিক অধিকার ব্যবহার করিলে, বৈদেশিক কর্মীকে হত্যা করিলে তাহা কোন স্বাধীন দেশের সরকার

www.pathagar.com

বরদাশত করিতে পারেন না', সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিকারীরা নীচ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি, চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা তবে তা 'আত্মসম্মান বিসর্জন' দিয়ে নয়, চীন কর্তৃক জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপ্রাপ্তির প্রশ্নে ভেটো প্রদানের সমালোচনা, স্বাধীনতা আন্দোলনে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সাহায্যের উল্লেখ, 'বন্ধুত্ব সহজে আসে নাই, দুর্দিনে যে কাছে থাকে সেই আমাদের প্রকৃত বন্ধু', 'আমরা একে অন্যের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিব না', 'আমরা থাকিতে চাই পাশাপাশি বন্ধুরূপে' ইত্যাদি। কিছু কিছু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ করে দলকে কলুষমুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'দুই চারজন মানুষের অন্যায়ের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস—উহার বদনাম হইতে দেওয়া যায় না।' দলের কর্মীদের সততা ও ত্যাগের মানসিকতার ওপর গুরুত্বারোপ এবং সবার জন্য আত্মসমালোচনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন, 'দেশের স্বাধীনতা বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, দেশকে শোষণমুক্ত করিতে হইলে প্রয়োজন নিঃস্বার্থ কর্মীর আর প্রয়োজন আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি ও আত্মসমালোচনার।' বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল লক্ষ্য 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো' বাস্তবায়নে নেতাকর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'খোদাকে হাজের নাজের করিয়া প্রতিজ্ঞা করুন—বাংলার মানুষের কাছে দাঁড়াইতে হইবে, শোষণের অবসান করিতে হইবে, হইবে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাইতে।' বঙ্গবন্ধু তাঁর একই ভাষণে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) ও কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে গঠিত ত্রি-দলীয় গণঐক্যজোট এবং আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনসমূহকে একই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন : বিদেশি অতিথিদের ভাষণ ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা

১৯শে জানুয়ারি সকাল ১০টা ও বিকেল ৩টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে দুই বেলা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সকালের অধিবেশনে আমন্ত্রিত বিদেশি প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন আর বিকেলের অধিবেশনে দেশের সার্বিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

বিদেশি প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁরা হলেন আই এস কুলিচেনকো (সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য), জোসেফ সেগুর (হাঙ্গেরি), মিহনিয়া চিরগুই (রোমানিয়া), এস আব্দুর রহমান (মালয়েশিয়া), নিচিতা এ সাকাতা (জাপানের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী), সালাবাহ ইউসুফ (মিশর), ওয়াবনার জারইউনস্কি (পূর্ব জার্মানি), এম ইঞ্জিনিয়ার্স (পোল্যান্ড), ড. আব্দুল্লাহ আল সালেম সামুআহি (ইরাক), অরুণ মিত্র (সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি)। তাঁদের কারো কারো বক্তব্যের অংশবিশেষ তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে।[৩২]

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি কুলিচেনকো তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আওয়ামী লীগের ২৫ বছরের ইতিহাস ও গণঐক্যজোট গঠন এবং জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। হাঙ্গেরির প্রতিনিধি দলের নেতা জোসেফ সেগুর তাঁর বক্তব্যে

www.pathagar.com

বলেন, 'বঙ্গবন্ধুকে এখন সারা বিশ্বে একজন অন্যতম মহান রাজনীতিবিদ বলিয়া গণ্য করা হয়'। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মালয়েশিয়া দলের নেতা এস আব্দুর রহমান বঙ্গবন্ধুকে 'শতাব্দীর অন্যতম মহান নেতা' বলে অভিহিত করেন। তিনি দেশকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রদানের প্রশংসা করে বলেন, 'ইহা আওয়ামী লীগের একটি গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য'। জাপানের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিনিধি দলের নেতা মিচিতা এ সাকাতা স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাদেশের জনগণের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন যে, তারা এখন স্বাধীনতা-উত্তরকালের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও সক্ষম হচ্ছেন। শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরওপ করে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের জনগণের উচিত হবে শিক্ষাকে উন্নয়নের উপায় হিসেবে অবলম্বন করা এবং তা হলেই 'তাহারা সোনার মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারিবে'। মিশরের প্রতিনিধি দলের নেতা সালাবাহ ইউসুফ ইসরাইলের বিরুদ্ধে আরবদের সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। পূর্ব জার্মানির প্রতিনিধি ওয়াবনার জারইউনস্কি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, তাঁর দেশ সর্বদাই বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ছিল এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিতে সমর্থন করেছে। ইরাকি দলের নেতা ড. আব্দুল্লাহ আল সালেম সামুআহি বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের সাফল্য দুনিয়ার ইতিহাসে এক গৌরবজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে'। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও ভারতীয় দলের নেতা অরুণ মিত্র বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের মধ্যে যে মৈত্রী সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অখণ্ডনীয়। ভারত সর্বদা বাংলাদেশের সহিত সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব বজায় রাখিবে'। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, 'তাঁহার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নতির অগ্রসীমায় পৌছাতে পারিবে'। অরুণ মিত্র বঙ্গবন্ধুকে একটি প্রামাণিক চিত্রের ৩টি রিল উপহার দেন। এসব অতিথিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, তাঁদের অংশগ্রহণের ফলে আওয়ামী লীগের এ কাউন্সিল অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। খোলা আকাশের নিচে প্যান্ডেল করে এসব অতিথির উপস্থিতিতে কাউন্সিল অধিবেশন করতে হওয়ায় বঙ্গবন্ধু দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'ঢাকা শহরে পাঁচ হাজার লোক ধারণের মতো পাবলিক হল নাই।'[৩৩]

বিকেলের অধিবেশনে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশদ পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ আলোচনায় গুরুত্ব পায়। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, কালোবাজারি ও দুর্নীতির ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর এর বিরূপ প্রভাব আলোচনায় ওঠে আসে। দ্বিতীয় দিনের এ অধিবেশন থেকে জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের আরও শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। দলের কেউ 'ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ার' সামান্যতম চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণেরও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়।[৩৪] অধিবেশনে রওশন আলী (সংসদ সদস্য, যশোর), নূরুল হক (সংসদ সদস্য, নোয়াখালী), আব্দুল হান্নান (চট্টগ্রাম), নাজমুল হুদা (দিনাজপুর), ইকরামুল হক (প্রতিনিধি, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ) প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যায় গণভবনে বঙ্গবন্ধুর

www.pathagar.com

সভাপতিত্বে দলের কর্মকর্তা নির্বাচন, গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রের সংশোধন সম্পর্কিত আলোচনার উদ্দেশ্যে সাবজেক্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় দিনের অধিবেশন : প্রস্তাব গ্রহণ, গঠনতন্ত্র সংশোধন, কর্মকর্তা নির্বাচন

কাউন্সিলের তৃতীয় ও শেষ দিন সকাল ১০টা ও বিকেল ৩টায় দুটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সেশনে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সকালের অধিবেশনে পূর্বের দিনের দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর আলোচনা অব্যাহত থাকে। এতে অন্যান্যের মধ্যে শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভূমি সংস্কার, বৈদেশিক নীতি, সাংগঠনিক বিষয় ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এসব প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ :[৩৫]

১. শহিদ ও লাঞ্ছিত মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা : বাঙালির জাতীয় মুক্তি তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব অকুতোভয় সংগ্রামী আত্মদান করেছেন, যেসব মা-বোন লাঞ্ছিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন।

২. স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ়করণ : বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত ও সুদৃঢ় করার দৃঢ় অঙ্গীকার।

৩. জাতির পিতার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও আজীবনের ত্যাগ-সাধনায় আওয়ামী লীগ একটি সংগ্রামী ও বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে, তাঁর এই নেতৃত্বে সশস্ত্র গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্বে স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় পুনর্গঠন কার্যের সুবিশাল দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিয়েছে।

৪. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে ব্যক্ত অঙ্গীকার অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার শপথ।

৫. বঙ্গবন্ধু সরকারের জাতিগঠনমূলক উদ্যোগের প্রশংসা : স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র দুবছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, বিধ্বস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন, স্থানীয় সংস্থাসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ জাতিগঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এর প্রশংসা।

৬. ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা : দুই দশকের পাকিস্তানি অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ এবং ৭১-এর রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও নানা প্রচেষ্টায় জনগণের জন্য খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির সরকারি উদ্যোগের প্রশংসা।

www.pathagar.com

৭. সরকারের জাতীয়করণ নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন : বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ব্যাংক, বিমা, বৃহৎ শিল্প-কারখানা, পাট, বস্ত্র, চিনি শিল্প, ১৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের পরিত্যক্ত কলকারখানা, বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশির ভাগ জাতীয়করণ করায় সন্তোষ প্রকাশ করে এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন। এ পদক্ষেপ সফল করতে ঐসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান।

৮. ভূমি-সংস্কার ও কৃষিনীতির জন্য সরকারের প্রতি অভিনন্দন : ভূমির সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা নির্ধারণ এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের নীতি গ্রহণ করায় সরকারের প্রতি অভিনন্দন। কৃষি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত 'সবুজ বিপ্লব' এবং চির অবহেলিত কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নে তাঁর সরকারের অর্থনীতিতে কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদানের ঘোষণাকে ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করা। সরকারের নানা উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে কৃষি উৎপাদনে জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ।

৯. সমন্বিত প্রয়াসের ওপর গুরুত্বারোপ : কৃষি ক্ষেত্রে সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যাতে ফলপ্রসূ হয় সেজন্য জনগণ, পার্টি ও সরকারের মধ্যে সমন্বিত প্রয়াস থাকা।

১০. পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন : আওয়ামী লীগের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে পরিকল্পিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করে দেশের জনশক্তি, বিশেষ করে বিপুলসংখ্যক বেকারদের কাজে লাগিয়ে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ।

১১. পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতিতে উদ্বেগ প্রকাশ : পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় যে, অভ্যন্তরীণ ঘাটতি ছাড়াও আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের অভাব, অভ্যন্তরীণ পণ্য বণ্টন ব্যবস্থা এবং অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের প্রতি কঠোর ও বাস্তবমুখী পন্থা অবলম্বনের আহ্বান।

১২. জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান : আওয়ামী লীগের জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আদর্শ অনুসরণের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত। একই সঙ্গে বিশ্বের সংগ্রামী জনতার প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস।

১৩. প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস : চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি যথা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রশাসনিক কাঠামো ঢেলে সাজানোর আহ্বান।

১৪. স্বাধীনতা-বিরোধী 'ভুয়া বিপ্লবীদের' চক্রান্ত নস্যাতের আহ্বান : আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে যখন নিয়োজিত, তখন স্বাধীনতা-বিরোধী

www.pathagar.com

ও কিছু দল 'সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশি-বিদেশি কায়েমী স্বার্থের এজেন্ট হিসাবে অর্থহীন শ্লোগান এবং তথাকথিত বিপ্লবের বুলি আওড়াইয়া জনসাধারণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে সচেষ্ট।' এরা সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি, লুণ্ঠন, গুপ্তহত্যা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শান্তি, সংহতি ও অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে। এদের 'স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের' শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে এসব 'স্বাধীনতা-বিরোধী ভুয়া বিপ্লবীদের' সকল চক্রান্ত ও তৎপরতা নস্যাৎ করার জন্য আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, প্রগতিশীল সকল শক্তি ও দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতি আহ্বান।

১৫. আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত ও এর শুদ্ধীকরণ : যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করার জন্য আওয়ামী লীগকে আরও সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত, সচেতন ও সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং দুর্নীতি হতে মুক্ত করার আহ্বান।

১৬. জাতির পিতার সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন : যথাযথ গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে দলীয় কর্মী ও নেতাদের প্রতি শপথ গ্রহণের আহ্বান।

গঠনতন্ত্র সংশোধন

গঠনতন্ত্র সংশোধন ও পরিমার্জনের লক্ষ্যে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে ৯-সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি পূর্বে গঠন করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের শেষদিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ঐ কমিটির প্রস্তাব বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সংশোধনী গৃহীত হয় :[৩৬]

১. দলের পতাকা : আওয়ামী লীগের দলীয় পতাকার বর্ণনা ও এর পরিমাপ নির্ধারণ।

২. ওয়ার্কিং কমিটিতে পার্লামেন্টারি নেতার সদস্যপদ : আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতার পদাধিকার বলে দলের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ লাভের বিধান।

৩. আওয়ামী লীগ মহিলা শাখা : পূর্বের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মহিলা উপ-পরিষদ-এর স্থলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মহিলা শাখা নামকরণ।

৪. ওয়ার্কিং কমিটিতে মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব : আওয়ামী লীগ মহিলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদাধিকার বলে পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ লাভ।

৫. মহিলা কাউন্সিলরের বাধ্যবাধকতা : আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে দলের বিভিন্ন ইউনিট থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা।

৬. আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্বে পরিমার্জন : আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রতি শাখায় একজন প্রধান ও একজন উপ-প্রধানের

www.pathagar.com

যে বিধান ছিল, তাতে একজন প্রধান ঠিক রেখে একজন উপ-প্রধানের স্থলে দুজন উপ-প্রধান থাকার নিয়ম।

৭. আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধানের আওয়ামী লীগ সভায় যোগদান : আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান এখন থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে কোনো সভায় পদাধিকার বলে যোগদান ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে তাঁর কোনো ভোটাধিকার থাকবে না।

নেতৃত্ব নির্বাচন

বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনের শেষদিনের বিকেলের সেশনে পরবর্তী দুবছরের জন্য দলের নেতৃত্ব নির্বাচন করা হয়। এবারকার কাউন্সিলের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে বঙ্গবন্ধুর সরে দাঁড়ানো। কাউন্সিলের প্রথম দিন উদ্বোধনী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে তিনি আর আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না মর্মে ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৩৭] কাউন্সিলরদের 'না, না' ধ্বনি সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি তাঁর বক্তব্যে অটল থাকবেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে দুটি কারণ তুলে ধরেন, (এক) প্রধানমন্ত্রী ও একই সঙ্গে দলের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ রয়েছে। দলের গঠনতন্ত্রে লেখা রয়েছে যে, যিনি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কোনো মন্ত্রীর পদ বা এরূপ সরকারি বা রাষ্ট্রীয় কোনো পদে আসীন হবেন, তিনি দলের কোনো কর্মকর্তা পদে থাকতে পারবেন না।[৩৮] অতএব একই সঙ্গে উভয় পদে থাকা হবে গঠনতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থি বা লঙ্ঘন; (দুই) উভয় পদের দায়িত্ব খুবই বেশি এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর পক্ষে সংগঠনের সভাপতি হিসেবে সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।[৩৯] বঙ্গবন্ধু স্বয়ং দলের নতুন কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন এবং কাউন্সিলরগণ হাত তুলে তাঁদের সম্মতি জ্ঞাপন করেন। নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন :[৪০]

সভাপতি	:	এ এইচ এম কামারুজ্জামান
সহ-সভাপতি	:	মহিউদ্দিন আহমদ
		রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া
		ডা. আসাবুল হক
সাধারণ সম্পাদক	:	জিল্লুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	আব্দুর রাজ্জাক
প্রচার সম্পাদক	:	সরদার আমজাদ হোসেন
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	মুস্তাফা সারওয়ার
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	শেখ শহীদুল ইসলাম
দফতর সম্পাদক	:	আনোয়ার চৌধুরী
কৃষি সম্পাদক	:	রহমত আলী
শ্রম সম্পাদক	:	কাজী মোজাম্মেল হক

www.pathagar.com

মহিলা সম্পাদিকা	:	বেগম সাজেদা চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ	:	হামিদুর রহমান

সদস্যবৃন্দ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ফণিভূষণ মজুমদার, কোরবান আলী, কাজী জহিরুল কাইয়ুম, গাজী গোলাম মোস্তফা, রওশন আলী, নুরুল হক, সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, এ কে মুজিবর রহমান, শামসুদ্দীন মোল্লা, আব্দুল হান্নান, শেখ ফজলুল হক মনি,[৪১] লুৎফর রহমান, শামসুর রহমান খান, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, আলী আজম ভূঁইয়া, তোফায়েল আহমদ, নুরুল ইসলাম ভাণ্ডারী, ফজলুল হক বিএসসি, নুরুল ইসলাম ও হাবিবুর রহমান।

উল্লেখ্য, এ কাউন্সিলে দলের সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ দপ্তরকে দুভাগে ভাগ করে দুজন সম্পাদকের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারি দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সভাপতি এ এইচ এম কামারুজ্জামান ওয়ার্কিং কমিটির এসব সদস্যের নাম ঘোষণা করেন।[৪২] অপরদিকে, দলীয় কাউন্সিলে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ এইচ এম কামারুজ্জামান সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন।[৪৩]

কাউন্সিল অধিবেশনে কর্মকর্তা নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু তাঁদের মঞ্চে তুলে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি সভাপতির আসন ত্যাগ করে সেখানে নবনির্বাচিত সভাপতিকে উপবেশন করান। এরপর বঙ্গবন্ধু এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ঐতিহ্যের কথা সকলকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে নতুন প্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ ও নিঃস্বার্থভাবে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নবপর্যায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে কাউন্সিলরদের প্রতি আহ্বান জানান।[৪৪] নবনির্বাচিত সভাপতি এ এইচ এম কামারুজ্জামানও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে সংগঠনের দায়িত্বে ফিরে আসতে পারায় সন্তোষ প্রকাশ করে দলীয় কর্মীদের 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার' আহ্বান জানান।[৪৫] সবশেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও নতুন রাষ্ট্রের জন্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে তুলে একে সুদৃঢ় ভিত্তিদান ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের সম্মুখে বড় চ্যালেঞ্জ। উপরন্তু তাঁর সরকারকে স্বাধীনতা-বিরোধী দেশি-বিদেশি মহলের ষড়যন্ত্র এবং উগ্রপন্থিদের নানা ধ্বংসাত্মক তৎপরতার সম্মুখীন হতে হয়। এতৎসত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যে সরকারের পক্ষে এসব চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে একটি ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সম্ভব হয়। আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানকারী বিদেশি প্রতিনিধিবৃন্দের বক্তব্যেও তা ফুটে ওঠে ও প্রশংসিত হয়।

আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশনের একটি প্রধান ঘটনা ছিল আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নেওয়া। তিনি

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক হলেও শীঘ্রই তিনি হয়ে ওঠেন এর মূল সংগঠক ও প্রাণ। ১৯৫২ সালে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৫৩ সালে দলের প্রথম নিয়মিত কাউন্সিলে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। একটানা ১৪ বছর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬৬ সালের কাউন্সিলে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৪-এর এ কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত প্রায় ৮ বছর পুনর্নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। নিজের কঠোর শ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। এর নেতৃত্বভার ছেড়ে দেওয়া তাঁর জন্য কিছুতেই সহজ বিষয় ছিল না। তিনি অকপটে তাঁর মনের অভিব্যক্তি প্রকাশও করেছিলেন।[৪৬] তবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন মনে-প্রাণে, চিন্তায়-চেতনায় একজন খাটি গণতন্ত্রী। শাসনতন্ত্র বা নিয়ম-কানুন সমুন্নত রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই যত্নবান। শাসনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য তিনি পাকিস্তানি আমলে পুরো সময় সংগ্রাম করেছেন। ইচ্ছে করলে দলের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে তিনি প্রধানমন্ত্রিত্বের পাশাপাশি একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের সভাপতির পদে আসীন থাকতে পারতেন। কিন্তু গঠনতন্ত্র সমুন্নত রাখতে তিনি তা করেননি। বরং তিনি মনে করেছেন যে, এর ফলে দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার মানসিকতা বৃদ্ধি পাবে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন যে, 'তিনি গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে দলে একটি গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।'[৪৭] উল্লেখ্য, এ এইচ এম কামারুজ্জামান গঠনতন্ত্রের বিধান মেনে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে দলের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গঠনতন্ত্র বা আইনকে কীভাবে শ্রদ্ধা জানাতে হয়, সমুন্নত রাখতে হয়, এ দুই ঘটনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের সকলের, বিশেষভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য এটি একটি অবশ্য শিক্ষণীয় ব্যাপার।

আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য, আর তা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণতা বা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। পাকিস্তানি শাসন-পর্বে বাঙালির জাতীয় মুক্তির জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বা প্লাটফরম ছিল অত্যাবশ্যক, যে-কারণে ১৯৫৭ সালে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন-সংগ্রাম, সর্বোপরি ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা অর্জিত হলে, এবারের চ্যালেঞ্জ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন এবং নতুন রাষ্ট্রকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানো। বঙ্গবন্ধু সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। এবার ছেড়ে দিলেন দলের সভাপতির পদ। বঙ্গবন্ধু ব্যতীত ঐ সময়ের জাতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যনির্দেশ

১. *ইত্তেফাক*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ১২; *সংবাদ*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৮; *আজাদ*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ১২

www.pathagar.com

২. *ইত্তেফাক*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১২; *সংবাদ*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৮; *আজাদ*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৭
৩. বঙ্গবন্ধুর বাণী দ্রষ্টব্য, *ইত্তেফাক*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪, ক্রোড়পত্র, পৃ. ৩
৪. *ঐ*, পৃ. ১৯
৫. দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, *সংবাদ*, *আজাদ*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪
৬. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩৪৪-৩৫০; Obaidul Huq, *Bangabandhu Sheikh Mujib : A Leader with a Difference*, Second Edition, Dhaka 1996, Appendix v, pp. 143-149
৭. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩৪৮
৮. যেমন আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট)। Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*, Dhaka 1980, pp. 172-173
৯. সওগাতুল আলম ছগীর এমসিএ (মঠবাড়িয়া, বরিশাল, ৩রা জানুয়ারি ১৯৭৩), নুরুল হক এমপি (নড়িয়া, ফরিদপুর, ৩১শে মে ১৯৭৩), মোতাহার উদ্দিন আহমেদ (লালমোহন, ভোলা, ১০ই জানুয়ারি ১৯৭৪), মইনুদ্দিন মিয়াজী এমপি (যশোর), গোলাম কিবরিয়া এমপি (কুষ্টিয়া) এঁরা সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন।
১০. Talukder Maniruzzaman, *Bangladesh Revolution*, pp. 164
১১. ১৯৭২ সালের মে মাসে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খান-পন্থি ও এর বিপরীত ধারার মধ্যে বহিষ্কার পাল্টা-বহিষ্কারের মাধ্যমে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২১-২৩শে জুলাই ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপের কেন্দ্রীয় সম্মেলন পৃথকভাবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের (যা সে সময় 'মুজিববাদী ছাত্রলীগ' নামে পরিচিতি পায়) কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর ৩১শে অক্টোবর ১৯৭২ সিরাজুল আলম খান-পন্থিরা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে একটি নতুন দল গঠনের ঘোষণা দেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ৯নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর এম এ জলিল এবং ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসুর সাবেক ভিপি আ স ম আবদুর রব-কে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৭-সদস্যবিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন শাজাহান সিরাজ (ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক), নুরে আলম জিকু (ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর আঞ্চলিক সহ-প্রধান), বিধান কৃষ্ণ সেন (১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আগরতলা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত), সুলতান উদ্দিন আহমেদ (১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আগরতলা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত) ও রহমত আলী (কমিটি ঘোষণার দিন বিবৃতি দিয়ে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার; তিনি আওয়ামী লীগেই থেকে যান এবং বর্তমানে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য)। একই বছর ডিসেম্বর মাসে মেজর এম এ জলিল সভাপতি, আ স ম আবদুর রব সাধারণ সম্পাদক ও শাজাহান সিরাজ-কে যুগ্ম সম্পাদক করে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী বছর (১৯৭৩) ১১-১৩ই মে পল্টনে ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে দলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম-সম্পাদক অপরিবর্তিত থাকেন। জাসদ ছিল মূলত তরুণদের একটি দল এবং ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকর্মীরাই

www.pathagar.com

ছিল এর প্রাণশক্তি। দ্রষ্টব্য মহিউদ্দিন আহমদ, *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ে রাজনীতি*, ঢাকা ২০১৪, পৃ. ৭৬-৯০, ৯২-৯৩, ১০২

১২. ১৯৬৩-১৯৬৫ এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক; '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর চার অধিনায়কের অন্যতম; জাসদ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও দলের তাত্ত্বিক নেতা।

১৩. ১৯৬৯-১৯৭০ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক; ১৯৭০-১৯৭১ ডাকসুর ভিপি; ৭১-এ মুজিব বাহিনীর আঞ্চলিক সহ-অধিনায়ক; জাসদ-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক (অক্টোবর ১৯৭২), সাধারণ সম্পাদক (ডিসেম্বর ১৯৭২)।

১৪. ১৯৭০-১৯৭২ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক; '৭১-এ মুজিব বাহিনীর আঞ্চলিক সহ-প্রধান; জাসদ-এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য (অক্টোবর ১৯৭২), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (ডিসেম্বর ১৯৭২)।

১৫. ১৯৬৬ সালে ঢাকা শহর ছাত্রলীগের সভাপতি; ১৯৬৩-১৯৭০ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য; '৭১-এ মুজিব বাহিনীর আঞ্চলিক সহ-প্রধান; জাসদ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

১৬. ১৯৬০-১৯৬২-তে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি; '৭১-এ মুজিব বাহিনীর আঞ্চলিক সহ-প্রধান; জাসদ-এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য (অক্টোবর ১৯৭২); সাংগঠনিক সম্পাদক (ডিসেম্বর ১৯৭২)।

১৭. ১৯৭০ সালে কুষ্টিয়া জেলা/চুয়াডাঙ্গা মহকুমা আওয়ামী লীগের অন্যতম সম্পাদক; জাসদ-এর সহ-সভাপতি (১৯৭৩)।

১৮. ১৯৬৯-১৯৭০-এ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ বুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদক; '৭১-এ ভারতের টাঙোয়া ক্যাম্পে মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষক; জাসদ-এর কৃষক ফ্রন্ট জাতীয় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক (১৯৭২)।

১৯. ১৯৭০-১৯৭২-এ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি; '৭১-এ মুজিব বাহিনীর আঞ্চলিক সহ-প্রধান; জাসদ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

২০. ১৯৭০-এপ্রিল ১৯৭২ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি; '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনীর ক্যাম্প প্রশিক্ষক; মে ১৯৭২-১৯৭৩ জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি।

২১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে এমপিএ নির্বাচিত; জাসদ-এর কৃষক ফ্রন্ট জাতীয় কৃষক লীগের সভাপতি (১৯৭২)।

২২. ঢাকার তেজগাঁও অঞ্চলের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা; আওয়ামী লীগের শ্রমিক ফ্রন্ট জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন (১৯৬৯) অন্যতম নেতা; ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে নির্বাচিত দলের শ্রম সম্পাদক; জাসদ-এর শ্রমিক ফ্রন্ট জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক (১৯৭২)।

২৩. ঢাকার পোস্তগোলা অঞ্চলের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা; আওয়ামী লীগের শ্রমিক ফ্রন্ট জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন (১৯৬৯) অন্যতম নেতা; জাসদ-এর শ্রমিক ফ্রন্ট জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৭২)।

২৪. যেমন শেখ কামরুজ্জামান টুকু (খুলনা), খন্দকার আব্দুল বাতেন (টাঙ্গাইল), আব্দুল লতিফ মীর্জা (সিরাজগঞ্জ)।

www.pathagar.com

২৫. দ্রষ্টব্য মহিউদ্দিন আহমদ, *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ে রাজনীতি*, ঢাকা ২০১৪, পৃ. ১০৭-১০৮; চুক্তি দ্রষ্টব্য, *সংবাদ*, ২০শে মার্চ ১৯৭২, পৃ. ৩

২৬. *সংবাদ*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৫, ৮; *আজাদ*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৭, ৮; *ইত্তেফাক*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ১১, ১২; *আজাদ*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৭

২৭. *ইত্তেফাক*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১১

২৮. *ঐ*, আরও, *সংবাদ*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৮

২৯. *ইত্তেফাক*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১১

৩০. *ঐ*, আরও, *আজাদ* ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৮

৩১. দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ১১, ১২; আরও *সংবাদ*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৫; *আজাদ*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৮

৩২. দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ২০শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৮; আরও *সংবাদ*, ২০শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৭; *আজাদ*, ২০শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৮

৩৩. *ইত্তেফাক*, ২০শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১

৩৪. *ঐ*, পৃ. ১, ১২

৩৫. সংকলিত *ইত্তেফাক*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৮; *ঐ*, পৃ. ৩, ১০

৩৬. *ইত্তেফাক*, ২২শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৩; *আজাদ*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৭

৩৭. *ইত্তেফাক*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১; *আজাদ*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৭

৩৮. ১৯৫৫ সালে গৃহীত দলের গঠনতন্ত্রের ৬৬ ধারায় এ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এ বইয়ের অধ্যায় চার দ্রষ্টব্য।

৩৯. দ্রষ্টব্য 'আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়', *ইত্তেফাক*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১; *সংবাদ*, ১৯শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৫

৪০. *ইত্তেফাক*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৮; *আজাদ*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৭; *সংবাদ*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৫

৪১. ১৯৬০-১৯৬৩ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর অন্যতম আঞ্চলিক অধিনায়ক, আওয়ামী যুবলীগের (১৯৭২) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি এই প্রথমবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন।

৪২. *ইত্তেফাক*, ১০ই জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ১২

৪৩. *ইত্তেফাক*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৫

৪৪. *ইত্তেফাক*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৮

৪৫. *ইত্তেফাক*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৭

৪৬. বঙ্গবন্ধু বলেন যে, 'তাঁহাকে দল হইতে আলাদা বলিয়া চিন্তা করা যায় না। তিনি দলের সহিত রহিয়াছেন এবং দলের সম্পর্ক রহিয়াছে জনগণের সহিত।' *ইত্তেফাক*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৮। ২১শে জানুয়ারি মহিলা আওয়ামী লীগের প্রথম জাতীয় সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দানকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু বাংলার মানুষের ভালবাসা হারাতে পারিব না।' *ইত্তেফাক*, ২২শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১,

www.pathagar.com

১২। আওয়ামী লীগের কাউন্সিল শেষে *দৈনিক ইত্তেফাক* 'আওয়ামী লীগ সভাপতির পদ হইতে বঙ্গবন্ধু বিদায় নিলেন' শিরোনামে একটি মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা খুবই প্রণিধানযোগ্য। এতে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দলের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নিবিড় সম্পর্ক এবং আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ ২৫ বছরের অসামান্য অবদান সবিস্তার তুলে ধরে বলা হয় : "প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর আওয়ামী লীগের সভাপতির আসন অলংকৃত করিবেন না। দলের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য তিনি গতকাল (রবিবার) ৩ দিনব্যাপী আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের শেষ দিনে স্বেচ্ছায় দলীয় প্রধানের পদটি তাঁহার উত্তরাধিকারী ও সুদীর্ঘকালের সহকর্মী জনাব কামারুজ্জামানের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন।" এরপর বলা হয়, "বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমান অভিন্ন নাম, একে অন্যের পরিপূরক। দীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবৎ একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও একজন অসম সাহসী ব্যক্তিত্বকে এদেশবাসী কখনও বিচ্ছিন্নভাবে দেখে নাই, দেখার কল্পনাও করে নাই।" *ইত্তেফাক*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১, ৮

৪৭. *ইত্তেফাক*, ২১শে জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৮

www.pathagar.com

অধ্যায় : বারো

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৭ : দল পুনর্গঠনের উদ্যোগ

পূর্ববর্তী কাউন্সিল (জানুয়ারি ১৯৭৪) থেকে ৩ বছর ২ মাস ১৫ দিন পর ১৯৭৭ সালের ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল ঢাকার ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে দুদিনব্যাপী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] এতে সভাপতিত্ব করেন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমেদ। সারাদেশ থেকে প্রায় ১৩শ কাউন্সিলর ও সমসংখ্যক ডেলিগেটস এ অধিবেশনে যোগ দেন।[২] কাউন্সিলে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন প্রস্তুতি কমিটির অপর যুগ্ম-আহ্বায়ক মিজানুর রহমান চৌধুরী। উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দীন আহমদের স্ত্রী সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এটি ছিল দলের প্রথম কাউন্সিল। এর মাধ্যমে দলকে পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্মর্তব্য, ১৯৭৫ সালের ৬ই জুন সমমনা অন্যদের নিয়ে আওয়ামী লীগের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে একটি জাতীয় প্লাটফর্ম। ১৫ই আগস্টের রক্তাক্ত ঘটনায় সমগ্র দেশ এবং দল হিসেবে আওয়ামী লীগ এক চরম বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়। বর্তমান কাউন্সিল ছিল সে অবস্থার মধ্য থেকে আওয়ামী লীগের নিজ নামে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এ কাউন্সিল ছিল খুবই তাৎপর্যবহ।

পটভূমি

১৯৭৪ সালের কাউন্সিল-পরবর্তী সময় থেকে ১৯৭৭ সালের কাউন্সিল-পূর্ব সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব ঘটনা নবীন রাষ্ট্রের জন্য খুবই বিপর্যয়কর ছিল। এর মধ্যে তথাকথিত বামপন্থিদের সশস্ত্র তৎপরতা আরও জোরদার, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা, খন্দকার মোশতাকের স্বল্পকালীন শাসন, ২২শে আগস্ট (১৯৭৫) জাতীয় চার নেতার গ্রেপ্তার, ২৪শে আগস্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত হওয়া, ২৬শে সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাকের 'ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স' ঘোষণা, ৩রা নভেম্বরের (১৯৭৫) জেল হত্যা, জাসদের ক্ষমতা দখলের চেষ্টা, ক্যু, পাল্টা ক্যু, সামরিক শাসন, জেনারেল জিয়ার উত্থান, খন্দকার মোশতাকের পরিবর্তে বিচারপতি সায়েমের রাষ্ট্রপতি হওয়া (৬ই নভেম্বর ১৯৭৫), কর্নেল তাহেরের ফাঁসি (২১শে জুলাই ১৯৭৬), রাজনৈতিক দলবিধি জারি (২৮শে জুলাই ১৯৭৬), আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনের উদ্যোগ (১৯৭৬), প্রেসিডেন্ট সায়েমের স্থলে জেনারেল জিয়ার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ গ্রহণ (৩০শে নভেম্বর ১৯৭৬) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারকে চরম সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট ও দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হয়। একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে সারাদেশ জুড়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রলয়ংকরী বন্যা দেখা দেয়। মাঠের ফসল ও মানুষের অন্যান্য সম্পদ মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হয়। হেলিকপ্টার ও নৌকা ছাড়া দেশের বহু স্থানে যোগাযোগের আর কোনো উপায় সে-সময় ছিল না। বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে চলছিল ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি। সরকার যখন অনেক চেষ্টায় অধিক মূল্যে বিশ্ববাজার থেকে খাদ্যসামগ্রী ও অত্যাবশকীয় পণ্য আমদানি করে সারাদেশে ৫৭০০ লঙ্গরখানা খুলে প্রতিদিন ৪৪ লক্ষাধিক লোককে খাবার সরবরাহ করছিল, তখন একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী চোরাকারবারি, মুনাফাবাজি ও মওজুদারির আশ্রয় গ্রহণ করে।[৩] একই সময়ে চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্যবোঝাই জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের কাছাকাছি এসে ফিরে যায়। অজুহাত ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোর শত্রু সমাজতান্ত্রিক কিউবার নিকট বাংলাদেশের চটের ব্যাগ রপ্তানি।[৪] এসবই ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত দেশি-বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্রের অংশ। আন্তর্জাতিক মহলের আশঙ্কা ছিল, বাংলাদেশে অন্তত দুই কোটির মতো লোক দুর্ভিক্ষে মারা যাবে। সরকারের নানা প্রচেষ্টায় তা ঠেকানো সম্ভব হলেও, দুর্ভিক্ষে সরকারি হিসেব মতে ২৭৫০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ রাজনৈতিক ধারা ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত জাসদই হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এর নামে আওয়ামী লীগ সরকারের সর্বাত্মক বিরোধিতা করাই যেন এ দলটির রাজনীতির উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৪ সালে এসে জাসদ আওয়ামী লীগ সরকারকে সশস্ত্র পন্থায় উৎখাত করতে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত হয়। বলা যায়, এরই অংশ হিসেবে ঐ বছর ১৭ই মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও-এর মতো চরম হঠকারী কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচি পালনকালে সেদিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে গোলাগুলিতে অনেকে হতাহত হয়। দলের সভাপতি মেজর এম এ জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ স ম আব্দুর রবসহ অনেক নেতা গ্রেপ্তার হন। এ ঘটনার পর জাসদ রাজনীতিতে আরও চরম হঠকারী লাইন অনুসরণ করতে থাকে; গড়ে তোলে গণবাহিনী নামে সশস্ত্র বাহিনী। সেনাবাহিনীর মধ্যে গড়ে তুলেছিল 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে গোপন সংগঠন। জাসদ ছাড়া অন্যান্য কথিত বামপন্থি সংগঠনগুলোও তাদের গোপন সশস্ত্র তৎপরতা বৃদ্ধি করে। সারাদেশে চলতে থাকে রাজনৈতিক হত্যা, নাশকতা ও বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। ১৯৭৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর ঈদের জামাতের মধ্যে গুলি করে হত্যা করা হয় কুষ্টিয়ার আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি গোলাম কিবরিয়াকে। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ দলীয় ৩০০০ নেতা-কর্মীর সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন।[৫]

জাতীয় জীবনে উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে

www.pathagar.com

সংসদীয় পদ্ধতির স্থলে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা এবং একটিমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দলের বিধান রেখে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী করা হয়। পরিবর্তিত সংবিধানের আওতায় বঙ্গবন্ধু হলেন রাষ্ট্রপতি আর ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী হলেন সরকারের প্রধানমন্ত্রী। ৬ই জুন বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল এবং সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল পেশার ব্যক্তিবিশেষকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে একটি জাতীয় দল-এর ১১৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেন।[৬] ২১শে জুন সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে পূর্বের ১৯টি জেলার স্থলে ৬১টি জেলা সৃষ্টি করা হয়, যা ছিল আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা।[৭] ১৬ই জুলাই বঙ্গবন্ধু ৬১টি জেলার প্রতিটির জন্য একজন করে গভর্নর নিয়োগ করেন।

এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দ্রুত দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এক কথায়, দেশের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। ঠিক এমনই এক সময় সংঘটিত হয় ১৫ই আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এর নির্মম শিকার হলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্য। যদিও সেনাবাহিনীতে চাকরিরত এবং বিভিন্ন সময়ে নানা অভিযোগে চাকরিচ্যুত কিছু সেনাসদস্য এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে, তবে এর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত দেশি-বিদেশি শক্তি ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের সংশ্লিষ্টতা আজ স্পষ্ট প্রমাণিত।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তাঁর সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতায় আরওহণ করে রাষ্ট্রপতি পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন। তার মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই পূর্বে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।[৮] এভাবে প্রথমে এটিকে আওয়ামী লীগের একটি অংশ কর্তৃক ক্ষমতা দখল বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করা হয়। তখনও সংসদ বাতিল ঘোষিত হয়নি। মার্শাল ল' ঘোষণা করা হয় ক্ষমতা দখলের ৫ দিন পর অর্থাৎ ২০শে আগস্ট। মূলত জীবনের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ও গ্রেপ্তার এড়াতে বঙ্গবন্ধু সরকারের অনেকে মোশতাক সরকারে যোগদান করেন। পরে আবার এদের অনেকেই আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন। তবে এটা ঠিক যে, জাতীয় চার নেতা বা গ্রেপ্তারকৃত অন্য নেতৃবৃন্দের মতো সেদিন তারা সাহসী পদক্ষেপ নিতে যে ব্যর্থ হন, পরবর্তীতে এঁদের কেউ-কেউ অকপটে প্রকাশ্যে তা স্বীকারও করেন।

বস্তুত খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সেদিন পাকিস্তানি ভাবধারার চরম প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করেছিল। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে পাকিস্তানের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির বিনিময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেল ব্যবস্থাধীনে যুক্ত থাকার একটি গোপন উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যদিও শুরুতেই তা নিষ্ফল করে দেওয়া হয়। ২২শে আগস্ট বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ,

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৪শে আগস্ট সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল কে এম শফিউল্লাহকে সরিয়ে সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এর পূর্বে খুনি চক্রের কারো কারো সঙ্গে জিয়ার কথা হয় এবং তিনি ঐ ব্যাপারে পূর্ব থেকেই ওয়াকেবহাল ছিলেন।[৯] ৩১শে আগস্ট রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে এক অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা জিল্লুর রহমান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ এবং পরে আরও অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাক ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্তদের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য বিচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স'[১০] নামে একটি কুখ্যাত আইন জারি করেন। ৩রা অক্টোবর খন্দকার মোশতাক জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে পরবর্তী বছর ১৫ই আগস্ট থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় চালু এবং ১৯৭৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ১৬ই অক্টোবর তিনি আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের এক সভা আহ্বান করেন। এসবই করেছিলেন তার নিজের অবস্থান সুদৃঢ়, তার পক্ষে আওয়ামী লীগের সমর্থন আদায় ও সাধারণ জনগণের সহানুভূতি লাভের হীন উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়। বরং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের জন্য আওয়ামী লীগ সংসদীয় কমিটির সভায় তাকে তীব্র ক্ষোভের সম্মুখীন হতে হয়।

এদিকে ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী জুনিয়র সেনা অফিসাররা যেমন কর্নেল ফারুক, কর্নেল রশিদ, মেজর ডালিম প্রমুখ ক্যান্টমেন্টে ফিরে না গিয়ে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভবনে অবস্থান করে সেখান থেকে রাষ্ট্র ও সরকারি বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এ নিয়ে সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময় ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর মধ্যে চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৩রা নভেম্বর এক সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত করেন। প্রায় একই সময় খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে ১৫ই আগস্টের খুনিরা ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের সেলে বন্দি মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতাকে গুলি ও বেয়নেট দিয়ে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, দেশ ও আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করা, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে আওয়ামী লীগ যাতে পুনরায় উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ না পায়। কার্যত ৩রা নভেম্বর খন্দকার মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত হন, তবে এর দুদিন পর রাষ্ট্রপতির পদ থেকে তার পদত্যাগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। অবসান ঘটে খন্দকার মোশতাক-এর ৮৩ দিনের শাসন।

৩রা নভেম্বরের অভ্যুত্থানে মূল নেতৃত্বদানকারী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ জেনারেল জিয়াকে তার পদ থেকে অপসারণ ও বন্দি করে নিজে সেনাবাহিনী প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। ৬ই নভেম্বর বিচারপতি এ এস এম সায়েম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। কিন্তু খালেদ মোশাররফ মাত্র

www.pathagar.com

চারদিনের বেশি টিকে থাকতে সক্ষম হলেন না। বলার অপেক্ষা রাখে না, তখনকার অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। চতুর্দিকে বাতাসের বেগে ছড়িয়ে দেওয়া হলো খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও ভারতের অনুকূলে সেনা অভ্যুত্থান ঘটেছে। এ মর্মে ক্যান্টমেন্টে জাসদ-এর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে লিফলেট বিতরণ করা হয়।[১১] এক ধরনের শঙ্কা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুখেমুখে দ্রুত অনেক কল্পকাহিনী ছড়ানো হয়। এ-রকম এক অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সেনা সদস্যদের মধ্যে জেনারেল জিয়ার সাধারণ সমর্থক ও জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার উদ্যোগে সংঘটিত হয় পাল্টা সেনা অভ্যুত্থান। এতে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও গণবাহিনী প্রধান এবং জাসদের অঘোষিত নেতা কর্নেল তাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ তাঁর দুই প্রধান সহকর্মী কর্নেল হায়দার ও কর্নেল হুদাসহ নিহত হন। জেনারেল জিয়া বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে পুনর্বহাল হন। জাসদ নেতৃবৃন্দ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই জেনারেল জিয়ার সঙ্গে জাসদ নেতৃত্বের, বিশেষ করে কর্নেল তাহেরের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তা তীব্র আকার ধারণ করে। জাসদ জেনারেল জিয়াকে 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে নতুন করে অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালায়। জেনারেল জিয়া অতিদ্রুত কর্নেল তাহেরসহ জাসদ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করেন।

৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর কার্যত জেনারেল জিয়ার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সরকারি কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকলেও তিনি শীঘ্রই তা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের ঘোষণা না দিয়ে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করেন। বিচারপতি সায়েমকে সামনে রেখে তিনি পর্যায়ক্রমে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেন। সেনাবাহিনীর ভেতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে বন্দি অবস্থায় কর্নেল তাহের ও জাসদের অন্য নেতৃবৃন্দের এক বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে প্রহসনমূলক বিচার অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৬ সালের ২১শে জুলাই কর্নেল তাহেরের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করা হয়। জাসদ-এর মেজর এম এ জলিল, আ স ম আবদুর রব, সিরাজুল আলম খানসহ অন্য নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৭৬ সালের ২৮শে জুলাই রাজনৈতিক দলবিধি বা পিপিআর ঘোষণা[১২] এবং ৩০শে জুলাই থেকে 'ঘরোয়া রাজনীতি'র (Indoor Politics) অনুমতি দেওয়া হয়। পিপিআর-এর অধীনে রাজনৈতিক দলগুলোকে সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করে বৈধতার সনদ লাভের বিধান করা হয়। এভাবে প্রথমে ২১টি দল সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। ৪ঠা নভেম্বর আওয়ামী লীগ সরকারের নিবন্ধন লাভ করে।[১৩] একই বছর ৩০শে নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েমের স্থলে জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে আসীন হন।[১৪] প্রথমে খন্দকার মোশতাক এবং পরে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েম জাতির উদ্দেশে তাঁদের ভাষণে ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। কিন্তু জেনারেল জিয়া সেদিকে অগ্রসর না হয়ে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের আয়োজন করেন।[১৫]

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড ও বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর পরিবর্তিত অবস্থায় আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে দলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দীন আহমেদকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং মহিলা সম্পাদিকা বেগম সাজেদা চৌধুরীকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[১৬] উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠনের পূর্বে (৬ই জুন ১৯৭৫) আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন এ এইচ এম কামারুজ্জামান, যিনি ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় খন্দকার মোশতাকের খুনি চক্রের হাতে নিহত হন। অপরদিকে জিল্লুর রহমান, যিনি দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর অন্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। স্মর্তব্য, ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলনকালে বঙ্গবন্ধুসহ দলের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় নেতা গ্রেপ্তার হলে মহিলা সম্পাদিকা আমেনা বেগমের ওপর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

তখন দেশে চলছিল জেনারেল জিয়ার 'ভীতির' রাজত্ব ও দুর্বিষহ শাসন। বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যমে নিষিদ্ধ ছিল। পত্র-পত্রিকায় কারো নামে উদ্ধৃতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম মুদ্রিত হলে তা 'বঙ্গবন্ধু' এভাবে বন্ধনীযুক্ত করে দেওয়া হতো। পাকিস্তানি ভাবাদর্শে বিশ্বাসী চরম দক্ষিণপন্থি মহল থেকে এসময়ে প্রকাশ্যে জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা পরিবর্তনের ধৃষ্টতা পর্যন্ত দেখানো হয়। এ পরিস্থিতিতে দলের পুনর্গঠন কাউন্সিল অনুষ্ঠান ছিল খুবই কঠিন কাজ।

১৯৭৬ সালের ২৫শে আগস্ট মিজানুর রহমান চৌধুরীর ধানমন্ডির বাসভবনে সাবেক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দীন আহমেদ। এতে ৬০ জন প্রাক্তন গণপরিষদ সদস্য, ২৪০ জন সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক জেলাসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ মোট এক হাজারেরও অধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, মোল্লা জালাল উদ্দীন আহমেদ, আবদুল মান্নান, সোহরাব হোসেন, ফণীভূষণ মজুমদার, আসাদুজ্জামান খান, আবদুল মমিন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ, দেওয়ান ফরিদ গাজী, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল মমিন তালুকদার, ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল, শাহজাদা আবদুল মালেক খান, কাজী জহিরুল কাইয়ুম, রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া, সালাউদ্দিন ইউসুফ, মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন, শামসুর রহমান খান (টাঙ্গাইল), আজিজুর রহমান আক্কাস (কুষ্টিয়া), এ কে মুজিবর রহমান (বগুড়া), কামরুজ্জামান (যশোর), ফজলুল হক বিএসসি, ফজলুল করিম, মোজাফফর হোসেন পল্টু, ডা. আলাউদ্দিন (রাজশাহী), আবদুর রউফ (রংপুর), আবুল কাশেম (পটুয়াখালী) প্রমুখ।[১৭] বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা শেষে বক্তাদের 'শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও' বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার 'লৌহ কঠিন' সংকল্পের কথা ঘোষণার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়[১৮]

www.pathagar.com

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নামে দলকে পুনর্গঠিত করা।
২. পিপিআর বা দলবিধি-র আওতায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের জন্য ৩১শে আগস্টের মধ্যে দলের গঠনতন্ত্র, ম্যানিফেস্টো ও অন্য দলিলপত্র সরকারের নিকট পেশ।
৩. দলের পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশনে নতুন কর্মকর্তা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত ১৯৭৫ সালের ৬ই জুন তারিখে আওয়ামী লীগের যে কার্যনির্বাহী কমিটি ছিল দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দীন আহমেদ-এর নেতৃত্বে দলের সম্মেলনের জন্য মিজানুর রহমান চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে গঠিত প্রস্তুতি কমিটির সঙ্গে সে কমিটির একযোগে সংগঠনের কার্য চালিয়ে যাওয়া।
৪. সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটিকে রাজনৈতিক দলবিধির শর্তের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংগঠনের গঠনতন্ত্র, ম্যানিফেস্টো ইত্যাদি সরকারের নিকট দাখিল করার ক্ষমতা অর্পণ।
৫. দল পুনর্গঠনের সরকারি অনুমোদন পাওয়ার পর যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠান এবং সে কাউন্সিলে দলীয় গঠনতন্ত্রের বিধান অনুসারে কর্মকর্তা নির্বাচন।

সাংগঠনিক কমিটির উল্লিখিত সভার তিনমাস পর ২৯শে নভেম্বর (১৯৭৬) দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী গ্রেপ্তার হন। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দীন আহমেদ গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে চলে যান। এরপর ফণীভূষণ মজুমদারকে দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণে তিনিও দায়িত্ব থেকে সড়ে দাঁড়ান। এ সম্বন্ধে আওয়ামী লীগ রাজনীতির একজন ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক ও শুভানুধ্যায়ী গোলাম আকবর চৌধুরী বলেন :

> ...২৯ নভেম্বর সাজেদা চৌধুরী, আব্দুল মালেক উকিল, সালাউদ্দিন ইউসুফ, আব্দুল মমিন তালুকদার, মোজাফফর হোসেন পল্টু সহ অনেককে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হলো। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দীন আহমেদ আত্মগোপন করলেন। ...ফলে দেখা গেল নেতৃত্বের সংকট। তখন সাময়িকভাবে ফণীভূষণ মজুমদারকে আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ...টেলিফোনে আমাকে জানান যে, অর্থ ও জনবলের অভাবে তাঁর পক্ষে দায়িত্ব চালানো সম্ভব নয়। ...একদিন তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দেন।

জাতীয় পরিস্থিতি ও পার্টির এরূপ সাংগঠনিক অবস্থার পটভূমিতে আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল অধিবেশন

১৯৭৭ সালের ৩রা এপ্রিল সকাল ১০টায় ঢাকার ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ-এর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের দুই দিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে সারাদেশ থেকে ২৬০০ কাউন্সিলর ও ডেলিগেটস যোগ দেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন। জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ নজরুল ইসলামের স্ত্রী বেগম নজরুল ইসলামের উদ্বোধন করার কথা থাকলেও, অসুস্থতার কারণে তিনি উপস্থিত হতে

www.pathagar.com

পারেননি। সম্মেলনের শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীর স্ত্রী বেগম আমেনা মনসুর এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সম্মেলনের সভাপতি মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর সভামঞ্চে রক্ষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য দান করেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক মিজানুর রহমান চৌধুরী। এরপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ করা হয়। অতঃপর এক শোক প্রস্তাবে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নিহত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতা এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল আন্দোলনে নিহত শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এক মিনিট নীরবতা পালন ও তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে সমবেত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'জাতির জনক লও সালাম', 'জেল হত্যার বিচার চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই', 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'মার্কিনী দালালেরা হুঁশিয়ার' ইত্যাদি স্লোগান ধ্বনিত হয়।[১৯]

জোহরা তাজউদ্দীনের উদ্বোধনী ভাষণ

কাউন্সিলের উদ্বোধক সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ রাখতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। মঞ্চে উপবিষ্ট শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীর স্ত্রী আমেনা মনসুর আলীও কান্নায় ভেঙে পড়েন। সমবেত কাউন্সিলর-ডেলিগেটদের মধ্যে এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতাকে নির্মম হত্যার পর দেশের কী অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকা এবং আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ওপর যে কোনো আঘাত প্রতিরোধ এবং জনগণের অধিকার ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাউন্সিলর-ডেলিগেটদের প্রতি আহ্বান জানান।[২০]

মিজানুর রহমান চৌধুরীর সাংগঠনিক রিপোর্ট

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক মিজানুর রহমান চৌধুরী কাউন্সিলে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় আওয়ামী লীগ সরকারের অনুমোদন লাভের পর যেসব সাংগঠনিক তৎপরতা চালানো হয়, তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বেশকিছু বক্তব্য রাখেন। তাঁর এসব বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে : ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি দৃঢ়ভাবে ধারণ, জেল হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট প্রকাশ, একজন বিচারপতির নেতৃত্বে জেল হত্যা তদন্ত কমিশন গঠন এবং অপরাধীদের যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন বন্ধ, ১৫ই আগস্ট-পরবর্তী

www.pathagar.com

ক্ষমতা দখলকারীদের পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন করার চক্রান্ত, বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র বানানোর পাঁয়তারা, পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার দাবি, ঘরোয়া নয় প্রকাশ্য রাজনীতি চর্চার অধিকার, বন্দি আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মুক্তি, জাতীয় নির্বাচন না করে স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন করার উদ্দেশ্য, ক্ষমতাহীন সরকারের নির্দলীয় দাবি প্রমাণে 'অতিসত্বর' জাতীয় নির্বাচন দেওয়া, একমাত্র আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেই ভবিষ্যতে বেসামরিক সরকার গঠন হবে মর্মে ঘোষণা, জাতীয় দিবসে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতাদের আমন্ত্রণ না জানিয়ে বরং স্বাধীনতা-বিরোধীদের আমন্ত্রণ জানানোয় ক্ষোভ, আওয়ামী লীগ-সমর্থক পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি না দেওয়া বা কালক্ষেপণ পক্ষান্তরে স্বাধীনতা-বিরোধীদের অতিদ্রুত অনুমতি প্রদানে ক্ষোভ প্রকাশ ইত্যাদি।[২১]

আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, '[বঙ্গবন্ধু] শেখ মুজিব আর সশরীরে ফিরে আসিবেন না। তবে তাঁহার আদর্শ ও চার মূলনীতি যতদিন আমরা প্রতিপালন করিতে পারিব, ততোদিন বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে বাঁচিয়া থাকিবেন।'[২২] তিনি পুনরায় বলেন, 'আমরা যদি 'বঙ্গবন্ধুর' আদর্শে বিশ্বাস করি তাহা হইলে আওয়ামী লীগকে কেহ ধ্বংস করিতে পারিবে না।'[২৩]

বর্তমান চরম প্রতিকূল অবস্থায় নেতা-কর্মীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের আজকের রাজনীতি নেতৃত্বের নয়, অস্তিত্বের। আওয়ামী লীগ না থাকিলে দেশের স্বাধীনতা থাকিবে না।'[২৪] আওয়ামী লীগ সম্বন্ধে স্বাধীনতা-বিরোধীদের কটূক্তি প্রসঙ্গে বলেন, 'যাহারা এই দেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বেঈমানী করিয়াছে, তাহারা আজ আওয়ামী লীগকে বেঈমান বলিতেছে। ইহার বিচার করিতে হইবে।'[২৫] প্রকাশ্য রাজনীতি চর্চার অধিকার দাবি করে তিনি বলেন, 'আর ঘরোয়া নয়, পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার চাই। ...আমরা জনগণের কাছে ছিলাম, জনগণের কাছে ফিরিয়া যাইতে চাই।'[২৬] ক্ষমতাসীনদের তারা 'অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য' এ দাবি সম্বন্ধে তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'আর অন্তর্বর্তীকালীন সময় বলতে কয় মাস কয় বছর হয়, তাও জানতে চাই।'[২৭] সরাসরি নাম উল্লেখ না করে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের কনফেডারেশন গঠন ও ইসলামি রাষ্ট্র বানানোর চক্রান্ত সম্বন্ধে বলেন, '১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর একটু সুযোগ পাইয়াছিল। এই সুযোগেই পাকিস্তানের সহিত কনফেডারেশনের চক্রান্ত করা হইয়াছিল। ...বর্তমান হাব-ভাব দেখিয়া মনে হয় বাংলাদেশকে যেন ইসলামী রাষ্ট্র বানাইতে চায়।'[২৮]

সভাপতি মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ-এর ভাষণ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ তাঁর ভাষণে যেসব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে :[২৯] অবিলম্বে প্রকাশ্য রাজনীতির সুযোগ, পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান, স্বাধীনতা রক্ষা ও সুসংহত করতে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের কর্তব্য, স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করার আহ্বান, আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগ নেতাসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি, জেল হত্যার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ, আওয়ামী লীগের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান ইত্যাদি।

স্বাধীনতা রক্ষায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'এদেশ স্বাধীন করার সংগ্রামে আওয়ামী লীগ ও উহার নেতা-কর্মীরা নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। তাই সেই স্বাধীনতা রক্ষা ও সুসংহত করার দায়িত্ব আমাদেরই বহন করিতে হইবে।'[৩০] জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরে তিনি বলেন :

> সরকার নিজেদেরকে নিরপেক্ষ, নির্দলীয় ও অন্তর্বর্তীকালীন বলে ঘোষণা করেছেন। রাজনৈতিক দলবিধি আইনের অধীনে ঘরোয়া রাজনীতির সীমিত সুযোগ দিয়েছেন। এর আগে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে, দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মতো পরিবেশ ছিল। প্রকাশ্য রাজনীতির সুযোগ সৃষ্টি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্যে অবিলম্বে বাস্তব কর্মসূচি ঘোষণা করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি।[৩১]

প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন

দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশন বিকেল ৩টায় মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৮টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ জেলার সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন।[৩২] সাবজেক্ট কমিটি গঠন শেষে অধিবেশনের কার্য সমাপ্ত হয়। এরপর সন্ধ্যায় কাজী জহিরুল কাইউমের বাসভবনে এ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন : গঠনতন্ত্র গ্রহণ, প্রস্তাব পাস ও কর্মকর্তা নির্বাচন

৪ঠা এপ্রিল বিকেল ৩টায় ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের বা সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

গঠনতন্ত্র গ্রহণ

তাতে ৫৬টি অনুচ্ছেদ যুক্ত দলের একটি গঠনতন্ত্র গ্রহণ করা হয়। এতে প্রথমেই বলা হয়, 'এই দলের নাম "বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ" হইবে' (অনুচ্ছেদ ১)। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতিভিত্তিক "বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি বিধান, নর-নারী ও ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান ...ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, সকল সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন"সহ শোষণমুক্ত ও সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। অনুচ্ছেদ ৩-এ রয়েছে দলের পতাকার বর্ণনা : "বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পতাকা হইবে দুই-তৃতীয়াংশ সবুজ এবং এক-তৃতীয়াংশ লাল। সবুজের উপর চারটি লাল বর্ণের তারকা খচিত থাকিবে।" অন্যান্য অনুচ্ছেদে দলের গঠনপ্রণালি বর্ণনা করা হয়। নতুন এ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক বাংলাদেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ নির্ধারিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর ও দ্বি-বার্ষিক ২ টাকা চাঁদা প্রদান করে সদস্য পদ লাভের যোগ্য হবেন (অনুচ্ছেদ ৪)।[৩৩]

www.pathagar.com

প্রস্তাব পাস

কাউন্সিলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে বেশকিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব পাঠ করেন সৈয়দ মোহাম্মদ শাহজাহান। গৃহীত প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :[৩৪]

১. জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা সমুন্নত রাখা : যে কোনো মূল্যে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা পরিবর্তনের সকল অশুভ ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে বাংলাদেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষা।

২. চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি রক্ষা : যে কোনো মূল্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি যথা জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করা।

৩. সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ চতুর্থ সংশোধনীর অধীনে প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা থেকে পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসে। আওয়ামী লীগ সবসময় সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তা বাস্তবায়নে দীর্ঘ আন্দোলন করেছে। ১৯৭৫ সালে সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন ছিল উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি সাময়িক পদক্ষেপ এবং পুনরায় সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের কথা বঙ্গবন্ধু স্বয়ং ঐ সময় বলেছিলেন।

৪. সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান : দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক শূন্যতা দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি।

৫. রাজনৈতিক দলবিধি বা পিপিআর বাতিল।

৬. জেল হত্যার বিচার দাবি।

৭. সামরিক আইনে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আপিলের সুযোগ।

৮. অন্যান্য : শিক্ষানীতি, মানবাধিকার, পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্পদ আদায়, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত, শ্রমনীতি, সুতার মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব।

এছাড়া কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন, দল পরিচালনা, নির্বাচিত কাউন্সিলর-ডেলিগেটদের নিয়ে পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস হয়, যা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

নেতৃত্ব নির্বাচন

আওয়ামী লীগের দুইদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনের শেষের দিন দলের কর্মকর্তা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ। সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানসহ দলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা তখনো কারাগারে বন্দি। অপরদিকে নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে দেখা দেয় মতানৈক্য। কেবল প্রেসিডেন্ট পদে ৬ জন প্রার্থী হওয়ার কথা জানা যায়।[৩৫] পরিশেষে সমঝোতা হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনকে আহ্বায়ক করে ৪৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, নতুন আহ্বায়ক দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে আগামী ১০ দিনের মধ্যে সাংগঠনিক কমিটির সদস্যদের নাম

www.pathagar.com

ঘোষণা করবেন। এ কমিটি চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব চালিয়ে যাবে। এও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, আওয়ামী লীগের যে সব কর্মকর্তা বা কার্যকরী কমিটির সদস্য কারাগারে আটক আছেন, তাঁরা মুক্তিলাভ করার পর স্বাভাবিকভাবেই এই কমিটির সদস্য হবেন। অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, এ কমিটি আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নতুন কাউন্সিলর নির্বাচন শেষে পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনের আয়োজন করবে।[৩৬]

কাউন্সিলে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের নাম সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে প্রস্তাব করা হলে উপস্থিত কাউন্সিলর, ডেলিগেটবৃন্দ বিপুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মাধ্যমে তা সমর্থন করেন। এরপর সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন কাউন্সিলে বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আওয়ামী লীগ একটি আদর্শভিত্তিক সংগঠন। এ ধরনের সংগঠনের মৃত্যু নেই।' তিনি আরও বলেন :[৩৭]

> জাতি আজ এক ক্লান্তিলগ্ন অতিক্রম করছে। বর্তমানে স্বাধীনতার ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ইতিহাসকে বিকৃত করা যায় না। শুধু রক্তপাত দিয়ে স্বাধীনতা আসে না। তা যদি হতো তাহলে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ সফল হতো। নেতৃত্ব ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় না। ১৯৭১ সালে 'বঙ্গবন্ধুর' ডাকেই স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় এবং তা সফল হয়।

জোহরা তাজউদ্দীন তাঁর বক্তব্যে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ সবসময় সত্য উদ্‌ঘাটন করেন অথচ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটে গেল তার প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে তাঁরা এখন পর্যন্ত সক্ষম হননি। তিনি আওয়ামী লীগ সংগঠনে সকল বিভেদ ভুলে যে কোনো মূল্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।[৩৮]

কাউন্সিল অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৫ই এপ্রিল সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির ৪৪ সদসস্যের নাম ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন :[৩৯] মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ, ফণীভূষণ মজুমদার, কাজী জহিরুল কাইয়ুম, মতিউর রহমান, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মান্নান, আবদুল মোমিন, সোহরাব হোসেন, আসাদুজ্জামান খান, মনোরঞ্জন ধর, দেওয়ান ফরিদ গাজী, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী, ডা. ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল, মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন (ঢাকা), মফিজুল ইসলাম খান কামাল, ফজলুল করিম, মোহাম্মদ হানিফ, আনসার আলী, ওমর আলী, শামসুর রহমান খান (টাঙ্গাইল), ব্যারিস্টার শওকত আলী, মহিউদ্দীন আহমদ (বরিশাল), আহম্মদ আলী (কুমিল্লা), আলী আজম ভূঁইয়া, নূরুল ইসলাম, এ বি এম তালেব আলী (ফেনী), অধ্যাপক মোহাম্মদ হানিফ (নোয়াখালী), আবদুল হাকিম (ময়মনসিংহ), খন্দকার আবুল কাশেম (পটুয়াখালী), কামরুজ্জামান (যশোর), হামিদুজ্জামান, আজিজুর রহমান আক্কাছ (কুষ্টিয়া), খন্দকার আবু তালেব (পাবনা), ডা. আলাউদ্দিন (রাজশাহী), এ কে মুজিবর রহমান (বগুড়া), লুৎফর রহমান (রংপুর), আবদুর রহিম (দিনাজপুর), সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ মহসিন (খুলনা), সৈয়দ কামাল বখত, নূরুন্নবী (ফরিদপুর), এম এ ওয়াহাব (চট্টগ্রাম), বেগম মাহমুদা চৌধুরী (ঢাকা) ও বেগম রওশন আরা মুস্তাফিজ (রংপুর)।

www.pathagar.com

আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগের ১৯৭৭ সালের এ কাউন্সিল অধিবেশন নানা দিক বিচারে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এ অবস্থা ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে বহুলাংশে তুলনীয়। স্মর্তব্য, ৫০ ও ৬০-এর দশকে প্রথমে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এবং এরপর সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মঞ্চ এনডিএফ গঠনের কারণে দীর্ঘদিন সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড স্থগিত রাখার পর ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসভবনে অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। প্রায় অনুরূপভাবে আলোচ্য কাউন্সিলের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ নাম থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নামে সংগঠনের নবযাত্রা শুরু হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, নেতৃত্ব নির্বাচন প্রশ্নে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের মতো সর্বজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বকে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও নেতৃত্বের অগ্রভাগে নিয়ে আসা, যা দলের ঐ ক্রান্তিকালে ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপর একটি বিষয় হচ্ছে, এ কাউন্সিলের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ চিরদিন যে সরকার ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, ৭৫-পরবর্তী পরিবর্তিত ও বাস্তব অবস্থার তাগিদ মেনে নিয়ে সেই পূর্বের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় দলটি পুনরায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যে ব্যবস্থা আজ বাংলাদেশে বিদ্যমান।

তথ্যনির্দেশ

১. *ইত্তেফাক*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ৩রা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১; *সংবাদ*, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৭, পৃ. ১, ৭; *আজাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১,৭,৮

২. *সংবাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৭

৩. ১৯৭৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, *ইত্তেফাক*, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৩

৪. Rehman Sobhan, 'Politics, Food and Famine in Bangladesh', *Economic and Political Weekly* (Bombay), 1 December 1979, Nurul Islam, *Making of Nation Bangladesh : An Economist's Tale*, Dhaka 2005 pp. 229-233

৫. ১৯৭৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।

৬. কমিটির পূর্ণ তালিকা দ্রষ্টব্য, নূহ-উল-আলম লেনিন, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*, পৃ. ৭২-৭৪

৭. ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে এ মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ বইয়ের অধ্যায় নয় দ্রষ্টব্য।

৮. বঙ্গবন্ধু সরকারের ১৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১০ জন এবং ৯ জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে ৮ জন মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। Talukder Maniruzzaman, *Bangladesh Revolution*, pp. 186

৯. S A Karim, *Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy*, Dhaka 2005, pp. 366-369

১০. দ্রষ্টব্য হারুন-অর-রশিদ, 'ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স এবং বাংলাদেশের সংবিধান',

www.pathagar.com

এমাজউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র : প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা*, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ১০৮-১১৪

১১. দ্রষ্টব্য 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার পক্ষ থেকে দেশবাসীর প্রতি', মহিউদ্দিন আহমদ, *জাসদের উত্থান পতন* পৃ. ২০৭; ঐ, পৃ. ১৯০

১২. দ্রষ্টব্য Abdul Latif Masoom, *Dilemmas of a Military Ruler : A Political Study of Zia Regime*, Dhaka 2000, pp. 109

১৩. গোলাম আকবর চৌধুরী, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ১৯

১৪. ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল বিচারপিতি এ এস এম সায়েমের স্থলে জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি হন। বিচারপতি সায়েম স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন।

১৫. ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৬. *সংবাদ*, ২৬শে আগস্ট ১৯৭৬, পৃ. ১, ৮

১৭. *ঐ*, পৃ. ৮

১৮. *ঐ*, পৃ. ১, ৮

১৯. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৭; *আজাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৭, ৮

২০. *আজাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৭, ৮

২১. *আজাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৭; *সংবাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৭

২২. *আজাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৭

২৩. *ইত্তেফাক*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৮

২৪. *আজাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৭; আরও *ইত্তেফাক*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৮

২৫. *আজাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৭

২৬. *সংবাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৭; *ইত্তেফাক*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৮

২৭. *সংবাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৭

২৮. *ঐ*

২৯. *সংবাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৭; *ইত্তেফাক*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৮

৩০. *ইত্তেফাক*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৮

৩১. *সংবাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৭

৩২. *ইত্তেফাক*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৮; *সংবাদ*, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৭

৩৩. সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন, *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ১৯৭৭*, গ্লোরি প্রিন্টার্স লি., ঢাকা, ৪ঠা মে ১৯৭৭

৩৪. সংকলিত, *সংবাদ*, ৫ই এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৪; *ইত্তেফাক*, ৫ই এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৮

৩৫. *আজাদ*, ৭ই এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৮

৩৬. *সংবাদ*, ৫ই এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৪; *ইত্তেফাক*, ৫ই এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৮; *আজাদ*, ১৬ই এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৮

৩৭. *সংবাদ*, ৫ই এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৪

৩৮. *ইত্তেফাক*, ৫ই এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৮; *সংবাদ*, ৫ই এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ৪

৩৯. সাংগঠনিক কমিটির সদস্যদের তালিকা, *সংবাদ*, ১৬ই এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৮; *আজাদ*, ১৬ই এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৮

www.pathagar.com

অধ্যায় : তেরো

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৮ : দলীয় ঐক্য রক্ষার সংকট

১৯৭৭ সালের কাউন্সিলের পর ১১ মাসের মধ্যে ১৯৭৮ সালের ৩-৫ই মার্চ ইডেন হোটেলে তিনদিনব্যাপী আওয়ামী লীগের পরবর্তী দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] কাউন্সিলে কর্মকর্তা নির্বাচনসহ পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পরিবর্তে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনকে আহ্বায়ক করে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়েছিল। একই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েক মাসের ব্যবধানে বর্তমান কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন। এর উদ্বোধন করেন বেগম মনসুর আলী। সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন ও দলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী উভয়ই তাঁদের স্ব-স্ব সময়ের রিপোর্ট পেশ করেন। কাউন্সিলর-ডেলিগেট ছাড়াও অনেক আমন্ত্রিত অতিথি এতে উপস্থিত ছিলেন। দলের নেতৃত্ব নিয়ে চরম কোন্দল এবং স্লোগান-পাল্টা স্লোগানের মধ্যে এ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এ কাউন্সিলকে ঘিরে আওয়ামী লীগের দলীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে হুমকি দেখা দেয়।

পটভূমি

ঘরোয়া রাজনীতি, মোশতাক-সায়েমের জাতীয় নির্বাচনের অঙ্গীকার উপেক্ষা করে জেনারেল জিয়ার স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন আয়োজন (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭), সংবিধানের প্রস্তাবনাসহ ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মৌলিক পরিবর্তন (এপ্রিল ১৯৭৭), ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি (সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ বাতিল), জিয়ার তথাকথিত আস্থা বা হ্যাঁ-না ভোট (৩০শে মে ১৯৭৭), জিয়ার আশীর্বাদপুষ্ট জাগদল (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮), দল পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল ইত্যাদি কাউন্সিল-পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আলোচ্য সময়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বরের সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি নেতৃত্বের অগ্রভাগে উঠে আসেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁর অবস্থা সুসংহত করতে আরও কিছুটা সময় নেন, যা পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৩০শে নভেম্বর বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে সরিয়ে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। পরবর্তী বছর ২১শে এপ্রিল তিনি বিচারপতি সায়েমের স্থলে নিজেকে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করেন।[২] তিনি একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর প্রধান পদেও বহাল থাকেন।[৩] নিজের অবস্থা সুসংহত করতে তিনি সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেন। একই উদ্দেশ্যে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি, সামরিক খাতে বাজেট বৃদ্ধি, নতুন সেনা ডিভিশন গঠন, বিশেষ পুলিশ ফোর্স গঠন, গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি

www.pathagar.com

পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সহায়তাদানকারী, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তে ঐ সময়ে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনকারী চীন এবং সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জেনারেল জিয়া জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সহায়তা নিয়ে ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ ছিটকে পড়া অবস্থা থেকে পুনরুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতার অগ্রভাগে উঠে আসতে সমর্থ হন বটে, কিন্তু সপ্তাহ যেতে না যেতেই এঁদের ওপর নেমে আসে তার খড়্গ। মোশতাক-সায়েমের ঘোষণা অনুযায়ী নির্ধারিত সময় (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭) জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান না করে তিনি স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচন নিয়ে পর্যায়ানুক্রমে অগ্রসর হন। জানুয়ারি মাসে ইউনিয়ন পরিষদ এবং আগস্ট মাসে পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন।

এদিকে রাষ্ট্রপতি পদে নিজেকে আসীন করার পরের দিন ২২শে এপ্রিল (১৯৭৭) তিনি রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে এক সংবিধান সংশোধনী আদেশবলে ৭২-এর বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনা ও এর দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতির দুটি—জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ২৫নং অনুচ্ছেদে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনেন। 'জাতীয়তাবাদ' কথাটি বহাল থাকলেও এ দ্বারা 'বাঙালির' (অসাম্প্রদায়িক চেতনা-বৈশিষ্ট্য অর্থে) পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' (অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে ধর্মীয় চেতনা-বৈশিষ্ট্য সংমিশ্রিত) জাতীয়তাবাদ জুড়ে দেওয়া হলো। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নীতি সম্পূর্ণ বাতিল করে তদস্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস' এ-কথা প্রতিস্থাপিত হলো। 'সমাজতন্ত্র' নীতির সঙ্গে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার' এ ব্যাখ্যা যুক্ত করা হলো। চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মধ্যে সংবিধানে শুধু 'গণতন্ত্র' মূলনীতি হিসেবে অপরিবর্তিত থাকল। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়ে দাঁড়াল: 'রাষ্ট্র ইসলামিক সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর সাথে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ ও জোরদার করার চেষ্টা করবে।'[৪] এর পূর্বে ১৯৭৬ সালের ৩রা মে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের এক আদেশবলে ৭২-এর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮ বাতিল করা হয়,[৫] যাতে পূর্বে ধর্মভিত্তিক বা কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘ, সমিতি বা দল গঠন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এখন সে বিধিনিষেধ উঠে গেল। এক কথায়, বাঙালির যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য, যা মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল, তার স্থলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস এতে স্থান করে নেয়। ফলে রাষ্ট্র এর সর্বজনীন রূপ হারিয়ে সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, অন্তত আনুষ্ঠানিক অর্থে। এভাবে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার নব-উত্থানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইনগত ভিত্তি তৈরি হয়।

অতঃপর ১৯৭৭ সালের ৩০শে মে জেনারেল জিয়া কর্তৃক পাকিস্তানি শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের অনুকরণে দেশব্যাপী আস্থাভোট বা রেফারেন্ডাম-এর আয়োজন করা হয়। জেনারেল জিয়া ও তার এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি

www.pathagar.com

ভোটারদের আস্থা আছে কি-নাই, সেটিই ছিল একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। ফলাফলে তিনি প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯৮.৮৮ ভাগ হ্যাঁ-সূচক ভোট পান বলে ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের উভয় অংশের ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর মধ্যে তাঁর প্রতি আস্থা যাচাই করতে হ্যাঁ-না ভোটের আয়োজন করেছিলেন। তিনি তখন শতকরা ৯৫.৬ ভাগ হ্যাঁ-ভোট পেয়েছিলেন।[৬] প্রাপ্ত ভোটের হার বিবেচনায় জেনারেল জিয়ার সাফল্য জেনারেল আইয়ুবের চেয়েও অধিক। তবে এ ধরনের ভোটের আয়োজন সব সময়ই একপক্ষীয় হয়, আর তাই এর গ্রহণযোগ্যতা থাকে সর্বদা প্রশ্নবিদ্ধ। আওয়ামী লীগ এ গণভোট অঘোষিতভাবে বর্জন করে। তবে, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মিত্র হিসেবে পরিচিত ন্যাপ (মোজাফফর) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি জেনারেল জিয়ার সমর্থনে এ ভোটে অংশগ্রহণ করে।

হ্যাঁ-না ভোট আয়োজনের পূর্বে জেনারেল জিয়া তথাকথিত 'উৎপাদনের রাজনীতি'র নামে তাঁর ১৯-দফা আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি নিয়ে চার সপ্তাহব্যাপী সারা দেশজুড়ে গণসংযোগ করেন। বস্তুত, তিনি সুদূরপ্রসারী এক রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। গণভোট ছিল তার অংশমাত্র। পরে (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮) জিয়ারই পৃষ্ঠপোষকতায় তার ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) নামে একটি দল গঠন করেন। পরে এর সঙ্গে আওয়ামী লীগ-বিরোধী অন্য দল ও ব্যক্তিরা যোগ দেয়। এভাবে এক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা পায় বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (বিএনপি), যার সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আওয়ামী লীগে তাঁর মতো আর কোনো সম্মোহনী নেতা থাকলেন না। নেতৃত্বের পরের স্তরে ছিলেন জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্বদান করার মতো এবারও তাঁর অবর্তমানে তাঁরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে দলকে পুনরায় সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অনেকটা ভূমিকা পালন করতে পারতেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর বন্দি অবস্থায় তাঁদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ফলে দলের পুনর্গঠনকে কেন্দ্র করে দেখা দেয় নেতৃত্বের কোন্দল, যা ১৯৭৬-১৯৭৭ সময়েই প্রকাশ পায়। আলোচ্য কাউন্সিল উপলক্ষে তা চরম ও প্রকাশ্য রূপ নেয়। দলের ভাঙন নিশ্চিত বলে অনেকে মনে করতে থাকেন।[৭] অপরদিকে, তখনো দেশে প্রকাশ্য রাজনৈতিক অধিকার ছিল না,[৮] চলছিল 'ঘরোয়া রাজনীতি'। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকে যেমন শেখ আবদুল আজিজ, ফণীভূষণ মজুমদার, আব্দুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান, নুরুল হক, তোফায়েল আহমেদ, গাজী গোলাম মোস্তফা, সরদার আমজাদ হোসেন, আব্দুল মান্নান, রওশন আলী, এখলাসুর রহমান, রহমত আলী, আমজাদ হোসেন, শ্রমিক লীগের আব্দুল মান্নান প্রমুখ তখনো কারাবন্দি অবস্থায়।[৯] এছাড়া সারাদেশ জুড়ে দলের ও এর সহযোগী সংগঠনসমূহের বিভিন্ন স্তরের শত শত নেতা-কর্মী কারাগারে আটক ছিলেন। এমনই এক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অবস্থায় আয়োজিত হয় ১৯৭৮ সালের আওয়ামী লীগ কাউন্সিল।

www.pathagar.com

কাউন্সিল অধিবেশন

আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন ৩রা মার্চ ১৯৭৮ বিকেল ৩টায় হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে শুরু হয়। উদ্বোধক ছিলেন শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীর সহধর্মিণী বেগম মনসুর আলী। এতে সারাদেশ থেকে ১৫০০ কাউন্সিলর ও সমসংখ্যক ডেলিগেট যোগ দেন।[১০] কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বের দিন বিডিআর (বর্তমান বিজিবি)-এর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব.) শওকত আলী ও কর্নেল (অব.) আনওয়ারুল্লাহ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন[১১] এবং মনোনীত কাউন্সিলর হিসেবে অধিবেশনে অংশ নেন। তাঁদেরকে কাউন্সিলে উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। নির্ধারিত কাউন্সিলর-ডেলিগেটস ছাড়াও যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মাইক ব্যবহার করে সভার কার্য শুরু হয়।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সদ্য কারামুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক। কাউন্সিল প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বেগম মনসুর আলী এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন। সভামঞ্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান, ১৫ই আগস্টে শহিদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মনি এঁদের প্রতিকৃতি রক্ষিত ছিল। চারটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ শেষে এঁদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর টেপ রেকর্ডার বাজিয়ে ও তারও পরে দেলোয়ার হোসেন নামে এক শিল্পী বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত দুটি সংগীত পরিবেশন করেন।[১২]

কাউন্সিলে উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন আব্দুল মালেক উকিল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, বেগম সাজেদা চৌধুরী, মহিউদ্দিন আহমেদ, কোরবান আলী, আব্দুল মান্নান, মতিউর রহমান, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, আসাদুজ্জামান খান, আব্দুর রাজ্জাক, দেওয়ান ফরিদ গাজী, আবদুল মোমেন তালুকদার, খন্দকার ইলিয়াস, সোহরাব হোসেন, নুরুল ইসলাম প্রমুখ।[১৩] তখন দলের নেতাদের অনেকে কারাবন্দি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও ১৫ই আগস্টে নিহত তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতা, আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মনি প্রমুখের জন্যও শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে এসব হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও বিচার এবং জেল হত্যার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবি করা হয়। এক প্রস্তাবে ১৫ই আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস' ঘোষণার দাবি জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুসহ অন্য নেতৃবৃন্দের হত্যাকারীদের চাকরি হতে অপসারণ ও বিচার দাবি করা হয়।[১৪]

www.pathagar.com

বেগম মনসুর আলীর ঐক্যের আহ্বান

কাউন্সিলের উদ্বোধন ঘোষণাকালে বেগম মনসুর আলী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর নেতা-কর্মীদের 'একতাই বল' এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যে কোনো অবস্থায় দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার 'আকুল আবেদন জানিয়ে' বলেন, 'আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠান। সারা জীবন দিয়া তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়া থাকুক।'[১৫] 'সবার মধ্যে ঐক্য থাক, কোন বিভেদ যেন না আসে।'[১৬]

বেগম সাজেদা চৌধুরীর বক্তব্য ও রিপোর্ট পেশ

আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী গ্রেফতার হওয়ার কারণে ১৯৭৭ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদান করতে পারেননি।[১৭] কারামুক্তির পর এবারের কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। কাউন্সিলে তিনি তাঁর সময়কার সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। এছাড়া তিনি অন্যান্য বিষয়েও বক্তব্য রাখেন।[১৮] তিনি তাঁর বক্তব্যে দলের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থি, 'বামপন্থী মুখোশধারী' ও জাতীয়তাবাদী এই তিন মতাদর্শের অনুসারী রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দক্ষিণপন্থি অংশ 'কথার মারপ্যাঁচে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে সরে যেতে চায়। তারা চার মূলনীতির বাস্তবায়ন চায় না।' অপরদিকে বাম মুখোশধারীরা 'পরাশক্তির শিখণ্ডী হিসেবে বিদেশি ভাবধারা আনতে চায়।' নিজেকে সত্যিকার জাতীয়তাবাদী হিসেবে তুলে ধরে তিনি তাঁর বক্তব্যে উভয় গ্রুপ সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'প্রয়োজনে এসব লোককে সংগঠন থেকে বের করে দিতে হবে।' দলীয় ঐক্যের প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য, 'আদর্শগত পার্থক্য থাকিলে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।' তিনি আদর্শভিত্তিক দলীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অঙ্গীকার ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের পূর্ণ সম্মতি নিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাব।' তিনি দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের সুপারিশ করে বলেন, '[বঙ্গবন্ধু] শেখ মুজিবের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন নেতা আজ আওয়ামী লীগে না থাকায় কাহারও হাতে এখন একক ক্ষমতা দেওয়া উচিত হইবে না।'

সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের ভাষণ ও রিপোর্ট পেশ

অধিবেশনের সভাপতি ও আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন সর্বশেষে কাউন্সিলে একটি লিখিত ভাষণ রাখেন,[১৯] যাতে তিনি তাঁর এক বছর সময়ের সাংগঠনিক রিপোর্ট তুলে ধরেন। তাঁর এ সময়ে ৬৫টি সাংগঠনিক জেলা কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।[২০] তিনি তাঁর রিপোর্টে এও উল্লেখ করেন যে, গত এক বছরে ৫৭টি সাংগঠনিক জেলার দলীয় কর্মী সমাবেশে তিনি যোগ দেন। তাঁর বক্তব্যের অন্য উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে : সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কাউন্সিল অধিবেশনে মাইক ব্যবহার এবং এটিকে আন্দোলনের শুরু হিসেবে বর্ণনা করা, বঙ্গবন্ধুকে মহান শিক্ষক হিসেবে আখ্যায়িত করা, আওয়ামী লীগকে গড়ে তুলতে

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের ত্যাগ ও সংগ্রাম, শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে বঙ্গবন্ধুর 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ, 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' কর্মসূচি গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের এদেশীয় চক্র কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা, ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫)-পরবর্তী সামরিক শাসন, সকল গণতান্ত্রিক কার্যক্রম বন্ধ হওয়া, বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি, জনগণের ওপর বাড়তি করের বোঝা, জমির খাজনা বৃদ্ধি, পাঠ্যপুস্তকের মূল্যবৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পে-কমিশনের রিপোর্ট, বারবার ঘোষণা সত্ত্বেও জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা, একটার পর একটা নতুন বিধি জারি, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে নিষ্পেষণ করার দুরভিসন্ধি নিয়ে 'জননেতা সম্পত্তি হিসাব' দাখিলের সরকারি নির্দেশ, নির্বাচিত সরকারের অনুপস্থিতি তথা রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে বাংলাদেশকে আমলাতান্ত্রিক চক্র কর্তৃক 'অক্টোপাসের' মতো আঁকড়ে ধরা ইত্যাদি। তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষে স্বাধীনতা-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা এবং 'পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার'-এ উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রকাশ্য রাজনীতি করার অধিকারের দাবিতে বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে রাজনীতিকে আর চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে দেওয়া যায় না।' অতঃপর নেতা-কর্মীদের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়ে সে জন্য মানসিক প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন :

> এক বছর আগে যখন আমি সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন দলীয় কর্মীরা আন্দোলনের ডাক আর কর্মসূচি চেয়েছিলেন।...সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আন্দোলনের ঝুঁকি গ্রহণ করার মধ্যেই প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয়। আমরা একটা পর্ব শেষ করে আর একটি পর্বে যাচ্ছি। এই পর্বে 'বঙ্গবন্ধুর' চার মূলনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।[২১]

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

৪ঠা মার্চ সকাল ১০টায় কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন নির্দিষ্ট ছিল। এতে সাংগঠনিক জেলাসমূহের পক্ষে রিপোর্ট পেশ এবং তার ওপর নেতৃবৃন্দের আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঢাকা নগরসহ বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার তালিকাভুক্ত কাউন্সিলরদের অনেকে কার্ড না পাওয়ায় অধিবেশন শুরুর পূর্ব থেকেই তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। বিক্ষোভকারীরা এও দাবি করেন যে, 'প্রকৃত কাউন্সিলরদের পরিবর্তে অনেক ভুয়া কার্ড ইস্যু হয়েছে'।[২২] কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিষয়টি নিয়ে তাৎক্ষণিক জরুরি বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে জানানো হয় যে, বিভিন্ন জেলা হতে নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত কাউন্সিলরদের নাম প্রেরণ করায় ইতঃপূর্বে সাংগঠনিক কমিটি এক বৈঠকে প্রতি জেলার জন্য শতকরা ২০ ভাগ কাউন্সিলর কার্ড বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সময়ের অভাবে যথাসময়ে তাঁদের কাছে কার্ড পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় পূর্বে ইস্যুকৃত কাউন্সিলর কার্ড বাতিল করে নতুন করে তা ইস্যু এবং কাউন্সিল উপলক্ষ্যে উপস্থিত সাংগঠনিক জেলাসমূহের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।[২৩] উদ্ভূত অবস্থায় দ্বিতীয় দিনের কাউন্সিল

www.pathagar.com

অধিবেশন মূলতুবি করে পরের দিন বিকেল ৩টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়। তবে নেতৃবৃন্দের এসব ব্যাখার বাইরেও দলের অভ্যন্তরে নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে তীব্র বিরোধকে এরূপ অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে মনে করা যায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কাউন্সিলরদের কার্ড ইস্যুর বিষয়টি নিয়ে নেতৃবৃন্দ যখন রুদ্ধদ্বার বৈঠকে রত, তখন কাউন্সিল প্যান্ডেলের চতুর্দিকে বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ ও যুব-কর্মীরা স্লোগান-পাল্টা স্লোগান দিচ্ছিল। এক দলের কণ্ঠে ছিল : বিভেদ না ঐক্য-ঐক্য ঐক্য, সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে লড়তে হবে একসাথে, শেখ শেখ শেখ মুজিব, লও লও লও সালাম, মার্কিনী দালালেরা হুঁশিয়ার, সিআইএ'র দালালেরা হুঁশিয়ার, সরকারি দালালেরা হুঁশিয়ার প্রভৃতি। অপর দলের স্লোগান ছিল : তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা, রুশ-মার্কিন চিনি না, বঙ্গবন্ধু ছাড়া মানি না, মস্কো না ওয়াশিংটন, ঢাকা ঢাকা, মুজিববাদের ভিত্তিতে লড়তে হবে এক সাথে। তবে উভয় গ্রুপের অভিন্ন স্লোগান ছিল 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'।[২৪] এ থেকে স্পষ্ট যে, এর দ্বারা এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে সোভিয়েতপন্থি কিংবা মার্কিনপন্থি হিসেবে লেভেল দেওয়ার চেষ্টা করছিল। তবে উভয় গ্রুপকেই বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য রেখে তা করতে হয়েছিল। মত বা দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে নেতা-কর্মীদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিল সর্ব-উর্ধ্বে বা সর্বজনীন এবং এটি তারই প্রমাণ।

কাউন্সিল অধিবেশনের শেষ দিন : নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন

৫ই মার্চ ছিল কাউন্সিল অধিবেশনের শেষ দিন। কার্যসূচিতে একমাত্র বিষয় ছিল দলের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সাংগঠনিক জেলাসমূহের রিপোর্ট পেশ ও এর ওপর আলোচনার কথা থাকলেও ঐ অধিবেশন মুলতবি হয়ে যাওয়ার কারণে তা হতে পারেনি। অধিবেশনের শেষের দিন সকালে একটি সেশনের আয়োজন করে সেটি সম্পন্ন করা যেত। কিন্তু দলের নেতৃত্ব নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নেতৃবৃন্দের মধ্যে চরম মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। এমনকি শেষের দিনের অধিবেশন বিকেল ৩টায় নির্ধারিত থাকলেও তাও দুই ঘণ্টা বিলম্বে বিকেল ৫টায় সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।[২৫]

কাউন্সিল অধিবেশন শুরুর দিন ৩রা মার্চ *দৈনিক সংবাদ-এ* 'আজ কাউন্সিল অধিবেশন। নেতৃত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগে কোন্দল' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি সবিস্তার চিত্র পাওয়া যায়।[২৬] প্রতিবেদনে সম্ভাব্য যে-সব প্যানেলের কথা উল্লেখ করা হয়, তা হচ্ছে : জোহরা তাজউদ্দীন-আব্দুর রাজ্জাক, মহিউদ্দিন-আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুল মালেক উকিল-আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুল মালেক উকিল-মতিউর রহমান (রংপুর), আব্দুল মালেক উকিল-মিজানুর রহমান চৌধুরী, কোরবান আলী-আব্দুর রাজ্জাক, কোরবান আলী-বেগম সাজেদা চৌধুরী, মিজানুর রহমান চৌধুরী-মতিউর রহমান প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন, আব্দুর রাজ্জাক, মহিউদ্দীন আহমেদ ছিলেন একপক্ষে আর মিজানুর রহমান চৌধুরী, মতিউর রহমান ছিলেন অপরপক্ষে। আব্দুল মালেক উকিল কোনো গ্রুপের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হয়ে নিজেকে এর উর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করেন। কোরবান আলী

www.pathagar.com

ছিলেন মধ্যপন্থি। জোহরা তাজউদ্দীন এর পূর্বে এক বছর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন ও সারাদেশে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হন। তবে তিনি নিজের প্রার্থিতার ব্যাপারে নমনীয় ছিলেন। অপরদিকে, দলের অন্যতম সিনিয়র নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী যিনি ৬০-এর দশকে ৬-দফা আন্দোলনকালে একটি সময়ে দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি দলের সভাপতি পদের জন্য খুবই আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। গত কাউন্সিল (১৯৭৭), যাতে দলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন না করে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনকে আহ্বায়ক করে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সে সময়ও মিজানুর রহমান চৌধুরী দলের প্রধান পদের প্রত্যাশী ছিলেন। দলের সিনিয়র নেতাদের কেউ কেউ তাঁর পক্ষে ছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বা মাঝ বয়সী নেতা-কর্মীরা তাঁকে মার্কিন বা পাশ্চাত্যঘেঁষা হিসেবে দেখতেন। পক্ষান্তরে, জোহরা তাজউদ্দীন, আব্দুর রাজ্জাক, মহিউদ্দীন আহমেদ এঁদের বঙ্গবন্ধুর 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বা শোষণমুক্তির পক্ষের হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সে অর্থে, তাঁদের মধ্যকার এ প্রভেদের মূলে এক ধরনের আদর্শগত বিবেচনা ক্রিয়াশীল ছিল বটে, তবে শীর্ষ নেতৃত্ব লাভের বিষয়টিই মুখ্য ছিল বলে মনে হয়। আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী, দলের কাউন্সিলর বিশেষ করে এদের অপেক্ষাকৃত তরুণ অংশের মধ্যে ৬০-এর দশকের বলিষ্ঠ ছাত্রনেতা, পরে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ও বঙ্গবন্ধুর স্নেহভাজন আব্দুর রাজ্জাক, যিনি ১৯৭২ সালের কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তরুণ কাউন্সিলরবৃন্দের চেষ্টা ছিল তাঁকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি সর্বসম্মত প্যান্ডেল তৈরি ও তা নির্বাচিত করা।

দলের ঐক্য রক্ষার্থে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে একটি একক প্যানেল তৈরির ব্যাপারে নেতৃবন্দ নানা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। কাউন্সিল অধিবেশন শুরুর পূর্বে ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২রা মার্চ এ সময়ে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি তিনদিনে মোট ২৬ ঘণ্টা বৈঠক করেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি।[২৭] একই ব্যাপারে কাউন্সিল অধিবেশন চলাকালে ৪ ও ৫ তারিখ দলের বিষয় নির্বাচনি কমিটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হয়। অতঃপর ৫ তারিখ কাউন্সিলের শেষদিন সকালে ও বিকালে পার্টির সিনিয়র নেতা কাজী জহিরুল কাইউমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুই দফা বৈঠক শেষে একটি সর্বসম্মত প্যানেল তৈরি করা সম্ভব হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে আব্দুর রাজ্জাক প্রস্তাবিত নতুন কমিটির সদস্যদের নাম পাঠ করেন। এরপর অধিবেশনের সভাপতি সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন বিষয় নির্বাচনি কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত প্যানেলটি কাউন্সিলরদের অনুমোদনের জন্য পেশ করলে 'তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির পর হাত তুলে এবং সমর্থক সূচক ধ্বনি দিয়ে' কাউন্সিলরবৃন্দ তা অনুমোদন করেন।[২৮] নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন :

সভাপতি	:	আব্দুল মালেক উকিল
সহ-সভাপতি	:	সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন

www.pathagar.com

		মতিউর রহমান
		আব্দুল মান্নান
		রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া
		মহিউদ্দিন আহমদ
		আব্দুল মমিন তালুকদার
সাধারণ সম্পাদক	:	আব্দুর রাজ্জাক
যুগ্ম-সম্পাদক	:	বেগম সাজেদা চৌধুরী
সালাহ উদ্দীন ইউসুফ		
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	তোফায়েল আহমেদ[২৯]
প্রচার সম্পাদক	:	সরদার আমজাদ হোসেন
দফতর সম্পাদক	:	সৈয়দ আহম্মদ
শ্রম সম্পাদক	:	কাজী মোজাম্মেল হক
কৃষি সম্পাদক	:	কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	এস এম ইউসুফ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	ইয়াহিয়া চৌধুরী পিন্টু
মহিলা সম্পাদিকা	:	বেগম আইভি রহমান
যুব সম্পাদক	:	আমির হোসেন আমু
কোষাধ্যক্ষ	:	ফজলুল করিম

লক্ষণীয় যে, ১৯৭৪ সালে দলের বিভাগীয় কর্মকর্তার সংখ্যা যেখানে ছিল ১৪ জন, সেখানে ১৯৭৮ সালে এসে তা দাঁড়ায় ২০ জনে। পূর্বের ৩টি সহ-সভাপতি পদের স্থলে আরও ৩টি সহ-সভাপতির পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৪৯) ব্যতীত পূর্বে যুগ্মসম্পাদকের পদ ছিল না। এবারের কাউন্সিলে ২টি যুগ্মসম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা হয়। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদের সঙ্গে শিক্ষা যুক্ত করে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক করা হয়। যুব সম্পাদকের পদ পূর্বে কখনই ছিল না, এটি নতুন। আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কর্মকর্তাদের মধ্যে মিজানুর রহমান চৌধুরীর নাম অন্তর্ভুক্ত নেই। ৬ জন সহ-সভাপতির মধ্যেও তাঁর স্থান হয়নি।

যাহোক, অনেক প্রচেষ্টার পর সর্বসম্মতিক্রমে দলের কর্মকর্তা নির্বাচন সম্ভব হলেও শীঘ্রই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন নিয়ে নতুন বিরোধ দেখা দেয় এবং তা প্রকাশ্য রূপলাভ করে। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কর্মকর্তা নির্বাচনের পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলের সভাপতি কর্তৃক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ মনোনীত হয়ে থাকেন। বর্তমান কাউন্সিল শেষে ২৩শে মার্চ দৈনিক *সংবাদে* এ সংক্রান্ত দুটি তালিকা প্রকাশিত হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক প্রথম সহ-সভাপতি সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের প্রতিস্বাক্ষরে ৬৩ জনের একটি তালিকা ২২শে মার্চ ঘোষণা করেন।[৩০] অপরদিকে, দলের সভাপতি আব্দুল মালেক উকিল এর একদিন

www.pathagar.com

পূর্বে ২১শে মার্চ ২৭ জনের একটি তালিকা প্রকাশ করেন এবং ১১ জনের নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে উল্লেখ করেন।[৩১] আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্য ছিল, 'সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার স্বার্থে সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও প্রথম সহ-সভাপতির পক্ষে পরামর্শ ও তাদের অনুমোদনক্রমে সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির ৬৩ জন সদস্য মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা করা হয়।'[৩২] তিনি এও দাবি করেন যে, সভাপতি, প্রথম সহ-সভাপতি ও তিনি নিজে সর্বসম্মতিক্রমে তালিকাটি প্রণয়ন করেন এবং সেটি ২৫শে মার্চ তারিখে সংবাদপত্রে প্রেরণের কথা ছিল। সভাপতি কর্তৃক একতরফা নাম ঘোষণায় 'ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ' করে আব্দুর রাজ্জাক দাবি করেন যে, মালেক উকিলের স্বাক্ষর করা সদস্য তালিকা আওয়ামী লীগ অফিস থেকে পাঠানো হয়নি। পক্ষান্তরে, আব্দুল মালেক উকিল এক বিবৃতিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক ও প্রথম সহ-সভাপতি সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের এধরনের কার্যক্রমকে 'সম্পূর্ণ অবৈধ, গঠনতন্ত্র বিরোধী ও দুর্ভাগ্যজনক' বলে অভিহিত করেন। তিনি দলের গঠনতন্ত্রের বিধানবলে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন একথা উল্লেখ করে দাবি করেন যে, আব্দুর রাজ্জাক ও সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন এঁদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের সম্মতিতেই তিনি তাঁর ঐ তালিকা তৈরি করেন। তিনি এও উল্লেখ করেন যে, কাউন্সিলে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত দলের গঠনতন্ত্রের কোনো সংশোধনী করা হয়নি, তাই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সংখ্যা কিছুতেই ৬৩ জন নয়।[৩৩] এরপর ২৭শে মার্চ আওয়ামী লীগের ৯১ নবাবপুর রোড কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একইদিন সকাল ১০টায় আব্দুর রাজ্জাক এবং বিকেল ৩টায় আব্দুল মালেক উকিল দলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করেন।

এমতাবস্থায় দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আপোসের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে দলের প্রবীণ নেতা কাজী জহিরুল কাইউম এবং কোরবান আলী বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের যথাক্রমে শান্তিবাগ ও ওয়ারির বাসভবনে একাধিক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বৈঠক হয়।[৩৪] অবশেষে ৮ই এপ্রিল গভীর রাতে কোরবান আলীর বাসভবনে আব্দুল মালেক উকিল ও আব্দুর রাজ্জাক উভয়ের উপস্থিতিতে প্রবীণ নেতৃবৃন্দের মধ্যস্থতায় একটি সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়। সে অনুযায়ী কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সংখ্যা ৪৭ (২০ কর্মকর্তাসহ) থেকে ৫৪ জনে উন্নীত করা হয়। সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২৭ জনের তালিকা ঠিক রেখে (যার মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক প্রকাশিত তালিকার ১৫ জনের নাম অভিন্ন ছিল) সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের তালিকা থেকে নতুন ৭ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে একটি বিবৃতি পত্র পত্রিকায় প্রেরণ করা হয়।[৩৫] এভাবে ২০ জন কর্মকর্তা ব্যতীত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে আরও যে ৩৪ জন সদস্যের নাম চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়, তাঁরা হলেন :[৩৬]

কোরবান আলী, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, শেখ আব্দুল আজিজ, কাজী জহিরুল কাইয়ুম, মিজানুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ফণীভূষণ মজুমদার, আব্দুস সামাদ আজাদ, আব্দুল মোমিন, সোহরাব হোসেন, জিল্লুর রহমান, দেওয়ান ফরিদ গাজী, মোহাম্মদ মহসীন, মনোরঞ্জন ধর, মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন,

www.pathagar.com

সিরাজুল হক, এ কে মজিবুর রহমান, এ কে এম শামসুজ্জোহা, আজিজুর রহমান আককাস, শামসুর রহমান খান, লুৎফর রহমান, ডা. আলাউদ্দিন, মহিউদ্দীন আহমদ, কামরুজ্জামান, মোহাম্মদ ইউনুস আলী, এস এম নূরুন্নবী, আব্দুল্লাহ আল হারুন, জহিরুল ইসলাম, এবিএম তালেব আলী, মোজাফফর হোসেন পল্টু, খালেদ মোহাম্মদ আলী, সৈয়দ হায়দার আলী, হরনাথ বাইন ও আব্দুর রউফ।

পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন[৩৭]

কাউন্সিলের শেষের দিন কর্মকর্তা নির্বাচনের পাশাপাশি ১০ সদস্যের একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হয়। এর নির্বাচিত সদস্যরা হলেন কোরবান আলী, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, আব্দুল মান্নান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, আব্দুল মোমিন, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন, কাজী জহিরুল কাইউম ও লুৎফর রহমান (গাইবান্ধা)। দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে এর সদস্য ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর জাতির জন্য ও দল হিসেবে আওয়ামী লীগের জন্যও এক বিরাট নেতৃত্বশূন্যতা দেখা দেয়। এটি ঠিক, ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারণে দলের সভাপতি পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে শুধু ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থেকেছিলেন। দলের পদে আনুষ্ঠানিকভাবে না থাকলেও তাঁর উপস্থিতিই ছিল বড় কথা, কেননা তিনিই ছিলেন দলের প্রাণ এবং তাঁর প্রতি দলের সকল স্তরের নেতা-কর্মীর আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি ছিলেন সকলের কাছে বটবৃক্ষতুল্য। তাই বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে নেতৃত্বের প্রশ্নে দলকে বেশকিছু সময় ধরে টানাপড়েন ও সংকটের মোকাবেলা করতে হয়। আলোচ্য কাউন্সিলেও তা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অনেক প্রচেষ্টা শেষে দলের ঐক্য সে সময়ে বজায় রাখা সম্ভব হলেও এর মাত্র পাঁচ মাস পর (১১ই আগস্ট ১৯৭৮) মিজানুর রহমান চৌধুরী (যিনি ওয়ার্কিং কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে দল থেকে বের হয়ে গিয়ে পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন করেন।[৩৮] দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ১৮ই আগস্ট মিজানুর রহমান চৌধুরী ও আরও ৭ জনকে মূল আওয়ামী লীগ থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়, যা সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

তথ্যনির্দেশ

১. *সংবাদ*, ৩রা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৮, পৃ. ৮; গোলাম আকবর চৌধুরী, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও আওয়ামী লীগের ভূমিকা*, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ২১। তিনি ভুলবশত কাউন্সিলের মাস ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ উল্লেখ করেছেন, হবে মার্চ ১৯৭৮।

২. বিচারপতি সায়েম স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন।

৩. *সংবাদ*, ২৩শে এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১

৪. পূর্ণ বিবরণী, *সংবাদ*, ২৩শে এপ্রিল ১৯৭৭, পৃ. ১, ৮; আরও হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩০৯

www.pathagar.com

৫. *ইত্তেফাক*, ৫ই মে ১৯৭৬, পৃ. ১, ৮
৬. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ২২৪, ৩৫৪
৭. দ্রষ্টব্য *সংবাদ*, ৩রা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮
৮. ১৯৭৮ সালের ১লা মে থেকে রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।
৯. *সংবাদ*, ২রা এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮
১০. *ঐ*, ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৮
১১. দ্রষ্টব্য *সংবাদ*, ৩রা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮। যোগদান অনুষ্ঠানে এক লিখিত বক্তব্যে জেনারেল খলিল বলেন, 'দেশে বর্তমানে এক চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করছে... বহু সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষায় পরীক্ষিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে বলে বিশ্বাস করেই আমি আওয়ামী লীগে যোগদান করছি।'
১২. বিস্তারিত *সংবাদ*, ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৮
১৩. *সংবাদ*, ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৮
১৪. *ইত্তেফাক*, ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৮
১৫. *ঐ*
১৬. *সংবাদ*, ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৮
১৭. *ঐ*, পৃ. ১; গোলাম আকবর চৌধুরী, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ১৯
১৮. দ্রষ্টব্য *সংবাদ*, ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৮
১৯. দ্রষ্টব্য *ঐ*
২০. মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানের ২রা মার্চ (১৯৭৮) আওয়ামী লীগে যোগদান অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন এ তথ্য দেন। *সংবাদ*, ৩রা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৮
২১. *সংবাদ*, ৪ঠা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১
২২. বিস্তারিত, *সংবাদ*, ৫ই মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ৫ই মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৮
২৩. *সংবাদ*, ৫ই মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮
২৪. *ঐ*, পৃ. ১
২৫. *সংবাদ*, ৬ই মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮
২৬. *সংবাদ*, ৩রা মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮
২৭. *ঐ*, পৃ. ১
২৮. *সংবাদ*, ৬ই মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ৬ই মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৮
২৯. কারাগারে বন্দি অবস্থায় নির্বাচিত। তিনি ১৯৭৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হন এবং ১২ই এপ্রিল ১৯৭৮ মুক্তি লাভ করেন।
৩০. আব্দুর রাজ্জাক ঘোষিত তালিকায় যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হলেন : কাজী জহিরুল কাইয়ুম, কোরবান আলী, শেখ আব্দুল আজিজ, ফণীভূষণ মজুমদার, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, জিল্লুর রহমান, আব্দুস সামাদ আজাদ, গাজী গোলাম মোস্তফা, নূরুল হক, আব্দুল মোমিন,

www.pathagar.com

মিজানুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সোহরাব হোসেন, শামসুজ্জোহা, দেওয়ান ফরিদ গাজী, রওশন আলী, মনোরঞ্জন ধর, আসাদুজ্জামান খান, লুৎফর রহমান, কামরুজ্জামান, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, ইউনুস আলী (চুয়াডাঙ্গা), আব্দুল মান্নান (চট্টগ্রাম), নুরুন্নবী (ফরিদপুর), মোহাম্মদ হানিফ (ঢাকা নগর), সৈয়দ কামাল বখত (খুলনা), শামসুর রহমান খান (টাঙ্গাইল), আব্দুল হাদী (রাজশাহী), শাহ মাহতাব উদ্দীন (দিনাজপুর), আব্দুল ওহাব (চট্টগ্রাম), ফজলুল হক বিএসসি, তালেব আলী (ফেনী), অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক মোহাম্মদ হানিফ (নোয়াখালী), মফিজুল ইসলাম কামাল, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, আনসার আলী, বোরহান উদ্দীন খান গগন, রহমত আলী, হাবিব উল্লাহ, হরনাথ বাইন (বরিশাল), আবুল কাশেম (পটুয়াখালী), ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন (বরিশাল), এখলাস উদ্দীন আহম্মদ (নড়াইল), কছিম উদ্দীন আহম্মদ (বগুড়া), জহিরুল ইসলাম (কক্সবাজার), নুরুল ইসলাম, শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী, সৈয়দ রেজাউর রহমান, রাশেদ মোশাররফ, খন্দকার আবু তালেব, আব্দুর রব (চাঁদপুর), ইলিয়াছ আহম্মদ চৌধুরী, আলী আজম ভূঁইয়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), ফজলুল হক ভূঁইয়া, মাহমুদা চৌধুরী, আফতাব উদ্দীন ভূঁইয়া, শামসুল আলম দুদু (কুষ্টিয়া), আফছার আলী আহম্মদ (নীলফামারী), আব্দুল হামিদ (কিশোরগঞ্জ), মহাম্মদ ইলিয়াস (মৌলভীবাজার), শাহ আবু জাফর ও মমতাজ বেগম। *সংবাদ*, ২৩ শে মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

৩১. আবদুল মালেক উকিল কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় যাঁদের নাম ছিল : কোরবান আলী, মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, শেখ আব্দুল আজিজ, কাজী জহিরুল কাইয়ুম, মিজানুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ফণীভূষণ মজুমদার, আব্দুস সামাদ আজাদ, আব্দুল মোমিন, সোহরাব হোসেন, জিল্লুর রহমান, দেওয়ান ফরিদ গাজী, মোহাম্মদ মহসীন, মনোরঞ্জন ধর, মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন, সিরাজুল হক এডভোকেট, এ কে মজিবর রহমান, একেএম শামসুজ্জোহা, আজিজুর রহমান আককাস, শামসুর রহমান খান, ডা. আলাউদ্দীন, মহিউদ্দীন আহম্মদ, আব্দুর রউফ, আব্দুল্লাহ আল হারুন, সৈয়দ হায়দার আলী, খালেদ মোহাম্মদ আলী ও মোজাফফর হোসেন পল্টু। *সংবাদ*, ২৩ শে মার্চ ১৯৭৮,পৃ ৮

৩২. আব্দুর রাজ্জাকের বিবৃতি দ্রষ্টব্য *সংবাদ*, ২৩শে মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

৩৩. আবদুল মালেক উকিলের বিবৃতি, *সংবাদ*, ২৪শে মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

৩৪. *সংবাদ*, ১লা এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ৫ই এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *আজাদ*, ৯ই এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ৯ই এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

৩৫. *আজাদ*, ১০ই এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

৩৬. *সংবাদ*, ১০ই এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

৩৭. *সংবাদ*, ৬ই মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৮

৩৮. *সংবাদ*, ১২ই আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১; *সংবাদ*, ১৩ই আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

www.pathagar.com

অধ্যায় : চৌদ্দ

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৮১ : ঐক্যের প্রতীক শেখ হাসিনা

১৯৭৮ সাল থেকে তিন বছর পর ১৯৮১ সালের ১৪-১৬ই ফেব্রুয়ারি ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে তিন দিনব্যাপী আওয়ামী লীগের ত্রয়োদশ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও এর উদ্বোধন করেন দলের সভাপতি আব্দুল মালেক উকিল। অধিবেশনে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান আবদুস সামাদ আজাদ। কাউন্সিল অধিবেশনে প্রায় ৪ হাজার কাউন্সিলর ও ডেলিগেট এবং সারাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক কর্মী যোগ দেন। এছাড়া বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে বিদেশি প্রতিনিধি ও দেশের মধ্যের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। দলের নেতৃত্ব নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেই এ কাউন্সিল অধিবেশন নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। বস্তুত এ কাউন্সিল ছিল আওয়ামী লীগের ঐক্যবদ্ধ থাকার 'ভাগ্য নির্ধারণী' কাউন্সিল।[২] চরম মতানৈক্য ও অনিশ্চিত এক অবস্থায় বিদেশে নির্বাসনে থাকা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার এ সময়ে আবির্ভাব ঘটে দলের ঐক্যের প্রতীক ও ত্রাতারূপে।

পটভূমি

১লা মে ১৯৭৮ থেকে রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (৩রা জুন ১৯৭৮), জিয়া বনাম ওসমানী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জেনারেল জিয়ার সমর্থনে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট, জেনারেল ওসমানীর সমর্থনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—বিএনপি গঠন (১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮) ও জিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ, জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯), উভয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ, নির্বাচনের পর জিয়া কর্তৃক স্বাধীনতা-বিরোধী শাহ আজিজুর রহমানকে সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ, আওয়ামী লীগে ভাঙন ও মিজানুর রহমান চৌধুরীর পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন (১১ই আগস্ট ১৯৭৮), আব্দুল মালেক উকিল ও আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল (২৩ ও ২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৮), আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল (ফেব্রুয়ারি ১৯৮১)-কে কেন্দ্র করে দলে নতুন করে নেতৃত্বের কোন্দল এবং নিশ্চিত ভাঙনের আশঙ্কা ইত্যাদি হচ্ছে কাউন্সিল পূর্ববর্তী প্রধান ঘটনা।

রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জেনারেল জিয়া নিজের অবস্থা সুসংহত করতে একটি পরিকল্পনা নিয়ে ধাপে-ধাপে অগ্রসর হন। ১৯৭৬ সালের ৩০শে নভেম্বর বিচারপতি এ এস এম সায়েমকে সরিয়ে তার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়া, ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল বিচারপতি সায়েমের স্থলে নিজের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ,

www.pathagar.com

পরের দিন সংবিধানের প্রস্তাবনাসহ চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সংশোধনী আদেশ, পূর্বে ১৯৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল অধ্যাদেশ, অপর এক আদেশবলে ১৯৭৬ সালের ৩রা মে ৭২-এর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৮ বাতিল ঘোষণা করে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি, একই বছর ২৮শে জুলাই রাজনৈতিক দলবিধি বা পিপিআর ঘোষণা, ১৯৭৭ সালের ৩০শে মে তার ওপর আস্থা জ্ঞাপনার্থে গণভোট আয়োজন, ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবহার করে ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার কর্তৃক 'জাগদল' নামে নতুন দল গঠন (যা ছিল বিএনপির পূর্বসূরী) এ সবই ছিল ঐ একই পরিকল্পনার অংশ। এরপর তিনি প্রথমে রাষ্ট্রপতি এবং পরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে অগ্রসর হন। ১৯৭৮ সালের ৩রা জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে জাগদল-এ যোগদান করেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এই প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতির মাঠ সরগরম হয়ে ওঠে। এর পূর্বে ১লা মে (১৯৭৮) রাজনীতির ওপর আরওপিত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়। এ নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজনীতিতে মেরুকরণ ঘটে। জেনারেল জিয়ার সমর্থনে সরকারি 'জাগদল'-এর সঙ্গে আওয়ামী লীগ-বিরোধী মশিউর রহমান যাদু মিয়ার নেতৃত্বাধীন ন্যাপ (ভাসানী), কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ইউপিপি), স্বাধীনতা-বিরোধী মুসলিম লীগ, লেবার পার্টি ও তফসিলি ফেডারেশন এ ৫টি দল নিয়ে গঠিত হয় জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট নামে একটি জোট। জিয়া ছিলেন এর চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী। অপরদিকে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জেনারেল এম এ জি ওসমানীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় জনতা পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর), সিপিবি, গণআজাদী লীগ ও পিপলস লীগ এ ৫টি সমমনা দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানী ছিলেন এ জোটের প্রার্থী। নির্বাচন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ও গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট বা জেনারেল জিয়া ও জেনারেল ওসমানীর মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত হয়। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, এটি ছিল আওয়ামী লীগ বনাম জিয়াকে কেন্দ্র করে সংগঠিত আওয়ামী লীগ-বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল আওয়ামী লীগ তথা গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের প্রধান নির্বাচনি ইস্যু। নির্বাচনে জিয়া শতকরা ৭৬.৬৩ ভাগ এবং ওসমানী ২১.৭ ভাগ ভোট পান।[৩] বিদ্যমান অবস্থায় এরূপ ফল হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এই প্রথম আওয়ামী লীগ নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে জনগণের কাছে যাওয়ার সুযোগ পায়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ৩ মাসের মধ্যে ১লা সেপ্টেম্বর জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টভুক্ত দলগুলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (Bangladesh Nationalist Party BNP) নামে একক দলে অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্বে প্রতিষ্ঠিত জাগদল বিলুপ্ত হয়। জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সাবেক বামপন্থি, চীনপন্থি, স্বাধীনতা-বিরোধী, ইসলামপন্থি, ক্ষমতালোভী দলছুট এদের একত্রিত করে বিএনপির প্রতিষ্ঠা। 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'-এর নামে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সমর্থন, ৭১-এর

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধী ও ৭৫-এর ১৫ই আগস্টের খুনিচক্রের প্রতি সহানুভূতি, আওয়ামী লীগ বিরোধিতা, ভারত বিরোধিতা, পাকিস্তান ও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সে দেশের পক্ষ অবলম্বনকারী চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি ছিল এ দলের রাজনৈতিক অবস্থান ও ভিত্তি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট জিয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে ছোটো বড়ো ৩১টি দল অংশগ্রহণ করে। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সরকারি দল বিএনপি আওয়ামী লীগের মধ্যে। এ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের মূল অঙ্গীকার ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৫টিতে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ৩৯টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২৪.৫৫ ভাগ লাভ করে।[৪] পক্ষান্তরে, ক্ষমতাসীন বিএনপি শতকরা ৪১.১৬ ভাগ ভোট পেয়ে ২০৭টি আসনে বিজয়ী হয়।

তখনও মার্শাল ল' অব্যাহত ছিল এবং এর ভেতরই আলোচ্য দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিএনপির পক্ষে সরকারি প্রভাব বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী ক্ষমতাসীনদের আওয়ামী লীগ ও ভারত-বিরোধী প্রচারণা থেকে জনগণের একটি অংশের মধ্যে সৃষ্ট বিভ্রান্তি তখনো বিদ্যমান ছিল, যা অপনোদন হতে বেশ সময়ের প্রয়োজন হয়। অপরপক্ষে, আওয়ামী লীগকে চরম প্রতিকূল এক অবস্থার মধ্যে এ দুটো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হয়। নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা, রাজনৈতিক হয়রানি, গ্রেপ্তারের ভীতি ছিলই। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ফল অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে এ উভয় নির্বাচন ছিল আওয়ামী লীগের জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ। সে ক্ষেত্রে দলটি বহুলাংশে সফল হয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী এবং স্বাধীনতা-উত্তর দালাল আইনে গ্রেপ্তার শাহ আজিজুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট জিয়া কর্তৃক নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়।[৫] অতঃপর ৬ই এপ্রিল ১৯৭৯ থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এর পূর্বে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সকল সামরিক আইন-বিধি, আদেশ, ঘোষণা, অধ্যাদেশ বা অন্যান্য আইন ও আদেশকে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর আওতায় বৈধতা দেওয়া হয়।[৬]

এদিকে ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে অবশেষে আওয়ামী লীগের ভাঙন ঠেকিয়ে দলের কর্মকর্তাদের একক একটি প্যানেল নির্বাচন সম্ভব হলেও দলের এ ঐক্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র ৫ মাসের ব্যবধানে ১৯৭৮ সালের ১১ই আগস্ট মিজানুর রহমান চৌধুরীর[৭] নেতৃত্বে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবনে কতিপয় সদস্য ও কিছু কর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁকে আহ্বায়ক করে দলের বাইরে পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়।[৮] এতে মূল আওয়ামী লীগের ২০ জন কর্মকর্তার মধ্যে দুজন যথা রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া (সহ-সভাপতি) ও কাজী মোজাম্মেল হক (শ্রম সম্পাদক) এবং ওয়ার্কিং কমিটির ৩৪ জন সদস্যের ১১ জন[৯] যোগ দেন। মিজান চৌধুরীর সঙ্গে আরও যারা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নূরে

www.pathagar.com

আলম সিদ্দিকী[১০], আবদুল কুদ্দুস মাখন[১১] এদুজনের নাম উল্লেখযোগ্য। ১২ই আগস্ট মিজানুর রহমান চৌধুরী তাঁর বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন।[১২] সাংবাদিক সম্মেলন স্থলে বঙ্গবন্ধুর মাল্যভূষিত একটি প্রতিকৃতি রক্ষিত ছিল। ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি 'আমাদেরটাই আসল আওয়ামী লীগ' দাবি করে তাঁর লিখিত বক্তব্য এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে যেসব কথা বলেন, সংক্ষেপে তা হচ্ছে : তিনি ও তাঁর অনুসারীরা 'নির্ভেজাল সংসদীয় গণতন্ত্র', সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বহুদলীয় ব্যবস্থা, প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন বিচার বিভাগ, আন্তর্জাতিকতার বিপরীতে বাঙালি কৃষ্টি-ঐতিহ্যভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শভিত্তিক সমাজতন্ত্রে' বিশ্বাসী। তিনি মূল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিদেশি 'ইজম'-এর অনুপ্রবেশ, 'হঠকারী উগ্রবামপন্থী' প্রবণতা, 'এখনও প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি ও এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার স্বপ্ন' ইত্যাদি অভিযোগ উত্থাপন করেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'আমরা যারা বাকশাল বা এক দলীয় শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি না তারা একত্রিত হয়ে 'নতুনভাবে' আওয়ামী লীগ গঠন করেছি।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, মস্কোপন্থি হিসেবে পরিচিত মহিউদ্দিন আহমদ ও খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস এ দুজনকে কখনও তাঁর দলে নেবেন না। এরপর ৩-৫ নভেম্বর ১৯৭৮ ইডেন হোটেলে তিন দিনব্যাপী আওয়ামী লীগ (মিজান)-এর কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে 'সার্বভৌম পার্লামেন্ট' ও সংসদ নির্বাচনের দাবি জানানো হয়। কাউন্সিল শেষে মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সভাপতি, অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে সাধারণ সম্পাদক, মহিউদ্দিন আহমদ (পিস্তল মহিউদ্দিন) ও মোজাফফর হোসেন পল্টুকে যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং নূরে আলম সিদ্দিকীকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা হয়।[১৩]

সাংবাদিক সম্মেলনে মিজান চৌধুরীর বক্তব্য রাখার একদিন পর ১৩ই আগস্ট মূল আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরি সভা ৯১ নবাবপুর দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আব্দুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মিজানুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক আওয়ামী লীগের নামে পৃথক আহ্বায়ক কমিটি গঠন ও তাঁর সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠানকে 'সম্পূর্ণ বেআইনী, অবৈধ, এখতিয়ার বহির্ভূত, দলীয় গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ পরিপন্থী' হিসেবে অভিহিত করে ১৭ ও ১৮ই আগস্ট অনুষ্ঠেয় আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভায় এ ব্যাপারে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। 'প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি', 'বাকশাল' বা এক দলীয় ব্যবস্থা এখনও ধারণ ইত্যাদি অভিযোগ তুলে মূল আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যে বক্তব্য রাখেন, তাকে 'দায়িত্বহীন উক্তি, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যমূলক, নিন্দনীয় ও হাস্যাস্পদ' বলে বর্ণনা করে ওয়ার্কিং কমিটির ঐ সভা থেকে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় অটল আস্থাশীল এবং 'সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে এই চার নীতি বাস্তবায়নে' দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মিজানুর রহমান চৌধুরী ও তাঁর সহযোগীদের 'উচ্চাভিলাষী' আখ্যায়িত করে সভায় 'জাতীয় শোক দিবস'-এর 'মাত্র তিনদিন আগে' তাদের 'হীন কার্যকলাপ দলের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতের শামিল' বলে উল্লেখ করা হয়।[১৪]

www.pathagar.com

১৭ ও ১৮ই আগস্ট ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে আব্দুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভায় মিজানুর রহমান চৌধুরীসহ ৮ জনকে[১৫] দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সাময়িকভাবে বহিষ্কার এবং ১৫ দিনের মধ্যে কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না তার কারণ দর্শানোর সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে মিজান চৌধুরীর নেতৃত্বে পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন ও এর আহ্বায়ক কমিটিতে নাম অন্তর্ভুক্ত দেখে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকে এর প্রতিবাদ করে এ ধরনের উদ্যোগের সঙ্গে তাঁদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই বলে পত্রিকায় বিবৃতি দিতে থাকেন। একই সঙ্গে মূল আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁদের আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করেন।[১৬]

ইডেন হোটেলে আওয়ামী লীগ (মিজান)-এর কাউন্সিল অধিবেশনের (৩-৫ই নভেম্বর ১৯৭৮) তিন সপ্তাহের মধ্যে একই ভেন্যুতে ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর আব্দুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে মূল আওয়ামী লীগের দুইদিনব্যাপী বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। কাউন্সিলে সভাপতির ভাষণে আব্দুল মালেক উকিল সংবিধানের চার মূলনীতি সংশোধনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করে বলেন, 'আমরা পঁচিশ বছর লড়াই করে সেক্যুলারিজম পেয়েছি। একে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই।' তিনি অবিলম্বে সামরিক বাহিনীর পদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আইয়ুব খানের মতো ডিক্টেটরও প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর নতুন একজনকে চিফ অব স্টাফ নিয়োগ দেন।'[১৭] কাউন্সিলে মিজানুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক আওয়ামী লীগ থেকে কিছু লোক ভাগিয়ে দল গঠন করার প্রসঙ্গ টেনে এর তীব্র সমালোচনা করে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'অতীতে এ জাতীয় রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ভিন্ন মতাদর্শীরা যখনই দল থেকে বেরিয়ে গেছে, তখনই আওয়ামী লীগ জঞ্জালমুক্ত হয়ে সংগ্রামের পথে এগিয়ে গেছে।'[১৮] বিশেষ এ কাউন্সিলে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিষয়ে দলীয় নীতি ও কর্মপন্থা স্থির করণের চূড়ান্ত দায়িত্ব কার্যনির্বাহী কমিটির ওপর অর্পণ করা হয়।[১৯]

আওয়ামী লীগ থেকে মিজানুর রহমান চৌধুরীর আলাদা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব নিয়ে দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেনি বরং তা নতুন করে সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তী কাউন্সিলের তারিখ (১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১) যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, ততই তা তীব্র হয়ে ওঠে। কাউন্সিলের দেড় মাস পূর্বে ২৮-৩০শে ডিসেম্বর ১৯৮০ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভার সময় এ অবস্থার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। 'লাঠালাঠি, মারামারি, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও বোমাবাজির' মধ্যে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত ছাড়াই তিনদিনব্যাপী বর্ধিত সভা মুলতবি ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয়। সভায় দলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের কয়েকজন এবং আওয়ামী লীগের এক নেতাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে সাময়িকভাবে বহিষ্কার ও কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়।[২০] এরপর ৮ই জানুয়ারি সংগঠনের চট্টগ্রাম জেলা শাখার কাউন্সিল অধিবেশনে একই ধরনের আক্রমণের ঘটনা ঘটে। প্রতিক্রিয়ায় ১১ই জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নবাবপুর কেন্দ্রীয় অফিসে হামলা হয়। ২৯শে জানুয়ারিও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্মুখে বিবদমান দুই

www.pathagar.com

গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এরপর এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কায় দলীয় কার্যালয়ের পরিবর্তে বিভিন্ন নেতার বাসভবনে ওয়ার্কিং কমিটির একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ সংঘর্ষের পর ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রথম কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত মুলতবি সভা দলের নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণে নির্ধারিত সময়ে কাউন্সিল আদৌ অনুষ্ঠিত হবে কি-না বা হলেও দলে বিভক্তির আশঙ্কা দেখা দেয়।[২১] উল্লেখ্য ইতঃপূর্বে তিনবার দলে কাউন্সিলের তারিখ নির্ধারণ করা সত্ত্বেও একই কারণে তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।[২২]

আওয়ামী লীগের মধ্যে এসময় ৩টি উপদল বা প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ লক্ষ করা যায়, যথা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাককে কেন্দ্র করে একটি, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদকে কেন্দ্র করে অপর একটি এবং সভাপতি আব্দুল মালেক উকিল, সংসদে আওয়ামী লীগের বিরোধী দলীয় নেতা আসাদুজ্জামান খান প্রমুখের নেতৃত্বে তৃতীয় আর একটি গ্রুপ। রাজ্জাক গ্রুপ মস্কোঘেঁষা, তোফায়েল গ্রুপ মার্কিন বা পাশ্চাত্যঘেঁষা এবং তৃতীয় গ্রুপটি দলের কর্মী ও ওয়াকেবহাল মহলে মধ্যপন্থি হিসেবে পরিচিত ছিল।[২৩] কাউন্সিলকে সামনে রেখে প্রত্যেক গ্রুপেরই সভাপতি পদে নিজস্ব পছন্দের প্রার্থী ছিল। এ-রকম এক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক অবস্থায় আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল অধিবেশন

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ অপরাহ্নে ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে আব্দুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এর উদ্বোধক ছিলেন তিনি নিজে। উদ্বোধনী অধিবেশনে ১৮৮৪ জন কাউন্সিলর, সমসংখ্যক ডেলিগেট ও ১১ হাজার দলীয় কর্মী যোগ দেন।[২৪] আমন্ত্রিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মনি সিং, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক আ স ম আব্দুর রব, ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সৈয়দ আশরাফ হোসেন, ন্যাপ (পঙ্কজ)-এর চৌধুরী হারুনুর রশীদ, একতা পার্টির সভাপতি সৈয়দ আলতাফ হোসেন ও গণআজাদী লীগ-এর সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ উপস্থিত ছিলেন ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। বিদেশি অতিথিদের মধ্যে প্যালেস্টাইন লিবারেল অর্গানাইজেশন (পিএলও)-এর রাজনৈতিক শাখার পরিচালক জাকারিয়া আবদুর রহিম যোগ দেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ ও ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কর্মসূচির মধ্যে ছিল অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যানের বক্তব্য, জেনারেল সেক্রেটারির রিপোর্ট, অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য দান।

জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং চারটি ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মধ্য দিয়ে কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। মঞ্চে রক্ষিত বঙ্গবন্ধু ও নিহত জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। স্লোগান-পাল্টা স্লোগান যাতে না হয় সেজন্য ওয়ার্কিং কমিটি পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, শুধু মঞ্চ হতে স্লোগান দেওয়া হবে এবং তা হবে কেবল

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার নামে, অন্য কারো নামে নয়। এ সিদ্ধান্তের কথা বারবার মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হয়। এরপর সংসদ সদস্য মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, কাজী গোলাম মোস্তফা, লে. মতিউর রহমান, শহীদউদ্দিন এস্কান্দার, যুক্তরাজ্য শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি গাউস খানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মৃত্যু, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণাকারী প্রথম বাঙালি কূটনীতিক হুসেন আলী, ৯ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ আহূত হরতালের দিন নিহত শাহজাদা ও নুরুল আলম, বিশিষ্ট সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী, সাহিত্যিক সত্যেন সেন ও কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ টিটো, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আলেক্সী কোসিগিন, এ্যাংগোলার প্রেসিডেন্ট অগাস্তিনো নেটো, ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি পি গিরি, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধী, ভারতের সর্বদলীয়নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়েরী বূমেদীন প্রমুখ দেশি-বিদেশি বিশিষ্টজনের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এটি পাঠ করেন দলের প্রচার সম্পাদক সরদার আমজাদ হোসেন।

শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা বাণী

সম্মেলন উপলক্ষ্যে ভারতে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একটি শুভেচ্ছা বাণী পাঠান। এটি পাঠ করে শোনান সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক। এর আগে অনুষ্ঠান পরিচালক তোফায়েল আহমদ টেলিফোনে শেখ হাসিনার সঙ্গে শেখ সেলিমের আলাপ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সমবেত সকলের উদ্দেশে ঘোষণা করেন, 'একটি সুসংবাদের অপেক্ষায়' তারা আছেন। শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে 'সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব বিভেদ ভুলিয়া আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে কাউন্সিলর ও নেতৃবৃন্দকে বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচী বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।'[২৫]

অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যানের ভাষণ

অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান আবদুস সামাদ আজাদ তাঁর লিখিত বক্তব্যে জিয়াউর রহমান সরকার কর্তৃক ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশে 'আত্মবিনাশী শক্তিকে' উৎসাহ যোগানোর কঠোর সমালোচনা করেন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সরকার বাংলাদেশের 'পরীক্ষিত মিত্রদের' দূরে ঠেলে দিয়ে 'বিপজ্জনক অবস্থা' সৃষ্টি করেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বঙ্গবন্ধুর 'বাকশাল কর্মসূচীকে' 'জনগণের আশার শিখা' হিসেবে অভিহিত করে তিনি কাউন্সিলরগণকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ 'শোষণমুক্ত সোনার বাংলা কায়েমের লক্ষ্যে' এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।[২৬]

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক ৪৩ পৃষ্ঠার একটি লিখিত রিপোর্ট পেশ করেন।[২৭] এতে তিনি যেসব বিষয় উল্লেখ করেন, সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে : প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির নামে জিয়া সরকার কর্তৃক 'এক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম', অবিলম্বে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল, মুসলিম লীগ, জামায়াত, ডেমোক্রেটিক লীগ,

www.pathagar.com

আইডিএল (ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ), আওয়ামী লীগ (মিজান), উগ্রবামপন্থি দলগুলোর কঠোর সমালোচনা করে এদের 'পরাশ্রয়ী লতার মত' ক্ষমতাসীনদের ওপর নির্ভরশীল হওয়া, সরকারের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিসর্জন, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বেসরকারি খাতে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার সমালোচনা, দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নৈরাজ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে উদ্বেগ, ইহুদিবাদী ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনি ও আরব ভূখণ্ড দখলের নিন্দা, ইরাক-ইরান যুদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি, আফগানিস্তান পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে উত্তেজনা ও অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে দলের ভাবমূর্তি অনেকখানি ক্ষুণ্ন হওয়া, শাসকগোষ্ঠীর আওয়ামী লীগকে 'ঘায়েল করিতে না পারিয়া' দলের মধ্যে ভাঙনের নীতি গ্রহণ, শাসকগোষ্ঠীর কারণে বিরোধী দলগুলো ভেঙে টুকরা-টুকরা হওয়া ইত্যাদি। দেশের দুই শিবিরে রাজনৈতিক বিভক্তি এবং এজন্য জিয়া সরকারকে দায়ী করে তিনি বলেন, 'স্বৈরাচারী সরকারের নানা পদক্ষেপে দেশ আজ রাজনৈতিকভাবে দুইভাগে বিভক্ত। একদিকে স্বাধীনতার [পক্ষের] প্রগতিশীল শক্তি, অন্যদিকে স্বৈরতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িকতাবাদী উগ্রদক্ষিণ ও উগ্রবাম হঠকারী শক্তি।' ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া 'নিছক নির্বাচনের মাধ্যমে' এ সরকারকে অপসারণ করা 'কঠিন ব্যাপার' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ বড় পার্টি হইলেও গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি ও দলের সঙ্গে ঐক্যের নীতিতে বিশ্বাসী।' জিয়া সরকারের মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করতে গিয়ে আব্দুর রাজ্জাক তাঁর রিপোর্টে বলেন, 'মুক্তিবাহী চেতনাকে বিসর্জন দিয়া বাংলাদেশ বেতারকে রেডিও বাংলাদেশ, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসকে জাতীয় দিবস এবং মুক্তিযুদ্ধের নাম-নিশানা মুছিয়া ফেলার সর্বনাশা পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে।' একই রিপোর্টে তিনি বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিকে সমাজ বদলের কর্মসূচি হিসেবে তুলে ধরে কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বলেন, 'আমরা শুধু সরকার বদলের জন্য নয়, পুরাতন সমাজকে ভাঙ্গিয়া সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন সংগ্রাম করিয়া যাইব। এই সব লড়াইয়ের মধ্য দিয়াই তুলিয়া ধরিতে হইবে বাকশালের আর্থ সামাজিক প্রশাসনিক কর্মসূচীর মূল কথা।'

আমন্ত্রিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিদেশি প্রতিনিধির বক্তব্য

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দলের আমন্ত্রিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তাঁদের কয়েক জনের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হলো :

জাসদের সাধারণ সম্পাদক আ স ম আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুকে 'শেখ মুজিব' বলে সম্বোধন করে বক্তৃতা শুরু করলে উপস্থিত কাউন্সিলর-ডেলিগেটদের মধ্য থেকে এর প্রতিবাদ ওঠে। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বক্তৃতা চালিয়ে যান এবং বলেন, 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে [বঙ্গবন্ধু] শেখ মুজিবের অবদান বিচারের ভার ইতিহাসের ওপর ছাড়িয়া দিন।' বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও এর বিচার সম্বন্ধে তিনি বলেন, '[বঙ্গবন্ধু] শেখ মুজিব হত্যার বিচার আমরাও চাই। আপনারাও সেই দাবী জানাইতেছেন। হত্যাকারীরা যেন দলে ঢুকিয়া না পড়ে, সর্বাগ্রে তাহা নিশ্চিত করুন।'

www.pathagar.com

ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সৈয়দ আশরাফ হোসেন, ন্যাপ (পঙ্কজ)-এর চৌধুরী হারুনুর রশীদ ও গণআজাদী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ তাঁদের বক্তব্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যের আহ্বান জানান। ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ক্ষমতা দখলকারীদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশের পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ধারায় প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে একতা পার্টির নেতা সৈয়দ আলতাফ হোসেনের মন্তব্য ছিল, 'বাংলাদেশ আজ স্বাধীন নয়। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট আমরা সার্বভৌমত্ব হারাইয়াছি।' তিনি 'নতুন দীক্ষা লইয়া নতুন কায়দায়' ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'একাকী অগ্রসর হইবার আহমিকায় ভুগিলে ভুল হইবে।' একমাত্র বিদেশি প্রতিনিধি পিএলও-র জাকারিয়া আব্দুর রহিম তাঁর শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকে সারা বিশ্বের সংগ্রামরত জনগণের জন্য বেদনাবহ বলে উল্লেখ করেন।[২৮]

সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ

উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতি ও আওয়ামী লীগ প্রধান আব্দুল মালেক উকিল যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে তাঁর বক্তব্য রাখেন,[২৯] সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : 'শত্রুর মুখে ছাই' দিয়া আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠান, 'যাহারা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে তাহারা অনৈক্যের সৃষ্টি করিতেছে,' 'বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগে কোন্দল সৃষ্টির জন্য কিছু লোক ঢুকাইয়াছেন', 'জয় বাংলা মুখে লইয়া কিছু সরকারী লোক সম্মেলনে ঢুকিয়া পড়িয়াছে', বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর কেহ কেহ মই বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন', 'আওয়ামী লীগ কর্মীর সংগঠন, নেতার সংগঠন নহে', 'এই সংগঠনকে কোন নেতা পকেটে নিতে পারিবে না', 'এই সরকারের প্রতি জনগণের আনুগত্য নাই।... প্রয়োজনে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করিয়া দিব', 'কাউন্সিলরেরা যে রায় দিবেন, মেহেরবাণী করিয়া আপনারা সকলেই তাহা মানিয়া লইবেন', পাকিস্তানিদের নাগরিকত্ব ও কলকারখানা ফেরতদানের সমালোচনা, শিক্ষক ও শ্রমিক বিক্ষোভ, চরাঞ্চলে কৃষক নির্যাতনের সমালোচনা ইত্যাদি। আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠানে অনিশ্চয়তা ও দলের সম্ভাব্য ভাঙন সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> অনেকেই বলাবলি করিয়াছিল আওয়ামী লীগ ভাঙ্গিয়া যাইবে, কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হইবে না কিন্তু সকলের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হইতেছে। নিজেদের মধ্যে ঐক্যের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আমরা যাহারা বঙ্গবন্ধুর সহিত একসাথে কাজ করিয়াছি, বিভিন্ন আন্দোলন করিয়াছি, একসাথে জেলে গিয়াছি, তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য হইবে না।

দলের ঐক্য ও প্রেরণার উৎস এখনও বঙ্গবন্ধু এ কথা কাউন্সিলরদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধকালে বন্দীশালায় থাকিয়াও যেভাবে তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দিয়াছেন, টুঙ্গীপাড়ায় চিরশয্যায় শায়িত বঙ্গবন্ধু একইভাবে দলকে পরিচালনা করিবেন।'

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন : গঠনতন্ত্র সংশোধন, সাংগঠনিক রিপোর্ট

১৫ই ফেব্রুয়ারি ছিল কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিন। সকালে ও বিকেলে দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন ছিল জেলা কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ ও

www.pathagar.com

প্রস্তাব গ্রহণের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু দলের নেতৃত্বের প্রশ্নে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব সংকটে রূপ নেওয়ার কারণে এর সমাধানকল্পে গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়ায় সকালের সেশনে কোনো সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ হয়নি। বিকেলের সেশনে ২০টি সাংগঠনিক জেলার রিপোর্ট পেশের পর সন্ধ্যায় কাউন্সিল অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয়। এরপর পরবর্তী দিন সকাল ১০টার পূর্বে অধিবেশন আর বসেনি।

দলীয় প্রধান আব্দুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে সকাল ১০টায় ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় দিনের সকালের অধিবেশন শুরু হয়। বিবেচ্য বিষয় দলের জন্য যৌথ নেতৃত্বের বিধান। এজন্য কাউন্সিলের কিছুদিন পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভায় একটি গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি গঠন করা হয়।[৩০] উপর্যুপরি কয়েকদিন বৈঠক শেষে কমিটি দলের সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তন করে একটি নতুন কাঠামোর রূপরেখা সুপারিশ করে এবং তা কাউন্সিলের বিবেচনার্থে পেশ করা হয়। সে অনুযায়ী দলের কেন্দ্রীয় নতুন কাঠামোগত বিন্যাস হচ্ছে :[৩১] জাতীয় কাউন্সিল, জাতীয় কমিটি এবং সভাপতিমণ্ডলী (প্রেসিডিয়াম), সম্পাদকমণ্ডলী (সেক্রেটারিয়েট) ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটি।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ৫৩ জন কর্মকর্তা ও সদস্য এবং ৬৯টি জেলার প্রত্যেকটি থেকে একজন করে প্রতিনিধিসহ মোট ১২২ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় কমিটি গঠিত। কাঠামোতে এটি নতুন সংযোজন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটি ১১ জন প্রেসিডিয়াম সদস্য, জেনারেল সেক্রেটারি ও ১৪ জন বিভাগীয় সেক্রেটারি এবং ২৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ২৭ জন সদস্য প্রেসিডিয়ামের সঙ্গে পরামর্শক্রমে দলের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন। সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হওয়ার ২১ দিনের মধ্যে ২৭ জন মনোনীত সদস্যের নাম ঘোষণা করার বিধান। সম্পাদকমণ্ডলীতে আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের পদ নতুন সৃষ্টি। এছাড়া শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদকের পদটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রেসিডিয়াম বা সভাপতিমণ্ডলী সভাপতি ও ১০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। জেনারেল সেক্রেটারি পদাধিকারবলে এর সদস্য। তিনি এর বৈঠক আহ্বান করবেন। দলের কাঠামোতে প্রেসিডিয়ামের সংযুক্তি সম্পূর্ণ নতুন। যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এটি সৃষ্টি। সভাপতি, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। প্রেসিডিয়ামের সভাপতির গঠনতন্ত্রের যে কোনো ধারা ব্যাখ্যা ও রুলিং প্রদানের ক্ষমতা থাকবে। তিনি সংসদীয় দলসহ পার্টির যে কোনো শাখাকে নির্দেশনা প্রদান এবং নির্দেশ ভঙ্গ করলে শাস্তি বিধান করতে পারবেন। দলের কেন্দ্রীয় কাঠামো পরিবর্তন সম্পর্কিত গঠনতন্ত্র সংশোধনের এ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন সহ-সভাপতি আবদুল মমিন তালুকদার।

এছাড়া গঠনতন্ত্র সংশোধন করে নগর আওয়ামী লীগ নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ২০ থেকে ৫৩ জনে উন্নীত করা হয়। অধিকন্তু ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী নগর কমিটিকে সাংগঠনিক জেলা কমিটির মর্যাদা দান করা হয়। এটি প্রস্তাব করেন দলের সভাপতি আব্দুল মালেক উকিল স্বয়ং। গঠনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত উভয় প্রস্তাব কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

অধিবেশনের শেষ দিন : সাংগঠনিক রিপোর্ট, প্রস্তাব গ্রহণ ও নেতৃত্ব নির্বাচন

১৬ই ফেব্রুয়ারি ছিল কাউন্সিল অধিবেশনের শেষদিন। সকাল ১০ টায় যথাস্থানে দলের সভাপতি আব্দুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে সকালের অধিবেশন শুরু হয়। দলের কর্মকর্তা নির্বাচনের কথা থাকলেও তখন পর্যন্ত সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব না হওয়ায় প্রথমে বাকি জেলা কমিটিসমূহ তাদের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে অভিন্নভাবে দলের অভ্যন্তরে বিরাজমান নেতৃত্বের 'কোন্দল ও সংঘাতের' সমালোচনা করা হয় এবং দলের 'ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার' আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া, এলাকায় রাজনৈতিক হত্যা, হরতাল ভাঙার জন্য সরকারি দলের 'নৈরাজ্য সৃষ্টি' ও নানা প্রকার হয়রানির কথা তাতে স্থান পায়।[৩২]

প্রস্তাব গ্রহণ

কাউন্সিলের একই সেশনে বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :[৩৩]

১. ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডের বিচার ও শাস্তি দাবি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড এবং তৎপরবর্তী ৩রা নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্ত, হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তি দাবি এবং তা আদায়ে দলের প্রতিজ্ঞা।

২. বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যার দেশে প্রত্যাবর্তন : প্রবাসে নির্বাসনে থাকা বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার পূর্ণ মর্যাদায় দেশে প্রত্যাবর্তনের যথাযথ ব্যবস্থা করা।

৩. চার মূলনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা : বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প।

৪. স্বৈরাচার ও সামরিকতন্ত্রের বিরোধিতা : আওয়ামী লীগ সর্বদা স্বৈরাচার, একনায়কতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, আমলাতন্ত্র প্রভৃতির সার্বিক বিরোধিতা করবে।

৫. অর্থনৈতিক মুক্তি : স্বাধীনতা অর্জনের পর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা ছিল আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য। এজন্যই বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। তাই জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার এ নতুন সংকল্প ঘোষণা।

৬. সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি : বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমে নতুন অঙ্গীকার।

৭. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংস্কার : পুরানো সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে মুক্ত, প্রগতিশীল মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ দক্ষ নাগরিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মৌলিক সংস্কার সাধন।

www.pathagar.com

৮. বৈদেশিক নীতি : বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ, বিশ্বশান্তির পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশবাদ, নয়া-ঔপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও ইহুদিবাদের বিরোধিতা এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মুক্তি সংগ্রামে অব্যাহত সমর্থন।

নেতৃত্ব নির্বাচন

কাউন্সিলে নেতৃত্ব নির্বাচন ছিল দলের জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। কাউন্সিল অধিবেশন শুরুর বেশ কয়েকদিন পূর্ব থেকে সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে সমঝোতার চেষ্টা করে আসছিলেন। একাধিকবার কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি ও এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৩৪] কিন্তু কিছুতেই সমাধান হচ্ছিল না। এক পর্যায়ে যৌথ নেতৃত্বের মধ্যে সমাধানের পথ খোঁজা হয়। এর আলোকে দলের কাঠামোয় পরিবর্তন আনতে গঠিত হয় গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী একক সভাপতির স্থলে সভাপতি ও সভাপতিমণ্ডলীর বিধান করা হয়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আগের দিন (১৫ই ফেব্রুয়ারি) এ বিষয়ের প্রস্তাব কাউন্সিলে পেশ করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। একই দিন কাউন্সিল অধিবেশন সংক্ষিপ্ত করে দলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য এবং জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে গঠিত সাবজেক্ট কমিটি নেতৃত্বের প্রশ্নে সমঝোতার লক্ষ্যে ৯১ নবাবপুর দলীয় কার্যালয়ে বৈঠকে বসে।[৩৫] গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক চলার পরও কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছার কারণে তা মুলতুবি হয়।

এমন অবস্থায় ব্যালটের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন প্রায় অবধারিত হয়ে ওঠে।[৩৬] কিন্তু কাউন্সিলরগণ নির্বাচনের ঘোর বিরোধী। তাঁরা শুরু থেকেই ছিলেন সমঝোতার পক্ষে।[৩৭] উদ্ভূত অবস্থায় সমঝোতা প্রচেষ্টার পাশাপাশি নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। মনোরঞ্জন ধর, সুধাংশু শেখর হালদার এমপি ও কর্নেল শওকত আলী এমপি এই ৩ জনকে নিয়ে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়।[৩৮] কমিটি ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করাসহ নির্বাচনের আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টার মধ্যে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে বলা হয়। প্রেসিডিয়াম ও সম্পাদকমণ্ডলীর ২৬টি পদের জন্য ১৮৭টি মনোনয়নপত্র দাখিল হয়। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ নিয়ে দ্বন্দ্বই ছিল মুখ্য। সভাপতি পদে ছিলেন ৫ জন প্রার্থী যথা আব্দুল মালেক উকিল, ড. কামাল হোসেন, আবদুস সামাদ আজাদ, কোরবান আলী ও সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন। সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জন প্রার্থী যথা আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন ও সালাহ উদ্দীন ইউসুফ। তবে এঁদের মধ্যে সভাপতি পদে আব্দুল মালেক উকিল, ড. কামাল হোসেন ও আবদুস সামাদ আজাদ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ ছিলেন মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। সাধারণ সম্পাদক পদে সমঝোতার সম্ভাবনা দেখা গেলেও সভাপতি পদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীগণ ছিলেন খুবই অনড়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি নবাবপুর অফিসের বৈঠকের পর ১৬ই ফেব্রুয়ারি দুপুরে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিন্যুর দলীয় কার্যালয়ে সাবজেক্ট কমিটির সভা পুনরায় বসে। কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা শেষে সভাপতি পদপ্রার্থী ৫ জন এবং সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ এই ৭ জনকে পৃথকভাবে বসে তাঁদের মধ্যে সমঝোতার জন্য বৈঠকের পক্ষ

www.pathagar.com

থেকে বলা হয়। এভাবে দুদিনে দীর্ঘ ২৭ ঘণ্টা ধরে সাবজেক্ট কমিটির বিভিন্ন প্রস্তাব-পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে সমাধানের কঠিন প্রচেষ্টা গ্রহণের এক পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের একটি অংশ ভারতে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন এবং তাঁকে সভাপতি পদ গ্রহণ করে দলকে চরম সংকট থেকে উদ্ধারের অনুরোধ জানান।[৩৯] শেখ হাসিনার সম্মতি পেয়ে দুজন নারী নেত্রী যথা বেগম সাজেদা চৌধুরী ও আইভি রহমান ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিন্যুর কার্যালয় থেকে কাউন্সিল অধিবেশন স্থলে ছুটে যান। তখন গভীর রাত। কয়েক হাজার কাউন্সিলর, ডেলিগেট ও সাধারণ কর্মী সেখানে অধীর আগ্রহ আর উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষমাণ। উভয় নেত্রী, আমির হোসেন আমু, শেখ ফজলুল করিম সেলিম প্রমুখ মঞ্চে শেখ হাসিনার পক্ষে একের পর এক বক্তৃতা করে যাচ্ছিলেন। এরই এক পর্যায়ে তোফায়েল আহমদ, আব্দুল মালেক উকিল ও আব্দুর রাজ্জাক মঞ্চে এসে উপস্থিত হন এবং শেখ হাসিনাকে সভাপতি করার কথা ঘোষণা করেন।[৪০] উপস্থিত নেতা-কর্মী ও কাউন্সিলরবৃন্দ উল্লাসে ফেটে পড়েন। অতঃপর দলের অন্য কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন :[৪১]

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য	:	আব্দুল মালেক উকিল
		সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন
		ডক্টর কামাল হোসেন
		আবদুল মান্নান
		কোরবান আলী
		জিল্লুর রহমান
		আবদুস সামাদ আজাদ
		মহিউদ্দীন আহমদ
		আব্দুল মমিন তালুকদার
		ফণীভূষণ মজুমদার
সাধারণ সম্পাদক	:	আব্দুর রাজ্জাক
যুগ্ম সম্পাদক	:	বেগম সাজেদা চৌধুরী
	:	আমির হোসেন আমু
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	তোফায়েল আহমদ
প্রচার সম্পাদক	:	সরদার আমজাদ হোসেন
দফতর সম্পাদক	:	সৈয়দ আহমদ
শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক	:	এস এম ইউসুফ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	মফিজুল ইসলাম কামাল
মহিলা সম্পাদিকা	:	বেগম আইভি রহমান
শ্রম সম্পাদক	:	এ বি এম তালেব আলী
কৃষি সম্পাদক	:	অধ্যাপক মোহাম্মদ হানিফ

www.pathagar.com

যুব সম্পাদক	:	মোহাম্মদ নাসিম
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	:	আবদুল জলিল
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	শফিকুল আজিজ মুকুল
কোষাধ্যক্ষ	:	ফজলুল করিম

দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কর্মকর্তা ব্যতীত ওয়ার্কিং কমিটির বাকি ২৭ জন সদস্য সভানেত্রী কর্তৃক মনোনীত হবেন।

শেখ হাসিনার প্রতিক্রিয়া : 'উল্লসিত হওয়ার কারণ দেখি না'

আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার এক সপ্তাহ পর ২৪শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) নয়া দিল্লিতে শেখ হাসিনার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।[৪২] উল্লেখ্য, তখন তার বয়স ৩৩ বছর। তাঁর এ সাক্ষাৎকারটি নানা কারণে প্রণিধানযোগ্য। এর দ্বারা তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা, নেতৃত্ব ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের প্রধান নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর অনুভূতি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ সভানেত্রী হওয়াতে উল্লসিত হওয়ার কারণ দেখি না।' এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, 'সত্য কথা বলিতে কি, ভাবাবেগ মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ছয় বৎসর পূর্বে পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হত্যার পর তাহারা কিছুতেই উল্লসিত হইতে পারেন না।' আওয়ামী লীগ প্রধানের পদ গ্রহণ সম্বন্ধে 'কখনও এই দায়িত্ব চান নাই' উল্লেখ করে বলেন, 'রাজনীতি তাঁহার রক্তের সহিত মিশিয়া আছে। জন্মলগ্ন হইতেই রাজনৈতিক পরিবেশে তিনি লালিত। কিন্তু রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা তিনি কখনও মনে পোষণ করেন নাই।' এরপর বলেন যে, 'দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি এই নতুন দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন।' তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'এই দায়িত্ব তাঁহাকে জনগণের স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিবে।' তিনি সাক্ষাৎকারে পিতার হত্যাকারীদের বিচার দাবি করেন, যা পরবর্তীতে তাঁর সরকারের সময়ই বাস্তবায়িত ও বিচারের রায় কার্যকর হয়। দলের নীতি সম্বন্ধে কোনো বক্তব্য-মন্তব্য অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে তিনি শুধু গঠনতন্ত্রে যৌথ নেতৃত্ব সৃষ্টিকে 'গঠনমূলক' উল্লেখ করে বলেন যে, 'সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শের পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করিবেন।' তবে পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল খুবই স্পষ্ট এবং তা বঙ্গবন্ধু প্রদর্শিত 'সকলের সহিত বন্ধুত্ব, কাহারো সহিত শত্রুতা নয়।' প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি যা বলেন, তা সময় বিচারে খুবই প্রাজ্ঞ, 'একটি ক্ষুদ্র ও গরীব দেশ হিসাবে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।'

আজ থেকে ৩৫ বছর পূর্বে আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে শেখ হাসিনার নির্বাচন নাটকীয়ভাবে ঘটলেও তা ছিল অতি আবশ্যকীয়। ঐ সময় দলের ভাঙন এড়ানোর তিনিই ছিলেন শেষ ভরসা। যদিও ২ বছর ৮ মাস ব্যবধানে দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক-এর নেতৃত্বে একটি বড় অংশের দল থেকে বের হয়ে গিয়ে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন (যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে)

www.pathagar.com

ছিল আওয়ামী লীগের জন্য এ যাবৎকালের মধ্যে বড় ধাক্কা। তবে কয়েক বছরের ব্যবধানেই তা কাটিয়ে উঠে দলকে সুসংহত ও সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা সমর্থ হন। আশ্চর্যজনকভাবে, বর্তমান সময় থেকে ৩৫ বছর পূর্বে ৩৩ বছর বয়সে দীর্ঘ ছয় বছর ধরে নির্বাসনে থাকা অবস্থায় নিজের অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম সাক্ষাৎকারে তিনি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তা থেকে তাঁর কোনোরূপ বিচ্যুতি ঘটেনি, বরং সে পথ ধরেই তিনি ক্রমান্বয়ে দৃঢ় পদে এগিয়ে চলছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত *আজাদ*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮; *আজাদ*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১,৭,৮; *আজাদ*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮

২. দ্রষ্টব্য *আজাদ*, ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৭

৩. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩৫৫

৪. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩৫৬। আওয়ামী লীগ (মিজান) পৃথকভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে মিজানুর রহমান চৌধুরীসহ দুইজন বিজয়ী হন এবং দলের প্রার্থীগণ প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২.৭৮ ভাগ লাভ করেন।

৫. তিনি ৩১শে মার্চ ১৯৭৯ প্রধানমন্ত্রী হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানি জান্তা সরকারের সমর্থনে জাতিসংঘে একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং 'পূর্ব পাকিস্তানে' সবকিছু স্বাভাবিক বলে দাবি করেন।

৬. *সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আইন*, ১৯৭৯ দ্রষ্টব্য, ২০১০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ এটিকে বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক চরিত্র ও কাঠামোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিবেচনায় অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেন।

৭. আওয়ামী লীগের অন্যতম সিনিয়র নেতা। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা'র আন্দোলনকালে বঙ্গবন্ধুর কারাবন্দি অবস্থায় তিনি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর (১৯৮২-১৯৯০) তিনি এরশাদ সরকারে যোগ দেন এবং ১৯৮৬ সালে এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে গিয়ে পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠনের সময় তিনি ওয়ার্কিং কমিটির একজন সাধারণ সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭-৭৮ সময়ে তিনি দলের সভাপতি পদলাভে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

৮. বিস্তারিত *সংবাদ*, ১২ই আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১; *সংবাদ*, ১৩ই আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

৯. এঁরা হলেন মিজানুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সোহরাব হোসেন, মোহাম্মদ মোহসীন, মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন, শামসুল হক, দেওয়ান ফরিদ গাজী, আজিজুর রহমান আককাস, মহিউদ্দিন আহমদ (বরিশালের, পিস্তল মহিউদ্দিন নামে পরিচিত), আবদুর রউফ, মোজাফফর হোসেন পল্টু। দ্রষ্টব্য, *সংবাদ*, ১২ই আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১; *সংবাদ*, ১৩ই আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ৬ই নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১। পরে দলের অন্যতম সহ-সভাপতি মতিয়ুর রহমান

www.pathagar.com

(রংপুর), ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সিরাজুল হক, সৈয়দ হায়দার আলী, এ কে মজিবুর রহমান ও খালেদ মোহাম্মদ আলী এঁদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ (মিজান)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ এনে কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করা হয়। *ইত্তেফাক*, ৬ই অক্টোবর ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

১০. তিনি ১৯৭০-৭২ এ সময়ে ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন।

১১. তিনি ১৯৭০-৭১ এ সময়ে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

১২. বিস্তারিত *সংবাদ*, ১৩ই আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

১৩. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান)-এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির নবনির্বাচিত কর্মকর্তাগণ হলেন : সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সহ-সভাপতি শামসুল হক, সৈয়দ আদুস সুলতান, সোহরাব হোসেন, দেওয়ান ফরিদ গাজী, মোহাম্মদ মহসীন, মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন, আজিজুর রহমান আককাস, আবিদুর রেজা খান, যুগ্মসম্পাদক মহিউদ্দিন আহমদ ও মোজাফফর হোসেন পল্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরে আলম সিদ্দিকী, কৃষি সম্পাদক আবদুর রউফ, শ্রম সম্পাদক কাজী মোজাম্মেল হক, মহিলা সম্পাদিকা অধ্যাপিকা আজরা আলী, প্রচার সম্পাদক মইনুল হুদা, দপ্তর সম্পাদক এম এ রশীদ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক দেবদাস বিশ্বাস, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ইদ্রিস আলম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক হামিদুর রহমান। এছাড়া একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হয়। এর সদস্যগণ হলেন : শামসুল হক, মতিউর রহমান, সোহরাব হোসেন, হাতেম আলী তালুকদার, মোসলেম উদ্দিন খান (হাবু মিয়া), এডভোকেট আহমদ আলী, ডা. আসাবুল হক, শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী। *ইত্তেফাক*, ৬ই নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১; কাউন্সিল সম্বন্ধে বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১, ৭, ৮; আরও দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ৭ই জানুয়ারি ১৯৭৯, পৃ. ১, ৮

১৪. *সংবাদ*, ১৪ই আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

১৫. এঁরা হলেন মিজানুর রহমান চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, সোহরাব হোসেন, রফিক উদ্দীন ভূঁইয়া, কাজী মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ মহসীন, শামসুল হক ও মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন। অন্যদের ১৫ দিনের মধ্যে অবস্থান পরিষ্কার করতে বলা হয়। *সংবাদ*, ১৯শে আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

১৬. দ্রষ্টব্য *সংবাদ*, ১৮ই আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ২০শে আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৭ ও ১৮ই আগস্ট মূল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভায় যাঁরা ভিন্ন কারণে উপস্থিত হতে পারেননি, তাঁদের মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোরঞ্জন ধর ও কিশোরগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট মো. আবদুল হামিদ (বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি) ছিলেন। তাঁরা উভয়ই তারবার্তা ও চিঠির মাধ্যমে মূল আওয়ামী লীগের প্রতি তাঁদের সমর্থন এবং 'বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের শাস্তি দাবী' করেন। সূত্র : *সংবাদ*, ২০শে আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ১, ৮

১৭. *সংবাদ*, ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১,৮

১৮. *ঐ*

১৯. *সংবাদ*, ২৫শে নভেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১, ৫। কাউন্সিলে আরও যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দলের ১১-দফা আন্দোলনের কর্মসূচি অনুমোদন, নির্বাচনের পূর্বে সামরিক আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিল ও প্রত্যাহার, সামরিক আইনে আটক সকল রাজবন্দির মুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান,

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও কার্যক্রম বন্ধ, সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল শক্তিকে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ইত্যাদি। অপর এক প্রস্তাবে বলা হয়, 'আওয়ামী লীগ চার নীতির মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ কায়েম করার লক্ষ্যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট পদ্ধতির এবং পার্লামেন্টের কাছে পরিপূর্ণভাবে দায়ী শাসন পদ্ধতিতে বিশ্বাসী।'

কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল মালেক উকিল একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, জিয়ার পিপিআর-এর অধীনে দলের অনুমোদন নেওয়ার সময় দাখিলকৃত প্রস্তাবনা ও ঘোষণাপত্রে "বঙ্গবন্ধু'র চারনীতিসহ বঙ্গবন্ধু'র নাম ছিল। 'বঙ্গবন্ধু' শব্দে সরকার আপত্তি করায় আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শব্দটি ছাড়াই ঘোষণাপত্র প্রস্তাবনা সাবমিট করে।" অতঃপর তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দলের পরিপূর্ণ ঘোষণাপত্র প্রস্তাবনা গ্রহণ করার প্রস্তাব করলে কাউন্সিল তা 'বিপুল করতালির মাধ্যমে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে।' *সংবাদ*, ঐ

২০. *আজাদ*, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮

২১. দ্রষ্টব্য 'আওয়ামী লীগের কোন্দলের চরম বহিঃপ্রকাশ : দ্বিধা বিভক্তির সম্ভাবনা স্পষ্ট', *আজাদ*, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮; আরও *আজাদ*, ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৭, ৮

২২. *আজাদ*, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮

২৩. *ঐ*

২৪. *ইত্তেফাক*, ১৫ই আগস্ট ১৯৮১, পৃ. ৮

২৫. দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক* ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮

২৬. *আজাদ*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮; *ইত্তেফাক*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮

২৭. দ্রষ্টব্য *আজাদ*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮; *ইত্তেফাক*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮

২৮. আমন্ত্রিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অতিথির বক্তব্য, *আজাদ*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮; *ইত্তেফাক*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮

২৯. দ্রষ্টব্য *আজাদ*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮

৩০. দ্রষ্টব্য *আজাদ*, ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮

৩১. বিস্তারিত *আজাদ*, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৭; *ইত্তেফাক*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮

৩২. দ্রষ্টব্য *আজাদ*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৭; *ইত্তেফাক*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮

৩৩. সংকলিত *আজাদ*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮

৩৪. দ্রষ্টব্য *আজাদ*, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮; *আজাদ*, ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৭, ৮; *আজাদ*, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৭

৩৫. *ইত্তেফাক*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮

৩৬. *আজাদ*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৭, ৮

৩৭. *ঐ*, পৃ. ৭; *ইত্তেফাক*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮

www.pathagar.com

৩৮. বিস্তারিত, *আজাদ*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১; *ইত্তেফাক*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮

৩৯. *আজাদ*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮; *ইত্তেফাক*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮; আরও দ্রষ্টব্য, 'শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের নেপথ্য কিছু কথা', গোলাম আকবর চৌধুরী, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ১১-১৭। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনাকে সভাপতি করার ব্যাপারে গোলাম আকবর চৌধুরী (বেগম সাজেদা চৌধুরীর স্বামী) নেপথ্যে থেকে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

৪০. *ইত্তেফাক*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৮। সমঝোতার লক্ষ্যে ৭ নেতার বৈঠকে ড. কামাল হোসেন সভাপতি হিসেবে শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করলে আব্দুর রাজ্জাক ও আবদুল মালেক উকিল বিভিন্ন সাংগঠনিক যুক্তি দেখিয়ে প্রথমে তীব্র বিরোধিতা করেন মর্মে পত্রিকায় প্রকাশ। দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ঐ; আরও দ্রষ্টব্য গোলাম আকবর চৌধুরী, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, পৃ. ১১-১৭

৪১. *ইত্তেফাক*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮; *আজাদ*, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ৪

৪২. সাক্ষাৎকারটি দ্রষ্টব্য *আজাদ*, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ. ১, ৮; আরও পরিশিষ্ট পনেরো।

www.pathagar.com

অধ্যায় : পনেরো

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৮৭ : গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের ৬ বছর পর ১৯৮৭ সালের ১-৩ জানুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও এর উদ্বোধন করেন দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৮১ সালের কাউন্সিলে অনুপস্থিতিতে সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন। কাউন্সিলে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী। এতে বিপুলসংখ্যক কাউন্সিলর ও ডেলিগেট যোগ দেন। এছাড়া আমন্ত্রিত হয়ে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিদেশি প্রতিনিধিরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধিবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। সামরিক শাসনের কবল থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কঠিন সংগ্রাম এবং দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে একটি অংশের পৃথক হয়ে যাওয়া এরূপ পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশন ছিল খুবই গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানে দীর্ঘ বিলম্বের মূলে ছিল দেশের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

পটভূমি

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি হচ্ছে ৬ বছর নির্বাসনে থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন (১৭ই মে ১৯৮১), ব্যর্থ সেনাঅভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়া, (৩০শে মে ১৯৮১), নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (১৫ই নভেম্বর ১৯৮১), বিচারপতি সাত্তার বনাম ড. কামাল হোসেনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখল (২৪শে মার্চ ১৯৮২), ৬টি জেলা সদরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন, উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রশাসনের সামরিকীকরণ, এরশাদের সেনা শাসন-বিরোধী দীর্ঘ জোটবদ্ধ আন্দোলন, মধ্য ফেব্রুয়ারির (১৯৮৩) ছাত্র হত্যা, জেনারেল এরশাদের একাধিকবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর বিধিনিষেধ আরওপ, আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে গিয়ে আব্দুর রাজ্জাক ও মহিউদ্দীন আহমদের বাকশাল গঠন (অক্টোবর ১৯৮৩), এরশাদের হ্যাঁ-না ভোটের আয়োজন (২১শে মার্চ ১৯৮৫), উপজেলা নির্বাচন (মে ১৯৮৫), এরশাদের সমর্থনে জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা (১লা জানুয়ারি ১৯৮৬), জাতীয় সংসদ নির্বাচন (৭ই মে ১৯৮৬), রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (১৫ই অক্টোবর ১৯৮৬) ইত্যাদি।

১৯৮১ ও ১৯৮৭ এ দুই কাউন্সিল অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময় ছিল খুবই সংকটপূর্ণ। ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান কর্তৃক সামরিক শাসন তুলে নেওয়া হলেও রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে সেনাবাহিনী নেপথ্য থেকে তখনও ছিল। তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে জন্ম নেয় রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ। এদিকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আপনজন বলতে জীবনে বেঁচে থাকা একমাত্র বোন শেখ রেহানাসহ ৬ বছর ধরে শেখ হাসিনাকে দেশের বাইরে নির্বাসনে কাটাতে হয়। সর্বশেষ কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা তাঁর পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। বৈরী আবহাওয়া সত্ত্বেও রাস্তার দুই ধারে উপচেপড়া বৃষ্টিভেজা লাখো জনতার ভালোবাসায় তিনি সিক্ত হন। আগমনের দিন থেকেই শুরু হয় সেনা কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে গণতন্ত্র ও জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারে তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম। তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তনের দুই সপ্তাহের মধ্যে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রামে এক ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান নিহত হন। জিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং একই বছর ১৫ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আয়োজন করেন। ১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মতো এবারও আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন ড. কামাল হোসেন। জাসদ, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ও শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল নিয়ে গঠিত ত্রি-দলীয় ঐক্যজোট থেকে মুক্তিযুদ্ধের ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ও জাসদ সভাপতি মেজর এম এ জলিলকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। নির্বাচনে মোট ৩১ জন প্রার্থী থাকলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় ক্ষমতাসীন বিএনপি প্রার্থী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এবং আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. কামাল হোসেন এ দুজনের মধ্যে। আওয়ামী লীগের প্রধান নির্বাচনি কর্মসূচি ছিল 'বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করে স্বাধীন সার্বভৌম সংসদ গঠন' এবং ৭২-এর শাসনতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন।[২] নির্বাচনে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার শতকরা ৬৫.৮০ ভাগ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। ড. কামাল হোসেন লাভ করেন ২৬.০৫ ভাগ ভোট।[৩] পূর্বের তুলনায় আওয়ামী লীগের ভোট শতকরা ৪.৩০ ভাগ বৃদ্ধি এবং সরকারি দল বিএনপির ১০.৮৭ ভাগ হ্রাস পায়।

জিয়ার হত্যাকারীদের দমন করা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে আসেন বটে, তবে তিনি 'দেশ শাসনে সেনাবাহিনীর স্থায়ী ভূমিকা'র কথা বলে[৪] ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করতে থাকেন। এভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মাত্র চার মাস ন' দিনের ব্যবধানে ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ বিচারপতি সাত্তারকে সরিয়ে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। সংবিধান স্থগিত করা হয়। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। 'জেনারেল জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি প্রথমে রাষ্ট্রপতি পদে না বসে বিচারপতি এ এফ এম আহসান উদ্দীনকে ঐ পদে বসান। তিনি থাকেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। ১১ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ আহসান উদ্দীনকে সরিয়ে জেনারেল এরশাদ নিজে রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন।

জেনারেল এরশাদ তাঁর ন' বছরের শাসন আমলে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যার মধ্যে প্রশাসনের পুনর্বিন্যাস ও বিকেন্দ্রীকরণ, ঢাকার বাইরে ৬টি জেলা সদরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন, নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নে কমিশন গঠন, পার্বত্য

www.pathagar.com

জেলা স্থানীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে দেশের ৪৬০টি থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত ও মহকুমাসমূহকে জেলায় উন্নীত করা এবং ড. আবদুল মজিদ খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ছিল তাঁর সরকারের বহুল সমালোচিত পদক্ষেপ।

এরশাদ শাসন আমলের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রশাসনের ব্যাপক সামরিকীকরণ, যার সূচনা হয় ৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে। এরশাদ স্বয়ং 'সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্ব'-এর বক্তব্য দিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে ৪০ ভাগ ছিলেন সামরিক বাহিনী থেকে আগত। এ সময়ে ২৮ জন সেনা অফিসার সচিবালয়ের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। দেশের ২২টি বৃহৎ কর্পোরেশনের মধ্যে ১৪টির দায়িত্বে ছিলেন সেনা কর্মকর্তারা। ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৩টির এসপি ছিলেন সেনা বাহিনীভুক্ত। বিদেশে বাংলাদেশের ৪৮টি মিশনের এক-তৃতীয়াংশ বা ১৬টির প্রধান পদে ছিলেন তাঁরা।[৫] অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-সংস্থায়ও সেনাসদস্যদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এছাড়া অদৃশ্য উপস্থিতি তো ছিলই।

ক্ষমতায় আসীন হয়ে জেনারেল এরশাদ তাঁর পূর্বসূরি জেনারেল জিয়ার প্রদর্শিত পথ প্রায় হুবহু অনুসরণ করে চলেন। যেমন এক পর্যায়ে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি, এরপর প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর থেকে বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া,[৬] স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা) নির্বাচন, হ্যাঁ-না বা গণভোট (২১শে মার্চ ১৯৮৫) আয়োজন। জেনারেল জিয়ার ১৯-দফা কর্মসূচির অনুরূপ জেনারেল এরশাদের ছিল ১৮-দফা কর্মসূচি। জেনারেল জিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় জাগদল সৃষ্টি, আর তাঁর ছিল জনদল (২৭শে নভেম্বর ১৯৮৩)। জিয়ার সমর্থনে আওয়ামী লীগ-বিরোধী কট্টর চীনপন্থি, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানপন্থি ও তথাকথিত ধর্মভিত্তিক দল নিয়ে প্রথমে ফ্রন্ট (জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট), পরে এদের একীভূত করে ফ্রন্ট থেকে দল গঠন (বিএনপি), এরশাদও একই সমর্থকগোষ্ঠী নিয়ে প্রথমে ১৯৮৫ সালের ১৬ই আগস্ট ফ্রন্ট (জাতীয় ফ্রন্ট), এরপর ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি এদের সম্মিলিত করে একটি দলে রূপান্তরিত (জাতীয় পার্টি) করেন। এসবের পর উভয়েই রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন।

ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মধ্যে জেনারেল এরশাদকে প্রবল ছাত্র-গণআন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয়। রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠনের পাশাপাশি এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিপুলসংখ্যক মানুষ যোগ দেন। এরশাদের সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর জোটবদ্ধ রূপ। এভাবে ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট,[৭] এর পূর্বে সরকার-বিরোধী ১৪টি ছাত্র সংগঠন মিলে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ,[৮] একই বছর শেষের দিকে বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট,[৯] ১১টি শ্রমিক ও কর্মচারী সংগঠন নিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ, ১৭টি কৃষক সংগঠন ইত্যাদি গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

১৯৮৩ সালের শেষভাগে দুই বৃহৎ জোট ১৫ দল ও ৭ দল ৫-দফাভিত্তিক আন্দোলনের একটি অভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়নে সমর্থ হয়। ৫-দফা দাবির মধ্যে ছিল[১০] অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত নেওয়া, মৌলিক অধিকারসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর থেকে বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া, যে-কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান, আটক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মুক্তি ও সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ছাত্র হত্যার তদন্ত, বিচার ও শাস্তির দাবি এবং নিহতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদান। লক্ষণীয় বিএনপি রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হয়েও সেখান থেকে সরে আসে।

আন্দোলনের সকল শক্তির মধ্যে সমন্বয়ের জন্য গঠন করা হয় লিঁয়াজো কমিটি। চলতে থাকে একের পর এক কর্মসূচি—কখনো জোটের এককভাবে, কখনো যুগপৎ। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল অর্ধদিবস, পূর্ণদিবস, ২৪ ঘণ্টা ও ৪৮ ঘণ্টার হরতাল, লংমার্চ, রাজধানী অভিমুখে জনতার 'চলো ঢাকা চলো' অভিযাত্রা, মহাসমাবেশ ইত্যাদি। এ আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ১৫ দলীয় জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। একাধিকবার তিনি গ্রেফতার ও গৃহবন্দি হন।[১১] কখনো তাঁর যাতায়াত সীমিত করা হয়। দলের অন্য নেতৃবৃন্দের অনেকে গ্রেপ্তার হন। ১৯৮৩-১৯৮৬ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাসহ অনেক ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক কর্মী সরকারি বাহিনীর হাতে নিহত হন। এসব ছাত্র ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে জয়নাল, জাফর, কাঞ্চন, মোজাম্মেল ও দীপালি সাহা (১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩), সেলিম ও দেলোয়ার[১২] (২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪), শাজাহান সিরাজ (২৩শে ডিসেম্বর ১৯৮৪), রাউফুন বসুনিয়া[১৩] (১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫), আদমজীর শ্রমিক নেতা তাজুল ইসলাম (১লা মার্চ ১৯৮৪), আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক এমপি এডভোকেট মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন (২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৪) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য পর্বে এরশাদ গৃহীত যেসব পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেসবের মধ্যে বাংলাদেশ জমীয়াতুল মোদাররেসীন সম্মেলনে জেনারেল এরশাদের 'বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার' লক্ষ্য ঘোষণা এবং শহীদ মিনার ও একুশে ফেব্রুয়ারি সম্বন্ধে চরম আপত্তিকর বক্তব্য,[১৪] নতুন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, উপজেলা নির্বাচন, গণভোট, জাতীয় সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উল্লেখযোগ্য। ১৯৮২ সালের ৭ই নভেম্বর এরশাদের শিক্ষামন্ত্রী ড. আবদুল মজিদ খান শিক্ষানীতি সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তাতে প্রাথমিক পর্যায় থেকে বাংলার পাশাপাশি আরবি ও ইংরেজি ভাষাশিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং উচ্চ শিক্ষা ব্যয়বহুল ও ধনীর সন্তানদের স্বার্থের অনুকূল হওয়ায় এর বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৮৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি মিছিল সহকারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ করার কর্মসূচি নিয়ে ছাত্ররা অগ্রসর হলে পুলিশ অতর্কিতে তাদের ওপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৫ জন ছাত্র ঘটনাস্থলে নিহত, অনেকে আহত এবং কয়েক শ' ছাত্র গ্রেফতার হয়। পরের দিন উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ একটি বৈঠকে মিলিত হলে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ এক ডজনেরও অধিক কেন্দ্রীয় নেতা গ্রেফতার হন। এরশাদের সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনে এ ঘটনা ছিল টার্নিং পয়েন্ট। উল্লেখ্য, এরপর এরশাদ সরকার শিক্ষানীতি নিয়ে আর অগ্রসর হয়নি।

এরশাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল তার সরকার প্রবর্তিত নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচন। ১৯৮৪ সালের ২৪শে মার্চ তা অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল। বিরোধী দলের বক্তব্য ছিল অনির্বাচিত ও সামরিক সরকারের এরূপ প্রশাসনিক বিন্যাসের কোনো অধিকার নেই। অনেকের আবার আশঙ্কা ছিল এরূপ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে অধিক মাত্রায় দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে। যাহোক, বিরোধী দল ও জোটের বয়কট ও প্রতিরোধের কারণে পূর্ব ঘোষিত সময়ে এরশাদ সরকারের পক্ষে এ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি।

অতঃপর এরশাদ কঠোর পন্থা অবলম্বন করেন। ১লা মার্চ ১৯৮৫ থেকে পূর্বে চালু হওয়া প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা পুনরায় বন্ধ ঘোষণা করেন। সামরিক আইনের প্রয়োগে কড়াকড়ি আরওপ করা হয়। সামরিক আদালত পুনর্বহাল করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শেখ হাসিনাকে গৃহবন্দি এবং আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। এমনই এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় বন্দুকের মুখে প্রায় ভোটারবিহীন অবস্থায় এরশাদ সরকার প্রথমে ২১শে মার্চ হ্যাঁ-না ভোট বা গণভোট এবং মে মাসের ১৬ ও ২০ তারিখ উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন করে।

জেনারেল এরশাদের জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান। তিনি একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে মাত্র ১২৯ দিনের ব্যবধানে সরিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সঙ্গে-সঙ্গে ১৯৭৯ সালে গঠিত সংসদ ভেঙে দেন। তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা ছিল ১৯৮৪ সালের ২৪শে মার্চ উপজেলা এবং ২৭শে মে একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন করা। কিন্তু তার বিরুদ্ধে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠলে ঘোষিত তারিখে এর কোনোটিই অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বিরোধী জোটের ৫-দফায় সর্বাগ্রে 'সার্বভৌম সংসদ' নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি করা হয়েছিল। ফলে ঐবার সব নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করতে হয়। পরবর্তী বছর মে মাসে উপজেলা নির্বাচনের পূর্বে ৬ই এপ্রিল এবার প্রথমে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়ে পরক্ষণে নির্বাচনের ফল নিজেদের পক্ষে নাও আসতে পারে ভেবে সরকারই সেখান থেকে সরে আসে। অতঃপর ১৯৮৬ সালের ২৬শে এপ্রিল নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হলেও ১৫ দলের দাবি অনুযায়ী আরও কিছুদিন সময় বর্ধিত করায় তা ৭ই মে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা-না করা প্রশ্নে ১৫ দল ভেঙে যায় এবং বামপন্থি হিসেবে পরিচিত ৫টি দল[১৫] বের হয়ে গিয়ে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭-দলীয় জোটও নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮টি দল নিয়ে গঠিত হয় নতুন জোট[১৬] এবং তারা আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনে মোট ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দল আসন ভাগাভাগি করে

www.pathagar.com

জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। বস্তুত এটি ছিল আওয়ামী লীগ ও সরকারি দল জাতীয় পার্টির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৫৬টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে ৭৬টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২৬.১৫ ভাগ লাভ করে। ৮ দলের শরিকরা বাকি আসনে প্রার্থী দিয়ে ২১টি আসন লাভ করে। জোটগতভাবে তাদের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৭টি ও প্রাপ্ত ভোট শতকরা ৩১.২১ ভাগ। অপরদিকে, জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি ৩০০টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ১৫৩টি আসন ও শতকরা ৪২.৩৪ ভাগ ভোট পায়। বাকি আসন জোট বহির্ভূত দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা লাভ করেন।[১৭] সরকারি দল ও প্রশাসনের ছত্রছায়ায় নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস, বোমাবাজি, ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট কেড়ে নিয়ে সিল দিয়ে বাক্স ভর্তি করা ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। জাতীয় প্রচার মাধ্যমে নির্বাচনের ফল ঘোষণায় বিরোধী দল বিশেষ করে ৮ দলের প্রার্থীরা এগিয়ে থাকলে এক পর্যায়ে দীর্ঘ ৩০ ঘণ্টা ফল ঘোষণা বন্ধ রাখা হয়।

নির্বাচন বর্জনকারীদের বক্তব্য ছিল আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা। অপরপক্ষে ৮ দলসহ নির্বাচনে যারা অংশ নিয়েছে তাদের কথা হচ্ছে, ১৯৮৩ সাল থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে কঠোর আন্দোলন করেও সরকারের পতন ঘটানো যায়নি। সরকারি দল (জনদল/জাতীয় পার্টি) তখন পর্যন্ত ছিল অসংগঠিত। কাজেই ১৫ দল ও ৭ দল সমঝোতা করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হলে ব্যালটের মাধ্যমে সরকার দলীয় প্রার্থীদের পরাজয় ঘটানো সম্ভব ছিল। যাহোক, এ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের মুখোশ আরও বেশি করে জনসম্মুখে উন্মোচিত করা সম্ভব হয়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দল ঘোষণা করে যে, সামরিক আইন প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত তারা সংসদে যোগ দেবে না। এদিকে সংসদ নির্বাচনের ৫ মাসের ব্যবধানে সরকারের পক্ষ থেকে ১৫ই অক্টোবর (১৯৮৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন ধার্য হয়। এবার ৮ দল, ৭ দল, ৫ দল সবাই এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তা প্রতিহত এবং এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে একের পর এক কর্মসূচি পালন করতে থাকে। এদিকে এক সামরিক আদেশ বলে এরশাদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-বিরোধী সকল তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অধিকন্তু নির্বাচনের আগের দিন শেখ হাসিনাকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে অন্তরিন করে রাখা হয়। এ-রকম এক পরিস্থিতিতে ১২ জন সাক্ষীগোপাল প্রার্থী দাঁড় করিয়ে[১৮] প্রায় ভোটারশূন্য অবস্থায় অনুষ্ঠিত তথাকথিত নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর ১০ই নভেম্বর জাতীয় সংসদে ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ ক্ষমতা দখল থেকে ১৯৮৬ সালের এদিন পর্যন্ত সামরিক সরকারের সকল কর্মকাণ্ড বৈধ ঘোষণা করে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী পাস শেষে একই দিন এক ঘোষণা বলে সামরিক আইন তুলে নেওয়া হয়।

সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগের জন্য এটি ছিল দুঃসময় (১৯৮১-১৯৮৭)। এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম দিকে দলের অভ্যন্তরে নতুন করে উপদলীয় দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক।

www.pathagar.com

এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৮১ সালের ১৭ই অক্টোবর দলের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পাল্টা কমিটি গঠনের মাধ্যমে[১৯] এবং তা আরও জটিল আকার ধারণ করে যখন এর দেড় বছর পর ১৯৮৩ সালের ১লা মে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ছাত্রলীগের পৃথক সম্মেলন আহ্বান করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।[২০] মীমাংসার অনেক চেষ্টা শেষে পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভা ডেকে আব্দুর রাজ্জাকসহ ৬ জন কেন্দ্রীয় নেতার বিরুদ্ধে 'দলীয় আদর্শ, শৃঙ্খলা ও গঠনতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে' তাঁদের সাময়িকভাবে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি[২১] দিয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। প্রতিক্রিয়ায় আব্দুর রাজ্জাক ওয়ার্কিং কমিটির এক সভার নামে আওয়ামী লীগের শীর্ষ স্থানীয় ৯ নেতার বিরুদ্ধে[২২] পাল্টা বহিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এরপর দ্রুত দল আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্তির দিকে এগিয়ে যায়। ৯ ও ১০ই অক্টোবর (১৯৮৩) আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দলের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সাময়িকভাবে বহিষ্কৃতদের কারণ দর্শানোর জবাব 'সন্তোষজনক' না হওয়া, উপরন্তু দলীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি দান ও 'দলীয় আদর্শ, শৃঙ্খলা ও গঠনতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহত' রাখার কারণে আব্দুল মালেক উকিল[২৩] ছাড়া অপর ৫ জন কর্মকর্তা যথা দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, প্রেসিডিয়াম সদস্য মহিউদ্দীন আহমদ ও আব্দুল মমিন তালুকদার, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ আহমদ, শিক্ষা সম্পাদক এস এম ইউসুফ এঁদের দল থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয় এবং অন্যদের দলে ফিরে আসার সুযোগ হিসেবে ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়।[২৪] ২১ ও ২২শে অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে মহিউদ্দীন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে দুইদিনব্যাপী রাজ্জাক গ্রুপের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[২৫] এর উদ্বোধন করেন স্থপতি মাযহারুল ইসলাম। মঞ্চে বঙ্গবন্ধু, জাতীয় চার নেতা, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ ফজলুল হক মনির প্রতিকৃতি রক্ষিত ছিল। ৭০টি সাংগঠনিক জেলা থেকে ১২৩৮ জন কাউন্সিলর এ বিশেষ কাউন্সিলে যোগ দেন বলে দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

সম্মেলনের প্রধান শ্লোগান ছিল : 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'বাকশালের কর্মসূচি গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে দাও', 'ভাত চাই, কাপড় চাই– বাঁচার মত বাঁচতে চাই', 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক' ইত্যাদি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ন্যাপ (মোজাফফর), ন্যাপ (চৌধুরী হারুন), একতা পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, আওয়ামী লীগ (মিজান), জাসদ (ইনু) ও গণআজাদী লীগের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এসব দলের সবকটি তখন ১৫ দলীয় জোটভুক্ত ছিল।

অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল মমিন তালুকদার তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, 'দেশে এখন দুইধারা বর্তমান– একটি সমাজ প্রগতি ও বঙ্গবন্ধুর শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের পথ, অন্যটি প্রতিক্রিয়া ও পুঁজিবাদের ধারা। আমরা সমাজতন্ত্র ও বঙ্গবন্ধুর ধারার সঙ্গে একাত্ম।' আব্দুর রাজ্জাক তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'যাহারা মনে করে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র সব সমস্যার সমাধান দিবে আমরা তাহাদের সঙ্গে নাই।' তিনি 'বাকশাল তথা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত জাতীয় গণতান্ত্রিক লড়াইর' জন্য কর্মীদের প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

দলে ভাঙনের জন্য তিনি ও অন্যরা তাঁদের বক্তব্যে 'ঘাপটি মারিয়া থাকা সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদের' দায়ী করে বলেন যে, দলের সভানেত্রী এসব এজেন্ট দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছেন। আব্দুর রাজ্জাক এও বলেন, 'বহুদিন ধরিয়াই দলের অভ্যন্তরে আদর্শগত ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছিল।'[২৬] সভার সভাপতি মহিউদ্দীন আহমদ তাঁর ভাষণে বলেন, 'একদিন এ রকম কাউন্সিলের মাধ্যমে যেমন বঙ্গবন্ধুর তনয়াকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছি– আজ তেমনি বিদায় অভ্যর্থনার জন্য এ কাউন্সিল।'[২৭] দুদিনব্যাপী বিশেষ সম্মেলনে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে নতুন দল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া মহিউদ্দীন আহমদকে সভাপতি ও আব্দুর রাজ্জাককে সাধারণ সম্পাদক করে ১২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কমিটিও গঠন করা হয়।[২৮] কমিটিতে আওয়ামী লীগের ২৬ জনের মধ্যে ৯ জন কর্মকর্তার নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৯]

আদর্শগত কারণ দেখিয়ে[৩০] আওয়ামী লীগের রাজ্জাক সমর্থকদের বাকশাল নামে আলাদা দল গঠনের পেছনে দৃষ্টিভঙ্গিগত এক ধরনের ভিন্নতা থাকলেও, এর মূলে ছিল নেতৃত্ব তথা দলের ওপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার ও তা সংরক্ষণের প্রশ্ন। ১৯৯১ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব শর্তহীনভাবে মেনে নিয়ে আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বাকশালের আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে একীভূত হওয়া এবং আব্দুর রাজ্জাকের আমৃত্যু (২৩শে ডিসেম্বর ২০১১) এ দলে থাকা তা-ই প্রমাণ করে। যাহোক, প্রায় একই সময় পূর্বে মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে গিয়ে পৃথক দল গঠন এবং পরে পুনরায় সেখান থেকে আলাদা হওয়া দলের এরূপ পুরানো নেতৃত্বের একটি অংশ দেওয়ান ফরিদ গাজী, মহিউদ্দিন আহমেদ (পিন্তল মহিউদ্দিন) ও মোজাফফর হোসেন পল্টু এঁদের নেতৃত্বে মূল আওয়ামী লীগে ফিরে আসে।[৩১] ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ বাকশাল ও এর সহযোগী সংগঠনের বহু নেতা-কর্মী সাবেক তিন এমপি যথা কর্নেল শওকত আলী, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ও রাশেদ মোশাররফ এঁদের নেতৃত্বে শেখ হাসিনার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে দলে প্রত্যাবর্তন করেন।[৩২]

জাতীয় রাজনীতি ও দলের সাংগঠনিক সার্বিক অবস্থার এমনই এক পটভূমিতে ১৯৮৭ সালের শুরুতে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল।

কাউন্সিল অধিবেশন

১৯৮৭ সালের ১লা জানুয়ারি বিকেলে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিলম্বিত তিনদিনব্যাপী দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়। কাউন্সিলের উদ্বোধনও করেন দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। এই প্রথম ইডেন হোটেলের পরিবর্তে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। যথারীতি জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সারাদেশ থেকে ৪ হাজার কাউন্সিলর ও ডেলিগেট এতে যোগ দেন। এছাড়াও বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, পাকিস্তান, আলজেরিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাস এবং পিএলওর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাজ্যের

www.pathagar.com

হাইকমিশনারের একটি শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। মোহাম্মদ নাসিমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি আবদুস সামাদ আজাদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

শুভেচ্ছা বক্তব্য

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ, এনএপির অন্যতম আহ্বায়ক চৌধুরী হারুনর রশীদ, ন্যাপ (মোজাফফর)-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ, গণআজাদী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ, ব্রিটেনের লেবার পার্টির নেতা ও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সমর্থনকারী ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ[৩৩] প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। সিপিবি'র কমরেড ফরহাদ আওয়ামী লীগ ও তাঁর দলের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'চরম দুর্দিনে ও দুঃসময়ে পাশাপাশি থেকে আমরা লড়াই করেছি। আমাদের সম্পর্ক সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।' চৌধুরী হারুনর রশীদ, সৈয়দ আশরাফ ও আবদুস সামাদ তাঁদের বক্তব্যে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে 'দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোকে আরও ঐক্যবদ্ধ' হওয়ার তাগিদ দিয়ে এ ব্যাপারে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে 'বড় দলের অহমিকা ত্যাগ' করে 'ঐতিহাসিক দায়িত্ব' পালনের আহ্বান জানান। ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রতিনিধি ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ও তাঁর দলের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।'[৩৪]

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী একটি দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেন,[৩৫] যা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ কাউন্সিল অধিবেশন থেকে শুরু করে বর্তমান কাউন্সিলের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় রাজনীতি ও সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি দিনপঞ্জি আকারে তাতে স্থান পায়। তাঁর রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে : আজীবন ত্যাগী প্রয়াত ফণীভূষণ মজুমদার, এককালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, এরশাদ সরকারের সন্ত্রাসীদের হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যার শিকার মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন প্রমুখকে স্মরণ, সামরিক স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, এর সহযোগী সংগঠনসমূহ ও অন্যান্য দলের নিহত নেতা-কর্মী ও ছাত্রদের অনেকের তালিকা, শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ, এর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সামরিক শাসনের কবল থেকে দেশকে উদ্ধারে শেখ হাসিনার দৃপ্ত শপথ, ক্ষমতা গ্রহণের পর জেনারেল এরশাদের শহিদ মিনার ও একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন সম্বন্ধে জমীয়াতুল মোদাররেসীন সম্মেলনে ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য-মন্তব্য, ১৯৮৩ সালের মধ্য-ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি প্রদানের উদ্দেশ্যে ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যা, ছাত্র মিছিলে ট্রাক তুলে দিয়ে সেলিম ও দেলোয়ারকে হত্যা, আদমজীর শ্রমিক নেতা তাজুল হত্যা,

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ নেতা ময়েজউদ্দিন হত্যা, এরশাদের সামরিক স্বৈরাচার-বিরোধী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে শেখ হাসিনার সাহসী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা, রাজনীতির ওপর জারি করা বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে জেলা পর্যায়ে শেখ হাসিনার সফর ও কর্মী সভায় যোগদান, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ১৫ দলীয় জোট গঠন, বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠন, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ৫-দফা কর্মসূচি, ড. মজিদ খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, উপজেলা ও হ্যাঁ-না ভোট, সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন, ১২, ২৪, ৪৮ ঘণ্টার হরতাল, 'ঢাকা চলো' কর্মসূচি, লংমার্চ, মানিক মিয়া এভিন্যুর মহাসমাবেশ, শেখ হাসিনা ও অন্য নেতাদের বারবার গ্রেপ্তার ও অন্তরিন করে রাখা, আন্দোলনের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করে কোনো কোনো নেতার এরশাদের সরকারে যোগদান, ১৯৮৬ সালের ৭ই মে-র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ও পক্ষে যুক্তি, 'মিডিয়া ক্যু'র মাধ্যমে সরকার কর্তৃক জনগণের রায় উল্টে দেওয়া, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে উপদলীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি ও বাকশাল গঠন, আওয়ামী লীগ (মিজান) ও বাকশালের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে অনেক নেতার মূল আওয়ামী লীগে ফিরে আসা ইত্যাদি।

শেখ হাসিনার ভাষণ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভানেত্রী শেখ হাসিনা, যিনি একই সঙ্গে আওয়ামী লীগেরও সভানেত্রী, কাউন্সিলে দীর্ঘ ৭৫ মিনিটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লিখিত ভাষণ রাখেন।[৩৬] যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে তাঁর এ ভাষণ, সেগুলোর প্রধান দিকসমূহ ছিল : বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশে ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং বিদেশে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য হওয়া, প্রবাসে অবস্থানকালে বিভিন্ন দেশ ও স্থানে সফর এবং ৭৫-এর ১৫ই আগস্টের 'প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র ও হত্যাকারীদের মুখোশ উন্মোচনের প্রচেষ্টা', ১৫ই আগস্টের খুনিদের একটি উদ্দেশ্য ছিল 'আওয়ামী লীগকে বাংলার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করা' এ কথার উল্লেখ, অনুপস্থিতিতে তাঁকে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচন করা, সংগঠন পরিচালনার গুরুদায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নিতে পূর্বে 'এক মুহূর্তের জন্যে'ও তাঁর কোনো ইচ্ছা বা ভাবনা-চিন্তা না থাকা, 'জাতির জনকের কন্যা হিসেবে' তাঁর ওপর 'অর্পিত দায়িত্বভার' গ্রহণ করেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, রাজনৈতিক পরিবারে তাঁর জন্ম ও রাজনীতির সঙ্গে তাঁর আজন্ম সম্পর্কের কথা, 'পারিবারিক পরিবেশের মধ্য থেকেই আমার রাজনীতির হাতে খড়ি', ৬২-এর ছাত্র আন্দোলনের 'সেই উত্তাল সময়ে' সরাসরি তাঁর রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, দেশে প্রত্যাবর্তনের পর 'বঙ্গবন্ধু প্রেমিক' বাঙালি জাতির স্নেহ ও ভালোবাসা লাভ, 'দেশে পর্যায়ক্রমিক সামরিক শাসনের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে' যথাসময়ে কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত করতে না পারা, বাঙালির স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার কথা, গত ৩৮ বছরে এ দেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের ভূমিকা, 'বাংগালী জাতির মুক্তির প্রশ্নে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানরূপে' বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলার সংগ্রামের ধারায় এর নতুন গতি সঞ্চার,

www.pathagar.com

আগরতলা মামলা সাজিয়ে আইয়ুব সরকারের বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন, ইয়াহিয়া খানের 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রলোভন' দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুকে প্ররোচিত করতে না পারা, বঙ্গবন্ধুর সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন ও ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ি থেকে ঘোষিত তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ব বাংলার প্রশাসন পরিচালিত হওয়া, ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর 'একটি সর্বাত্মক জনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান', পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে 'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে' বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, বঙ্গবন্ধু সরকারের যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে সাফল্য, নারীর পুনর্বাসন, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশে চিকিৎসা, মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ, কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণ, শিক্ষার বিস্তার, আধুনিক ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা, স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে 'একটি সর্বাধুনিক গণতান্ত্রিক সংবিধান' জাতিকে উপহার দেওয়া, সংবিধানে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা, ৭৩-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বঙ্গবন্ধু সরকারের জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি ও বিশ্বশান্তির প্রতি অবিচল অঙ্গীকার, ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে সে-দেশে ফেরত পাঠানো, মুজিব-ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তি, গঙ্গা চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য ৪৪ হাজার কিউসেক পানি আদায়, জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুর বাংলা ভাষায় ভাষণদান, বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-বিরোধী ও উগ্র হঠকারী গোষ্ঠীর চক্রান্ত ও সন্ত্রাসী তৎপরতা, ৫ জন সংসদ সদস্যসহ আওয়ামী লীগের কয়েক হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা, দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি, বাংলাদেশকে স্বাবলম্বী ও একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর 'দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি' ঘোষণা, ৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশের চিত্র, 'যারাই ক্ষমতায় এসেছে তাদের কেউ এসেছেন বেসামরিক লেবাসে বন্দুকের নলে চেপে বসে, আর কেউ এসেছেন সরাসরি উর্দি পরে বন্দুক হাতে', 'আইয়ুবী রূপে' গণতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে পরিবর্তন, ক্ষমতার স্বার্থে সেনাবাহিনীর মধ্যে হানাহানি, সশস্ত্র বাহিনীকে জনতার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা, রাজনৈতিক দলে ভাঙন সৃষ্টি ও নেতাদের চরিত্র হননের প্রক্রিয়া, জাতির জনকের হত্যাকারী ও জেলে জাতীয় চার নেতার খুনিদের পুনর্বাসন ও দূতাবাসে চাকরি প্রদান, রাজনীতিতে গণতন্ত্রের বদলে স্বৈরতন্ত্রের ধারা, ক্ষমতার স্বার্থে সামরিক বাহিনীতে নির্বিচার হত্যা, 'হত্যা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এক জেনারেলের হাত থেকে ক্ষমতার পালা বদল হচ্ছে অন্য জেনারেলের হাতে', সরকারি অর্থ, গোয়েন্দা সংস্থা, সেনানিবাস ব্যবহার করে ক্ষমতাসীনদের নতুন দল গঠন, নতুন সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের নামে এরশাদ সরকারের গ্রাম পর্যায়ে দুর্নীতির প্রসার, বেসামরিক প্রশাসনের সামরিকীকরণ, ১৯৮৩ সাল থেকে চার বছর ধরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ৫-দফা ভিত্তিক আন্দোলন, এরশাদের স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলনে শহিদদের তালিকা, প্রহসনের গণভোট, দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের এক পর্যায়ে আন্দোলনের অংশ হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত, ৭ই মে (১৯৮৬)-র সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলের বিজয় 'ব্যাপক সন্ত্রাস, ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যু'র মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়া, সংবিধানের ৫ম ও ৭ম সংশোধনীতে সেনা শাসকদের অবৈধ কর্মকাণ্ডকে 'বৈধতা' দেওয়ায় এর

www.pathagar.com

কঠোর সমালোচনা, স্বাধীনতা রক্ষা ও চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, জাতির জনক ও জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি রোধ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, সুদক্ষ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা ইত্যাদি ব্যাপারে লক্ষ্য নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান, স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ ও শান্তির পক্ষে পররাষ্ট্রনীতি, দলের অভ্যন্তরে উপদল সৃষ্টির চিন্তা পরিহার ও দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলার আহ্বান, জীবন দিয়ে হলেও পিতার মতো দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার অঙ্গীকার ইত্যাদি।

কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বিদেশে নির্বাসনে থাকার পর স্বদেশে ফিরে আসার দিনের স্মৃতি, বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে মানুষের অফুরন্ত ভালোবাসা পাওয়া এবং বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ ও এ দেশের মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক-সম্বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে যেসব কথা বলেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> ...আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে ফেরার পর বঙ্গবন্ধু প্রেমিক বাংগালী জাতি আমাকে সুগভীর আত্মীয়তায় একাত্ম করে নিয়েছে। স্বদেশে ফেরার সেই বর্ষণমুখর দিনে লক্ষ-কোটি বাংগালীর যে অকৃত্রিম ভালবাসার উষ্ণতা আমি লাভ করেছি, তা-ই আমার চলার পথের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে গত ৫ বছর দলীয় কর্মকাণ্ডে আপনাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছি। আন্দোলনে, সংগ্রামে ও দলীয় কার্যক্রমে আমি সারা বাংলায় দেখতে পেয়েছি বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ ও বাংলার জনগণ এক প্রাণ এক আত্মা।[৩৭]

বাংলাদেশের রাজনীতি ও এ দেশের জনগণের জীবনে আওয়ামী লীগের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেন :

> বাংলাদেশের জনগণের জীবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান। গত তিন যুগের অধিক সময় ধরে বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে জনগণের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য। জাতীয় জীবনের সকল ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এদেশের জনগণের সংগঠন এবং আওয়ামী লীগের কোন বিকল্প নেই।[৩৮]

আওয়ামী লীগের জন্মের ইতিহাস উল্লেখপূর্বক একমাত্র গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে, কোনোরূপ ষড়যন্ত্রের পথে নয়, ক্ষমতায় যাওয়ার ওপর অবিচল আস্থা স্থাপন করে শেখ হাসিনা কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বলেন :

> প্রাসাদের অভ্যন্তরে বা সেনা ছাউনিতে এই দলের জন্ম হয়নি। কোন সামরিক শাসকদের পকেট থেকেও বের হয়ে আসেনি। বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘ তিন যুগ ধরে। কোন ষড়যন্ত্র আমাকে ক্ষমতায় বসিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন দলে পরিণত করবে আমরা তা বিশ্বাস করি না। একমাত্র ব্যালট ও জনগণের ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কিছুই ক্ষমতা দখলের উপায় হিসাবে আমরা বিবেচনা করি না।[৩৯]

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অতীত ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ অঙ্গীকার সম্বন্ধে শেখ হাসিনা বলেন :

> যেন তেন প্রকারে ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য যেমন আওয়ামী লীগের জন্ম হয়নি, তেমনি ক্ষমতার সাথে ও ক্ষমতার বাইরে বিগত ৩৮ বছরে আওয়ামী লীগের ভূমিকা হচ্ছে বাংগালী জাতির মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বস্ততার সাথে নেতৃত্ব দান। আজো এই কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের অংগীকার হচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে স্বৈরতন্ত্রের চির অবসান ঘটিয়ে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।[৪০]

আওয়ামী লীগের জন্য বর্তমান কাউন্সিলের গুরুত্ব, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, তাঁর নিজস্ব অনুভূতি, সাংগঠনিক সংকট কাটিয়ে ওঠা ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, একটি ঐতিহাসিক ভূমিকায়ও মণ্ডিত। একদিকে জাতীয় রাজনীতিতে বিগত প্রায় একযুগের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি অপরদিকে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বিগত দিনের নানা জটিলতা ডিঙ্গিয়ে আজকের এই কাউন্সিল আমাদের দলীয় ও জাতীয় জীবনে নূতন দিগন্ত উন্মোচনের অঙ্গীকার নিয়ে এসেছে। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসাবে আমি এই প্রথম আপনাদের সাথে দলীয় কাউন্সিলে সমবেত হয়েছি। গত পাঁচ বছরের সমস্যাসংকুল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দলের অভ্যন্তরীণ সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার পর আমি আজ এই কাউন্সিলে আপনাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। সারা বাংলায় আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমাদের সংগঠন যেমনি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি আপনাদের সুগভীর আত্মীয়তা আমাকেও পিতৃ-মাতৃ-ভাই-স্বজনহীন এই স্বদেশে শুধু বেঁচে থাকার শক্তিই দেয়নি সংগ্রামের সাথে একাত্ম হওয়ার সাহসও দিয়েছে। আমি সব হারিয়ে আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি।[৪১]

শেখ হাসিনা দলের সভানেত্রী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন এবং তাঁর অঙ্গীকার সম্বন্ধে ভাষণের শেষে যে কথাগুলো বলেন, তা ছিল তাঁর হৃদয় উৎসারিত ও মর্মস্পর্শী :

> যে গুরুদায়িত্ব আপনারা আমার উপর অর্পণ করেছিলেন, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসাবে আমি আমার সীমিত শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে গত পাঁচ বছর তা পালন করতে সচেষ্ট থেকেছি। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। দেশ ও জাতির সেবা করার শিক্ষাই আমার জীবন আমাকে শিখিয়েছে। আপনাদের অর্পিত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমি নিজেকে নিয়োজিত করেছি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দলকে শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আওয়ামী লীগের মত এত বিশাল সংগঠন পরিচালনার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। আপনাদের সর্বাত্মক ও সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি বলেই গত পাঁচ বছর দলকে আমি পরিচালনা করতে পেরেছি।...এ কাজে যদি কোন ব্যর্থতা থেকে থাকে, সেটুকু আমার অক্ষমতার কারণেই হয়েছে। আপনারা এই সংগঠনের সাথে দীর্ঘ দিন থেকেই জড়িত আছেন। আপনাদের অনেকেই বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী হিসাবে আওয়ামী লীগের জন্মলগ্ন থেকে এই দলকে গড়ে তুলেছেন। আপনারা এবং আপনাদের পরিবারবর্গ বহু নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আপনাদের

www.pathagar.com

> আত্মত্যাগের ফসলই হচ্ছে বাংলার স্বাধীনতা ও বাংলার জনগণের এই সুবিশাল সুসংহত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ... কর্মক্ষেত্রে যদি কোন ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত রেখে যাই তবে তাও আপনারা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন। আমি আমার বাবা, মা, ভাই, স্বজন সব হারিয়ে এই আওয়ামী লীগকেই আমার পরিবার হিসাবে পেয়েছি। জাতির জনকের কন্যা হিসাবে আমার প্রতি আপনাদের সম্মান, স্নেহ, ভালবাসাই আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। আপনাদের এই গভীর স্নেহ-ভালবাসাই আমাকে সব হারানোর বেদনা সহ্য করার শক্তি যুগিয়েছে। কর্ম ক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকায় এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের পদমর্যাদা বা বড় কোন অবস্থান আমার কাম্য নয়।...
>
> যেখানে যে অবস্থার মধ্যেই আমি থাকি না কেন, আমার বাবা যে জাতির জন্য সংগ্রাম করেছেন, সারা জীবন ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন, আমি জীবন দিয়ে হলেও তাদের সেবা করে যাব। আমি সব হারিয়ে আপনাদের স্নেহের ছায়ায় ফিরে এসেছি। বঙ্গবন্ধু যে ভাবে এ দেশের মানুষের সেবা করেছেন, সেভাবে বাংলার দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমিও ... বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসাবে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আপনাদের সাথে এগিয়ে যাব, এই আমার অঙ্গীকার।[৪২]

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন : সাংগঠনিক রিপোর্ট

২রা জানুয়ারি ছিল কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিন। শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অপরাহ্নে শুরু হয়ে তা রাত্রি পর্যন্ত চলে। এতে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদকবৃন্দ রিপোর্ট আকারে তাঁদের কার্যবিবরণী পেশ করেন। মোট ৩০টি জেলার পক্ষ থেকে তা করা হয়। সকল রিপোর্টেই ৫ বছরব্যাপী এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসন-বিরোধী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন, ৭ই মে (১৯৮৬)-র জাতীয় সংসদ নির্বাচন, দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক অবস্থা তুলে ধরা হয়। জেলা নেতৃবৃন্দ তাঁদের রিপোর্টে ৭ই মে'র সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলে বর্ণনা করেন।[৪৩] এছাড়া তাঁরা সকলেই দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করে ভবিষ্যতেও যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত করার পক্ষে মত দেন।

শেষদিনের অধিবেশন : সাংগঠনিক রিপোর্ট, গঠনতন্ত্র সংশোধন, প্রস্তাব গ্রহণ, নেতৃত্ব নির্বাচন

তৃতীয় ও শেষদিনের কাউন্সিল অধিবেশন ৩রা জানুয়ারি শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে শুরু হয়ে অনেক রাত পর্যন্ত চলে। পূর্বের দিন সাংগঠনিক কমিটির রিপোর্ট পেশ সমাপ্ত না হওয়ায় এ দিন ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সাংগঠনিক জেলা কমিটিসমূহের পক্ষ থেকে তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরে রিপোর্ট পেশ করা হয়।

গঠনতন্ত্র সংশোধন

একই অধিবেশনে দলের গঠনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়।[৪৪] প্রেসিডিয়ামের সদস্য সংখ্যা ১০ থেকে বৃদ্ধি করে ১২ করা হয়। ৩টি নতুন সম্পাদকীয় পদ যথা—অর্থ ও

www.pathagar.com

পরিকল্পনা, তথ্য ও গবেষণা এবং আইন বিষয়ক সম্পাদক সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া ৩টি নতুন সহকারী সম্পাদকের পদও সৃষ্টি করা হয়। পূর্বের যুব সম্পাদকের পদটি বিলুপ্ত করা হয়।

৫৪ সদস্যের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫৯ সদস্যে এবং জেলা কমিটির সদস্য সংখ্যা ৪০ থেকে ৪৯ সদস্যে উন্নীত করা হয়। জেলা কমিটিতে ৩ জন সহ-সভাপতির স্থলে ৫ জন সহ-সভাপতি রাখার বিধান করা হয়।

প্রস্তাব গ্রহণ

কাউন্সিলের এ অধিবেশনে 'জনগণের ক্ষমতা ছিনতাইকারী সরকারের উৎখাতই এই মুহূর্তে জাতীয় দায়িত্ব' এ ঘোষণা দিয়ে '৭-দফা আশু দাবি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে' ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশের সকল গণতন্ত্রকামী, প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক দল, শক্তি ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ৭-দফা দাবি ছিল নিম্নরূপ :[৪৫]

১. সংসদীয় পদ্ধতির সরকার : বর্তমান সরকারের অপসারণ ও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার।

২. রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি : '৭২ সালের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত প্রতিহত করে প্রতিটি মৌলিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

৩. বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, শিশু ও নারী হত্যাকারীদের বিচার ও খুনিদের পুনর্বাসনের অপচেষ্টা প্রতিরোধ। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব-বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. গণতান্ত্রিক প্রশাসন ও আইনের শাসন : জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রশাসন, জীবনধারা ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধন এবং আইনের শাসন কায়েম।

৫. রাজবন্দিদের মুক্তি : সকল রাজবন্দির মুক্তি ও রাজনৈতিক নির্যাতন বন্ধ।

৬. প্রতিরক্ষা বাহিনী ও উপজাতীয় সমস্যা : দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সকল রাজনৈতিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা। উপজাতীয় সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান।

৭. পররাষ্ট্রনীতি : নতজানু পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তে কার্যকর স্বাধীন জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ।

এছাড়া একই অধিবেশনে ১২-দফা অর্থনৈতিক দাবি গৃহীত হয়। এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপ :[৪৬]

বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : ১৯৭৫-এর পর দেশে অনুসৃত অবাধ পুঁজিবাদী উন্নয়নের অভিজ্ঞতা থেকে একথা আজ নির্দ্বিধায় বলা যায় যে,

www.pathagar.com

গণমানুষের কল্যাণের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই ছিল সঠিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। কাজেই বঙ্গবন্ধুর নীতিমালাসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্য, অনাহার, শোষণ, বুভুক্ষা দূর করে সুখী সুন্দর শোষণহীন বাংলাদেশ গড়ে তুলে জনগণের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও চাকরির অধিকার নিশ্চিত করা ও সুখীসমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া বন্ধ : অনতিবিলম্বে বিরাষ্ট্রীয়করণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে জনগুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো, বিশেষত ব্যাংক, পাট শিল্প, পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি ব্যবসা পুনরায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা।

জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে সহায়ক পদক্ষেপ : জাতীয় অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাশাপাশি জাতীয় পুঁজি বিকাশে সহায়ক ব্যক্তিমালিকানায় ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি ও উৎসাহ দান, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি বন্ধ করা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের নীতি পরিহার করা। খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ জোরদার করে জাতীয় স্বার্থে এগুলোর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা, কৃষিখাতে ভর্তুকি বহাল করা, যুক্তিসংগত ভূমিসংস্কার করা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা প্রভৃতি।

পাটবিষয়ক প্রস্তাব : সরকারের পাটনীতির তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, সরকারের ভ্রান্ত ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী নীতি গ্রহণের ফলে সোনালি আঁশ পাট চাষিদের গলার ফাঁসে পরিণত হয়েছে। পাটের ন্যূনতম দাম প্রকারভেদে ৪শ' থেকে ৫শ' টাকা ধার্য, অভ্যন্তরীণ বাজারে সরকারি ক্রয়-বিক্রয় সংস্থার মূল্য নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সারাদেশে গ্রামাঞ্চলে পাট ক্রয় কেন্দ্র খোলার দাবি। লে-অফকৃত পাটকলগুলো অবিলম্বে সরকারি উদ্যোগে চালু এবং শ্রমিক ছাটাই বন্ধসহ ভবিষ্যতে লে-অফ করার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার ঘোষণা।

কৃষিবিষয়ক প্রস্তাব : সার বীজ কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণের মূল্য ৫০ ভাগ হ্রাস, কৃষি ঋণ আদায়ের নামে সার্টিফিকেট জারি বন্ধ, প্রকৃত কৃষকদের নামমাত্র সুদে কৃষিঋণ প্রদান এবং গ্রামের খেতমজুরদের কাজ ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান। ভূমির মালিকানা সিলিং আরও কমানো, কৃষকের হাতে জমি ও বহুমুখী গ্রাম সমবায় নীতির ভিত্তিতে আমূল ভূমি সংস্কার সাধন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির ওপর খাজনা মওকুফ এবং ভূমি থেকে বর্গা চাষিদের উচ্ছেদ কঠোরভাবে দমন ও তেভাগা ব্যবস্থা চালু।

দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ : একই সাথে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বতন গতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

অন্যান্য প্রস্তাব[৪৭]

কাউন্সিলে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাব : শেখ হাসিনাসহ ১৫ দলীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত 'বগুড়া ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহার; কাদের সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে মামলা ও সকল বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে সসম্মানে তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তন; শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ ও স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন

www.pathagar.com

রিপোর্টের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন; বাঙালির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বিজয় ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে দেশিয় সংস্কৃতিকে লালন ও সমৃদ্ধ করার দাবি ইত্যাদি।

নেতৃত্ব নির্বাচন

কাউন্সিলের শেষ দিনের অধিবেশনে দলের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা হয়। সভানেত্রী পদে শেখ হাসিনা সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁরা হলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আমির হোসেন আমু ও সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ।[৪৮] এজন্য বিষয় নির্বাচনি কমিটিকে কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করতে হয়। অবশেষে রাত্রি ১১টায় বিষয় নির্বাচনি কমিটির পক্ষে শেখ হাসিনা কাউন্সিলরদের সামনে নতুন কর্মকর্তাদের নাম পেশ করেন। কাউন্সিলরগণ হাত তুলে তা সমর্থন করেন। কোষাধ্যক্ষ এবং অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক এবং ৩টি সহকারী সম্পাদকের নাম পরে ঘোষণা করা হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নামও প্রেসিডিয়ামের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সভানেত্রী কর্তৃক পরে ঘোষিত হয়। দলের নির্বাচিত কমিটি নিম্নরূপ :[৪৯]

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য	:	আব্দুল মালেক উকিল
		সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন
		আবদুস সামাদ আজাদ
		আবদুল মান্নান
		জিল্লুর রহমান
		ডক্টর কামাল হোসেন
		পুলিন দে
		সালাহউদ্দিন ইউসুফ
		কামরুজ্জামান
		মতিউর রহমান
		এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম
		ডা. আলাউদ্দীন
সাধারণ সম্পাদক	:	বেগম সাজেদা চৌধুরী
যুগ্ম সম্পাদক	:	আমির হোসেন আমু
		আবদুল জলিল
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	তোফায়েল আহমেদ
প্রচার সম্পাদক	:	মোহাম্মদ নাসিম
সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	:	মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন
দফতর সম্পাদক	:	ফজলুল হক বিএসসি

www.pathagar.com

সহ-দফতর সম্পাদক	:	খ ম জাহাঙ্গীর
শ্রম সম্পাদক	:	বেগম মনুজান সুফিয়ান
কৃষি সম্পাদক	:	বেগম মতিয়া চৌধুরী
শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক	:	শামসুর রহমান খান শাজাহান
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	:	শফিকুল আজিজ মুকুল
সহ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	:	মমতাজ হোসেন
ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ	:	মফিজুল ইসলাম কামাল
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	:	এডভোকেট সিরাজুল হক
আইন বিষয়ক সম্পাদক	:	আবু সাঈদ সাগর
মহিলা সম্পাদিকা	:	বেগম আইভি রহমান
অর্থ ও পরিকল্পনা	:	আতাউর রহমান খান (কায়সার)
কোষাধ্যক্ষ	:	ব্যারিস্টার শওকত আলী খান

কার্যনির্বাহী কমিটির ২৫ জন সদস্য হচ্ছেন :[৫০] আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম, শেখ আবদুল আজিজ, রফিকউদ্দিন ভূইয়া, আবদুল মোমিন, দেওয়ান ফরিদ গাজী, শামসুজ্জোহা, ইউনুস আলী, রওশন আলী, মো. ইলিয়াস, নূরুন্নবী, গাজী আজহার উদ্দিন, ওয়াজেদ চৌধুরী, আবদুল মান্নান (চট্টগ্রাম), সিদ্দিক হোসেন, জহিরুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান খান, হরনাথ বাইন, তালেব আলী, মতিয়ুর রহমান (জামালপুর), আনোয়ার চৌধুরী, আবদুর রব (এমপি), মোহাম্মদ হানিফ, রাজিউদ্দিন রাজু, ওমর আলী ও ওবায়দুল কাদের।

লক্ষণীয় যে, আব্দুর রাজ্জাকের স্থলে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী পূর্ণ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। প্রবীণ নেতা আব্দুল মালেক উকিল দলে ফিরে আসায় প্রেসিডিয়ামে তাঁর পূর্বের ১ নম্বর পদে তাঁকে বহাল করা হয়। এছাড়া ৬ জন নতুন সদস্য প্রেসিডিয়ামে অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁরা হলেন পুলিন দে, সালাহউদ্দিন ইউসুফ, কামরুজ্জামান, মতিউর রহমান, এডভোকেট সিরাজুল হক ও ডা. আলাউদ্দিন। আমির হোসেন আমু ও তোফায়েল আহমেদ তাঁদের পূর্বের স্ব-স্ব পদে পুনর্নির্বাচিত হন। মোহাম্মদ নাসিমকে প্রচার সম্পাদক করা হয়। এই প্রথম সৃষ্ট তিনজন সহ-সম্পাদক পদে মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, খ ম জাহাঙ্গীর ও মমতাজউদ্দিন সভানেত্রী কর্তৃক মনোনীত হন। শফিকুল আজিজ মুকুল বাকশাল থেকে আওয়ামী লীগে ফিরে আসায় তাঁকে তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক করা হয়। সাবেক দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ আহমদ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক এস এম ইউসুফ দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে বহিষ্কৃত হওয়ায় তাঁদের স্থলে যথাক্রমে ফজলুল হক বিএসসি ও শামসুর রহমান খান শাহজাহান ঐ পদে নির্বাচিত হন। শ্রম সম্পাদক এ বি এম তালেব আলী বাকশালে যোগদান করায় তাঁর স্থলে বেগম মনুজান সুফিয়ান শ্রম সম্পাদক হন। নতুন সৃষ্ট আইন সম্পাদক পদে আবু সাঈদ সাগর এবং অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক পদে আতাউর রহমান খান (কায়সার)-কে নির্বাচিত করা হয়। কোষাধ্যক্ষ ফজলুল

www.pathagar.com

করিম বাকশালে থেকে যাওয়ায় তাঁর স্থলে ব্যারিস্টার শওকত আলী খানকে নতুন কোষাধ্যক্ষ করা হয়।

নানা কারণে আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল খুবই গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কাউন্সিল অনুষ্ঠানের মতো অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি আদৌ ছিল না। বিরতিহীনভাবে চলছিল এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলন। ঘরোয়া রাজনীতি পর্যন্ত সরকার একাধিকবার বন্ধ করে দেয়। অপরদিকে দলের চরম অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে শেষ পর্যন্ত বড়ো ধরনের ভাঙন দেখা দেয়। এ-রকম অবস্থায় কাউন্সিল অনুষ্ঠান নেতৃত্বের জন্য ছিল রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে শেখ হাসিনা স্বয়ং কাউন্সিল শেষে এক প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, 'এবারের কাউন্সিল ছিল আমাদের জন্য একটি বিরাট পরীক্ষা। আমরা সুষ্ঠু ও ঐক্যবদ্ধভাবে তা সম্পন্ন করতে পেরেছি।'[৫১]

এ কাউন্সিল উপলক্ষ্যে শেখ হাসিনা সারাদেশের মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে প্রথমবারের মতো সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার সুযোগ পান। অন্যদিকে এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের মাঠে সাহসী এবং যখন প্রয়োজন হয়েছে কৌশলী ভূমিকা পালন করে তুলনামূলক কম সময়ের ব্যবধানে তিনি নেতৃত্বের অগ্রভাগে উঠে আসেন। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত সঠিক ও কৌশলী হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও ঐ সংসদ স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল, তারপরও এর মাধ্যমে তিনি সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রীর আসন ও মর্যাদা লাভ করেন। দলের নেতা-কর্মীরা পুরোদমে উজ্জীবিত হয়। ফলে যারা পূর্বে বিভিন্ন সময় দলত্যাগ করেছিলেন, তাদের অনেকে ফিরে আসতে শুরু করেন। দলকে সুসংগঠিত করা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে শেখ হাসিনা পূর্বের তুলনায় আরও বেশি আস্থাবান ও আত্মপ্রত্যয়ী হন, যা তাঁর বক্তব্যেও প্রকাশ পায় : 'প্রতিকূলতা ও বাধার মুখে আমরা আগে যেমন এগিয়ে গিয়েছি, এবারও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে... আওয়ামী লীগ হচ্ছে একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আওয়ামী লীগই পারবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে।'[৫২]

তথ্যনির্দেশ

১. *ইত্তেফাক*, ২রা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ২রা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮

২. দ্রষ্টব্য *রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৮১ : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার*

৩. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩৫৮

৪. তখনকার পত্র পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

৫. Ahmed Shafiqul Haque and Muhammad Yeahia Akhter, 'Militarization and Opposition in Bangladesh : Parliamentary Approval and Public Reaction', *The Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, 27:2 (July 1989), pp. 172-84; Muhammad Abdul Hakim, *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum*, Dhaka 1993, pp.12-14; আরও, হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩৬২

www.pathagar.com

৬. ১লা এপ্রিল ১৯৮৩ ঘরোয়া রাজনীতি এবং ১৪ই নভেম্বর ১৯৮৩ প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দিয়ে ১লা মার্চ ১৯৮৫ তা নিষিদ্ধ করা হয়। পুনরায় ১লা অক্টোবর ১৯৮৫ ঘরোয়া রাজনীতি এবং ১লা জানুয়ারি ১৯৮৬ প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেওয়া হয়। সরকার-বিরোধী তীব্র আন্দোলনের কারণে দুদফা ঘরোয়া ও প্রকাশ্য রাজনীতির অনুমতি দেওয়া ও তা বন্ধ করা হয়।

৭. ১৫ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (মোজাফফর), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, একতা পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, গণআজাদী লীগ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), আওয়ামী লীগ (মিজান চৌধুরী), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (চৌধুরী হারুন), বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (তোয়াহা), কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল, আওয়ামী লীগ (দেওয়ান ফরিদ গাজী), বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (নগেন সরকার) ও মজদুর পার্টি।

৮. ১৯৮২ সালের ২১শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে ১৪টি ছাত্র সংগঠন নিয়ে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

৯. ৭ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), ইউপিপি, কমিউনিস্ট লীগ, জাতীয় লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, ন্যাপ (ভাসানী) ও গণতান্ত্রিক পার্টি।

১০. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৮৭-তে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরীর *রিপোর্ট : '৮১ থেকে '৮৬* দ্রষ্টব্য (এরপর *রিপোর্ট : '৮১ থেকে '৮৬*)।

১১. ১৯৮৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ড. কামাল হোসেনের বাসায় বৈঠকরত অবস্থায় শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাই গ্রেপ্তার হন। এছাড়া ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর শেখ হাসিনাকে গৃহবন্দি করা হয়। ১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চের গণভোটের পূর্বে ২রা মার্চ পুনরায় তিনি গৃহবন্দি হন। একই বছর ১৬ ও ২০শে এপ্রিল তাঁকে গৃহবন্দি রেখে সরকার উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বের দিন তাঁকে ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু বাসভবনে অন্তরিন করে রাখা হয়।

১২. সেলিমের পুরো নাম এইচ এম ইব্রাহিম সেলিম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র। সে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিল। দেলোয়ারের পুরো নাম কাজী দেলোয়ার হোসেন। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। সে ছাত্রলীগ জাতীয় কমিটির সদস্য ছিল।

১৩. রাউফুন বসুনিয়া বাকশাল সমর্থিত জাতীয় ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ছিল।

১৪. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী মওলানা মান্নানের সভাপতিত্বে ১৩-১৪ জানুয়ারি ১৯৮৩ ঢাকায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ জমীয়াতুল মোদাররেসীন-এর দুদিনব্যাপী ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শেষের দিন প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রাম।' একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে শহিদ মিনারে আলপনা আঁকার কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে কোরআনখানীর আয়োজন করা হইবে।' সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের

www.pathagar.com

বিরোধিতাকারী শর্ষীনার পীর মওলানা শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। সৌদি আরব, পাকিস্তান, কুয়েত, ইরাকসহ কয়েকটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূতগণ এতে যোগ দেন। *ইত্তেফাক*, ১৫ই জানুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ১,৮

১৫. দলগুলো হলো জাসদ (ইনু), বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ও বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল।

১৬. ৮টি দল হলো আওয়ামী লীগ, বাকশাল, ন্যাপ (মোজাফফর), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, এনএপি, জাসদ (সিরাজ), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (নজরুল ইসলাম) ও গণআজাদী লীগ।

১৭. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩৬৪

১৮. এসব প্রার্থীর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি কর্নেল ফারুকও ছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার দায়ে শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে গ্রেপ্তার ও দীর্ঘ বিচার শেষে ২৮শে জানুয়ারি ২০১০ তারিখ তার বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় কার্যকর হয়।

১৯. ছাত্রলীগের মূল কমিটির সভাপতি ছিলেন মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন খ ম জাহাঙ্গীর। বিদ্রোহী কমিটির সভাপতি হলেন ফজলুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক বাহালুল মজনুন চুন্নু।

২০. নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে ফজলুর রহমান ও মুকুল বোস। ফজলুর রহমান বর্তমানে বিএনপির কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার নেতা, মুকুল বোস রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয়।

২১. এঁরা হলেন আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুল মালেক উকিল, মহিউদ্দীন আহমদ, আবদুল মমিন তালুকদার, সৈয়দ আহমদ ও এস এম ইউসুফ। ১৯৮৩ সালের ৩রা আগস্ট তাঁদের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

২২. এঁরা হলেন সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন, এম কোরবান আলী, আবদুল মান্নান, আব্দুস সামাদ আজাদ, ড. কামাল হোসেন, জিল্লুর রহমান, বেগম সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু ও তোফায়েল আহমেদ। *সংবাদ*, ১৬ই অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১। এঁদের মধ্যে প্রথম ৬ জন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং বেগম সাজেদা চৌধুরী ও আমির হোসেন আমু যুগ্মসম্পাদক আর তোফায়েল আহমেদ সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

২৩. আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুল মালেক উকিলের সঙ্গে তাঁর দলে ফেরার ব্যাপারে সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও অন্য নেতৃবৃন্দের একাধিক বৈঠক হয়। সর্বশেষ শেখ হাসিনার কাছে 'আপনার সাথেই আছি' এ কথা বলে লেখা এক পত্রে তাঁর (শেখ হাসিনা) নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে ভবিষ্যতে কাজ করে যাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় 'পথ রুদ্ধ না হইলে আজ হউক কাল হউক দলে ফিরিয়া আসিবেন' এ বিশ্বাসে তাঁকে বহিষ্কার থেকে রেহাই দেওয়া হয়। দ্রষ্টব্য, *ইত্তেফাক*, ১২ই অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮; *ঐ*, ১৩ই অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১

২৪. যাঁদের এ সুযোগ দেওয়া হয় তাঁরা হলেন সরদার আমজাদ হোসেন, শফিকুল আজিজ মুকুল প্রমুখ। *ইত্তেফাক*, ১২ই অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮। সরদার আমজাদ হোসেন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক এবং শফিকুল আজিজ মুকুল সংস্কৃতি সম্পাদক ছিলেন।

২৫. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ১৮ই অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১; *ঐ*, ২০শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮;

www.pathagar.com

ঐ, ২১শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮; *ঐ*, ২২শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮; *ঐ*, ২৩শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ২২শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮; *ঐ*, ২৩শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮

২৬. কাউন্সিলে আব্দুর রাজ্জাকের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য, *ইত্তেফাক*, ২২শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ২২শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮

২৭. কাউন্সিলে মহিউদ্দিন আহ্‌মদ-এর বক্তব্য দ্রষ্টব্য, *ইত্তেফাক*, ২২শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮

২৮. ২২শে অক্টোবর কাউন্সিলের শেষদিন সাংগঠনিক কমিটির ৭৫ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। ২৪শে অক্টোবর কমিটির প্রথম বৈঠকে আরও ১৫ জন সদস্যকে কো-অপ্ট করা হয়। পূর্ণাঙ্গ তালিকা দ্রষ্টব্য, *সংবাদ*, ২৪ ও ২৫শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮; আরও দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ২৩শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮

২৯. তাঁরা হলেন ২ জন প্রেসিডিয়াম সদস্য যথা মহিউদ্দীন আহমদ ও আবদুল মমিন তালুকদার, ৬ জন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। এঁরা হলেন আব্দুর রাজ্জাক (সাধারণ সম্পাদক), সরদার আমজাদ হোসেন (প্রচার সম্পাদক), সৈয়দ আহমদ (দপ্তর সম্পাদক), এস এম ইউসুফ (শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক), এ বি এম তালেব আলী (শ্রম সম্পাদক), শফিকুল আজিজ মুকুল (সাংস্কৃতিক সম্পাদক) এবং কোষাধ্যক্ষ ফজলুল করিম।

৩০. দ্রষ্টব্য রাজ্জাক 'কাউন্সিল অধিবেশনে আদর্শগত দ্বন্দ্বের প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে', *ইত্তেফাক*, ১৭ই অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৭; *ইত্তেফাক*, ২২শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ২২শে অক্টোবর ১৯৮৩, পৃ. ১, ৮

৩১. দ্রষ্টব্য রিপোর্ট : *'৮১ থেকে '৮৬।*

৩২. *ইত্তেফাক*, ২রা জানুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ১, ১২; আরও *রিপোর্ট : '৮১ থেকে '৮৬।* প্রত্যাগতদের দলে স্বাগত জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'স্বৈরশাসনের অবসান ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির ব্যাপক ঐক্য প্রয়োজন'। অন্যদেরও দলে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে এবং দল ত্যাগের মতো পরিস্থিতি যাতে ভবিষ্যতে সৃষ্টি না হয় একই সঙ্গে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'বিভ্রান্তিতে পড়িয়া এখনও যাঁহারা বাহিরে তাঁহারা ঘরে ফিরিয়া আসুন; তবে আর যেন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়।'

৩৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি অক্সফাম-এর মহাপরিচালক ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে অক্সফাম সে-সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩৪. *সংবাদ*, ২রা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮

৩৫. দ্রষ্টব্য *রিপোর্ট : '৮১ থেকে '৮৬।*

৩৬. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন '৮৭-তে *সভানেত্রীর ভাষণ* (এরপর *সভানেত্রীর ভাষণ '৮৭*); আরও দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ২রা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮

৩৭. *সভানেত্রীর ভাষণ ১৯৮৭*

৩৮. *ঐ*

৩৯. *ঐ*

৪০. *ঐ*

www.pathagar.com

৪১. ঐ

৪২. ঐ

৪৩. *ইত্তেফাক*, ৩রা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১; *সংবাদ*, ৩রা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮;

৪৪. *সংবাদ*, ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮

৪৫. সংকলিত, *ইত্তেফাক*, ৫ই জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ৫ই জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১

৪৬. সংকলিত, *সংবাদ*, ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮

৪৭. *সংবাদ*, ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ৮

৪৮. ঐ, ৩রা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮

৪৯. *ইত্তেফাক*, ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮। ঢাকা মহানগর কমিটির ৩ জন কর্মকর্তার নাম ঘোষণা করা হয়। তাঁরা হলেন মোজাফফর হোসেন পল্টু (সভাপতি), এম এ আজিজ (সাধারণ সম্পাদক) ও আখতারুল আলম (সাংগঠনিক সম্পাদক)। *সংবাদ*, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ১, ৮

৫০. কার্যনির্বাহী কমিটির আরও ২ জনের নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়। *সংবাদ*, ২৩ শে জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ৮

৫১. *সংবাদ*, ৪ জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ৮

৫২. ঐ

www.pathagar.com

অধ্যায় : ষোলো

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯২ : নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা

গত কাউন্সিলের (১-৩রা জানুয়ারি ১৯৮৭) ৫ বছর ৮ মাস ১৮ দিন পর ১৯৯২ সালের ১৯-২০শে সেপ্টেম্বর দুদিনব্যাপী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও এর উদ্বোধন করেন সংগঠনের সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। এর পূর্বে একবার কাউন্সিলের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল বটে, কিন্তু রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানে বিলম্বের মূলে ছিল এরশাদ-বিরোধী দীর্ঘ আন্দোলন, এরশাদের পতনের পর জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নির্বাচনোত্তর নতুন করে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি। কাউন্সিলে সারাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক কাউন্সিলর ও ডেলিগেট যোগ দেন। দলের সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী এতে রিপোর্ট পেশ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়াসহ পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে জাতীয় উন্নয়নে নতুন দিক-নির্দেশনার আবশ্যকতা বিবেচনায় আওয়ামী লীগের এ কাউন্সিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাউন্সিলে নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণের পাশাপাশি দলের গঠনতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়।

পটভূমি

১৯৮৭ ও ১৯৯২ এ দুই কাউন্সিলের মধ্যবর্তী সময় খুবই ঘটনাবহুল ছিল। এ সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি হচ্ছে : সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিধান করে এরশাদ প্রণীত জেলা পরিষদ বিল (জুলাই ১৯৮৭) বিরোধী দল কর্তৃক প্রতিহত, বিরোধী দলীয় সদস্যদের একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ (নভেম্বর ১৯৮৭), এরশাদের দ্বিতীয় দফা জাতীয় সংসদ নির্বাচন (৩রা মার্চ ১৯৮৮) ও কার্যকর সকল বিরোধী দল ও জোটের তা বর্জন, সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী (৭ই জুন ১৯৮৮) ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে ৩ জোটের অভিন্ন রূপরেখা (১৯শে নভেম্বর ১৯৯০), এরশাদ সরকারের পতন (৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০) ও বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ নতুন রাষ্ট্রপতি, নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১), নির্বাচনোত্তর বিএনপি'র সরকার গঠন, সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস (৬ই আগস্ট ১৯৯১) ও সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন, ড. কামাল হোসেনের গণতান্ত্রিক ফোরাম (১৯৯১) ও গণফোরাম গঠন (১৯৯২), আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বাকশালের আওয়ামী লীগের সঙ্গে একীভূত হওয়া (আগস্ট ১৯৯১), শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা নাগরিক আন্দোলন (১৯৯২) ইত্যাদি। আন্তর্জাতিকভাবে

www.pathagar.com

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পতন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কোনো কোনো দেশের ভাঙনের সম্মুখীন হওয়া।

এরশাদের অধীনে ১৯৮৬ সালের ৭ই মে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন পূর্বের ১৫ দলভুক্ত ৫টি বামপন্থি দলের বর্জনের কথা পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের রাজনৈতিক লাইন ছিল আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটানো। আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃত্বাধীন নবগঠিত ৮ দলীয় জোট ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বটে, তবে তা ছিল মূলত কৌশলগত। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জোটের বিজয়কে মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এরূপ ধারণা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল ছাড়াও অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। এরপর সকল দল ও জোটের বর্জন সত্ত্বেও রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে এরশাদ সরকার যেভাবে ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিয়ে নেয়, তা এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে, যে বিষয়টি আওয়ামী লীগকে আরও ক্ষুব্ধ করেছিল তা হলো, ঐ নির্বাচনে জাতির পিতার আত্মস্বীকৃত খুনি কর্নেল ফারুককে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দান।[২]

১৯৮৭ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে এরশাদ সরকার সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বসহ জেলা পরিষদ বিল সংসদে উপস্থাপন করে। বিলের উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি ও প্রশাসনের ওপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। দেশ শাসনে সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্বের নামে জেনারেল এরশাদ প্রকারান্তরে এ দাবিই এতদিন করে আসছিলেন। এ বিলকে 'বেসামরিক লেবাসে সামরিক আইন জারি'[৩] হিসেবে আখ্যায়িত করে সংসদের ভেতরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলের সকল সদস্য এর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। পাশাপাশি চলে হরতালসহ রাজপথের আন্দোলন। বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে এক পর্যায়ে সরকার সংসদে বিলটি পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয় বটে, তবে সংসদের ভেতরে ও বাইরে তীব্র আন্দোলনের কারণে 'পুনঃবিবেচনার জন্য সংসদে ফেরৎ পাঠানোর' নামে বিলটি কার্যত প্রত্যাহার করে নিতে সরকার বাধ্য হয়।

সংসদের বাইরে যেমন, তেমন সংসদের ভেতরেও জেলা পরিষদ বিলের মতো নানা ইস্যুতে সরকারের সর্বাত্মক বিরোধিতার চেষ্টা শেষে ১৯৮৭ সালের নভেম্বর আওয়ামী লীগসহ সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় ৬ই ডিসেম্বর এরশাদ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

এর পূর্বে ২৮শে অক্টোবর ১৯৮৭ ৮ দল ও ৭ দলীয় জোট নেত্রী যথাক্রমে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া আন্দোলনকে আরও তীব্র করার লক্ষ্যে এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। ১০ই নভেম্বর ছিল ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় জোটের 'ঢাকা অভিযান' কর্মসূচি। সরকার কর্তৃক ঢাকা শহরে প্রবেশের সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও হাজার-হাজার মানুষ ঢাকার রাস্তায় সমবেত হয়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজনও বিপুল সংখ্যায় তাতে যোগ দেয়। সেদিন ঢাকার জিরো পয়েন্টে পুলিশের গুলিতে নিহত

www.pathagar.com

হয় যুবলীগ কর্মী নূর হোসেন, যার বুকে ও পিঠে লেখা ছিল 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' 'স্বৈরাচার নিপাত যাক'। নূর হোসেনের মৃত্যু মানুষের অনুভূতিতে ভীষণ নাড়া দেয়। সে পরিণত হয় আন্দোলনের প্রতীকে। ভীত-সন্ত্রস্ত সরকার পরের দিন দুই নেত্রীকে এক মাসের জন্য গৃহে অন্তরিন করে রাখে। বিরোধী জোট ২১শে নভেম্বর ৪৮ ঘণ্টার হরতাল আহ্বান করে। সে হরতাল সারাদেশে কার্যকরভাবে পালিত হলে ২৭শে নভেম্বর সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে। জবাবে আন্দোলনের জোটসমূহ ২৯শে নভেম্বর থেকে টানা ৭২ ঘণ্টার হরতাল ঘোষণা করে। জরুরি অবস্থার মধ্যে ২৪শে জানুয়ারি ১৯৮৮ আওয়ামী লীগ ও ৮ দল নেত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এক জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলে পথিমধ্যে পুলিশ তাঁকে বহনকারী গাড়ি ও জনতার মিছিলের ওপর বেপরোয়া গুলি চালায়। এতে অনেকের মৃত্যু ঘটে।

এদিকে সংসদ বাতিল হয়ে যাওয়ায় এরশাদ সরকার ৩রা মার্চ ১৯৮৮ নতুন করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ দেশের প্রায় সকল বিরোধী দল ও জোট একযোগে এ নির্বাচন বয়কট করে। নির্বাচন পরিণত হয় এক নির্লজ্জ প্রহসনে। তা সত্ত্বেও সরকারি দল জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন পেয়ে বিজয়ী এবং জাসদের এক অংশের নেতা আ স ম আব্দুর রব-এর নেতৃত্বাধীনে নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভুঁইফোঁড় সংগঠন নিয়ে গঠিত সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে বলে ফলাফলে দেখানো হয়।[৪] বঙ্গবন্ধুর এক খুনি বজলুল হুদাকেও ফ্রিডম পার্টির ব্যানারে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।[৫]

এরশাদের ৯ বছরের শাসন আমলে একাধিক নির্বাচন যেমন হ্যাঁ-না ভোট (২১শে মার্চ ১৯৮৫), উপজেলা নির্বাচন (১৬ ও ২০শে মে ১৯৮৫), দুইবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন (৭ই মে ১৯৮৬ ও ৩রা মার্চ ১৯৮৮), রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (১৫ই অক্টোবর ১৯৮৬) অনুষ্ঠিত হলেও, নির্বাচনের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সরকার বা নেতৃত্বের বৈধতা লাভ, তা আদৌ অর্জিত হয়নি। এরশাদ সরকার অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী হিসেবে জনমনে চিহ্নিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে, তাঁর শাসন আমলে নির্বাচনি রাজনীতির অভিধানে 'ভোট ডাকাতির নির্বাচন', 'চর দখলের নির্বাচন', 'ভোটারবিহীন নির্বাচন', 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং', 'মিডিয়া ক্যু' বা 'ঘোষণার নির্বাচন', 'গৃহপালিত বিরোধী দল' ইত্যাদি নতুন অভিধা যুক্ত হয়।

১৯৮৮ সালের প্রায় ভোটারশূন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন নির্বাচনের পর গঠিত সংসদে ৭ই জুন তারিখে এরশাদ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম এবং ৬টি জেলা সদরে[৬] সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার বিধান করে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বিল পাশ করিয়ে নেয়। সারাদেশ জুড়ে দেখা দেয় তীব্র প্রতিবাদ। আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের ব্যানারে আইনজীবীগণ আন্দোলনে শামিল হন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের আদালত বর্জন কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। তাঁদের দায়ের করা এক রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সর্বোচ্চ আদালত সরকারের হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ আইনকে সংবিধান পরিপন্থি হিসেবে চিহ্নিত করে তা বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে এরশাদ সরকার গণস্বার্থ-বিরোধী 'জাতীয় স্বাস্থ্য

www.pathagar.com

নীতি' ঘোষণা করলে, চিকিৎসক সমাজের সংগঠন বিএমএ (বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন) আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়।

১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে এবং দ্রুত চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল সমর্থিত ২২টি ছাত্র সংগঠন ১০ই নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নামে এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে শামিল হয়। এর পূর্বে ৬ই নভেম্বর ঢাকার পাল্টনের জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের (ক) ৩ ধারা, ৫৫ অনুচ্ছেদের (ক) ১ ধারা এবং ৫১ অনুচ্ছেদের ৩ ধারা অনুসারে এরশাদ ও তাঁর সরকারের পদত্যাগ এবং একজন নির্দলীয়-নিরপেক্ষ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি ফর্মুলা তুলে ধরেন। এটি আন্দোলনের তিন জোট ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৯শে নভেম্বর ঘোষিত হয় 'তিন জোটের রূপরেখা'[৭] খ্যাত একটি অভিন্ন ঘোষণা। এর ফলে এরশাদ-বিরোধী দীর্ঘ আন্দোলন দিক-নির্দেশনা লাভ করে। এর দুদিন পূর্ব থেকেই (১৭ই নভেম্বর) শুরু হয় ঢাকার মন্ত্রিপাড়া এবং সারাদেশে এরশাদ সরকারের দুর্নীতিবাজ এমপিদের বাসাবাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি। ২৭শে নভেম্বর বিএমএ আহূত দেশব্যাপী চিকিৎসক ধর্মঘটের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মোড়ে এরশাদের ঘাতক বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণ হারান বিএমএর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. শামসুল আলম মিলন। ১৯৬৯-এ পাকিস্তানি শাসনামলে আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে ইপিআর-এর গুলিতে নিহত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যুঘটনার অনুরূপ ডা. মিলনের এ হত্যাকাণ্ড এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। একই দিন রাতে সরকার ঢাকা শহরে কারফিউ এবং সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ২৯শে নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধী জোটের আন্দোলনের সঙ্গে সহমর্মিতা ঘোষণা করে একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এরপর এক-এক করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দও একই পথ অনুসরণ করেন। রেডিও-টেলিভিশনের শিল্পীরাও সর্বাত্মক অসহযোগিতা শুরু করেন। সেক্রেটারিয়েট-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী পর্যন্ত অফিস ছেড়ে রাস্তায় আন্দোলনে শামিল হন। সংঘটিত হয় এরশাদ-বিরোধী '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান। ৪ঠা ডিসেম্বর এরশাদ ক্ষমতা থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এরপর ৬ই ডিসেম্বর তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় সরকারের হাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে অবসান ঘটে এরশাদের দীর্ঘ ৯ বছরের দুঃশাসনের।[৮]

এরশাদের পতনের পর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তত্ত্বাবধানে ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অনেক দল অংশগ্রহণ করলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় দুটি বড়ো দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থীদের মধ্যে। আওয়ামী লীগের প্রধান নির্বাচনি অঙ্গীকার ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অপরদিকে, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি জাতীয়তাবাদী শক্তির (বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ) ঐক্যের

www.pathagar.com

ওপর গুরুত্বারোপ করে। আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে এককভাবে ২৬৪ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৮৮টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩০.০৮ ভাগ লাভ করে। বাকি ৩৬টি আসনে নিজ দলের প্রার্থী দাঁড় না করিয়ে তা ৮ দলের শরিক বাকশাল, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ও গণতন্ত্রী পার্টির পক্ষে ছেড়ে দেয়। এসব দল মিলে ১২টি আসন পায়। আওয়ামী লীগ ও সমমনা দলসমূহের একত্রে সিট সংখ্যা ছিল ১০০ এবং ভোট ৩৪.২৯ ভাগ। পক্ষান্তরে, বিএনপি ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৪০টি আসন ও ৩০.৮১ ভাগ ভোট পায়।[৯] নির্বাচনের ফল অনেককে বিস্মিত করে। অনেকেরই ধারণা ছিল, আওয়ামী লীগ বিজয়ী হবে। আওয়ামী লীগ তখন দেশের সবচেয়ে সুসংগঠিত ঐতিহ্যবাহী বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। বিএনপি তখনো সাংগঠনিকভাবে অনেকটা দুর্বল ও অসংগঠিত। সাধারণভাবে দেশে আওয়ামী লীগ-বিরোধী শক্তি সে-সময়ে বেশ প্রবল ছিল। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। বিশেষ করে, নির্বাচনে জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির যে অলিখিত সমঝোতা ছিল, তা ফলাফলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই কারণে, জামায়াতের পক্ষে ১৮টি আসন লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এরশাদের আমলে ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃত্বাধীন ৮ দল অংশগ্রহণ করলেও বিএনপি ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। অস্বীকার করা যাবে না, এর ফলে প্রধানত মিডিয়ার কল্যাণে খালেদা জিয়ার 'আপোষহীন নেত্রী'র এক ধরনের ইমেজ গড়ে ওঠে, যা বিএনপি নির্বাচনে কাজে লাগায়। দলগতভাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রাপ্ত ভোট প্রায় সমান। সমমনা দলের (যাদের অনেক প্রার্থী আওয়ামী লীগের 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন) প্রাপ্ত ভোট যুক্ত করলে নৌকার পক্ষে ভোটের হার বিএনপির চেয়ে বেশি। যাহোক, নির্বাচনে সম্প্রতি গণঅভ্যুত্থানে পতিত এরশাদের জাতীয় পার্টির ৩৫টি আসন লাভ ছিল সকলের জন্যই বিস্ময়কর।[১০]

নির্বাচনে সরকার গঠনের মতো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে[১১] বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীনে বিএনপির সরকার গঠিত হয়। আলোচ্য সময়ে 'তিন জোটের রূপরেখা' (১৯শে নভেম্বর ১৯৯০) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় পুনঃপ্রত্যাবর্তন ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড়ো ঘটনা। এ ব্যাপারে সারাদেশে সাধারণ ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছিল। আর ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আওয়ামী লীগ স্বনামে পুনর্গঠিত হওয়ার প্রথম সুযোগ থেকেই (১৯৭৬ সাল) সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে আসছিল। নবগঠিত সংসদে বিরোধী দলে অবস্থান সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এ সংক্রান্ত বিল উত্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে।[১২] এভাবে ১৯৯১ সালের ৬ই আগস্ট সংসদে সকল দলের সম্মতিক্রমে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাশের মাধ্যমে সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। শুরু হয় সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে নবযাত্রা।

দ্বাদশ সংশোধনী পাশের সময় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শীঘ্রই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথমে বিরোধ এবং পরে চরম বৈরী সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। একাধিক আসনে বিজয়ী সংসদ

www.pathagar.com

সদস্যদের ১১টি শূন্য আসনের উপনির্বাচন (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১)-কে কেন্দ্র করে এর সূচনা। নির্বাচনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সরকার দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে প্রশাসনের ওপর প্রভাব খাটানোর মতো ঘটনা ঘটে। তবে শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা-বিরোধী গোলাম আযমের গ্রেপ্তার ও বিচারের বিষয়টি ছিল এ-সময়ের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা, যা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন আওয়ামী লীগ, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অন্যান্য দল, দেশপ্রেমিক সামাজিক শক্তি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে বিএনপি সরকারের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

১৯৭১ সালে বাঙালিদের ওপর গণহত্যা ও দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের হত্যায় পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর প্রধান সহযোগী, মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের পর পাকিস্তানে আশ্রয়গ্রহণকারী পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির গোলাম আযম ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৯৭৮ সালে জেনারেল জিয়ার শাসন আমলে পাকিস্তানের পাসপোর্টে বাংলাদেশে আগমন করে। জিয়া-এরশাদের শাসন আমল ও পরে মোট ১৪ বছর এভাবে অবস্থানের পর ১৯৯১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমির নির্বাচিত হয়। ধৃষ্টতাপূর্ণ এ ঘটনা স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দল, মহল ও নাগরিক সমাজকে মারাত্মকভাবে ক্ষুব্ধ করে। প্রতিক্রিয়ায় ১৯৯২ সালের ১৯শে জানুয়ারি যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে শহিদ জননী জাহানারা ইমামকে আহ্বায়ক করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরের মাসের ১১ তারিখ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ৭২টি নাগরিক সংগঠন নিয়ে গঠিত হয় জাতীয় সমন্বয় কমিটি। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এ আন্দোলনের প্রতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা করে।[১৪] শেখ হাসিনা তখন শুধু আওয়ামী লীগ সভানেত্রীই নন, তিনি সংসদে বিরোধী দলের নেত্রীও। তাঁর পূর্ণ সমর্থন-সহযোগিতা নিয়ে ২৬শে মার্চ ১৯৯২ মহান স্বাধীনতা দিবসে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে হাজার-হাজার জনতার উপস্থিতিতে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত গণআদালতে এক প্রতীকী বিচারে গোলাম আযমের অপরাধ মৃত্যুদণ্ডতুল্য বলে রায় ঘোষণা করা হয়।[১৫] উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড চাপের মুখে গণআদালত বসার দুদিন পূর্বে সরকার গোলাম আযমকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। তবে একই সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে জাহানারা ইমামসহ গণআদালতের বিচারের সঙ্গে যুক্ত ২৪ জন দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিকের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' মামলা দায়ের করা হয়।[১৬] গোলাম আযম-বিরোধী এ আন্দোলন শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ধারায় বাংলাদেশের পুনঃপ্রত্যাবর্তনের সংগ্রামে এটি ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট, যা পরে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন হতে সহায়তা করে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে সক্ষম না হলেও সাংগঠনিকভাবে দলের জন্য সুখবর ছিল ১৪ই আগস্ট ১৯৯১ আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকভাবে বাকশাল বিলুপ্ত করে আওয়ামী লীগে যোগদান।[১৭] আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে গিয়ে 'বাকশাল' নামে আলাদা দল গঠন (১৯৮৩) যে সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না, এতদিনে এ উপলব্ধি তাঁদের হয়েছে ধরে নেওয়া যায়। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে ৬৮টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে মাত্র ৫ জন (তাও আওয়ামী লীগের সমর্থন ও নৌকা প্রতীক নিয়ে) বাকশাল থেকে নির্বাচিত হন। মাঝে অনেকে মূল দলে ফিরে আসেন। '৯১-এর নির্বাচনের পরপর মীর্জা সুলতান রাজার নেতৃত্বে জনতা মুক্তি পার্টি নামে সাবেক জাসদের একটি ক্ষুদ্র অংশ নিজেদের বিলুপ্ত ঘোষণা করে আওয়ামী লীগে যোগদান করে।

এটি ঠিক যে, এ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়নি, তবে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বিরোধী দলের নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় মানুষের ভাবনায় তাঁকে কেন্দ্র করে ক্রমান্বয়ে বিকল্প সরকারের ইমেজ সৃষ্টি হতে থাকে। এতৎসত্ত্বেও আলোচ্য কাউন্সিলের মাত্র ৩ মাস পূর্বে প্রেসিডিয়াম সদস্য ও দলের অন্যতম সিনিয়র নেতা ড. কামাল হোসেন কর্তৃক সাংগঠনিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে 'গণতান্ত্রিক ফোরাম' নামে ভিন্ন প্লাটফর্ম গঠন[১৮] আওয়ামী লীগের জন্য নতুন উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমসাময়িক সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়া, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির চরম বিপর্যয়, দীর্ঘ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক একমেরু বিশ্ব, বাজার অর্থনীতির দাপট ও তার দ্রুত প্রসার ইত্যাদি সহ নতুন এক বিশ্ব ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। এমনই এক জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও সাংগঠনিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল অধিবেশন

১৯৯২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে নির্মিত প্যান্ডেলে দুদিনব্যাপী আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে ভিন্নতর ছিল। একে ঘিরে সৃষ্টি হয় এক উৎসব মুখর পরিবেশ।[১৯] বঙ্গবন্ধু ও দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার ছবি সংবলিত ব্যাজ ধারণ করে সারাদেশ থেকে প্রায় ২৫০০ কাউন্সিলর ও সমসংখ্যক ডেলিগেট এবং কয়েক হাজার নেতা-কর্মী এতে যোগ দেন। শাহবাগের মোড় থেকে রমনার গেট পর্যন্ত এলাকা লোকারণ্য ছিল। অনুষ্ঠানের পরিচালক মোহাম্মদ নাসিম বলতে বাধ্য হন, 'আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হইতে পারে এমন বড় কোনো স্থান ঢাকা শহরে নাই।'[২০] যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও আরও কয়েকটি দেশ থেকে দলের প্রবাসী শাখার প্রতিনিধিগণ কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ন্যাপ, সিপিবি ও ৫ দলের নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নাগরিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়াও বিশ্বব্যাংকের ঢাকা মিশন প্রধান ক্রিস্টোফার উইলবি, ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার অমিতাভ ত্রিপাঠি, মার্কিন দূতাবাসের জেমস এফ কোল ও প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ শাহতা জারাব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত

www.pathagar.com

ছিলেন। জামায়াতে ইসলামী ও অনুরূপ কয়েকটি দল ছাড়া অন্য প্রায় সব দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিএনপি চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর দলের মহাসচিবকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় ও দলীয় পতাকা এবং ৭২টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতিগণের নিজ-নিজ স্ট্যান্ডে দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং পায়রা উড়ানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা। মঞ্চে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট কর্তৃক 'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটি পরিবেশিত হয়। অতঃপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ শেষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মূল কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্যায়ে প্রথমে অভ্যর্থনা উপ-পরিষদের আহ্বায়ক বেগম সাজেদা চৌধুরী (যিনি তখন দলের সাধারণ সম্পাদক) তাঁর স্বাগত ভাষণ রাখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সেদিনের সকল শহিদ, একই বছর ৩রা নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যাকাণ্ডের শিকার জাতীয় চার নেতা, জেনারেল জিয়া ও এরশাদের শাসনামলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং বিএনপি সরকারের দেড় বছরের শাসন আমলে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। শোক প্রস্তাবে আরও যাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় তাঁদের মধ্যে আবদুল মালেক উকিল, আসাদুজ্জামান খান, ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী, কাজী জহিরুল কাইয়ুম, অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, আবু সাঈদ চৌধুরী, কমরেড মনি সিং, মোহাম্মদ ফরহাদ, পটুয়া কামরুল হাসান, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো, সত্যজিৎ রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[২১]

শুভেচ্ছা বক্তব্য

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর আহ্বায়ক ও ৫ দলের অন্যতম নেতা খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।[২২] খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনমনে সৃষ্ট আকাঙ্ক্ষা আজ পদদলিত। একের পর এক কালাকানুন জারি হইতেছে। যদিও তাহা তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী বাতিল করার কথা ছিল।'

নুরুল ইসলাম নাহিদ তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, 'দেশ আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। সন্ত্রাস মোকাবিলা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন আজ জাতির সামনে জরুরি কর্তব্য।' তিনি একই বক্তব্যে সকল দেশপ্রেমিক জনতার ঐক্য কামনা করেন।

শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ[২৩]

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও কাউন্সিলের উদ্বোধক শেখ হাসিনা উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ৬২ মিনিটের একটি দীর্ঘ লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী বাঙালির

www.pathagar.com

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সমকালীন রাজনীতির বিষয়ে এটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল। তাঁর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ হচ্ছে : আওয়ামী লীগের বর্তমান কাউন্সিল অধিবেশনের পরিপ্রেক্ষিত ও গুরুত্ব, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য ও ভূমিকা, জনগণের সঙ্গে এর সম্পর্ক, তৃণমূল থেকে আওয়ামী লীগকে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুর জীবনের শ্রম ও সাধনা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেবল নয় মাসের যুদ্ধের কাহিনি নয়, বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন ও শত সংগ্রাম বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে '৭১-এ স্বাধীনতায় বাস্তবে রূপলাভ, স্বাধীনতা-উত্তর দেশের পুনর্বাসন-পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু সরকারের সাফল্য, '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা, হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ও পাল্টা দখল ধারার সূচনা, একই প্রক্রিয়ায় জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিদেশে নির্বাসনে থাকাকালীন জান্তা শাসনের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার সোচ্চার ভূমিকা, ১৯৮১ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের দিন থেকে সামরিক শাসনের চির অবসান, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জাতির পিতা ও জাতীয় ৪ নেতার হত্যার বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে সংকল্প গ্রহণ, জেনারেল এরশাদের শাসন আমলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দীর্ঘ সংগ্রাম ও এর বিশদ বিবরণ, ১৯৯১-এর সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, কালো টাকার খেলা, অশুভ শক্তির আঁতাঁত ও 'সূক্ষ্ম কারচুপি', খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সঙ্গে জামাত-শিবির ও '৭৫-এর ঘাতকদের গোপন আঁতাঁত[২৪] এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ওপর এদের আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া, খালেদা জিয়ার সরকারের স্বাধীনতা-বিরোধীদের হাতের 'ক্রীড়নকে' পরিণত হওয়া, 'পাকিস্তানি নাগরিক' গোলাম আযমের জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমির হওয়ার ধৃষ্টতা, এর বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার অনুষ্ঠানে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণআদালত গঠন, গোলাম আযমের বিরুদ্ধে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধের জন্য গণআদালত কর্তৃক 'মৃত্যুদণ্ডযোগ্য' শাস্তির রায় ঘোষণা (২৬শে মার্চ ১৯৯২), খালেদা জিয়ার সরকার কর্তৃক শহিদ জননী জাহানারা ইমামসহ গণআদালতের ২৪ জন দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী ও নাগরিকের বিরুদ্ধে 'দেশদ্রোহিতার মামলা' দায়ের, জাতীয় সংসদে শেখ হাসিনার 'আন্তর্জাতিক ক্রাইম এ্যাক্ট '৭৩ অনুসারে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে গোলাম আযমের বিচার' এবং গণআদালতের সংগঠকদের বিরুদ্ধে 'দেশদ্রোহিতার অভিযোগ' প্রত্যাহারের দাবি, বিরোধী দলের অব্যাহতভাবে সংসদ বর্জন, সরকারের সঙ্গে সংসদের বিরোধী দলের ৪-দফা সমঝোতা,[২৫] খালেদা জিয়ার সরকারের 'অযোগ্যতা, অক্ষমতা, অব্যবস্থা ও দলীয়করণের কারণে' দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটা, শিক্ষাঙ্গন, ব্যবসা-বাণিজ্য, টার্মিনালসহ সর্বত্র সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি, প্রেস ক্লাবের অভ্যন্তরে 'সরকারের পেটোয়া বাহিনী'র সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ, খুলনায় ত্যাগী প্রবীণ জননেতা কমিউনিস্ট পার্টির রতন সেনকে হত্যা, নেত্রকোনায় আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোশাররফ হোসেন, বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি ফেরদৌস জামান মুকুল এবং বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা সংসদ সদস্য রাশেদ খান

www.pathagar.com

মেননের ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণ ও হত্যা প্রচেষ্টা, ছাত্রলীগ কর্মীদের হাত-পায়ের রগ কাটা, চক্ষু উপড়ে ফেলা, হত্যা-খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই, হাইজ্যাকের ঘটনায় জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়া, নাগরিক নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থতার অভিযোগে খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলের (জামায়াত ব্যতীত) সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন, ঢাকার পলিটেকনিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড, 'সরকারি মদদে' স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের 'গৃহযুদ্ধের হুমকি', চলতি বছর (১৯৯২) জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৫৩ দিনে শুধুমাত্র শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ঘটনায় ৩০ জন নিহত ও ১৫৯৪ জনের আহত হওয়া, সন্ত্রাসী ও স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান, সরকারের সন্ত্রাস দমন আইনে বিনা বিচারে আটক রাখাসহ মৌলিক অধিকার হরণ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মন্দা ও বন্ধ্যাত্ব, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তির ঐক্য, সার্বিক অবস্থা থেকে উত্তরণে কেন আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে, সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার ও সমস্যাদির শান্তিপূর্ণ সমাধান, মায়ানমার (বার্মা) থেকে আগত রোহিঙ্গা সমস্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং এ ব্যাপারে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠনের আওয়ামী লীগের প্রস্তাব, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ও পরিবর্তন, পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক নীতিমালায় পরিবর্তন-পরিমার্জনের আবশ্যকতা, আওয়ামী লীগ কর্তৃক দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন ও জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ, 'সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপূরক হিসেবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম পরিচালনা' পদ্ধতিতে পরিবর্তন, পার্টির অভ্যন্তরে সর্বোচ্চ ঐক্য বজায় রাখা এবং আত্মসমালোচনার নীতি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, 'বাংলার দুঃখী মানুষের কল্যাণে' নিজ জীবন উৎসর্গের অঙ্গীকার, ইত্যাদি।

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অঙ্গীকার সম্বন্ধে বলেন :

> জনগণের মৌলিক অধিকার, ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, কালাকানুন বাতিল, প্রশাসন হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও প্রচার যন্ত্র দলীয়করণ প্রতিহতকরণ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, হত্যা-ক্যু-চক্রান্তের রাজনীতির চির অবসান এবং জবাবদিহিমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রের অর্থবহ কার্যকারিতার বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ়অঙ্গীকার ঘোষণা করছি।[২৬]

তিনি তাঁর দীর্ঘ ভাষণের শেষের দিকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বোচ্চ ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরওপ করে বলেন :

> জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও চেতনার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ কোন প্রকার ছাড় দিতে পারে না। মূলত সমগ্র দেশ আজ দুভাগে বিভক্ত– স্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে আমি স্বাধীনতার পক্ষের সকল দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিসহ সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা-বিরোধী '৭১ ও '৭৫ এর ঘাতকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।[২৭]

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন : সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, জেলার রিপোর্ট, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধন এবং নেতৃত্ব নির্বাচন

২০শে সেপ্টেম্বর সকালে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একই স্থানে কাউন্সিলের দ্বিতীয় ও শেষ দিনের অধিবেশন শুরু হয়। দিনের দুই বেলাসহ গভীর রাত পর্যন্ত তা চলে। সকালের অধিবেশনে প্রথমে দলের সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী বুকলেট আকারে মুদ্রিত ৬৩ পৃষ্ঠার সুবিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

১২টি সেকশনে বিভক্ত জেনারেল সেক্রেটারির রিপোর্টে ১৯৮৭ ও ১৯৯২ এ দুই কাউন্সিলের মধ্যবর্তী সময়ের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থান পায়। পূর্বাপর রাজনীতি, এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের এ চূড়ান্ত পর্বের সামগ্রিক ঘটনাবলি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জানতে এটি একটি মূল্যবান রাজনৈতিক দলিল। রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে[২৮]: জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা, এ দেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের ভূমিকা, ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-ভাবনার ঐতিহাসিক ধারায় ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, ১৯৭২-৭৫ সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য, মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর উগ্র বামপন্থি এবং 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীদের' চরম হঠকারি ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত স্বাধীনতা-বিরোধী দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী কর্তৃক '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা, দেশে হত্যা ক্যু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতার হাতবদল, পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ধারায় দেশের পুনঃপ্রত্যাবর্তন, নয় বছরব্যাপী জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসন, এরশাদের স্বৈরশাসন-বিরোধী দীর্ঘ আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, বিভিন্ন দলের এরশাদ-বিরোধী জোটবদ্ধ ও যুগপৎ আন্দোলন, ১৯৮৩ সাল থেকে '৯০-এর ডিসেম্বরে জেনারেল এরশাদের পতন পর্যন্ত দীর্ঘ আন্দোলনের প্রায় সকল ঘটনার উল্লেখ ও অনুপুঙ্খ বিবরণ, ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের জন্য বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে সমঝোতা বা সিট ভাগাভাগি ও আওয়ামী লীগ-বিরোধী সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও আওয়ামী লীগের মিত্র হিসেবে পরিচিত দলসমূহের মধ্যে পূর্ণ-সমঝোতার অভাব এবং আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মীর মধ্যে নির্বাচনে বিজয় সম্বন্ধে অতিশয় আত্মতুষ্টির মনোভাব, দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের (৬ই আগস্ট ১৯৯১) মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রে পুনঃপ্রত্যাবর্তনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা, আলোচ্য সময়কালে বিভিন্ন জাতীয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনসহ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক তৎপরতা, সহযোগী সংগঠনসমূহ ও দলের বৈদেশিক শাখার সাংগঠনিক তৎপরতা, ১৯৮৭-১৯৯২ এ সময়ে বিভিন্ন সংগঠন ও সরকারের আমন্ত্রণে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানি, হল্যান্ড.

www.pathagar.com

বেলজিয়াম, ভারত, নেপাল, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশ সফর, সেমিনারে যোগদান এবং সেখানকার সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময়, দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিএনপির ১৭ মাসের দুঃশাসন, খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে শিক্ষাঙ্গনে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং সন্ত্রাসীদের হাতে ছাত্রনেতা মনিরুজ্জামান বাদল, শরীফ, পরাগ, চয়ন, শাহীন, স্বপন, অজয়, সেলিম, মিজান, আরিফসহ আরও অনেকের প্রাণহানি, প্রশাসনে চরম দলীয়করণ, মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে মওদুদীবাদী সংগঠনের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ, বেগম খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ আচরণের পরিবর্তে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র (Absolute Monorchy)-এর মতো আচরণ, খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের আমলে স্বাধীনতা-বিরোধী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর, '৭১ ও '৭৫-এর ঘাতক দালাল, পাকিস্তানপন্থি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা, স্বাধীনতার পরেও গোলাম আযম ও তার অনুসারীদের মধ্যপ্রাচ্য ও লন্ডনে 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার আন্দোলন' চালিয়ে যাওয়ার ধৃষ্টতা, শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার অনুষ্ঠানের ঘটনা, বিএনপির বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের 'নব-সংস্করণ' হিসেবে আখ্যায়িত করা, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট বাংলাদেশে রাজাকার, আলবদর, আলশামস, জামায়াত-শিবির, গোলাম আযমদের ঠাঁই হবে না ঘোষণা, কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স' জারি (২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করা সভ্য দুনিয়ায় নজিরবিহীন ও জাতির জন্য কলঙ্ক বলে উল্লেখ, 'ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স' বাতিলের ব্যাপারে বিএনপির পূর্বে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও সেখান থেকে সরে আসা, এ কালো আইন বাতিল করে বাংলার মাটিতে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার অনুষ্ঠানের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা, আওয়ামী লীগের জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন, বিশ্ব রাজনীতির গতিধারা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারো প্রতি বৈরী মনোভাব নয়'—জাতির জনকের এ মূলনীতি অনুসরণ এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে আওয়ামী লীগের অবস্থান, আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী ও গতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে জেনারেশন গ্যাপ কমিয়ে আনার কথা, রাজনৈতিক বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে মেধার সংশ্লেষণ ঘটানোর নীতি, সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের এখনই 'বিকল্প সরকার' (Alternative Government)-এর প্রস্তুতি থাকা, বাংলাদেশের রাজনীতির দ্বি-ধারায় বিভক্তি, আওয়ামী লীগকে এদেশের রাজনীতির মূলস্রোত ধারা হিসেবে আখ্যায়িত করা, আওয়ামী লীগ কেন গণতান্ত্রিক শক্তির একমাত্র বিকল্প, সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানকে দেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এর প্রতিরোধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান ইত্যাদি।

সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী তাঁর রিপোর্টে দলকে গতিশীল ও আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ পেশ করেন, যা ছিল খুবই প্রণিধানযোগ্য। এর মধ্যে একটি ছিল প্রবীণ নেতৃত্বের পাশাপাশি তরুণদের দলে স্থান করে দেওয়া। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন :

www.pathagar.com

> ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অগণিত বিশিষ্ট ব্যক্তি আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তরে নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন।... এঁদের রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে,... রয়েছে নতুন প্রজন্মের এক বিশাল কর্মী বাহিনী। বিভিন্ন স্তরে দলীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রবীণ ও তরুণের সমন্বয় ঘটানোর বিষয়টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে করে 'জেনারেশন গ্যাপ' কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। দলের অগ্রগতি ও বিকাশে এটি অত্যাবশ্যক।[২৯]

রাজনীতি হচ্ছে জ্ঞানের একটি উচ্চ ক্ষেত্র। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাস্তব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই। তাই জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা উভয়ই রাজনীতির জন্য পরিপূরক। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতায় নানা কারণে জ্ঞানী-গুণী জন বা বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গ সরাসরি দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে ইচ্ছুক হন না। তাঁদের কীভাবে দলের নীতি-নির্ধারণী ও পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা যায় সে বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বেগম সাজেদা চৌধুরী বলেন, 'আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে রাজনৈতিক বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে মেধার সংশ্লেষণ ঘটানো, যা আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।'

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল সরকার ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ। সরকারের পতন ঘটলে বা নির্বাচনে জনগণের রায় পেলে বিরোধী দল তখন সরকার গঠনের সুযোগ পায়। সেজন্য বিরোধী দলে অবস্থানকালীনই, বিশেষ করে প্রধান রাজনৈতিক দলের সরকারি দায়িত্ব গ্রহণের এক ধরনের পূর্ব-প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন হয়। যদিও এ ধরনের চর্চা আমাদের দেশের রাজনীতিতে পূর্বে পরিলক্ষিত নয়, তবে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হওয়ার পর দায়িত্বশীল বিরোধী দলের জন্য এটি বর্তমানে আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। সম্ভবত সে দিকটি বিবেচনা করেই বেগম সাজেদা চৌধুরী তাঁর রিপোর্টে বলেন :

> বাংলাদেশে সম্প্রতি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সংসদে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ। উন্নত বিশ্বে সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে 'বিকল্প সরকার' (Alternative Government) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আওয়ামী লীগের জন্য একটি বিকল্প সরকারের প্রস্তুতি থাকা অমূলক কিছু হবে না। 'আগে ক্ষমতায় আসা যাক, এরপর দেখা যাবে' এ ধরনের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংসদীয় ব্যবস্থাধীনে দায়িত্বশীল কোন দলের পক্ষে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এক ধরনের পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে ক্ষমতায় গিয়ে যে কি অবস্থা হয় তার নজির আমাদের সামনে রয়েছে এবং বর্তমানেও আমরা তা দেখতে পাচ্ছি।[৩০]

তবে, এ প্রসঙ্গে তিনি নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'আন্দোলন-সংগঠন বাদ দিয়ে বা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্বারোপ না করে যাতে শুধু ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের প্রস্তুতির মধ্যে আমাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে তার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।'

www.pathagar.com

জেলা নেতৃবৃন্দের রিপোর্ট ও বক্তব্য

কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদকের পেশকৃত রিপোর্টের ওপর একই দিন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিকেলের অধিবেশনে জেলা নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন।[৩১] তবে সময়ের অভাবে শুধু কয়েকটি জেলার নেতৃবৃন্দ সে সুযোগ পান। তাঁরা হলেন, নরসিংদী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর, রাজশাহী জেলার সাধারণ সম্পাদক মো. ফারুক, খুলনার সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা রশিদী সুজা, ঢাকা জেলার সভাপতি সামসুদ্দোহা খান মজলিশ, মৌলভী বাজার জেলার সাধারণ সম্পাদক ডা. মুশফিক, সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক ডা. সাদিক, সিরাজগঞ্জ জেলার সভাপতি মোতাহার হোসেন তালুকদার প্রমুখ। এঁদের বক্তব্যের সারকথা ছিল :

এক. দলের অভ্যন্তরে ঘাপটি মেরে থাকা 'কুচক্রী, ষড়যন্ত্রকারী ও কোটারী' সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দুই. 'বিগত দিনে যারা দল ভেঙ্গে দল করেছেন এবং বর্তমানে দলের পাল্টা দল গড়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন তারা সকলেই দলের শত্রু।' আওয়ামী রাজনীতির স্রোতধারার বিপরীতে যে কোনো অপপ্রয়াসকে দলের নেতা-কর্মীরা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিহত করবে মর্মে ঘোষণা।

তিন. দলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে আরও সুসংহত করতে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দান।

চার. জেলা পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা, যেমন সন্ত্রাস, স্থানীয় সিভিল ও পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের প্রতি হয়রানি, নির্যাতন-নিপীড়ন।

পাঁচ. জামায়াত-শিবির, যুবকমান্ডসহ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সারাদেশে 'সরকারের মদদে ও আঁতাতে' চরম নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি। এদের বিরুদ্ধে এখনই রুখে দাঁড়ানো এবং সে-ক্ষেত্রে দলের নতুন নেতৃত্বের কাছ থেকে দিক নির্দেশনা প্রত্যাশা।

ছয়. আওয়ামী লীগ দেশের সর্ববৃহৎ সংগঠন হয়েও কেন ক্ষমতায় যেতে পারছে না, তার মূল্যায়ন এবং 'পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে নতুন কর্মসূচি দিয়ে জনগণের দুয়ারে' আওয়ামী লীগের বাণী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘোষণাপত্র ও নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক প্রণীত '৭২-এর সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রেও গুরুত্ব সহকারে তা স্থান পায়। পূর্বে, ১৯৬৬ সালের কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকার একই নীতির

www.pathagar.com

ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রীয় খাতের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে। আওয়ামী লীগ দীর্ঘ দিন ধরে একই নীতিমালা অনুসরণ করে আসে। কিন্তু '৯০-এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সংঘটিত বড়ো ধরনের ওলট-পালটের ঘটনা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিপর্যয়, বিশ্বজুড়ে দ্রুত বাজার অর্থনীতির বিস্তার, লাগামহীন বাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ সংকট, ইত্যাদি বিশ্বকে এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। এমনই এক অবস্থায় মানবকল্যাণের বিষয়টিকে কীভাবে সমুন্নত রাখা যায় সেটিই ছিল প্রধান প্রশ্ন। তবে উদ্ভূত বাস্তবতায় পুরাতন নীতিমালা ও পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে দলের ঘোষণাপত্রে কিছুটা পরিমার্জন করা হয়। চার মূলনীতি অপরিবর্তিত রেখে কোথাও কোথাও সরাসরি সমাজতন্ত্রের স্থলে 'শোষণমুক্ত সমাজ' এ কথা যুক্ত করা হয়।[৩২]

তবে অর্থনৈতিক নীতিমালায় পরিবর্তন ছিল দৃশ্যমান। কাউন্সিলের পূর্বে সেমিনার, দলীয় ফোরাম ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষে ১৯শে মার্চ (১৯৯২) আওয়ামী লীগ একটি খসড়া জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করে, যা বর্তমান কাউন্সিলে পেশ করা হলে তা অনুমোদিত হয়।[৩৩] এর সারকথা হচ্ছে, দ্রুত উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, ব্যক্তি খাতের দ্রুত বিকাশ, স্বাধীন জাতীয় পুঁজি গঠন, উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ, অপচয় রোধ, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতের প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণ। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সহায়ক ও সম্পূরক। আওয়ামী লীগের মূল আদর্শ জনকল্যাণ, বঙ্গবন্ধুর কথায়, 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো', সেখান থেকে দল সরে আসেনি। নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালার শিরোনামেও তা প্রতিভাত। দলের নতুন উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে আদর্শের সেতুবন্ধন এভাবে হয় : দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন এবং একই সঙ্গে জনকল্যাণার্থে তা নিয়োজিত করা, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পদের সুষম বণ্টন।[৩৪]

গঠনতন্ত্র সংশোধন

আলোচ্য কাউন্সিলে দলের গঠনতন্ত্রে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনা হয়। দলের অন্যতম যুগ্মসম্পাদক আবদুল জলিল এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গৃহীত সংশোধনী নিম্নরূপ :[৩৫]

১. দলের কাউন্সিল অধিবেশন দুবছরের স্থলে তিন বছর অন্তর অনুষ্ঠিত করা।

২. সভাপতিমণ্ডলী বা প্রেসিডিয়ামের সদস্য সংখ্যা ১২ থেকে বাড়িয়ে ১৩ করা। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ মোট সংখ্যা হবে ১৫।

৩. ওয়ার্কিং কমিটি বা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫৯ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করা। এ ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ পেতে দলের সদস্য হিসেবে ২ বছর অপেক্ষা করার বিধান রহিতকরণ।

www.pathagar.com

৪. এই প্রথম ১৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়। দলের সভানেত্রী কর্তৃক তাঁরা মনোনীত হবেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁরা সভানেত্রীকে পরামর্শ দান করবেন। প্রতি ৩ মাসে অন্তত একবার এর বৈঠক হবে। এ পরিষদের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে না।

৫. জেলা পর্যায়ে ৭ সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শ পরিষদ।

৬. শিল্প ও বাণিজ্য এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবেশ বিষয়ক দুটি নতুন সম্পাদকীয় পদ সৃষ্টি।

৭. পূর্বের ৩টির স্থলে ৫টি সহ-সম্পাদকের পদ সৃষ্টি।

৮. প্রত্যেক সম্পাদকীয় বিভাগে ৯ সদস্যের একটি উপ-পরিষদ থাকার বিধান। চেয়ারম্যান হবেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সচিব হবেন বিভাগীয় সম্পাদক। সংসদ সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বিশেষজ্ঞ এবং অঙ্গ সংগঠনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকদের মধ্য থেকে দলের সভানেত্রী কর্তৃক এসব সদস্য মনোনয়ন। প্রতি ৩ মাস অন্তর একবার সভা অনুষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বিষয়ে নীতিমালা তৈরিতে সহায়তা দান।

৯. ১৫ সদস্যবিশিষ্ট গ্রাম কমিটি, ৩৯ জনের পরিবর্তে ৫০ জনের জেলা কমিটি, মহানগর কমিটি ৫০ জন থেকে ৫৫ জনে উন্নীত, থানা কমিটি ৩৯ জন থেকে বাড়িয়ে ৫১ জন করা।

১০. মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর পদাধিকার বলে আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা হওয়া।

১১. দলের সভাপতি ও সম্পাদকগণ বা কোনো কর্মকর্তা একই সঙ্গে সরকারি পদ গ্রহণ করতে পারবেন না মর্মে গঠনতন্ত্রের ৫২ ধারায় পূর্বে যে বিধিনিষেধ ছিল, তা সম্পূর্ণ রহিতকরণ।

১২. সংগঠনের স্বার্থে ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সভাপতি কর্তৃক দলে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা।

১৩. একই সাথে দলের কোনো কর্মকর্তার একাধিক পদে বহাল না থাকা।

কর্মকর্তা নির্বাচন

দলের কাউন্সিল অধিবেশনের দ্বিতীয় বা শেষ দিনের কার্যসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নেতৃত্ব নির্বাচন। অনেক সময় এটি খুবই কঠিন কাজ। তবে সভানেত্রী পদ নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না। শেখ হাসিনা যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বসম্মতিক্রমে এ পদে নির্বাচিত হবেন সেটি সকলেরই জানা ছিল। শুধু বঙ্গবন্ধুর কন্যা বা রক্তের উত্তরাধিকারী হিসেবে নয়, ১৯৮১ সালে তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর বিগত প্রায় ১২ বছর ধরে নিজ নেতৃত্ব গুণে তিনি সারাদেশে অগণিত নেতা-কর্মীর মাঝে সেরূপ স্থায়ী একটি আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন সে হিসেবে। সমস্যা দেখা দেয় সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে। বিগত দিনেও একাধিকবার এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এবারের

www.pathagar.com

কাউন্সিলেও এ নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। যদিও এ পদে আনুষ্ঠানিকভাবে কারো নাম প্রস্তাব করা হয়নি, তবে আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাক এ তিন জনের নাম বেশি আলোচনায় ছিল। কাউন্সিলের শেষদিন রাত সাড়ে ৮টায় শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জেলা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সব সদস্য নিয়ে গঠিত সাবজেক্ট কমিটির সভা বসে। সেখানে আবদুস সামাদ আজাদের প্রস্তাবক্রমে শেখ হাসিনা সর্বসম্মতভাবে সভানেত্রী নির্বাচিত হন। এরপর অন্যান্য কর্মকর্তা নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে এক-এক করে সাবজেক্ট কমিটির সদস্যদের, বিশেষ করে জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মতামত জানতে চান। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে গভীর রাত পর্যন্ত গড়ায়। মাঝে তিনি সভাপতিমণ্ডলী ও সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গেও কথা বলেন। অতঃপর রাত ৩ টায় (ঘড়ির কাটা অনুযায়ী তখন ২১ তারিখ) কাউন্সিল সদস্যদের নিয়ে বৈঠক শুরু হয়। সেখানে তিনি এক আবেগময় বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য শেষে রাত প্রায় ৪ টার সময় তিনি সাধারণ সম্পাদক পদে জিল্লুর রহমানসহ ১৬ জন সম্পাদক ও সভাপতিমণ্ডলীর ১১ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করলে কাউন্সিলরগণ হাত তুলে ও করতালির মাধ্যমে তা সমর্থন করেন।[৩৬] এভাবে শেখ হাসিনা ও জিল্লুর রহমান উভয়ই স্ব স্ব পদে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হন। দলের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দ হলেন :[৩৭]

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য	:	সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন
		আবদুস সামাদ আজাদ
		আবদুল মান্নান
		কামরুজ্জামান
		বেগম সাজেদা চৌধুরী
		মহিউদ্দিন আহমেদ
		ডা. আলাউদ্দীন
		অধ্যাপক পুলিন দে
		আমির হোসেন আমু
		তোফায়েল আহমেদ
		আব্দুর রাজ্জাক
সাধারণ সম্পাদক	:	জিল্লুর রহমান
যুগ্মসম্পাদক	:	আবদুল জলিল
		শামসুর রহমান খান শাজাহান
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	মোহাম্মদ নাসিম
প্রচার সম্পাদক	:	মোজাফফর হোসেন পল্টু
সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	:	আব্দুল মান্নান

www.pathagar.com

দপ্তর সম্পাদক	:	সৈয়দ ফজলুল হক বিএসসি
সহ-দফতর সম্পাদক	:	
অর্থ ও পরিকল্পনা	:	আতাউর রহমান খান (কায়সার)
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	:	আবুল হাসান চৌধুরী
কৃষি সম্পাদক	:	বেগম মতিয়া চৌধুরী
শ্রম সম্পাদক	:	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	:	অধ্যাপক আবু সাইয়িদ
সহ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	:	
শিল্প ও বাণিজ্য	:	আকতারুজ্জামান চৌধুরী
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	ওবায়দুল কাদের
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সম্পাদক	:	ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন
মহিলা সম্পাদিকা	:	বেগম আইভি রহমান
ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ	:	
আইন বিষয়ক সম্পাদক	:	
কোষাধ্যক্ষ	:	

সভাপতিমণ্ডলী ও কার্যনির্বাহী কমিটির বাকি কর্মকর্তা ও সদস্যদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে মর্মে জানানো হয়। উল্লেখ্য, কোষাধ্যক্ষ পদও খালি থাকে।[৩৮]

সদস্য : আব্দুল কাদের সিদ্দিকী, রফিকউদ্দিন ভূইয়া, দেওয়ান ফরিদ গাজী, রওশন আলী এমপি, ইউনুস আলী, সুধাংশু শেখর হালদার এমপি, এম এ মান্নান, সিদ্দিক হোসেন, এ বি এম তালেব আলী, মতিয়ুর রহমান, আব্দুল আওয়াল, রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, আব্দুর রউফ চৌধুরী, ইমাম উদ্দিন আহমেদ, রহমত আলী এমপি, রহমত উল্লা চৌধুরী, খ ম জাহাঙ্গীর এমপি, মোনায়েম সরকার, মীর্জা সুলতান রাজা, ফজলুর রহমান, মুকুল বোস, মাহমুদুর রহমান মান্না, আক্তারুজ্জামান ও সুলতান মনসুর আহমেদ।

কাউন্সিল অধিবেশনের এক সপ্তাহের মধ্যে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা উপদেষ্টা পরিষদের ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জনের নাম ঘোষণা করেন। তাঁরা হলেন—শেখ আবদুল আজিজ, ড. কামাল হোসেন, সালাউদ্দিন ইউসুফ এমপি, মতিউর রহমান, আবদুর রহিম এমপি, আবদুল মমিন তালুকদার, এডভোকেট গাজিউল হক, ডা. এম এ কাদরী, স্থপতি মাযহারুল ইসলাম, সাবেক সিএসপি অফিসার মফিজুর রহমান, এ এস এইচ কে সাদেক, ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, শাহ এ এম এস কিবরিয়া।[৩৯]

উল্লেখ্য, পূর্বের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. কামাল হোসেন, সালাউদ্দিন ইউসুফ ও শেখ আবদুল আজিজ-এর স্থান হয় নবগঠিত উপদেষ্টা পরিষদে। ২৩শে অক্টোবর (১৯৯২) বেইলি রোডস্থ নিজ বাসভবনে *দৈনিক সংবাদ*-এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ড. কামাল হোসেন 'উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য পদ আমি গ্রহণ করিনি' এ

www.pathagar.com

কথা বলে তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় 'টিম ওয়ার্ক ও যৌথ নেতৃত্ব কাঠামো থেকে দলকে একক নেতৃত্ব কাঠামোর দিক নিয়ে যাওয়া হয়েছে' মর্মে অভিযোগ করেন। প্রার্থী নির্বাচন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি 'গোপন ব্যালটের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই' না করে 'একটা চরম অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আগানো হয়েছে' বলে মন্তব্য করেন।[৪০] ড. কামাল হোসেনের এ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার একদিন পর আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ও প্রবীণ নেতা জিল্লুর রহমান একই পত্রিকার সঙ্গে অনুরূপ এক সাক্ষাৎকারে ড. কামালের অভিযোগ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, '১৯৪৯ সালে জন্মলগ্ন থেকেই আমি দলের সবগুলি কাউন্সিল দেখেছি। এবারের মত সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আর কখনও কাউন্সিল হয়নি। এর চেয়ে গণতান্ত্রিকপন্থায় নেতৃত্ব নির্বাচন আওয়ামী লীগে কখনো হয়নি। অন্য কোন দলে কখনো হয়েছে বলেও আমার জানা নেই।'[৪১] আওয়ামী লীগের 'ট্র্যাডিশন' অনুযায়ী প্রতিটি কাউন্সিলে সাবজেক্ট কমিটিকে নেতৃত্বের প্যানেল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় উল্লেখপূর্বক আলোচ্য কাউন্সিলে অনুসৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যায় জিল্লুর রহমান বলেন :

> এবারের কাউন্সিলে সাবজেক্ট কমিটি সর্বসম্মতভাবে শেখ হাসিনাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভানেত্রী নির্বাচিত করে। পরে কমিটি অন্যান্য পদে নির্বাচনের দায়িত্ব এককভাবে সভানেত্রীকে দিতে চাইলে তিনি প্রবল আপত্তি জানান। অনেক অনুরোধের পর তিনি রাজি হলেও সাবজেক্ট কমিটির ১৮১ জন সদস্যের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে ডেকে তাদের মতামত নেন। রাত সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া শেষে সভানেত্রী সবার মতামতের ভিত্তিতে আমাকে সাধারণ সম্পাদক করে প্যানেল ঘোষণা করেন। কণ্ঠভোটে প্যানেল পাস হয়ে গেলেও সভানেত্রী পক্ষে-বিপক্ষে হাত তোলার আহ্বান জানান।[৪২]

কাউন্সিলে 'গোপন ব্যালটে ভোট' না হওয়া সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, 'ভোট হতে হলে অবশ্যই প্রার্থী থাকতে হয়।' ড. কামাল হোসেন প্রসঙ্গে পুনরায় বলেন, 'ড. কামাল হোসেন দলের কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন না[৪৩] ... তাই মনগড়া কিছু কথা বলে যাচ্ছেন। এরপর তিনি বলেন, 'রাজনীতির মঞ্চে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বাজিমাৎ করার যে চেষ্টা তিনি করছেন, তাতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই লাভবান হবে।' ড. কামাল হোসেনকে প্রেসিডিয়ামের পরিবর্তে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য করা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল :

> গত দেড় বছরে ড. কামাল দলের কার্যকরী কমিটির মাত্র তিনটি বৈঠকে স্বল্প সময়ের জন্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি দলের জন্য সময় দিতে পারছিলেন না, দলীয় কাজে একনাগারে অনুপস্থিত ছিলেন। ঢাকায় থেকেও কোন বৈঠকে আসছিলেন না। সম্ভবত এ কারণেই তাকে সভাপতিমণ্ডলীর পরিবর্তে উপদেষ্টা পরিষদে তার মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বদের সাথে রাখা হয়েছে।[৪৪]

আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশন নানাদিক বিবেচনায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কার্যত এটি ছিল দলের নীতি-নির্ধারণী কাউন্সিল। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের পরিবর্তে তিন বছর অন্তর তা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত এবং দলের প্রথম গঠনতন্ত্রে (১৯৫৫) কর্মকর্তাদের সরকারি পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে আরোপিত বিধিনিষেধ এ কাউন্সিলে তুলে দেওয়া উভয়ই ছিল মৌলিক পরিবর্তন। অপরদিকে, বিশ্বব্যাপী বড়ো

www.pathagar.com

ধরনের পরিবর্তনের ঘটনা বিবেচনায় রেখে কাউন্সিলে দলের নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। ঘোষণাপত্রে ব্যাখ্যা হিসেবে কিছু বাক্য যুক্ত করে এটিকে পরিমার্জন করা হয়। ১৯৮১ সালে দলের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রেসিডিয়াম বা সভাপতিমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়। এবার মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান সংযুক্ত করার লক্ষ্যে উপদেষ্টা পরিষদ ও প্রত্যেক সম্পাদকীয় বিভাগের জন্য উপ-পরিষদ সৃষ্টি করে দলের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হয়, যার স্পষ্ট ইঙ্গিত সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে দেওয়া ছিল। উদ্ভাবনী ও পরিবর্তনশীলতা দলটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। দাপটের সঙ্গে প্রায় সাত দশক ধরে আওয়ামী লীগের টিকে থাকার প্রাণশক্তিও এর মধ্যে নিহিত।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ৭; *ঐ*, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ১১; *ঐ*, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ১১; *সংবাদ*, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ২, ৭, ৮; *ঐ*, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ১১, ১২; *ঐ*, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ৮

২. বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্যদের হত্যার দায়ে বিচারে দোষী ও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হলে ২০১০ সালের ২৮শে জানুয়ারি ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে অন্য চার সহযোগীসহ ঐ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

৩. দ্রষ্টব্য, বেগম সাজেদা চৌধুরী, *জাতীয় কাউন্সিল '৯২ : সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট* (এরপর, *সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট '৯২*), পৃ. ১৭

৪. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩৬৫

৫. ফ্রিডম পার্টির চেয়ারম্যান ছিল কর্নেল ফারুক, কো-চেয়ারম্যান কর্নেল আবদুর রশীদ এবং ভাইস-চেয়ারম্যান মেজর বজলুল হুদা। বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ই আগস্টের অন্যদের হত্যার জন্য বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হলে ঐ হত্যাকাণ্ডে যুক্ত কর্নেল ফারুকসহ আরও ৪ জনের সঙ্গে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ২০১০ সালের ২৮শে জানুয়ারি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মেজর বজলুল হুদার দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

৬. জেলাসমূহ হচ্ছে রংপুর, যশোর, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম। ১৯৮২ সালে জেনারেল মুনীমের নেতৃত্বে গঠিত প্রশাসনিক সংস্কার। পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৪৬০টি থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত এবং মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার একই সময় ঐ ৬টি জেলায় হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপনের আদেশ দেওয়া হয়।

৭. তিন জোটের রূপরেখার মধ্যে ছিল এরশাদ সরকারের অপসারণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠা, হত্যা, ক্যু প্রভৃতি অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা বদলের অবসান ঘটিয়ে স্থায়ী গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ধারা প্রবর্তন, অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তিন মাসের মধ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত, গণপ্রচার মাধ্যমের পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা, রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করা, মৌলিক অধিকার পরিপন্থি সকল আইন বাতিল এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৮. বিস্তারিত, *রাজনৈতিক রিপোর্ট '৯২*

৯. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩০৮

১০. তবে জাতীয় পার্টির অধিকাংশ আসন ছিল রংপুরসহ বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে, যেখানে জেনারেল এরশাদের পৈতৃক বাড়ি।

১১. এ জন্য বিনিময়ে অন্যান্য সুবিধার সঙ্গে জামায়াত সংসদে রক্ষিত নারী আসন থেকে ২টি লাভ করে।

১২. সরকার কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে ১৯৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ এ মর্মে একটি বিল উত্থাপন করেন।

১৩. দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের পর সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনাসহ নেতৃবৃন্দের আনন্দঘন মুহূর্তের ছবি দ্রষ্টব্য, *দৈনিক বাংলা*, ৭ই আগস্ট ১৯৯১, পৃ. ১

১৪. বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে গণআদালতের রায় কার্যকর করা এবং জাহানারা ইমামসহ ২৪ জন দেশবরেণ্য নাগরিকের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত 'দেশদ্রোহিতামূলক' মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ও তৎসংলগ্ন এলাকাজুড়ে অনুষ্ঠিত লক্ষ জনতার মহাসমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বক্তব্য দ্রষ্টব্য *সংবাদ*, ১৫ই অক্টোবর ১৯৯২, পৃ. ১, ১২

১৫. বিচারকদের মধ্যে ছিলেন জাহানারা ইমাম, এডভোকেট গাজীউল হক, ড. আহমদ শরীফ, স্থপতি মাযহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, ফয়েজ আহমেদ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, মাওলানা আবদুল আওয়াল, লে. কর্নেল (অব.) কাজী নূর-উজ্জামান, লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী ও ব্যারিস্টার শওকত আলী খান। দ্রষ্টব্য শাহরিয়ার কবির, *গণআদালত ও জাহানারা ইমাম*, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৩৯। গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যাঁরা গণআদালতে অভিযোগ উত্থাপন করেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, কবি সৈয়দ শামসুল হক ও অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান।

১৬. তাঁরা হলেন জাহানারা ইমাম, এডভোকেট গাজীউল হক, ড. আহমদ শরীফ, স্থপতি মাযহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, ফয়েজ আহমেদ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, মাওলানা আবদুল আওয়াল, লে. কর্নেল (অব.) কাজী নূর-উজ্জামান, লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, এডভোকেট জেড আই খান পান্না, এডভোকেট শামসুদ্দিন বাদল, এডভোকেট উম্মে কুলসুম রেখা, এডভোকেট নজরুল ইসলাম, ড. আনিসুজ্জামান, ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক, শাহরিয়ার কবির, মওলানা ইয়াহিয়া, আলী যাকের, ড. মুশতাক হোসেন এবং অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী। *দৈনিক জনতা*, ২৯শে মার্চ, ১৯৯২

১৭. ১৪ই আগস্ট ১৯৯১ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাকশালের এক বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে দলের বিলুপ্তি ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এরপর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সেখানে উপস্থিত হলে বিপুল করতালি আর ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। বাকশালের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর

www.pathagar.com

রাজ্জাক আওয়ামী লীগে একীভূত হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আবেগভরা কণ্ঠে বলেন, 'দীর্ঘ আট বছর সাংগঠনিকভাবে আলাদা থাকলেও রাজনৈতিক অঙ্গনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৮ দলের কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজ করেছি। আজ সেই অভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থেই একীভূত হচ্ছি। স্বাধীনতার শত্রুরা চারদিকেই সক্রিয়। এবার এক হয়ে লড়াই করতে চাই।... আপনার নেতৃত্বে একজন কর্মী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চাই।' (*দৈনিক বাংলা*, ১৫ই আগস্ট ৯১)। শেখ হাসিনা বাকশাল নেতা-কর্মীদের দলে বরণ করে নিয়ে বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর সৈনিকেরা আজ ঐক্যবদ্ধ হলো। তারা আজ একই পরিবারের সদস্য। ঘরের ছেলে আজ ঘরে ফিরে এলো। এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে?' তিনি আরও বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যারা দেশ স্বাধীন করেছেন, তারা ভিন্ন পতাকায় কীভাবে কাজ করবেন তা ভাবতেও অবাক লাগে। হয়ত আমারই ভুল কিংবা দুর্বলতার জন্য ৮৩ সালে এই অঘটন ঘটে।' দ্রষ্টব্য *দৈনিক বাংলা*, ১৫ই আগস্ট ১৯৯১, পৃ. ১, ৮; আরও *The Bangladesh Times*. 15 August 1991, p. 1

১৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১৯শে জুন ১৯৯১ সেগুনবাগিচায় গণতান্ত্রিক ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের অনেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। দ্রষ্টব্য *সংবাদ*, ২০শে জুন ১৯৯২, পৃ. ১, ৭। এই গণতান্ত্রিক ফোরাম থেকে পরে (২৯শে আগস্ট ১৯৯২) ড. কামাল হোসেনকে আহ্বায়ক করে গণফোরামের প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে তিনি এর সভাপতি।

১৯. দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ১১; *সংবাদ*, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ১২

২০. *ইত্তেফাক*, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১১

২১. *ইত্তেফাক*, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১১

২২. বক্তব্য দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১১

২৩. পূর্ণ ভাষণ দ্রষ্টব্য, *সংবাদ*, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ২, ১০ (অতঃপর *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ '৯২*)

২৪. বিএনপি-জামায়াতকে নির্বাচনে সমর্থন দান সম্বন্ধে কর্নেল রশীদ-এর বক্তব্য দ্রষ্টব্য *দৈনিক বাংলা*, ১৬ই আগস্ট ১৯৯১, পৃ. ৮

২৫. বিশেষ ট্রাইব্যুনালে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার ও গণআদালতের ২৪ জন বরেণ্য নাগরিকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত 'দেশদ্রোহিতার' মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয়ে এ সমঝোতা চুক্তি হয়। গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে (১৪.১০.৯২) শেখ হাসিনার বক্তব্য দ্রষ্টব্য *সংবাদ*, ১৫ই অক্টোবর ১৯৯২, পৃ. ১, ১২

২৬. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ '৯২*

২৭. *ঐ*

২৮. *সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট '৯২*। রিপোর্টে তিনটি পরিশিষ্ট সংযোজিত। প্রথম দুটি পরিশিষ্টে ১৯৮৭-১৯৯২ এ সময়ে দলীয় নেতা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সব বিশিষ্টজন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং একই সময়ে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন ও বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারের দেড় বছরে সন্ত্রাসীদের হাতে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের যে-সকল নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন, তাদের দীর্ঘ তালিকা দেওয়া

www.pathagar.com

আছে। তৃতীয় পরিশিষ্টে বঙ্গবন্ধুর সরকার বনাম জিয়া-এরশাদ শাসন আমলের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ রয়েছে।

২৯. *সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট '৯২*

৩০. *ঐ*

৩১. বিস্তারিত 'ভিন্নধারা সৃষ্টির চেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন', *সংবাদ*, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ৮

৩২. *ইত্তেফাক*, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১,৭

৩৩. দ্রষ্টব্য *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ '৯২; সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ '৯২*, আরও *ইত্তেফাক*, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ১১; *সংবাদ*, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ৮

৩৪. দ্রষ্টব্য *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক নীতিমালা '৯২ (পুস্তিকা)*; আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) শেখ হাসিনার ভাষণ, *আমাদের রাজনীতির লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ সাধন এবং অর্থনৈতিক মুক্তি* (পুস্তিকা)।

৩৫. দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ৭; *সংবাদ*, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ৮

৩৬. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ১১; *সংবাদ*, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ৮; আরও, 'যেভাবে কমিটি হয়েছে', *সংবাদ*, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ৮; *সংবাদ*, ২৬শে অক্টোবর ১৯৯২, পৃ. ১, ৬

৩৭. *ইত্তেফাক*, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ১১; *সংবাদ*, ৬ই অক্টোবর ১৯৯২, পৃ. ১, ১২

৩৮. গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫ জন (সভাপতি/সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদকসহ)। সভাপতিমণ্ডলীর বাকী ২ জন সদস্য, সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, সহ-দফতর সম্পাদক, সহ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক, সহ-শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং বাকি ২৮ জন সদস্যের নাম দলের সভানেত্রী কর্তৃক মনোনীত হওয়ার কথা।

৩৯. *সংবাদ*, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ১২

৪০. ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকারটি দ্রষ্টব্য, *সংবাদ*, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ৮

৪১. জিল্লুর রহমানের সাক্ষাৎকার, *সংবাদ*, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ৬

৪২. *ঐ*

৪৩. ড. কামাল হোসেন কাউন্সিল অধিবেশন শুরুর একদিন আগে ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক আইন সমিতির সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা ত্যাগ করেন। সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরশেষে মধ্য-অক্টোবর (১৯৯২) দেশে ফিরে আসেন।

৪৪. জিল্লুর রহমানের সাক্ষাৎকার, *সংবাদ*, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১, ৬

www.pathagar.com

অধ্যায় : সতেরো

বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯৫ : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচন নয়

১৯৯৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একদিনব্যাপী আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত দলের নিয়মিত সম্মেলনে দ্বি-বার্ষিক-এর স্থলে ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী এবছর একই মাসে ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে চলমান আন্দোলনের কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই দলের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আলোচ্য বিশেষ কাউন্সিলের আয়োজন করা হয়। এতে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন এবং আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচন সম্বন্ধে দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনাপূর্ণ মূল্যবান ভাষণ রাখেন।

পটভূমি

গত কাউন্সিল থেকে (সেপ্টেম্বর ১৯৯২) বর্তমান সময় পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) দেশের প্রধান ঘটনাবলির মধ্যে ছিল মিরপুর (১৯৯৩) ও মাগুরার (১৯৯৪) উপনির্বাচন, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন (১৯৯৪), বিরোধী দলের একটানা সংসদ বর্জন, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আন্দোলন, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিদেশিদের মধ্যস্থতার উদ্যোগ, সংসদে বিরোধী দলীয় সদস্যদের দীর্ঘ অধিবেশন বর্জন শেষে একযোগে পদত্যাগ (১৯৯৪) ইত্যাদি।[২]

১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠিত হওয়ার পর সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি, সন্ত্রাস, খুন, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও প্রাণহানি ইত্যাদি কারণে নাগরিক জীবনে শঙ্কা ও চরম নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। অনুরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতি সরকারের গোটা সময় ধরেই বিদ্যমান থাকে। সরকারের টহল পুলিশের সদস্যদের দ্বারা ২৪শে আগস্ট ১৯৯৫ দিনাজপুরে এক দিন মজুরের কিশোরী কন্যা ইয়াসমিন ধর্ষণের শিকার হয়ে নিহত হয়। তার নিথর মৃতদেহ একটি খোলা ভ্যানের ওপর পড়ে থাকে। এ পৈচাশিক ঘটনা সারাদেশের মানুষের বিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দেয় এবং বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এছাড়া, ন্যায্যমূল্যে কৃষির সার দাবি করায় ১৮ জন কৃষক এবং শ্রমের ন্যায্য মজুরি দাবি করায় ১৭ জন শ্রমিককে হত্যা করা হয়।

এদিকে নির্বাচনের ব্যাপারে দেখা দেয় নতুন করে সংকট। ১৯৯৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি মিরপুর এবং ১৯৯৪ সালের ২০শে মার্চ মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচনে

www.pathagar.com

সরকার ও সরকারি দলের ছত্রছায়ায় ব্যাপক সন্ত্রাস, কারচুপি, কেন্দ্র দখলের ঘটনা ঘটে। এ অবস্থা এরশাদ সরকারের আমলের নির্বাচনের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী উভয় আসনে সরকার দলীয় প্রার্থী বিজয়ী হন। পক্ষান্তরে, আওয়ামী লীগের দাবি ছিল, সরকারি হস্তক্ষেপে তাদের পক্ষে প্রদত্ত জনগণের রায় পাল্টে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, মাগুরা-২ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পরাজয় স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়নি। এটি ছিল সারাদেশে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে নিরাপদ আসনগুলোর একটি। সন্ত্রাসীদের দাপটের মাত্রা এতই ছিল যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ পর্যন্ত অসহায়ের মতো হাত গুটিয়ে ঢাকা ফিরে আসতে বাধ্য হন। এর কাছাকাছি সময়ে (৩০শে জানুয়ারি ১৯৯৪) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার দলীয় প্রার্থীকে হারিয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোহাম্মদ হানিফ মেয়র নির্বাচিত হলে প্রতিশোধস্বরূপ সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরা পুরাতন ঢাকার লালবাগে বিজয়ী প্রার্থীর ৬ জন সমর্থককে গুলি করে হত্যা করে। এসব ঘটনা ছিল খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত, বিশেষ করে এরশাদের স্বৈরশাসনের পতনের পর দেশবাসী সন্ত্রাসের অবসান ও তাদের ভোটাধিকার সমুন্নত থাকবে এমনটিই বেশি করে আশা করছিল।

উল্লিখিত ঘটনাসমূহ একদিকে সরকারের সঙ্গে বিরোধী দলের দূরত্ব সৃষ্টি, অপরদিকে দলীয় সরকারের অধীনে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিরোধী দলগুলোকে মারাত্মকভাবে চিন্তিত করে তোলে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে, প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ নতুন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এটিকে সাংবিধানিক রূপ দেওয়ার দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। বিরোধী দলগুলো ছাড়াও কম সময়ের মধ্যে এ-প্রশ্নে দেশে সাধারণ ঐক্যমত্য সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এ মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, তাদের দাবি উপেক্ষা করে সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি পদে এমপি-দের পরিবর্তে মন্ত্রীদের বসানো, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার দিনের পর দিন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকা,[৩] প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর এর কোনো সভা না ডাকা, সংসদের কার্যউপদেষ্টা কমিটির সভায় তাঁর যোগদান না করা, এক ঘণ্টাব্যাপী প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন-উত্তর পর্বে কোনো বিষয়ে জবাব না দেওয়া, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় সংসদে উত্থাপন ও তার ওপর আলোচনা না হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার জাতীয় সংসদকে গুরুত্বহীন ও অকার্যকর করে রেখেছে। এ ছাড়া সংসদ সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যক্তিগত আক্রমণ ও মাত্রাজ্ঞানহীন কটূক্তির ঘটনা তো লেগেই ছিল। এ-রকম এক অবস্থায় বিরোধী দল ১৯৯৪ সালের ৩০শে মার্চ থেকে সংসদে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে টানা ৯ মাস ধরে সংসদ বর্জন চলে। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দিনদিন খুবই বিদ্বেষপূর্ণ ও জটিল রূপ ধারণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে কমনওয়েলথ-এর সেক্রেটারি জেনারেল এমেকা আনাওয়াকু মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি নিজে পাঁচ দিনের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৯৪) ঢাকা সফর করেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর অক্টোবর মাসে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক গভর্নর জেনারেল স্যার স্টিফেন নিনিয়ান ঢাকা

www.pathagar.com

আসেন।[৪] কিন্তু প্রায় দুসপ্তাহ ধরে তাঁর অব্যাহত প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হলে একই বছর ২৮শে ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও অন্যান্য দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন।

প্রায় অর্ধেকের মতো সংসদ সদস্যের পদত্যাগ ছিল নজিরবিহীন ঘটনা। এভাবে একযোগে পদত্যাগের ব্যাপারে সাংবিধানিকতার প্রশ্ন তুলে সরকার তা গ্রহণ না করে কালক্ষেপণ করতে থাকে। এভাবে বিরোধী দল-শূন্য অবস্থায় বছরাধিককাল সংসদ টিকিয়ে রাখা হয়। এরূপ অবস্থায় ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি সরকারের পদত্যাগ এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে প্রধান করে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি রূপরেখা তুলে ধরেন।[৫] জাতীয় রাজনীতির এ পটভূমিতে আওয়ামী লীগের আলোচ্য বিশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল অধিবেশন

১৯৯৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০:৩০টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে নির্মিত প্যান্ডেলে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয় এবং সন্ধ্যা ৬:৩০টা পর্যন্ত তা চলে। উন্মুক্ত এ কাউন্সিলে সারাদেশ থেকে ২ হাজার ৫০০ কাউন্সিলর, সমসংখ্যক ডেলিগেট সহ প্রায় ১০ হাজার নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। এরপর '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নিহত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্য, একই বছর ৩রা নভেম্বর একই খুনিচক্রের হাতে কারাগারে বন্দি অবস্থায় নিহত জাতীয় চার নেতা, গত কাউন্সিলের পর থেকে এ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদ, দলের প্রয়াত নেতা-কর্মী, শহিদ জননী জাহানারা ইমাম এঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়াও প্রস্তাবে বিদেশিদের মধ্যে প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারাল্ড উইলসন, ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্ঞানী জৈল সিং, পাকিস্তানের সিন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতা জি এম সৈয়দ প্রমুখের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিএনপি সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়ে (১৯৯৫) নিহত কিশোরী ইয়াসমিন এবং ১৮ জন কৃষক ও ১৭ জন শ্রমিক হত্যার কথাও তাতে স্থান পায় এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

শোক প্রস্তাব ছাড়াও কাউন্সিলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ ও সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করা হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান তাঁর রিপোর্টে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা কর্তৃক দেওয়া (৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের রূপরেখার কথা উল্লেখ করে তা সরকারকে মেনে নিতে বাধ্য করা, নয়তো আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটিয়ে দাবি আদায় করিতে নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। এরপর বিভিন্ন বিভাগের পক্ষ থেকে এক এক করে প্রতিনিধিবৃন্দ চলমান আন্দোলন ও সাংগঠনিক অবস্থা বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা হলেন ঢাকা বিভাগের পক্ষে মেয়র মোহাম্মদ

www.pathagar.com

হানিফ, চট্টগ্রাম বিভাগের পক্ষে মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, বরিশাল বিভাগের পক্ষে মহিউদ্দিন আহমদ (পিন্তল মহিউদ্দিন), রাজশাহী বিভাগের পক্ষে খায়রুজ্জামান লিটন, সিলেট বিভাগের পক্ষে আবু নসর এবং খুলনা বিভাগের পক্ষে এডভোকেট মনজুরুল ইমাম। এছাড়া পার্বত্য জেলাসমূহের পক্ষে সাবেক এমপি বীর বাহাদুর বক্তব্য রাখেন।[৬]

ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ কেন বিএনপি সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্ভব নয়, সে প্রসঙ্গে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পর বিজয় মিছিলে সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের হামলায় ৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'সেদিন আমাদের বিজয় মিছিলের পরিবর্তে ৬ জনের লাশ কাঁধে লইয়া কবরস্থানে যাইতে হইয়াছে। নির্বাচনের দেড় মাস পর আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে।'[৭] নির্বাচনে মনোয়ন দানের পর দলের ভেতর থেকে এর বিরোধিতা এবং তাতে দলের ক্ষতির প্রসঙ্গ তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। চট্টগ্রামের মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করতে আরও কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে তা সর্বাত্মকভাবে সফল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, 'জননেত্রী শেখ হাসিনার ডাকে প্রয়োজনে '৭১-এর মত চট্টগ্রামকে খালেদা জিয়ার সরকারের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।'[৮] বরিশালের প্রতিনিধি মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর বক্তব্যে ডিসি, এসপি, ইউএনও এদের সরকার কর্তৃক 'দলীয় কর্মচারী হিসেবে ব্যবহার' করার অভিযোগ তোলেন।

শেখ হাসিনার ভাষণ

বিশেষ কাউন্সিলে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা সভাপতির ভাষণে সংসদ থেকে বিরোধী দলের পদত্যাগ, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবির যৌক্তিকতা এবং আওয়ামী লীগের নীতি-আদর্শ ও উন্নয়ন ভাবনা বিশদভাবে তুলে ধরে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ধরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ রাখেন।[৯] ভাষণের প্রারম্ভে তিনি 'জাতীয় জীবনে এক চরম সংকটময় মুহূর্ত বিরাজমান বিধায়' নির্ধারিত সময়ে ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত করতে অপারগতার কথা, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি 'ভেঙ্গে পড়া', মানুষের জীবনে চরম নিরাপত্তাহীনতা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও ছাত্র-হত্যা, ন্যায্যমূল্যে সারের দাবি করায় ১৮ জন কৃষক হত্যা, ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন করায় ১৭ জন শ্রমিক হত্যা, 'বিএনপি সরকারের একদলীয় মনোভাবের কারণে' জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের সহযোগিতা দানের ইচ্ছা সত্ত্বেও তা গ্রহণে অস্বীকৃতি, বিরোধী দলকে সংসদে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন ও এর ওপর আলোচনার সুযোগ না দেওয়া, উপনির্বাচনে সরকারি দলের চরম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নতুন করে জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া, ঢাকার মেয়র নির্বাচনের পর ৬ জন দলীয় কর্মী-সমর্থককে সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের দ্বারা গুলি করে হত্যা, প্রধানমন্ত্রী ও সরকারি দলের অন্যদের কারণে সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়া, স্পিকারের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ ইত্যাদি উল্লেখ করে সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের নতুন দাবি প্রসঙ্গে বলেন :

www.pathagar.com

আমরা এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছি, রক্ত দিয়েছি।[১০] আশা ছিল সংসদের মাধ্যমে জনগণের সকল সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, মন্ত্রীদের দুর্নীতির তদন্ত, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ, সারের মূল্য কমানোসহ যত জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ আমরা সংসদে নেই সরকার সব বাতিল করিয়া দেয়। এমন কি হেবরনের মসজিদে নামাজ আদায়রত মুসলমানদের হত্যার প্রতিবাদে প্রস্তাব নিতে গেলে তাহাও বাতিল করা হয়, বরং আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিয়া কথা বলা হয়। ...বিশেষ করিয়া ফারাক্কার সমস্যার সমাধান ও গঙ্গার পানির হিস্যার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলিলে তাহাও আলোচনা করিতে দেওয়া হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও কোন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বিবৃতি দেন নাই, উপস্থিত থাকিয়াছেন কম ...এইভাবে তাহারা সংসদকে অকার্যকর ও সংসদীয় গণতন্ত্রের নবযাত্রাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। তাই কেবলমাত্র সংসদে বসিয়া বেতন-ভাতা খাওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া আমরা সংসদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছি। অন্যদিকে ধানমণ্ডি, মীরপুর ও মাগুরা উপনির্বাচনে এবং ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৬ জনকে হত্যার অভিজ্ঞতায় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া এ সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনে আমরা অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই এবং আন্দোলন শুরু করি।[১১]

এরপর তিনি তাঁর ভাষণে কৃষি, শিল্প, শ্রম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, নারীর মর্যাদা ও অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ইনডেমনিটি আইন, জনগণের মৌলিক অধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, প্রশাসন ব্যবস্থা, স্থানীয় সরকার পদ্ধতি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে দলের নীতি-আদর্শ ও উন্নয়ন ভাবনা তুলে ধরেন। তাঁর ভাষণের এ অংশটিকে ভবিষ্যৎ নির্বাচনের (যা ১২ই জুন ১৯৯৬ অনুষ্ঠিত হয়) আগাম প্রস্তুতি হিসেবে দেখলেও অত্যুক্তি হবে না।

বক্তৃতায় ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে (১৯৭৪) সামগ্রিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কৃষিনীতি সম্বন্ধে বলা হয়, 'আওয়ামী লীগ কৃষি উপকরণের ওপর প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' শিল্পনীতি সম্বন্ধে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়ন কৌশলের একদিকে থাকবে রপ্তানীশিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ, অন্যদিকে থাকবে কৃষিভিত্তিক ও শ্রমনিবিড় ক্ষুদ্র মাঝারী শিল্পের ব্যাপক প্রসার।' স্বাস্থ্য সেবা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে সর্বস্তরের জনগণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করবে।' নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রসঙ্গে 'আওয়ামী লীগ নারী-পুরুষের সমান ... অধিকারে বিশ্বাসী' এ কথা উল্লেখপূর্বক ঘোষণা করেন, 'নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সাধন করতে হবে।' এছাড়া 'অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপকতর ও ত্বরান্বিত করে নারী সমাজকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে সমান অধিকার দেওয়া ছাড়াও তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতিকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হবে।' নতুন গণতান্ত্রিক প্রশাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ জনগণের সেবা ও কল্যাণের স্বার্থে গণমুখী, গতিশীল ও দল নিরপেক্ষ জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।' অপরদিকে, ইউনিয়ন পরিষদকে আরও বেশি কার্যকর এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে মর্মে ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ... এক শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।' গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ও সংসদকে কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে তিনি ঘোষণা করেন, 'আওয়ামী লীগ সংসদকে কার্যকর করে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী করতে হবে– যাতে করে দেশরক্ষা বাহিনী তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে আরও সক্ষম হয়। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে এবং এই সশস্ত্র বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য করতে হবে।' পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বলেন, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন, 'সকলের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব এবং কারোও প্রতি বৈরীমনোভাব নয়'– এই মৌলিক আদর্শ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে উদ্বুদ্ধ করবে। ভারতের সঙ্গে ফারাক্কা ও অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর ঘোষণা, 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ফারাক্কা সমস্যা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টনের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের সঙ্গে সমতা ও প্রতিবেশীসুলভ সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে আলোচনা ও সমঝোতার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'

কাউন্সিলে প্রদত্ত শেখ হাসিনার ভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাতে দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর দল এবং তাঁর নিজের বিভিন্নমুখী অগ্রবর্তী চিন্তা-ভাবনা গুরুত্ব সহকারে স্থান পায়। যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে আওয়ামী লীগ সে সম্বন্ধে সচেতন। বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিস্ময়কর অগ্রগতিকে দেশের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরওপ করবে।[১২]

বক্তব্যের শেষাংশে শেখ হাসিনা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রসঙ্গে বলেন, 'জনগণের ভোট দেবার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেবার জন্য আমরা নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন চাই।' তিনি দলের নেতা-কর্মীদের চলমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনকে বেগবান করতে ১৬, ১৭ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর আহূত ৭২ ঘন্টার লাগাতার হরতাল কর্মসূচিকে 'সর্বাত্মকভাবে সফল করিয়া তোলার জন্য' কাউন্সিল অধিবেশন শেষে স্ব স্ব এলাকায় ফিরে গিয়ে কাজ করার নির্দেশনা দিয়ে বলেন, 'চলমান আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জনে যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকুন। আন্দোলন ছাড়া কোন দাবী আদায় হইবে না।'[১৩] একই সঙ্গে তিনি নির্বাচনের প্রস্তুতি ও নিজেদের মধ্যে সর্বোচ্চ ঐক্য বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'আজকের এই কাউন্সিল অধিবেশনে দূর-দূরান্ত থেকে আগত নেতা-কর্মীদের প্রতি আমি আহ্বান জানাবো সংগঠনকে শক্তিশালী করুন। কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রচার কার্য চালান, জনগণের পাশে দাঁড়ান। আগামী নির্বাচনে পার্লামেন্টারি বোর্ড থেকে যে প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হবে, তাকে জয়যুক্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন। দলের ভেতর কোন উপদল, লবিং বা গ্রুপিং সহ্য করা হবে না।'[১৪]

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন এ সময়ে মুখ্য হয়ে দাঁড়ানোর কারণে কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশন এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সাধারণত জাতীয় বা সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এবং নিম্ন পর্যায় থেকে দলের ইউনিটসমূহের নির্বাচন সম্পন্ন করে নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে দলের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করার রীতি রয়েছে। আলোচ্য কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এক. *তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি আদায়ে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলা।* দুই. *আন্দোলনের পাশাপাশি একই সঙ্গে নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ।* আন্দোলনের বিজয় সম্বন্ধে শেখ হাসিনা খুবই নিশ্চিত ছিলেন, যে-কারণে তিনি আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বের দিকনির্দেশনা দানের পাশাপাশি দলের নীতি-আদর্শ বা উন্নয়ন ভাবনা সমান গুরুত্ব সহকারে কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। দ্রুত ঘটনাপ্রবাহ সে দিকেই ধাবিত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১, ২; *ঐ*, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১, ১১

২. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩৭০-৩৭১; Jalal Firoj, *Democracy in Bangladesh : Conflicting Issues and Conflict Resolution*, Bangla Academy 2012, pp. 70-76, 125-128, 130-141,181-192

৩. দ্রষ্টব্য আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিলে (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) শেখ হাসিনার ভাষণ, *আমাদের রাজনীতির লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ সাধন এবং অর্থনৈতিক মুক্তি* (পুস্তিকা) এরপর *আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ১৯৯৫*

৪. বিস্তারিত Jalal Firoj, *Democracy in Bangladesh*, pp. 236-252

৫. *ইনকিলাব*, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

৬. *ইত্তেফাক*, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১১

৭. *ঐ*

৮. *ঐ*

৯. বিস্তারিত *আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ১৯৯৫;* আরও, *ইত্তেফাক*, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ১, ১১

১০. *আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ১৯৯৫*

১১. *ইত্তেফাক*, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ১১

১২. *আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ১৯৯৫*

১৩. *ইত্তেফাক*, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ১

১৪. *আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ১৯৯৫*

www.pathagar.com

অধ্যায় : আঠারো

কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯৭ : ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়

১৯৯৭ সালের ৬ ও ৭ই মে রাজধানী ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে দুদিনব্যাপী আওয়ামী লীগের প্রথম ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও এর উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দলের সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে এ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ক আন্দোলন, ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইত্যাদি কারণে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হয়ে দেড় বছর বিলম্বে তা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখলের পর ২১ বছর ধরে বিরোধী দলে অবস্থান ও নানা নির্যাতন-নিষ্পেষণ ভোগ শেষে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে এই প্রথম আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। ক্ষমতায় ফিরে আসার ১০ মাসের মধ্যে দলের এ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই এটিকে ঘিরে সারাদেশে নেতা-কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ভিন্নতর আবেগ ও আনন্দ-উচ্ছ্বাস। কাউন্সিলে উপস্থিতির মধ্যেও এর প্রকাশ ঘটে। প্রচুরসংখ্যক কাউন্সিলর-ডেলিগেট ছাড়াও সারাদেশ থেকে কয়েক হাজার নেতা-কর্মী এতে যোগ দেন।

পটভূমি

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বিশেষ কাউন্সিল থেকে বর্তমান কাউন্সিলের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় রাজনীতির উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি ছিল : বিএনপি সরকার আয়োজিত ১৯৯৬ সালের মধ্য-ফেব্রুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচন, সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ও 'জনতার মঞ্চ' (মার্চ ১৯৯৬), সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাশ (২৬শে মার্চ ১৯৯৬), আন্দোলনের মুখে খালেদা জিয়ার সরকারের পদত্যাগ, বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১২ই জুন ১৯৯৬), শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দাবি করে মামলা দায়ের (২রা অক্টোবর ১৯৯৬), ইনডেমনিটি আইন বাতিল (১২ই নভেম্বর ১৯৯৬), ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি (১২ই ডিসেম্বর ১৯৯৬) ইত্যাদি।

১৯৯৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর সংসদের ১৪৭ জন বিরোধী দলীয় সদস্য একযোগে পদত্যাগ করা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক তা গ্রহণ না করে ঝুলিয়ে রাখা হয়, যা পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পেছনে বিএনপি সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, যে-

www.pathagar.com

ভাবেই হোক সরকারের পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করা। বিরোধী দলের সদস্যদের পদত্যাগের বিষয়টি উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়।[২] মতামতের জন্য রাষ্ট্রপতি এটিকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে রেফারেন্স আকারে পাঠান। বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা ছিল প্রথম ও খুবই চাঞ্চল্যকর। এদিকে সরকারের কালক্ষেপণ[৩] নীতি চলতে থাকায় বিরোধী দলের আহ্বানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে দেশব্যাপী হরতালসহ একের পর এক কর্মসূচি পালিত হতে থাকে। এ দাবির সমর্থনে সারাদেশে সৃষ্টি হয় গণজাগরণ। বিরোধী দলবিহীন ১ বছর ৮ মাস[৪] অতিবাহিত করার পর অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ১৯৯৫ সালের ২৪শে নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধী দলের দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সরকার ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি নতুন সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। এবার সরকার ও বিরোধী দল মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়ায়। বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন ও তা প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। ১০ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মহাসমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে গণমিছিল, ১৩ই ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী অবরোধ এবং নির্বাচনের আগের দিন ও নির্বাচনের দিন ৪৮ ঘণ্টার হরতাল পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। নির্বাচন প্রতিহত করার কর্মসূচি সর্বাত্মকভাবে সফল করতে আওয়ামী লীগ 'গণকারফিউ' জারি করে।[৫] এ-রকম এক অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয় ভোটার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন মধ্য-ফেব্রুয়ারির (১৯৯৬) একতরফা নির্বাচন। বিএনপি এটিকে রুটিন রক্ষা বা সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার নির্বাচন বলে দাবি করলেও তা কোনো মহলে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। তথাকথিত নির্বাচনের একমাস চারদিন পর ১৯শে মার্চ নতুন সংসদ অধিবেশন বসে। এর মোট কার্যদিবস ছিল মাত্র চারদিন। ২৬শে মার্চ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন পাশ হয়।

সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণার পূর্বে বিরোধী দলীয় সদস্যদের সহযোগিতা নিয়ে সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ আইনটি পাশ করিয়ে নিতে পারত, যেমনটি ১৯৯১ সালের ৬ই আগস্ট পঞ্চম সংসদে সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন সংক্রান্ত সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের সময় ঘটেছিল। এটি মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, সরকার বিরোধী দলের শক্তি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুতে দেশজুড়ে গড়ে ওঠা সাধারণ জনমতকে যথাযথভাবে বুঝতে সক্ষম হয়নি। বিএনপির কৌশল ছিল, অন্তত আরও একটি মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় থাকা। কিন্তু তা আর ঘটেনি। বিরোধী দলবিহীন ও ভোটার শূন্য মধ্য-ফেব্রুয়ারির নির্বাচন তাদের জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়।

চলমান আন্দোলনকে আরও তীব্র করে খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটাতে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ২৩শে মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাব সংলগ্ন সড়কের ওপর 'জনতার মঞ্চ' নির্মিত হয় । ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে এটি সরকার-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। কবি, সাহিত্যিক,

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে যোগ দেয় এবং সার্বক্ষণিক অবস্থান নেয়। সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এর পূর্বে ৯ই মার্চ থেকে বিরোধী দলের আহ্বানে চলতে থাকে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি। বিভিন্ন বন্দরসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থলগুলো অচল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সচিবালয় থেকে প্রজাতন্ত্রের 'কর্মচারিবৃন্দ' জনতার মঞ্চে যোগ দেন। এক বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ৩০শে মার্চ (১৯৯৬) বেগম খালেদা জিয়া তাঁর সরকারের পদত্যাগ ঘোষণা করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনে বিজয় অর্জিত হয়।

এরপর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১২ই জুন ১৯৯৬ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বেশ কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আওয়ামী লীগ ও ক্ষমতাচ্যুত বিএনপির মধ্যে। আওয়ামী লীগ ২১-দফা সম্বলিত একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে।[৬] সংক্ষেপে, জনগণের 'ভোট ও ভাতের অধিকার' প্রতিষ্ঠা ছিল প্রধান নির্বাচনি অঙ্গীকার। অপরদিকে, বিএনপি তার নির্বাচনি ইশতেহারে দেশের অর্থনীতি তথা সার্বিক উন্নয়নের ওপর বিরোধী দলের দীর্ঘ আন্দোলন, হরতাল-অবরোধ, অসহযোগ কর্মসূচি কী বিরূপ প্রভাব ফেলে, তা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে। নির্বাচনি ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৪৬টি আসন ও শতকরা ৩৭.৫৬ ভাগ ভোট লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়।[৭] অন্যদিকে, বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ১১৬টি আসন ও শতকরা ৩৩.৪০ ভাগ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ২৯২টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ৩২টি আসন ও শতকরা ১৫.৯৯ ভাগ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে অবস্থান করে। ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৩টি আসন লাভ (৮.৭১% ভোট) ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কেননা ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দলটি ২২২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৮টি আসন ও শতকরা ১২.২৩ ভাগ ভোট লাভ করেছিল। এবার সকল আসনেই দলটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পূর্বের তুলনায় মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ আসন এবং অনেক কম ভোট পায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের যে আসন ভাগাভাগির সমঝোতা হয়েছিল, এবারের নির্বাচন তারই প্রমাণ। যাহোক, জাতীয় পার্টি ও জাসদ (রব)-এর সমর্থন নিয়ে ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার দিন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।[৮] অন্য দল থেকে মন্ত্রিসভায় প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এটিকে 'জাতীয় ঐকমত্যের সরকার' বলে অভিহিত করা হয়।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের ১০ মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর সরকার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের অন্তরায় কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইন বাতিল (১২ই নভেম্বর ১৯৯৬) করা হয়। এর পূর্বে ২রা অক্টোবর ১৯৯৬ বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী মুহিতুল ইসলাম ধানমন্ডি থানায় ২৩ জনকে আসামি করে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা দায়ের করেন। ফারুক, রশীদসহ খুনিদের

www.pathagar.com

কয়েকজন এ সময়ে গ্রেপ্তার হয়। নিম্ন আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।

ভারতের সঙ্গে ৩৬ হাজার কিউসেক পানি প্রাপ্তির ব্যবস্থাসহ ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি চুক্তি (১২ই ডিসেম্বর ১৯৯৬), ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের (১৯৭৪) আলোকে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রফেসর এম শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যবিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি' গঠন (১৪ই জানুয়ারি ১৯৯৭), স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গণতন্ত্রায়ন এবং নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এটিকে আরও প্রতিনিধিত্বশীল ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এডভোকেট রহমত আলী এমপি-কে চেয়ারম্যান করে ৮ সদস্যবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন (১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬) ইত্যাদি তাঁর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগের সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দলের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। পূর্বোল্লিখিত কারণে তা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। এর পরিবর্তে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে এক দিনব্যাপী আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলের সকল সদস্য তখন একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আন্দোলনরত ছিলেন।

জাতীয় রাজনীতি ও দলের এরূপ অবস্থা এবং ২১ বছর পর আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় ফিরে আসার পটভূমিতে অনুষ্ঠিত হয় আলোচ্য কাউন্সিল।

কাউন্সিল অধিবেশন

১৯৯৭ সালের ৬ই মে বিকেল ৩টায় আউটার স্টেডিয়ামে নির্মিত প্যান্ডেলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে দলের দুদিনব্যাপী ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এ উপলক্ষ্যে ৫ হাজারের অধিক কাউন্সিলর-ডেলিগেট, ১০ হাজার নেতা-কর্মী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য এক সুবিশাল প্যান্ডেল তৈরি করা হয়। কিন্তু লোক সমাগম এত বেশি ছিল যে, প্যান্ডেলের বাইরে পুরো স্টেডিয়াম এলাকা ছিল লোকে লোকারণ্য।[৯] ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসের প্রায় প্রতিটির প্রতিনিধি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন দেশ থেকে আওয়ামী লীগের প্রবাসী শাখার প্রতিনিধিবৃন্দ, দেশবরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী নেতা ও বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু। কাউন্সিলে রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শান্তির পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন। এ সময় দলের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ও সাংগঠনিক জেলার নেতৃবৃন্দ একযোগে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। দুই স্তর বিশিষ্ট প্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের আসন গ্রহণের পর জাতীয়

www.pathagar.com

সংগীত পরিবেশন ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ শেষে কাউন্সিলের মূল কাজ শুরু হয়। মঞ্চে রক্ষিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও ফজলুল হক মনির প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এরপর দলের অন্যতম যুগ্মসম্পাদক আবদুল জলিল বঙ্গবন্ধুসহ ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের শহিদ, একই বছর কারাগারে শহিদ জাতীয় চার নেতা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রয়াত অন্যান্য বিশিষ্ট জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা উপ-পরিষদের চেয়ারম্যান আমির হোসেন আমু স্বাগত ভাষণ রাখেন।

কাউন্সিল উপলক্ষ্যে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং চিনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বাণী পাঠানো হয়। ঐ বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে পিএলও প্রতিনিধি শাহতা জারাব এবং চিনের রাষ্ট্রদূত ইয়াং সু। ইয়াসির আরাফাত তাঁর বাণীতে পিএলও ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রশংসা করেন। অপরদিকে, চিনের কমিউনিস্ট পার্টির বাণীতে আওয়ামী লীগ সরকারের দশ মাসের শাসন আমলে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জনগণের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপের 'ভূয়সী প্রশংসা' করা হয়।[১০]

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জাসদ (ইনু)-এর কাজী আরেফ আহমদ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও কমিউনিস্ট কেন্দ্রের অজয় রায় উপস্থিত ছিলেন। বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সংসদে বিরোধী দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়াকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিএনপি ঐদিন চট্টগ্রাম বিভাগে হরতাল আহ্বান করে।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

দলের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান প্রথম দিনের দ্বিতীয় সেশনে ৬১ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁর রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে :[১১] আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক স্থায়ী আইন কমিশন প্রতিষ্ঠা, বিচার প্রশাসনে দক্ষতা ও গতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ, জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনেই বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ বিল উত্থাপনের প্রচেষ্টা, সন্ত্রাস দমনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, ভারতের সঙ্গে সরকারের ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর, আঞ্চলিক শান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এ চুক্তির গুরুত্ব, 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়'—জাতির জনকের এ নীতির ইতিবাচক ফল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হওয়া,[১২] 'উন্নয়নের ত্রিভুজ' বা 'চতুর্ভুজ' হিসেবে বাংলাদেশ, বিদেশি সরকার বা রাষ্ট্র প্রধানদের বাংলাদেশ সফর, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ, শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে ব্যক্তি পর্যায়ে

www.pathagar.com

পুঁজি বিনিয়োগে সরকারের সর্বপ্রকার সহযোগিতা দান, স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নে সরকারের কমিটি গঠন, রেডিও-টেলিভিশনসহ জাতীয় প্রচার মাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন প্রদানে বিশিষ্টজনদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, আওয়ামী লীগের জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক নীতিমালা, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ভিত্তি, সাবেক বিএনপি সরকারের শাসন আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, বিএনপি সরকারের সময় সন্ত্রাস, হত্যা, দখলদারিত্ব, দলীয়করণ, লুটপাট, দুর্নীতি, ভোট ডাকাতি, কৃষক ও শ্রমিক হত্যা ইত্যাদি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, প্রগতি ও মানবতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে একজোট হয়ে ক্ষমতাচ্যুত বিএনপির 'নতুন ষড়যন্ত্রে' লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্য করে জিল্লুর রহমান বলেন :[১৩]

> আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আপনাদের এ বিষয়ে আশ্বস্ত করতে চাই যে, বিগত একুশ বৎসর যে পশ্চাৎমুখী বাংলাদেশের রূপ আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন আজকের বাংলাদেশ সে বাংলাদেশ নয়। বাংলাদেশ আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে- সামনের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে বাংলার ১২ কোটি মানুষের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আপনারা সম্পূর্ণ নতুন এক বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ করবেন ইনশাল্লাহ।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেন :[১৪]

> আমরা... ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, যুগোপযোগী কর্মসূচী, বাস্তবানুযায়ী পদক্ষেপ, স্বল্প, মধ্য ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা [আর] জনগণকে সাথে নিয়ে, সম্মিলিতভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন-ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও সন্ত্রাসমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।

শেখ হাসিনার ভাষণ

৬ই মে অপরাহ্নে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধক শেখ হাসিনা ২২ পৃষ্ঠার একটি মুদ্রিত ভাষণ পাঠ করেন। এতে যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়, তা হচ্ছে :[১৫] সুদীর্ঘ ২১ বছরের সংগ্রাম শেষে সরকার গঠনের পর এক ভিন্ন পরিবেশে ও পটভূমিতে দলের কাউন্সিলের আয়োজন, বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠিত এ কাউন্সিল কেন দল এবং জাতির জন্য গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৫ই আগস্টের শহিদ বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্য, জাতীয় চার নেতা, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মনি, '৫২-র ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং এ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের যে অগণিত নেতা-কর্মী জীবন বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রাম, ১৫ই আগস্টের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড, জাতির পিতার হত্যার পর এ পর্যন্ত দেশের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া, ক্ষমতা দখলকারীদের কর্তৃক ইতিহাস বিকৃতি ও নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করা, দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে

www.pathagar.com

পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য দলের নেতা-কর্মী ও দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, '৯১-এর নির্বাচনের পর তিন জোটের রূপরেখা (১৯শে নভেম্বর ১৯৯০) পদদলিত করে বিএনপি সরকারের 'নির্বাচিত স্বৈরাচার'-এ পরিণত হওয়া, বিএনপি সরকারের দুঃশাসন, বিএনপি-র শাসনকালে কিশোরী ইয়াসমিন, ১৮ জন কৃষক ও ১৭ জন শ্রমিক হত্যা এবং জনগণের ভোটাধিকার হরণ, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে নতুন করে আন্দোলন, বিএনপি-র মধ্য-ফেব্রুয়ারির (১৯৯৬) ভোটারবিহীন নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ও জনতার মঞ্চ, আন্দোলনের মুখে বিএনপি সরকারের পতন (৩০শে মার্চ ১৯৯৬), বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১২ই জুন ১৯৯৬) ও আওয়ামী লীগের বিজয় লাভ, সরকার গঠন, সরকারের এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য, অন্য দলের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে 'ঐকমত্যের সরকার গঠন,' বিএনপি-কে এ সরকারে যোগদানের আমন্ত্রণ সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করা, বিএনপি-র জনগণের রায় মেনে নিতে না পারা, সন্ত্রাস নির্মূল ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে গৃহীত ব্যবস্থা ও অঙ্গীকার, ঐক্যের প্রতীক হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদে দলীয় ব্যক্তির পরিবর্তে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে ঐ পদে নির্বাচিত করা, বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতির জনকের 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' নীতি অনুসরণ, ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে অগ্রগতি, ভারতে আশ্রয় নেওয়া ঐ অঞ্চলের ৬ হাজারেরও বেশি শরণার্থীর দেশে প্রত্যাবর্তন, দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের আপত্তি সত্ত্বেও কৃষিতে ১০০ কোটি টাকার ভর্তুকি প্রদান, ১০ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্তকরণ, শিক্ষানীতি প্রণয়নে কমিটি গঠন, পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি রোধ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শের আলোকে তা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার নীতি, জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপের পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে জনকল্যাণকামী অর্থনৈতিক নীতি-মালা গ্রহণ, দেশে শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের প্রসার, রপ্তানিমুখী শিল্প, বিশেষ করে পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ, বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে গৃহীত জরুরি পদক্ষেপ, আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে সকল থানা ও ইউনিয়ন এবং পর্যায়ক্রমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্য, দেশের প্রতিটি নাগরিকের ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা, প্রতি থানায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ইউনিয়নে স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নত ও বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করা, পদ্মাসহ অন্যান্য সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা, নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, রেডিও ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে কমিশন গঠন, স্থায়ী আইন কমিশন প্রতিষ্ঠা, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের উদ্যোগ, প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন, স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন, কুখ্যাত ইনডেমনিটি

www.pathagar.com

আইন রহিতকরণ বিল পাস, ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্য শুরু হওয়া, জেল হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রসঙ্গ, আধুনিক, সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল, পেশাদার শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে 'অর্থনৈতিক কূটনীতি'র ওপর গুরুত্বারোপ, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ, ভারতের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা গ্রহণ, চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও নিবিড় করা, সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, জাপান, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় দেশসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক আরও গভীর করা, স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ ও মর্যাদাবান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার অভীষ্ট লক্ষ্য, এ লক্ষ্য অর্জনে মানুষকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের ভূমিকা, বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে জাতীয় জাগরণ এবং এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্ব, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি গণ-উদ্যোগ থাকার প্রয়োজনীয়তা, দুর্নীতি দমনে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, সাম্প্রদায়িকতার কুফল ও ঐক্যবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আবশ্যকতা, 'জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বাংলাদেশ হবে সবার' এ ঘোষণা, ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতা ও বেকারত্ব থেকে জাতিকে মুক্ত করার অঙ্গীকার, শ্রমের ন্যায্যমূল্য প্রদান, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী করে আওয়ামী লীগকে গড়ে তোলা, 'ক্ষমতায় যাওয়া সহজ কিন্তু জনগণের মুক্তির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে ক্ষমতায় টিকে থাকা কঠিন' –বঙ্গবন্ধুর এ উক্তি নেতা-কর্মী-কাউন্সিলরদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া, আওয়ামী লীগের কাজ হবে 'সরকারের সাথে জনগণের মৈত্রী বন্ধনের সেতু' রচনা এ উপদেশ, জনগণের ভোটের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের পর আওয়ামী লীগকেই এখন নেতৃত্ব দিতে হবে জনগণের 'ভাতের অধিকার আদায়ে' এ ঘোষণা, দলের বিভাগীয় দপ্তরসমূহকে পূর্বের ন্যায় সক্রিয় করা, সরকার ও সংগঠনের কাজের প্রচার ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ ইত্যাদি। তাঁর এ ভাষণ সমাপ্তির পূর্বে উপস্থিত সকলকে ২০২০ সাল স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে ঘিরে জাতির পিতার আজীবনের স্বপ্ন, সে স্বপ্ন পূরণে তাঁর সরকারের অঙ্গীকার এবং নেতা-কর্মীদের সে ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে অত্যন্ত আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে শেখ হাসিনা বলেন :[১৬]

> সুদীর্ঘ ২১ (একুশ) বছর পর জনগণ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন সরাসরি দেশের মানুষের সেবা করার, রাষ্ট্র পরিচালনার। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল, লক্ষ্য ছিল–বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করা; মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি স্বাধীন হয়েছে। আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথ বেয়ে একবিংশ শতাব্দীর অভিযাত্রায় আমাদেরও লক্ষ্য আছে, স্বপ্ন আছে, মিশন আছে। আগামী শতাব্দীর ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত। আসুন আমরা এই সময়ের মধ্যে জাতির জনকের আজন্ম লালিত স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন : জেলার রিপোর্ট, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধন, নেতৃত্ব নির্বাচন

দ্বিতীয় ও শেষদিনের কাউন্সিল অধিবেশন ৭ই মে সকাল সাড়ে ১০টায় একই স্থানে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে শুরু হয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত তা চলে। প্রথমে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টের ওপর বক্তব্য রাখার কথা থাকলেও তদ্রূপটি না হয়ে জেলার নেতৃবৃন্দ মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও তাঁদের নানা অভিব্যক্তি তুলে ধরেণ।

জেলা নেতৃবৃন্দের বক্তব্য

প্রধানত স্ব স্ব বিভাগের পক্ষ ধরে জেলার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সম্ভবত সময়ের কথা ভেবে বক্তাদের সংখ্যা সীমিত রাখার জন্য এরূপ আয়োজন। এভাবে যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁরা হলেন রাজশাহী বিভাগের পক্ষে সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মোতাহার উদ্দিন মাস্টার, খুলনা বিভাগের পক্ষে শেখ মো. হারুনুর রশিদ, চট্টগ্রাম বিভাগের পক্ষে সিটি মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সিলেট বিভাগের পক্ষে হবিগঞ্জ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুসফিক হোসেন চৌধুরী, ঢাকা জেলা শাখার সভাপতি শামসুদ্দিন খান মজলিশ, ঢাকা নগর সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এমপি, গোপালগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, বরিশাল বিভাগের পক্ষে মহিউদ্দিন আহমদ, রাঙ্গামাটি জেলার সাধারণ সম্পাদক ডা. আশুতোষ বড়ুয়া প্রমুখ। যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম ও যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক জোয়ার্দার এঁরা দুজন বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ

এক. সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দলীয় নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ত করা, কেননা স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে 'ভাল ফলাফল' করার জন্য এটি প্রয়োজন।

দুই. প্রশাসনের 'নির্দলীয়করণের কার্যক্রম' ত্বরান্বিত করার দাবি, তা না হলে বিএনপি আমলের প্রশাসন দিয়ে আওয়ামী লীগের সরকার চালানোযাবে না।

তিন. দলীয় কর্মীদের মূল্যায়ন করা। গত ২১ বছর ধরে তারা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। নেতা-কর্মীদের নামে যেসব মামলা রয়েছে তা প্রত্যাহার করা।

চার. আওয়ামী লীগের মধ্যে এখনো ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর। 'বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে মোশতাক যেভাবে প্রতারণা করেছিল, ঠিক তেমনিভাবে এখনো অনেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে থেকে প্রতারণা করার চেষ্টা চালাচ্ছে।' তাদেরকে চিহ্নিত করা।

পাঁচ. পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন আর রক্তের হোলিখেলা না হয়, সে ব্যাপারে সরকারের আরও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ।

ছয়. আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে মহল বিশেষের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সতর্ক থাকা।

www.pathagar.com

এছাড়া, যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক জোয়ার্দার তাঁর বক্তব্যে প্রবাসী বাঙালিদের ভোটের অধিকার সংক্রান্ত পূর্ব প্রতিশ্রুতির আশু বাস্তবায়ন দাবি করেন।

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধন

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধনের লক্ষ্যে পূর্বেই একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এর সদস্য সচিব ছিলেন যশোরের এ বি এম তালেব আলী। তিনি কাউন্সিলে উভয় ব্যাপারে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ঘোষণাপত্র

ঘোষণাপত্রের উল্লেখযোগ্য সংশোধনীর মধ্যে ছিল :[১৮]

১. বর্তমান ঘোষণাপত্রে 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দের সাথে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দ যুক্তকরণ। পরিবর্তিত রূপ হবে 'সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।

২. 'শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ' শব্দাবলির পরিবর্তে 'শোষণমুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সুষম সমাজ' প্রতিস্থাপন।

গঠনতন্ত্র

গঠনতন্ত্রের সংশোধনী নিম্নরূপ :[১৯]

১. কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সংখ্যা (কর্মকর্তাসহ) ৬৫ জন থেকে ৬৭ জনে উন্নীত করা। এর মধ্যে সাধারণ সদস্য ২৮ জনের স্থলে ২৯ জন হবে।

২. যুগ্মসম্পাদকের স্থলে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নামকরণ এবং ২টি পদের স্থলে ৩টি পদ সৃষ্টি।

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক এ দুটি নতুন সম্পাদকীয় পদ সৃষ্টি।

৪. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের পদ পৃথক করে শিক্ষা ও মানবসম্পদ সম্পাদক এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদকের পদ সৃষ্টি।

৫. সহ-প্রচার ও সহ-দপ্তর ছাড়া সহ-সম্পাদকের অন্য ৩টি পদ বিলুপ্ত করা।

৬. দলের সভানেত্রীকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে এই প্রথমবার অনূর্ধ্ব ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকার বিধান।[২০] উপদেষ্টা পরিষদের তিনটি সেল থাকিবে যথা– (১) রাজনৈতিক, (২) অর্থনৈতিক ও (৩) সামাজিক।

এছাড়া কাউন্সিলরদের পক্ষ থেকে ৩৪টি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়, এগুলোর মধ্যে ১৮টি গৃহীত হয়। পূর্বে যেখানে প্রতি ২৫ হাজারে একজন কাউন্সিলরের বিধান ছিল, সেখানে এখন থেকে প্রতি ৫০ হাজারে একজন কাউন্সিলর হবেন।

www.pathagar.com

নেতৃত্ব নির্বাচন

শেষদিনের (৭ই মে) বিকেলের সেশনের অন্যান্য কার্যসূচির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নেতৃত্ব নির্বাচন। এর জন্য যদিও কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি এবং জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে গঠিত সাবজেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রথমে একটি প্যানেল তৈরি করে কাউন্সিলে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করার কথা, তবে দলের ঐতিহ্য হচ্ছে, প্রথমে কাউন্সিল কর্তৃক সভাপতি নির্বাচন, এরপর সভাপতির সাবজেক্ট কমিটির সদস্য ও সিনিয়র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোপ-আলোচনা ও পরামর্শক্রমে প্যানেল তৈরি এবং তা কাউন্সিলে পেশ। বরাবরের মতো এবারও নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরুর প্রাক্কালে দলের সভানেত্রী পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে মঞ্চ থেকে নেমে কাউন্সিলরদের সারিতে গিয়ে আসন গ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি কাউন্সিলরদের উদ্দেশে ১৯৮১ সাল থেকে তাঁকে দলের সভানেত্রী নির্বাচিত করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবারের জন্য তাঁর নিজের অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'এখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দলকে ঠিকমতো সময় দিতে পারি না। সেজন্য এবার আপনারা দলের নতুন নেতা নির্বাচন করবেন এটাই আশা করি।'[২১]

এ পর্যায়ে নির্বাচনি অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আবদুস সামাদ আজাদ। তিনি সভানেত্রীর পদে শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করে বলেন :[২২]

> শেখ হাসিনা দলকে নেতৃত্ব দিয়ে কেবল ক্ষমতাসীন করেছেন তাই নয়, তার বিচক্ষণ নেতৃত্ব না পেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তিও সম্ভব হতো না। তাই দলে তাঁর নেতৃত্বের বিকল্প নাই।

সমগ্র কাউন্সিল তুমুল করতালি দিয়ে তাঁর এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। এরপর আবদুস সামাদ আজাদ নবনির্বাচিত সভানেত্রীর ওপর বাকি নেতৃত্ব নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব করেন এবং তাও একইভাবে গৃহীত হয়। এ পর্যায়ে শেখ হাসিনা মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা দেন যে, তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব একা পালন না করে জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে তিনি তা সম্পাদন করবেন। এ পর্যায়ে অধিবেশন কিছু সময়ের জন্য মুলতবি করা হয়। অতঃপর রাত ৯টার দিকে শেখ হাসিনা মঞ্চে এসে পুনরায় অধিবেশনের কাজ শুরু করেন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ নাসিম এবং সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। বাকি কর্মকর্তাদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে মর্মে জানানো হয়। কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করে। কাউন্সিল অধিবেশনের একদিন পর কার্যনির্বাহী কমিটির ৩টি পদ বাদে অন্য তালিকা প্রকাশ করা হয়, যা নিম্নরূপ :[২৩]

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য	:	সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন
		আবদুস সামাদ আজাদ
		আবদুল মান্নান
		অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামান

www.pathagar.com

		বেগম সাজেদা চৌধুরী
		আবদুল মমিন তালুকদার
		পুলিন দে
		আমির হোসেন আমু
		আব্দুর রাজ্জাক
		তোফায়েল আহমেদ
		ড. মোহাম্মদ সেলিম
		সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
		মো. আবদুল জলিল
সাধারণ সম্পাদক	:	জিল্লুর রহমান
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	:	শামসুর রহমান খান শাজাহান
		আজিজুর রহমান
		মোজাফফর হোসেন পল্টু
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	মোহাম্মদ নাসিম
প্রচার সম্পাদক	:	আবদুল মান্নান
সহ-প্রচার সম্পাদক	:	নূরুল ফজল বুলবুল
দপ্তর সম্পাদক	:	আবদুল মান্নান খান
সহ-দফতর সম্পাদক	:	সিদ্দিকুর রউফ খান
কৃষি সম্পাদক	:	বেগম মতিয়া চৌধুরী
শ্রম সম্পাদক	:	রহমত উল্লাহ চৌধুরী
অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক	:	আতাউর রহমান খান (কায়সার)
শিক্ষা ও মানব সম্পদ সম্পাদক	:	নুরুল ইসলাম নাহিদ
শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক	:	আকতারুজ্জামান চৌধুরী
তথ্য সম্পাদক	:	অধ্যাপক আবু সাইয়িদ
যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক	:	ওবায়দুল কাদের
ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	মুকুল বোস
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	:	আবুল হাসান চৌধুরী
আইন বিষয়ক সম্পাদক	:	এডভোকেট সাহারা খাতুন
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সম্পাদক	:	ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	আলমগীর কুমকুম
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	:	মোনায়েম সরকার*
মহিলা সম্পাদিকা	:	বেগম আইভি রহমান*
কোষাধ্যক্ষ	:	এইচ এন আশিকুর রহমান

কার্যনির্বাহী সদস্য : সৈয়দ ফজলুল হক বিএসসি, ফজলুল করিম, মোহাম্মদ হানিফ, আবদুল কাদের সিদ্দিকী, দেওয়ান ফরিদ গাজী, ইউনুস আলী এডভোকেট, সিদ্দিক

www.pathagar.com

হোসেন, আবদুল আওয়াল এডভোকেট, এ বি এম তালেব আলী, মতিউর রহমান তালুকদার, ইমাম উদ্দিন আহমেদ, মো. রহমত আলী, সুধাংশু শেখর হালদার, রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু, আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, এম এ মান্নান, বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান, ফজলুর রহমান খান এডভোকেট, খ ম জাহাঙ্গীর, মির্জা সুলতান রাজা, নুরুল মজিদ হুমায়ুন, ফুলু সরকার, আধ্যাপক ফজলুল হক, মাহমুদুর রহমান মান্না, আখতারুজ্জামান, সুলতান মো. মনসুর আহমেদ, নূহ-উল-আলম লেনিন।[২৪]

* মোনায়েম সরকার পরে দলের সভানেত্রী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পদে মনোনীত হন।
* মহিলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে যিনি সভানেত্রী নির্বাচিত হবেন তিনিই পদাধিকার বলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা হবেন। সে বিধানমতে বেগম আইভি রহমান ঐ পদে পরে অধিষ্ঠিত হন।
* ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্যের নাম পরে ঘোষণার কথা বলা হয়।

উল্লেখ্য শেখ হাসিনা ও জিল্লুর রহমান উভয়ই চতুর্থবারের জন্য স্ব স্ব পদে নির্বাচিত হন। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, ওয়ার্কিং কমিটিতে বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ সাবেক ছাত্র নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কাউন্সিলে নেতৃত্ব-নির্বাচন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর প্রাক্কালে শেখ হাসিনা কাউন্সিলরদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বলেন :[২৫]

> এই দলেই ঘাপটি মেরে থাকা কয়েক ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে পঁচাত্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুই কেবল নিহত হননি, আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাও হারাতে হয়েছিল। ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ অনেক সময় কেবল দলকেই নয়, দেশকেও ধ্বংস করে। ত্যাগের মনোভাব নিয়ে কাজ না করার মধ্য দিয়ে অর্জিত কোন কিছুই বেশিদিন ধরে রাখা যায় না। সেজন্য সবাইকে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ...কোন দল বা সরকার প্রতিবিপ্লবীদের হাতে ক্ষমতা হারালে আর কোনদিন ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে না, এটাই পৃথিবীর ইতিহাস। কিন্তু চরম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও বিরামহীন লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হত্যা-ক্যু-ষড়যন্ত্র করে নয়, জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এসে আমরা দুনিয়ার বুকে নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। তাই বলে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায়নি, আরও অনেক ত্যাগ করতে হবে, অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব নিয়ে এগুতে পারলে আমরা অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো। তাই আওয়ামী লীগের প্রতিটি নেতা-কর্মীকে ত্যাগের শপথই নিতে হবে।

আওয়ামী লীগের এবারের কাউন্সিল নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ২১ বছর পর সরকারে থেকে এই প্রথমবার দলের কাউন্সিল আয়োজন। দেশ পরিচালনা করা এক কঠিন দায়িত্ব এবং দলের কাউন্সিলে, বিশেষ করে সভানেত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে এ উপলব্ধি লক্ষ করা যায়। জনগণের কল্যাণ ও তাদের সমর্থন ছাড়া গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে যে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না, সে বিষয়টিও তিনি জাতির পিতার সেই উক্তি 'ক্ষমতায় যাওয়া সহজ কিন্তু ক্ষমতায় থাকা কঠিন' উদ্ধৃত করে নেতা-কর্মী-কাউন্সিলরদের স্মরণ করিয়ে দেন। সরকার পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণে তাঁর পূর্ণ প্রস্তুতি

www.pathagar.com

সমগ্র কাউন্সিল আয়োজনের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। সরকারের পাঁচ বছরের ছকবাঁধা মেয়াদ পূরণ নয়, বাংলাদেশকে ঘিরে তাঁর মধ্যে ছিল দীর্ঘ মেয়াদি এক উন্নয়নের ভিশন, যা কাউন্সিলে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আর এসবের প্রেরণার উৎসমূলে ছিল জাতির জনকের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'। আধুনিক যুগে কি রাজনীতি চর্চা, সরকার পরিচালনা, উন্নয়ন কোনো কিছুই যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া সম্ভব নয়, সে ব্যাপারেও দলের নেত্রীর সচেতনতা লক্ষণীয়। বস্তুত, শেখ হাসিনা আবির্ভূত হন দলের দিশারি ও ভিশনারি হিসেবে। আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিলের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল পেশাদারিত্ব। এই প্রথম কাউন্সিলরদের প্রত্যেককে একটি ফোল্ডারে সভানেত্রীর ভাষণ, সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, অভ্যর্থনা উপ-পরিষদের চেয়ারম্যানের স্বাগত ভাষণ, সরকারের ১০ মাসের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্যসহ অন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়। উপরন্তু সরকারি দায়িত্ব পালনে, বিশেষকরে সংসদীয় ব্যবস্থায়, একটি দলের পক্ষে পূর্বপ্রস্তুতি থাকা আবশ্যকীয় হয় এবং সম্ভবত সেদিকটি বিবেচনায় রেখে দলের বিভাগীয় দপ্তরগুলোকে সক্রিয় ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে শেখ হাসিনা কাউন্সিলে তাঁর বক্তব্যে নির্দেশনা দান করেন, যা ছিল খুবই প্রণিধানযোগ্য। এক কথায়, আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষুধা-দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ৭ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ২; *ঐ*, ৮ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ১১; আরও *ঐ*, ৫ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ২; *ঐ*, ৬ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ১১; *সংবাদ*, ৭ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ১২; *ঐ*, ৮ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ৮

২. দ্রষ্টব্য Harun-or-Rashid, 'Role of Judiciary in Political Development : The Bangladesh Perspective,' *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Haumanities)*, Diamond Jubilee Volume, 2011, pp. 53-66

৩. সরকার সংসদ সদস্যদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে একযোগে পদত্যাগ সংবিধান সম্মত কি-না এ প্রশ্নে কালক্ষেপণ করতে থাকে। এদিকে স্পিকার কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়া এবং অন্যদিকে সংসদ সদস্যদের একযোগে পদত্যাগের বৈধতা উভয় প্রশ্নে উচ্চ আদালতে দুটি পৃথক রিট আবেদন দাখিল হয়। অবশেষে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্সের আলোকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সংসদ থেকে সদস্যদের পদত্যাগকে দীর্ঘ অনুপস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে ঐসব আসন শূন্য হয়ে পড়া এবং নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণের আবশ্যকতা তুলে ধরে মতামত প্রদান করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ১৯৯৫ সালের ২৪শে নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেন। ইতোমধ্যে প্রায় ১১ মাস অতিবাহিত হয়। বিস্তারিত Harun-or-Rashid, 'Role of Judiciary in Political Development', pp. 58-59; আরও Jalal Firoj, *Democracy in Bangladesh*, pp. 181-185

৪. বিরোধী দল ১৯৯৪ সালের ৩০শে মার্চ থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৯ মাস একটানা সংসদ বর্জন করে। এরপর ১৯৯৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বিরোধী দলীয় সদস্যগণ

www.pathagar.com

একযোগে পদত্যাগ করেন। এরও ১১ মাস পর (২৪শে নভেম্বর ১৯৯৫) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়।

৫. *আজকের কাগজ*, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১

৬. দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬ : নির্বাচনি ইশতেহার*

৭. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩৭৪

৮. এতে জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। ২৯শে জুন মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করা হলে জাসদ (রব)-এর প্রধান আ স ম আবদুর রব নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অন্তর্ভুক্ত হন।

৯. *সংবাদ*, ৭ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ১২; *ইত্তেফাক* ৭ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ২

১০. *ইত্তেফাক* ৭ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ২

১১. দ্রষ্টব্য *ইনকিলাব*, ৭ই মে ১৯৯৭, পৃ. ২; *ঐ*, ৮ই মে ১৯৯৭, পৃ. ৪

১২. জিল্লুর রহমান এ বিষয়ে তাঁর রিপোর্টে আরও বলেন, 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আমাদের এখন আর ফকির-মিসকিন হিসেবে অবজ্ঞা করতে পারছে না। সম্ভাব্য উদীয়মান শক্তি হিসেবে বিবেচনা করছে।' *ইনকিলাব*, ৮ই মে ১৯৯৭, পৃ. ৪

১৩. *ইনকিলাব*, ৮ই মে ১৯৯৭, পৃ. ৪

১৪. *ঐ*

১৫. *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভানেত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ* ১৯৯৭। এরপর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ১৯৯৭।

১৬. *আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ* ১৯৯৭

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে আরও বলেন, '... সেবকের মনোভাব নিয়ে দেশ পরিচালনার মাধ্যমে দেশ, জাতি ও জনগণের অগ্রগতি-সমৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্য, জাতীয় ঐকমত্য আমাদের ভিত্তি, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম ও জনগণের প্রতি ভালবাসা আমাদের পাথেয়, জনসমর্থন আমাদের শক্তি, সততা-দক্ষতা-সৃজনশীলতা সাধনা আমাদের সম্পদ, কথা-কাজের মিল আমাদের বৈশিষ্ট্য, শ্রম-মেধা আমাদের পুঁজি, আত্মত্যাগ-সাহস আমাদের ঐতিহ্য। আমরা অগ্রসর হতে চাই, বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে গর্বিত জাতি হিসাবে দাঁড়াতে চাই। এই প্রত্যয়ই এবারের কাউন্সিলের পবিত্র মঞ্চ থেকে ঘোষণা করছি। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।'

১৭. দ্রষ্টব্য *সংবাদ*, ৮ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ৮

১৮. *ইত্তেফাক*, ৮ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ১১

১৯. *সংবাদ*, ৮ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ৮; *ইত্তেফাক*, ৮ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ১১

২০. দ্রষ্টব্য *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র* ১৯৯৭

২১. *সংবাদ*, ৮ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ৮

২২. *ঐ*

২৩. *ইত্তেফাক*, ১০ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ২

২৪. গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা ২৯। *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র* ১৯৯৭

২৫. *সংবাদ*, ৮ই মে ১৯৯৭, পৃ. ১, ৮

www.pathagar.com

অধ্যায় : উনিশ

কাউন্সিল অধিবেশন ২০০২ : বিএনপি-জামায়াত চক্রের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী দলের ঐক্যের আহ্বান

১৯৯৭ সালের ৬-৭ই মে'র কাউন্সিল থেকে প্রায় ৫ বছর ৮ মাস শেষে ২৬শে ডিসেম্বর ২০০২ পল্টন ময়দানে একদিনব্যাপী আওয়ামী লীগের পরবর্তী ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও এর উদ্বোধন করেন দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান। খুবই বৈরী পরিবেশে এ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি-জামায়াত জোট তখন ১৪ মাস ধরে ক্ষমতায়। পাঁচ বছর সরকার পরিচালনার পর আওয়ামী লীগ পুনরায় বিরোধী দলে। ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর জোট সরকারের আমলে সারাদেশে প্রথম দিন থেকেই শুরু হয় 'রেইন অব টেরর' বা ভীতির রাজত্ব।[২] তা সত্ত্বেও, সবকিছু উপেক্ষা করে সারাদেশ থেকে কয়েক হাজার কাউন্সিলর, ডেলিগেট ও দলের নেতা-কর্মী কাউন্সিল অধিবেশনে যোগ দেয়। আওয়ামী লীগের জন্য এ কাউন্সিল আয়োজন ছিল বড়ো চ্যালেঞ্জ।

পটভূমি

পূর্ববর্তী (মে ১৯৯৭) ও বর্তমান কাউন্সিল (ডিসেম্বর ২০০২)-এর মধ্যবর্তী সময় ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের ৪ বছরের সামান্য অধিক এবং বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ১৪ মাসের শাসনকাল। এ সময়ের প্রধান ঘটনাবলির মধ্যে ছিল সরকার পরিচালনায় আওয়ামী লীগের ৫ বছরের পূর্তি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশের পুনঃপ্রত্যাবর্তন, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি (২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭), নিম্ন আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার (১৯৯৮), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারির স্বীকৃতি (১৭ই নেভেম্বর ১৯৯৯), খাদ্যে বাংলাদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, স্থানীয় সরকারে সরাসরি ভোটে নারীর প্রতিনিধিত্ব (১৯৯৭), ইসলামের নামে ধর্মীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর গোপন নেটওয়ার্ক সৃষ্টি ও দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী হামলা, ২০০০ সালের ২৩শে জুন পল্টন ময়দানে একদিনব্যাপী আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, সরকারের ৪ বছর পূর্তি ও দলের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন, ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন ৪-দলীয় জোটের সরকার গঠন, দুই যুদ্ধাপরাধীর[৩] মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি, রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ, ধর্মীয় জঙ্গি-সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর প্রতি জোট সরকারের আনুকূল্য, আওয়ামী লীগ, সংখ্যালঘু ও প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গের ওপর জোট সরকারের নজিরবিহীন নির্যাতন-নিষ্পেষণ, 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' কনভেনশন (১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি

www.pathagar.com

২০০২), ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীর হামলায় আমেরিকার টুইন-টাওয়ার ধ্বংস ইত্যাদি।

১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে বিজয় লাভ করে ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকার ৫ বছরের মেয়াদ সফলভাবে পূর্ণ করে ২০০১ সালের ১৫ই জুলাই বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়। দীর্ঘ সময়ের পর অবশেষে সরকার পরিচালনার সুযোগ লাভ করায় শেখ হাসিনা এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জসমূহ কী হতে পারে, সে সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। তাই, শুধু আসন সংখ্যা বৃদ্ধির[৪] উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, '৯৬-র নির্বাচন উপলক্ষ্যে গৃহীত ২১-দফা ইশতেহারের অঙ্গীকার অনুযায়ী[৫] নীতিগতভাবেই তিনি সমমনা অন্য দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন করেছিলেন, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ঐকমত্যের সরকার'। সংসদের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-কেও তাতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু বিএনপি ঐ ডাকে সাড়া না দিয়ে উল্টো সরকারের সর্বাত্মক বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়।

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর থেকে বাংলাদেশ '৭৫-পরবর্তী পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ভাবধারা থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে আসতে শুরু করে। এক কথায়, তাঁর সরকারের আমলকে (১৯৯৬-২০০১) '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনা ও আদর্শের পুনঃপ্রত্যাবর্তন (Restoration of the Ideals of War of Liberation) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের অর্জন ছিল খুবই ঈর্ষণীয়।[৬] আইনের শাসন ও মানবতাবিরোধী কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইন বাতিল (নভেম্বর ১৯৯৬) এবং ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি (ডিসেম্বর ১৯৯৬)-র কথা পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রায় দু-দশক ধরে দেশের পার্বত্য অঞ্চলে চলে আসছিল পাহাড়ি ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ। উভয় পক্ষে প্রচুর প্রাণ ও সম্পদহানি ঘটে। প্রায় ৫৫ হাজার পাহাড়ি অধিবাসী পার্শ্ববর্তী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব হুমকির মুখে পড়ে। এমনই এক অবস্থায় শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পরপর পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর পক্ষে সশস্ত্র লড়াইয়ে নিয়োজিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি-র সঙ্গে নতুন করে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই সফল পরিণতি ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম 'শান্তিচুক্তি'। এর ফলে সেখানে দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটে।[৭] বর্তমানে সেখানে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে।

বহুদিন ধরে বাংলাদেশ ছিল খাদ্য ঘাটতির দেশ। এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল বছরে গড়ে ৩০ লক্ষ টন। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর কৃষি উপকরণে ভর্তুকি এবং কৃষি ও কৃষক বান্ধব অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করায় বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতি কাটিয়ে এই প্রথম খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়, যা দেশে-বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়। তাঁর সরকারের ৫ বছর গড় প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৫.৮৩ শতাংশ।

www.pathagar.com

তাছাড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যথা হতদরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত, গৃহহীন দুস্থ, অসহায় মানুষের জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের যোগানসহ সামাজিক নিরাপত্তামূলক নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে শেখ হাসিনার সরকার অনেক প্রশংসা অর্জন করে।

দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাদের উন্নয়নে শেখ হাসিনার সরকার যেসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এর পূর্বে কোনো সরকার তা করেনি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ পদক্ষেপ, ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন[৮], রাষ্ট্রীয় ও সরকারি উচ্চ পদে নারীদের আসীন ইত্যাদি।

১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ২১-দফা ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল জাতীয় সংসদকে রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা। সে অনুযায়ী তাঁর সরকার মন্ত্রীদের স্থলে সরকারি দল-বিরোধী দল নির্বিশেষে সংসদ সদস্যদের সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রীর সপ্তাহে একদিন প্রশ্ন-উত্তর পর্ব, ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারি স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের মহান ভাষা-শহীদ দিবস। পাকিস্তানি শাসন আমলে ১৯৫২ সালে এদিন বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গুলিতে বেশ কয়েকজন ছাত্র প্রাণ হারান। শেখ হাসিনার তখনকার সরকারের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কো বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখার অধিকারের প্রতীক হিসেবে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দান করে, যা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অনেক মর্যাদা ও গৌরবের বিষয়।

এসময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নিম্ন আদালতে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারশেষে রায় ঘোষণা। ১৯৯৮ সালের ৮ই নভেম্বর ঢাকার দায়রা জজ গোলাম রসুল দীর্ঘ শুনানি শেষে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আসামিদের মধ্যে ১৫ জনের 'ফায়ারিং স্কোয়াডে' মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেন। এরপর মামলাটি উচ্চ আদালতে গেলে ২০০০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বিচারপতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও এ বি এম খায়রুল হকের দ্বৈত বেঞ্চ এক বিভক্ত রায়ে প্রথম জন ১০ আসামির এবং দ্বিতীয় জন ১৫ আসামির ফাঁসির আদেশ বহাল রেখে ফায়ারিং স্কোয়াডের পরিবর্তে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রায় কার্যকরের নির্দেশ দেন। পরবর্তী বছর ৩০শে এপ্রিল তৃতীয় বিচারপতি মো. ফজলুল করিম ১২ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে রায় দেন। এরপর ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতাসীন হলে বিচারকার্য ঝুলে যায়।[৯]

১৯৭৯-৮০ সালে আফগানিস্তানে অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি, এর বিরুদ্ধে ধর্মভিত্তিক আফগান তালেবানি শক্তির উত্থান, অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো বাংলাদেশ থেকেও একটি বিশেষ মহলের লোকজনের সেখানকার প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ওসামা-বিন লাদেনের[১০] নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা সৃষ্টি, এদের হাতে ৯ই সেপ্টেম্বর ২০০১ আমেরিকার টুইন-

www.pathagar.com

টাওয়ার ধ্বংস (যা ৯/১১ ট্র্যাজেডি হিসেবে বিশ্বজুড়ে পরিচিত) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাৎক্ষণিক 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' (War on Terror) ঘোষণা ইত্যাদি ঘটনা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশে ইসলাম বা ধর্মের নামে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশও এর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। এভাবে প্রধানত ৯০-এর দশক থেকে এদেশে জামা'তুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), জাগ্রত মুসলিম জনতা, আনসারুল্লাহ বাংলা টীম, হরকাত-উল জিহাদ (হুজি), হিজবুত তাহরীর, আল-জিহাদ বাংলাদেশ, আল্লাহর দল ব্রিগেড ইত্যাদি নামে বহু জঙ্গিগোষ্ঠী ও তাদের নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে।[১১] শেখ হাসিনার সরকারের (১৯৯৬-২০০১) সময়ই এরা বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে থাকে। এ ক্ষেত্রে তারা সে সময় শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের সর্বাত্মক বিরোধিতায় অবতীর্ণ বিএনপি ও জামায়াতের পক্ষ থেকে এক ধরনের সমর্থন ও আশ্রয়-প্রশ্রয় পায় বলে মনে করা হয়। খুলনায় আহমদিয়া মসজিদে (১৯৯৯), পল্টনে সিপিবি-র জনসভায় (২০০১), ঢাকার রমনা বটমূলে ১লা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে (২০০১), গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরের বানিয়ারচর খ্রিষ্টান চার্চে (২০০১), নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে (২০০১), ময়মনসিংহের সিনেমা হলে (২০০২) সন্ত্রাসী আক্রমণ ও হতাহতের ঘটনার মূলে ছিল এরাই। একই চক্র ২০০০ সালের ২০শে জুলাই শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে কোটালিপাড়ায় তাঁর জনসভা স্থলে ৭০ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে রেখেছিল।

২০০১ সালের ১লা অক্টোবর বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতাসীন হয়। নির্বাচনে পূর্বের ন্যায় মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল দুই প্রধান দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-র মধ্যে। উভয় দল বিস্তারিত নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে। আওয়ামী লীগ এতে ৫ বছর তাদের সরকার পরিচালনায় সাফল্যের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে। পক্ষান্তরে, বিএনপি তার ইশতেহারে আওয়ামী লীগ সরকারের ৫ বছরের শাসনামলের কঠোর সমালোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ দলের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। তবে নির্বাচনি ফলাফলের ওপর এ-সব ইশতেহারের গুরুত্ব খুব কমই ছিল বলে মনে হয়।

বিএনপি এবার ১৯৯৬ সালের মতো এককভাবে না দাঁড়িয়ে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (নাজিউর রহমান) এবং শাইখুল হাদিস আজিজুল হক ও ফজলুল হক আমিনী'র নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে ৪-দলীয় ঐক্যজোট গঠন করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র ৬২টি আসন লাভ করে, যদিও ভোট পায় প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪০.১৩ ভাগ। অপরদিকে, বিএনপি এককভাবে ২৫২ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৯৩টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪০.৯৭ ভাগ লাভ করে।[১২] ৪-দলীয় জোটের অন্য ৩ শরিক দল[১৩] ৪৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৩টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬.০৮ ভাগ পায়। জামায়াত-বিএনপি ৪-দলীয় জোট সব মিলিয়ে ৩০০টির মধ্যে ২১৬টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৭.০৫ ভাগ লাভ করে। নির্বাচনের এ ফলাফল, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের মাত্র ৬২টি আসন লাভ দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের তো বটেই, এর

www.pathagar.com

বাইরে অনেককে বিস্মিত করে। গত নির্বাচনে (১৯৯৬) আওয়ামী লীগ এককভাবে সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৪৬টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৭.৫৬ ভাগ লাভ করেছিল। এবার আওয়ামী লীগের ভোট শতকরা ২.৬০ ভাগ বৃদ্ধি পায় বটে, তবে আসনসংখ্যা পূর্বের থেকে ৮৪টি হ্রাস পায়। এর নানা ব্যাখ্যা থাকতে পারে। দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় নির্বাচনে চরম অনিয়ম, সন্ত্রাস, ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করা, বহু স্থানে সূক্ষ্ম কারচুপি, আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের প্রতি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বৈরী আচরণ, আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিচিত সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও ভোট কেন্দ্রে আসা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র[১৪] ইত্যাদিকে আওয়ামী লীগের এরূপ বিপর্যয়কর ফলাফলের জন্য দায়ী করা হয়। এও বলা হয় যে, নির্বাচনের ফলাফলে 'বাংলার জনগণের প্রকৃত মতামত' প্রতিফলিত হয়নি।[১৫] দলের মধ্যে অনৈক্য, কোথাও-কোথাও ভেতর থেকে দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা, দীর্ঘ ২১ বছর প্রতীক্ষা শেষে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যাশা অনুযায়ী দলীয় কর্মীদের প্রাপ্তিযোগ না হওয়ায় তাদের মধ্যে হতাশা, আবার কোথাও কর্মীদের বাড়াবাড়ি—এমন ঘটনাও ছিল। অধিকন্তু যেটিকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে হয় তা হচ্ছে, একদিকে আওয়ামী লীগের এককভাবে নির্বাচন করা, অন্যদিকে, এর বিপরীতে আওয়ামী লীগ-বিরোধী প্রায় সকল শক্তি ও মহল আওয়ামী লীগের নৌকা ঠেকাতে ঐক্যবদ্ধ হয়, যা ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ছিল না। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, ২০০১ সালের নির্বাচনের ফলাফল যে স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। অন্তত ৫ বছরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার সরকারের সাফল্য বিবেচনায় দলটির নিঃসন্দেহে আরও ভালো ফল করার কথা।

১লা অক্টোবরের নির্বাচনের ৯ দিন পর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত জোট সরকারে দুই যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ-এর অন্তর্ভুক্তি সাধারণ জনগণ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকলকে মারাত্মকভাবে বিক্ষুব্ধ করে। যারা স্বয়ং এবং যাদের দল জামায়াতে ইসলামী ও তখন তাদের সৃষ্ট বিভিন্ন সশস্ত্র প্রাইভেট বাহিনী (রাজাকার, আলবদর, আলশামস) বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করে, যারা হানাদার বাহিনীর সঙ্গে বাঙালিদের ওপর গণহত্যায় লিপ্ত হয়, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নস্যাৎ করতে মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে এদেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের বাসা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে বধ্যভূমিতে অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে হত্যা করে, তাদের গাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের প্রতি এর চেয়ে অপমান, অবমাননা আর কী হতে পারে।

কার্যত সরকার গঠনের দিন থেকেই প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ, এর সমর্থক, সংখ্যালঘু, প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ সবার ওপর নেমে আসে বিএনপি-জামায়াতের চরম নির্যাতন-নিপীড়ন, যা সমূলে 'গোষ্ঠী উচ্ছেদ' বা এথনিক ক্লিনজিং-এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, অথচ বিএনপি-র নির্বাচনি ইশতেহারে অন্যতম অঙ্গীকার ছিল 'সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ ও জীবন' গড়ে তোলা।[১৬] অবাধে চলে গ্রেপ্তার, হত্যা, খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি,

www.pathagar.com

লুটপাট, দখলদারিত্ব। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের প্রথম ১৪ মাসে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি, শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব ও দলের কেন্দ্রীয় নেতা সাবের হোসেন চৌধুরী, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুকুল বোস, সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সাবেক প্রতিমন্ত্রী তালুকদার আবদুল খালেক, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় হুইপ মোস্তফা রশিদী সুজাসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের ৬০ সহস্রাধিক নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হন বলে দলের শীর্ষপর্যায় থেকে দাবি করা হয়।[১৭] আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র (সিআরআই) সিল করে দেওয়া হয়। বিএনপি-জামায়াত-এর সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে খুন হয় আওয়ামী লীগ কর্মী কনক, ভুট্টো, সোহেল, জামাল, দুলু, আজমসহ অন্তত কয়েক হাজার। সন্ত্রাসীদের গুলিতে পিতার কোলে নিহত হয় ৪ বছরের নিষ্পাপ শিশু নওশীন। বিএনপি-র ছাত্র সংগঠনের দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে প্রাণ হারায় বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন নাহার সানি। শিশু, কিশোর, বৃদ্ধা নির্বিশেষে অসংখ্য নারী এদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়। গ্যাং রেপের মতো পৈশাচিক ঘটনাও ঘটে। লাঞ্ছনার গ্লানি মুছতে কেউ-কেউ বেছে ন্যায় আত্মহত্যার পথ। দেশের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র ক্যাডারদের নির্মম অত্যাচারের শিকার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন প্রাণভয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়।[১৮]

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের রুদ্ররোষ থেকে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সিভিল সোসাইটির সদস্য কেউ রেহাই পায়নি। জনপ্রিয় প্রাইভেট টেলিভিশন 'একুশে টিভি' বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের পক্ষের সাহসী ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিংকে বাংলাদেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়। লেখক, সাংবাদিক ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট কলাম লেখক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, সাংবাদিক সালিম সামাদ, ঢাকাস্থ রয়টার্সের অন্যতম সংবাদদাতা এনামুল হক, এনজিও কর্মী পিসিলা রাজ এদের গ্রেপ্তার করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুলিশি অভিযান ও ছাত্রীদের গ্রেপ্তারের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা জোট সরকারের এ সময়েই ঘটে।

গ্রেপ্তার, নির্যাতন, প্রাণহানি এমনি পর্যায়ে পৌঁছে যে, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং যে-কোনো সময় গ্রেপ্তার, প্রাণনাশ কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র মামলা দায়ের এরূপ আশঙ্কা করতে থাকেন।[১৯] দেশের সার্বিক এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বিচারপতি কে এম সোবহানকে আহ্বায়ক এবং ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলামকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে গঠিত ৫৪৯ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন চত্বরে প্যান্ডেল তৈরি করে ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০২ দুদিনব্যাপী 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' (Crime Against Humanity) শীর্ষক জাতীয় কনভেনশন আয়োজন করা হয়।[২০] উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদে বিরোধী দলের নেতা ও

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ভারত, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিগণও এতে যোগ দেন।[২১] সারাদেশ থেকে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ও তাদের দলীয় সশস্ত্র ক্যাডারদের নির্মম নির্যাতনের শিকার কিছুসংখ্যক নারী, পুরুষ, ছাত্র, যুবক, সংখ্যালঘু, আওয়ামী লীগের কর্মীদের এ কনভেনশনে হাজির করা হয়েছিল। তাদের মুখের করুণ বর্ণনা আর শারীরিক নির্যাতনের চিহ্ন সব নিয়ে সেখানে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের সৃষ্টি হয়, যা ভাষায় বর্ণনাতীত। এছাড়া বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ১৪ মাসের শাসন আমলের অত্যাচার-নির্যাতনের বিভিন্ন কাহিনি, রূপ ও অভিজ্ঞতার বর্ণনাসহ সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি ১৬টি প্রবন্ধে দেশের বিশিষ্টজন কনভেনশনে তুলে ধরেন।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের এ সময়ের শাসনকালে নতুন করে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি অফিস আদালত থেকে নামিয়ে ফেলা হয়। বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার নামাঙ্কিত বিভিন্ন সেতু, স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ হাসিনার সরকারের সময় নির্মাণাধীন মুক্তিযুদ্ধের 'বিজয়স্তম্ভ', বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার ইত্যাদির কাজ স্থগিত হয়ে যায়। পুনরায়, শেখ হাসিনার সরকারের আমলে হাইকোর্টে ফাঁসির আদেশ প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার প্রক্রিয়া জোট সরকারের অসহযোগিতার কারণে[২২] আপিল বিভাগে গিয়ে ঝুলে যায়।

এ সময়ের অপর একটি ঘটনা হলো প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র তারেক রহমান[২৩] ঢাকার গুলশানে 'হাওয়া ভবন' নামে একটি ব্যক্তিগত অফিস খুলে সেখান থেকে কার্যত সরকারের সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে শুরু করে। বদলি, নিয়োগ, ঠিকাদারি, টেন্ডার, ব্যবসা, কমিশন ইত্যাদি নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সেখান থেকে নেওয়া হতো, যা লোকজনের মুখে-মুখে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। উপরন্তু জোট সরকার বিশিষ্ট চিকিৎসক, জেনারেল জিয়ার ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত, বিএনপি-র প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব এবং তাদেরই মনোনীত রাষ্ট্রপতি ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে জেনারেল জিয়ার কবরে ফুল দিতে না যাওয়ার কারণে ৭ মাসের মাথায়[২৪] অত্যন্ত অপমানজনকভাবে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয় যা তখন দেশে খুবই সমালোচিত হয়।

সাংগঠনিকভাবে ২০০০ সালের ২৩শে জুন দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিন আওয়ামী লীগ একটি বিশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠান করে নিয়মিত কাউন্সিলের সময় বর্ধিত করিয়ে নেয়। তখন দল ক্ষমতায়। এর এক বছর পর ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ঐ নির্বাচনে ক্ষমতার পরিবর্তন এবং নির্বাচনোত্তর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অধীনে আওয়ামী লীগকে প্রতিপক্ষ ধরে সারাদেশে যে চরম বৈরী অবস্থার সৃষ্টি করা হয় (যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে), তাতে দলের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত করা কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বিশেষ করে এর সভানেত্রী শেখ হাসিনা এ ব্যাপারে ছিলেন অনড়। তাঁর কথায় :[২৫]

> ওরা ভীত-সন্ত্রস্ত করে আমাকে ঘরে বসিয়ে রাখতে চায়। ওরা আওয়ামী লীগ কর্মীদের হতোদ্যম করে আন্দোলনের আগুন থেকে বাঁচতে চায়। কিন্তু আবারো

www.pathagar.com

ঘোষণা করছি, জনগণের কাছ থেকে কেউ আমাকে, আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। মৃত্যু ভয়ে আমরা কেউ ঘরে বসে থাকব না। প্রয়োজনে পিতার মতো বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে হলেও এই দুঃশাসনের অক্টোপাস বন্ধন থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করবোই ইনশাআল্লাহ।

তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'আপাতত জেলা ও অন্যান্য স্তরের কাউন্সিল করা সম্ভব না হলেও ত্রি-বার্ষিক জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবেই।'[২৬] প্রথম দিকে সিদ্ধান্ত ছিল ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর দুইদিন কাউন্সিল হবে। কিন্তু সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত ভিন্ন তারিখে একদিনের জন্য তা করতে হয়। এরূপ জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও সাংগঠনিক অবস্থায় ২৬শে ডিসেম্বর ২০০২ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল অধিবেশন

যথা সময়ে নিয়মিত কাউন্সিল অনুষ্ঠিত করতে না পারায় ২০০০ সালের ২৩শে জুন একদিনব্যাপী পল্টন ময়দানে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। একই অনুষ্ঠানে দলের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও আওয়ামী লীগ সরকারের ৪ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হয়। ঐ বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে পরবর্তী নিয়মিত কাউন্সিল অনুষ্ঠানে সময় ২ বছর বর্ধিত করে নেওয়া হয়।[২৭] সে অনুযায়ী ২৬শে মার্চ ২০০২ সকালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে নির্মিত প্যান্ডেলে দলের একদিনের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। তিনিই ছিলেন এর উদ্বোধক। এ কাউন্সিল উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পূর্বে ১৫টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। অভ্যর্থনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু। ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ-কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন দলের প্রবীণ নেতা আবদুস সামাদ আজাদ। সারাদেশ থেকে ১০ হাজার কাউন্সিলর-ডেলিগেট এবং সমসংখ্যক নেতা-কর্মী উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেন। ৪টি রাজনৈতিক দল যথা জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্য জোট, জাতীয় পার্টি (নাজিউর রহমান) ও কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী ও কূটনীতিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সরকারের সচিব, তিন বাহিনী প্রধান, পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এবার কাউন্সিলে আমন্ত্রণ না জানানোর সিদ্ধান্ত হয়।

দলের সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রচুর লোকসমাগম হয়। পল্টনে নির্মিত প্যান্ডেলের চতুর্দিকে ছিল উপচেপড়া ভিড়।[২৮] মঞ্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার ছবি রক্ষিত ছিল। দুই পাশে ছিল জাতীয় চার নেতা, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ ফজলুল হক মনির প্রতিকৃতি। সম্মেলনের মূল আহ্বান ছিল : 'জেগে ওঠো বাংলাদেশ'।

প্রতিবারের মতো শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির কপোত উড়িয়ে দেওয়া, দলের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ও সাংগঠনিক জেলাসমূহের

www.pathagar.com

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকদের সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের বেলুন উড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরিবেশন করা হয় জাতীয় সংগীত। এরপর মঞ্চে নেতৃবৃন্দ আসন গ্রহণ করলে শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মূল কর্মসূচি। প্রথমেই পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ, যা সব সময়েই করা হয়ে থাকে। তারপর ছিল 'ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা' এবং 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' এ দুটি গানের সঙ্গে মঞ্চের সম্মুখে শিশুদের নৃত্য পরিবেশন। এটি শেষ হলে দলের অন্যতম যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের অন্যান্য শহিদ, চার জাতীয় নেতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যাঁরা গত কাউন্সিলের পর মৃত্যুবরণ করেছেনে, তাঁদের স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা উপ-পরিষদের চেয়ারম্যান আমির হোসেন আমু স্বাগত ভাষণ রাখেন।

কাউন্সিলে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, চিন, রাশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা বক্তব্য[২৯]

কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশনে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-র সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, সাম্যবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবু হামেদ শাহাবুদ্দিন, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, জাসদ (রব)-এর সভাপতি নূরে আলম জিকু এবং জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)-র সাধারণ সম্পাদক শেখ শহীদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। জাতীয় পার্টি (এরশাদ)-র চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ উপস্থিত না হয়ে একটি শুভেচ্ছা বাণী পাঠান। এছাড়া চীনের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে পাঠানো শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

সিপিবি-র সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান তাঁর বক্তব্যে দেশের সামনে তিনটি 'ভয়াবহ বিপদ'-এর কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে সেগুলো হচ্ছে (এক) বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ 'লুণ্ঠন'সহ এদেশের ওপর 'মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদ'-এর আধিপত্য বিস্তারের চক্রান্ত, (দুই) জোট সরকারের মন্ত্রিসভায় দুজন 'স্বাধীনতা-বিরোধী রাজাকার'-এর অন্তর্ভুক্তি, যারা 'দেশকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে নিয়ে যেতে চায়', (তিন) দেশে স্বৈরতন্ত্রের স্থায়ী রূপ লাভের চেষ্টা। এরপর তিনি বলেন, 'এ তিন ভয়াবহ বিপদ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। প্রয়োজনে আরেক গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশকে বিপদমুক্ত করব।' রাশেদ খান মেনন তাঁর বক্তব্যে দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'দেশে বিএনপি-জামায়াত জোটের মাধ্যমে দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান ঘটেছে। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কোন বিকল্প নেই।' গণফোরামের সাইফুদ্দিন আহমদ

www.pathagar.com

মানিকও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়নে যে যেখানেই থাকি না কেন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' জাসদের হাসানুল হক ইনু তাঁর বক্তব্যে স্বৈরাচারী এরশাদ, রাজাকার নিজামী ও আওয়ামী লীগের 'একলা চলো নীতি'র সমালোচনা করে বলেন, 'আমরা অপশক্তিকে ছাড় দিতে চাই না, একলা চলো নীতিও চাই না।' বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশে গণতন্ত্র টিকবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়াছে। ইতোমধ্যেই তারা দেশকে বিষিয়ে তুলেছে। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)-র শেখ শহীদুল ইসলাম আওয়ামী লীগের প্রশংসা করে বলেন, 'ক্ষমতায় থাকুক বা না-ই থাকুক, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক–এ কথা অস্বীকার করা যায় না।'

শেখ হাসিনার ভাষণ

কাউন্সিল অধিবেশন একদিনের হওয়ায় উদ্বোধনী অধিবেশনেই শেখ হাসিনা তাঁর মূল ভাষণ প্রদান করেন। এটি ছিল ৩৮ পৃষ্ঠার ছাপানো বক্তব্য। দুপুর ১২টা ২৫ মিনিটে শুরু করে ১ টা ১০ মিনিট পর্যন্ত ৪৫ মিনিট সময় তিনি নেন। তাঁর ভাষণের মূল কথা ছিল, বিএনপি-জামায়াত অশুভচক্রের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল রাজনৈতিক দল ও শক্তির ঐক্য। জোট সরকারের অত্যাচার, নির্যাতন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সকলের প্রতি প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনিই জোরালো কণ্ঠে উচ্চারণ করেন : 'জেগে ওঠো বাংলাদেশ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও।'

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে যেসব কথা বলেন এবং যেসব প্রসঙ্গ তুলে ধরেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : 'এক ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে এই কাউন্সিল', 'অদ্ভূত এক আঁধার' বাংলাদেশের বুকে চেপে বসেছে, 'ষড়যন্ত্র, ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে প্রচণ্ড এক বৈরী পরিবেশে' কাউন্সিলে উপস্থিতির জন্য নেতা-কর্মী-কাউন্সিলর-ডেলিগেটদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন, কারাগারে যারা বন্দি তাদের প্রতি 'সংগ্রামী অভিনন্দন ও রক্তিম শুভেচ্ছা', 'অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে' কাউন্সিলে সমবেত সকলের সামনে তাঁর উপস্থিত হওয়ার কথা, 'যারা স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকার হারিয়ে বিএনপি-জামায়াত জোটের নৃশংস ঘাতকদের হাতে গত ২০০১ সালের ১৫ই জুলাইয়ের পর নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন' তাদের স্মরণ, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একমাত্র তাঁর সরকারের ৫ বছরের মেয়াদ পূরণ করে দেশে নজির স্থাপন, ১৫ই জুলাই ২০০১ 'গণতন্ত্রের বিজয় উৎসব' শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তর, ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচন ও তাতে যা ঘটে, নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ, আওয়ামী লীগ গত নির্বাচনের (১২ই জুন ১৯৯৬) চেয়ে ভোট পেয়েছে বেশি কিন্তু আসন পেয়েছে অবিশ্বাস্যভাবে কম (মাত্র ৬২টি), 'নির্বাচনের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়নি বাংলার জনগণের প্রকৃত মতামত ও রায়', 'নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ঠেকাতে বিএনপি-জামায়াত জোটের যোগসাজশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর ভূমিকা', 'শপথ গ্রহণের পর মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের সংবিধানের বিধি

www.pathagar.com

লঙ্ঘন করে ১৩ জন সচিবের বদলির আদেশ, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর আওয়ামী লীগ-বিরোধী ভূমিকা, নির্বাচনের কয়েকদিন আগ থেকে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, সমর্থক, সংখ্যালঘু ভোটারদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হামলা, গ্রেপ্তার, নির্যাতন, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, নির্বাচনের দিন আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিচিত সংখ্যালঘুদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধাদান, নির্বাচনের আগের দিন রাতেই বিএনপি-র প্রতীক ধানের শীষে সিল মেরে বাক্স পূর্ণ করা, প্রশাসনের ছত্রছায়ায় বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডারদের ভোট কেন্দ্র দখল, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত সদস্যদের কর্তৃক নৌকার এজেন্টদের জোর করে বের করে দেওয়া, বিএনপি-জামায়াত সমর্থক প্রিসাইডিং অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ও তাদের পক্ষপাতমূলক আচরণ, সর্বোপরি 'মিডিয়া ক্যু'র মাধ্যমে অনেক জায়গায় ফলাফল পাল্টে দেওয়া, নিজ দলের (আওয়ামী লীগ) দুর্বলতা যেমন অপ্রতুল প্রচারণা, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য, বিদ্রোহী প্রার্থী থাকা প্রভৃতি বিষয়েরও উল্লেখ, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ঠেকাতে মহলবিশেষ কর্তৃক যা-যা করা হয়েছে এবং যেভাবে করা হয়েছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত এবং আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র দ্বারা প্রকাশিত প্রামাণ্য দালিলিক গ্রন্থ 'কারচুপির নির্বাচন অবৈধ সরকার/বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাচন ২০০১' প্রত্যেককে দেখার সুপারিশ, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ১৪ মাসের শাসনকালে 'সারাদেশে এক ত্রাসের রাজত্ব' কায়েম হওয়া, দলের কেন্দ্রীয় নেতাসহ সমগ্র দেশে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের ৬০ সহস্রাধিক নেতা-কর্মীর গ্রেপ্তার হওয়া, তিনি (শেখ হাসিনা)সহ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে 'আড়াই লক্ষাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের', বিএনপি-জামায়াত জোটের সশস্ত্র ক্যাডারদের হাতে সারাদেশে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হত্যা, খুনের ঘটনা, জোটের ক্যাডারদের দেশব্যাপী সন্ত্রাস, ধর্ষণ, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, চাঁদাবাজি ও দখলদারিত্ব, পিতার কোলে শিশু হত্যা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, হল দখল, বুয়েটে সানি হত্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে গভীর রাতে পুলিশি অভিযান ও ছাত্রীদের ওপর নির্যাতন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক, এনজিও কর্মীদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন, দেশে তালেবানপন্থি ধর্মীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান এবং বিভিন্ন স্থানে এদের সন্ত্রাসী হামলা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গিবাদের উত্থান, সাম্প্রদায়িক জঙ্গিদের হাতে বৌদ্ধ ধর্মগুরু, হিন্দু পুরোহিত হত্যা, দেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার তাঁর (শেখ হাসিনা) গাড়িবহরে হামলা, তাঁর (শেখ হাসিনা) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য সংসদে পাস করা আইন জোট সরকার কর্তৃক বাতিল, নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কা, জোট সরকারের অত্যাচার-নির্যাতন, দুঃশাসন ও তাদের আশীর্বাদপুষ্ট সশস্ত্র ক্যাডারদের হত্যা, খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা এবং 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' শীর্ষক জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠান, উচ্চ আদালতে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর ক্ষেত্রে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অসহযোগিতা, জেল হত্যার বিচারের আসামিদের জামিনে ছেড়ে দেওয়া, বাংলাদেশের পুনরায় ৭৫-পরবর্তী হত্যা, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরতন্ত্রের ধারায়

www.pathagar.com

ফিরে যাওয়া, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্তম্ভ ও স্থাপনার নির্মাণ কাজ জোট সরকার কর্তৃক বন্ধ করা, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের 'হাওয়া ভবন' ও দ্বৈত শাসন কায়েম, তাঁর (শেখ হাসিনা) সরকারের ৫ বছরের আমলে অর্জিত সাফল্য (পরিশিষ্ট আকারে), আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বর্ষ এবং জোট সরকারের বর্তমান সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যের তুলনামূলক চিত্র, সরকারের উদ্দেশে ১১-দফা আহ্বান,[৩০] কাউন্সিল শেষে এলাকায় ফিরে গিয়ে নেতা-কর্মীদের করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশনা, বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন এবং ভয়-ভীতি, জেল-জুলুম মোকাবিলা করে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর পরামর্শ ইত্যাদি।

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের চরিত্র তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সকল দল ও শক্তিকে এদের প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে বলেন :

> মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিরোধী, দেশ-বৈরী, জাতি-বৈরী, সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তা-বিরোধী গণতন্ত্রের লেবাসধারী এই ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্রী সরকারকে হটাতে না পারলে বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের গৌরব, সভ্যতা এবং সকল অর্জন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তাই এই ঐতিহাসিক ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের মঞ্চ থেকে স্বাধীনতা, মানবিকতা, গণতন্ত্র ও মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী, দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে এই অশুভ-শক্তির বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানাই।[৩১]

নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত করতে আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ইতিহাস তুলে ধরে বলেন :

> ...লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মী-সমর্থক শুভানুধ্যায়ীর অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অকাতর আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আওয়ামী লীগ এগিয়ে চলেছে। আওয়ামী লীগ হচ্ছে বাংলার মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত সবচাইতে পরীক্ষিত বিশ্বস্ত দল। অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেলেও আওয়ামী লীগ চির তারুণ্যের প্রতীক। আওয়ামী লীগ মানে সামনে এগিয়ে চলা। আওয়ামী লীগ মানে পরাভব না মানা, মাথা নত না করা।[৩২]

তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন এই বলে, 'আগামী দিনের স্বপ্ন জয়ের এই সংগ্রামই হোক আজকের কাউন্সিল সভার দৃপ্তশপথ ও অঙ্গীকার। ভবিষ্যৎ আমাদেরই–বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।'[৩৩]

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, জেলা প্রতিনিধিদের বক্তব্য, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধন, নির্বাচন

একদিনের কাউন্সিল হওয়ায় আধা ঘণ্টা বিরতি দিয়ে একটানা সন্ধ্যা পর্যন্ত তা চলে। শেখ হাসিনার ভাষণের পর জিল্লুর রহমান সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন। এতে শেখ হাসিনার ভাষণের অনুরূপ ১লা অক্টোবরের (২০০১) নির্বাচনে পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগের বিজয় ঠেকানো, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দুঃশাসন, সারাদেশ জুড়ে হত্যা, খুন, সন্ত্রাস, নেতা-কর্মীদের হত্যা, নির্যাতন, গ্রেপ্তার ইত্যাদি বিষয় স্থান পায়।

www.pathagar.com

জিল্লুর রহমানের রিপোর্ট পেশের পর বিভাগ ও জেলার পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি এর ওপর বক্তব্য রাখেন। তাঁরা হলেন মোহাম্মদ হানিফ (ঢাকা) এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী (চট্টগ্রাম), মেজবাহ উদ্দিন সিরাজ (সিলেট), এ এইচ খায়রুজ্জামান লিটন (রাজশাহী), বীর বাহাদুর এমপি (বান্দরবন), আবু জাহিদ (হবিগঞ্জ), ফজলুল কাদের মজনু (ভোলা), ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু (বরগুনা), সাজেদুর রহমান (নাটোর), মমতাজউদ্দিন (বগুড়া) ও নাজিম উদ্দিন (ময়মনসিংহ)।[৩৪]

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধন

ঘোষণাপত্রে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। সময়ের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু কথা যুক্ত হয়। চার মূলনীতির অন্যতম 'সমাজতন্ত্র'র সঙ্গে 'শোষণমুক্ত সমাজ ও সামাজিক ন্যায় বিচার' 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র সঙ্গে 'সকল ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি' এবং 'জাতীয়তাবাদ'-এর আগে 'বাঙালি' এ কথাগুলো যুক্ত হয়।

গঠনতন্ত্রে যে-সব সংশোধনী আনা হয়, তা হচ্ছে :[৩৫]

১. কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ৬৭ জন থেকে ৭৩ জনে উন্নীত।
২. ধর্ম এবং বন ও পরিবেশ বিষয়ে নতুন দুটি সম্পাদকীয় পদ সৃষ্টি।
৩. একজন সাংগঠনিক সম্পাদকের স্থলে ৭ জন সাংগঠনিক সম্পাদক থাকার বিধান।
৪. উপদেষ্টা পরিষদ-এর সদস্য সংখ্যা ২১ থেকে বাড়িয়ে ৪১ জন করা।

গণতন্ত্রের কতিপয় অঙ্গীকার[৩৬]

১. রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যন্ত শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
২. সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন।
৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন।
৪. রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন।
৫. শিশু অধিকার রক্ষা এবং তাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা।
৬. দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকতর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও একটি শিল্প সমৃদ্ধ শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতির ভিত রচনা করা।
৭. জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা তথা ভাতের অধিকার নিশ্চিত করা।
৮. দীর্ঘ মেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৯. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারকে উৎসাহিত করা।

www.pathagar.com

১০. পঙ্গু, অসহায়, বিধবা, দরিদ্র বয়স্ক ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাসহ সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১১. পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক বনায়ন ও প্রাণী-বৈচিত্র্য রক্ষা।

নেতৃত্ব নির্বাচন

কাউন্সিলের অন্যান্য কার্যসূচি সম্পাদন শেষে বিকেলে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে নির্বাচনি পর্ব শুরু হয়। সভাপতি পদে তিনি যে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হবেন, সেটি নিশ্চিত ছিল। আলোচনা ছিল সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে। এ পদে পূর্ব থেকে ৩ জন তাঁদের প্রার্থিতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁরা হলেন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু ও আবদুল জলিল এবং যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। নির্বাচনের জন্য পূর্বে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেককে প্রধান করে ৩ সদস্যের একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এর অপর দুই সদস্য ছিলেন সুধাংশু শেখর হালদার ও মো. আবদুল হামিদ এডভোকেট।[৩৭]

পূর্ব-রীতি অনুযায়ী শেখ হাসিনা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে দলের বর্তমান কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে প্যান্ডেলে কাউন্সিলরদের সারিতে এসে আসন গ্রহণ করেন। এরপর মঞ্চ থেকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এ এস এইচ কে সাদেক মনোনয়ন আহ্বান করলে প্রবীণ নেতা ও প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ দলের সভানেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করেন। জিল্লুর রহমান, আমির হোসেন আমু, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত প্রমুখ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। শেখ হাসিনা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চমবারের মতো দলের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। এবার প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক পদে আবদুল জলিলের নাম প্রস্তাব করেন। শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও ওবায়দুল কাদের তা সমর্থন করেন। অন্য কোনো প্রার্থী না থাকায় তিনিও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ পর্যায়ে নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মঞ্চে আসন গ্রহণ করলে বিপুল করতালি দিয়ে তাঁদের সংবর্ধিত করা হয়। অতঃপর শেখ হাসিনা সভাপতিমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলীসহ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। কার্যনির্বাহী কমিটির ৬টি সম্পাদকীয় পদ ও সদস্য পদগুলো খালি রাখা ছিল। সভাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনাক্রমে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দুদিনের মধ্যে কমিটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।[৩৮] নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন :

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য	:	সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন
		আবদুস সামাদ আজাদ
		জিল্লুর রহমান
		বেগম সাজেদা চৌধুরী

www.pathagar.com

		আমির হোসেন আমু
		আব্দুর রাজ্জাক
		তোফায়েল আহমেদ
		সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
		বেগম মতিয়া চৌধুরী
		ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর
		কাজী জাফর উল্লাহ
		আতাউর রহমান খান (কায়সার)
		শেখ ফজলুল করিম সেলিম
সাধারণ সম্পাদক	:	মো. আবদুল জলিল
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	:	ওবায়দুল কাদের
		সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
		মুকুল বোস
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	সাবের হোসেন চৌধুরী
		আবদুল মান্নান
		আখতারুজ্জামান
		সুলতান মো. মনসুর আহমেদ
		মাহমুদুর রহমান মান্না
		আবদুর রহমান
		বীর বাহাদুর*
দপ্তর সম্পাদক	:	এডভোকেট আবদুল মান্নান খান
উপ-দপ্তর সম্পাদক	:	বি এম মোজাম্মেল হক
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	:	নূহ-উল-আলম লেনিন
প্রচার সম্পাদক	:	আসাদুজ্জামান নূর
উপ-প্রচার সম্পাদক	:	অসীম কুমার উকিল
অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক	:	আধ্যাপক আলী আশরাফ
আইন বিষয়ক সম্পাদক	:	এডভোকেট সাহারা খাতুন
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	:	সৈয়দ আবুল হোসেন
শিক্ষা ও মানবসম্পদ সম্পাদক	:	নুরুল ইসলাম নাহিদ
কৃষি সম্পাদক	:	ড. আবদুর রাজ্জাক
শ্রম সম্পাদক	:	হাবিবুর রহমান সিরাজ
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	:	শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক	:	দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুটুল
বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক	:	ড. হাসান মাহমুদ
শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক	:	কর্নেল (অব.) ফারুক খান

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সম্পাদক	:	ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	:	ইয়াফেস ওসমান
মহিলা সম্পাদিকা	:	বেগম আইভি রহমান
ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	নাজমা রহমান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	আলমগীর কুমকুম
কোষাধ্যক্ষ	:	এইচ এন আশিকুর রহমান

* পরবর্তীতে অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়।

কার্যনির্বাহী সদস্য : মোহাম্মদ হানিফ, মোহাম্মদ নাসিম এমপি, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, শুধাংশু শেখর হালদার, অধ্যাপক মোহাম্মদ হানিফ, রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু এমপি, আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন এমপি, বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, মির্জা সুলতান রাজা, আখতারুজ্জামান চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, তালুকদার আবদুল খালেক এমপি, মোস্তাফা রশিদী সুজা, মোস্তফা কামাল (লোটাস), মো. ওমর আলী, রহমতউল্লাহ, হাবিবুর রহমান মোল্লা, এডভোকেট ফজলে রাব্বী, হাবিবুর রহমান খান, শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু, মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার এমপি, এ এইচ খায়রুজ্জামান লিটন।

লক্ষণীয় যে, দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহী কমিটিতে এবার অনেক রদবদল করা হয়েছে। ৩২ জন নতুন যুক্ত[৩৯] হয়েছেন এবং পূর্বের ১৭ জন বাদ পড়েছেন।[৪০] প্রেসিডিয়ামে নতুন যাঁরা যুক্ত হয়েছেন তাঁরা হলেন বেগম মতিয়া চৌধুরী, ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, কাজী জাফরুল্লাহ, আতাউর রহমান খান (কায়সার) ও শেখ ফজলুল করিম সেলিম। সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম প্রথমবারেই দলের অন্যতম যুগ্মসাধারণ সম্পাদক হলেন। সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ থেকে মোহাম্মদ নাসিম এবং তথ্য সম্পাদকের পদ থেকে অধ্যাপক আবু সাইয়িদের নতুন কমিটিতে শুধু সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি ছিল দৃষ্টি কাড়ার মতো। তাছাড়া পূর্বের কমিটির অন্যতম যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন পল্টু এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মোনায়েম সরকারের নাম কোথাও না থাকা লক্ষ করার মতো। কাউন্সিলে ধর্ম ও পরিবেশ বিষয়ে দুটি নতুন সম্পাদকীয় পদ সৃষ্টি এবং ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদকের স্থলে ৬টি প্রশাসনিক বিভাগ বিবেচনায় ৬ জন সাংগঠনিক সম্পাদক থাকার বিধান করা হয়। কমিটি গঠনে দেখা যায়, ৬ জন সাংগঠনিক সম্পাদকের মধ্যে ৫ জনই সাবেক ছাত্রনেতা ও বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ। সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্য নিয়ে এটি করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

আলোচ্য কাউন্সিলের প্রধান সাফল্য ছিল চরম বৈরী অবস্থার মধ্যেও তা অনুষ্ঠিত করতে সক্ষম হওয়া। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এ কাউন্সিল নেতা-কর্মীদের প্রচণ্ডভাবে উজ্জীবিত করে। 'দেশের এই পরিস্থিতি কেন হলো' এবং এ থেকে 'উদ্ধারের উপায় কি'–দলের কাউন্সিলে শেখ হাসিনার এ আত্মজিজ্ঞাসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি উপলব্ধি করেন যে, স্বাধীনতা-বিরোধী ও

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াত এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বিরোধী বিএনপি এ দুই জোটবদ্ধ অশুভ শক্তিকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল ও শক্তির ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের বিকল্প নেই। তাই কাউন্সিলে তাঁর ভাষণে ছিল ঐক্যের আহ্বান, যার পথ ধরেই দলের পরবর্তী জোটবদ্ধ রাজনৈতিক অবস্থান গড়ে ওঠে।

আর একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় আর সেটি হচ্ছে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক এজেন্ডা। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের চরম নির্যাতন-নিষ্পেষণ সত্ত্বেও প্রতিশোধপরায়ণতার দিকে না গিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা জুড়ে ছিল কী করে ক্ষুধা-দারিদ্র্য মুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে, তাই। কাউন্সিলে তাঁর ভাষণে বিষয়টি এভাবে ফুটে ওঠে :

> দারিদ্র্য-পীড়িত অথচ সম্ভাবনাময় এই দেশটি কীভাবে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে, কীভাবে স্বাধীনতার অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়ন করবে, কীভাবে উন্নত, সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তুলবে, সেটাই আজ আমাদের সামনে প্রধান এজেন্ডা।[৪১]

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত *সংবাদ*, ২৭শে ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১, ২; আরও *ঐ*, ২৪শে ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১, ১১; *ঐ*, ২৫শে ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১, ২; *ঐ*, ২৬শে ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১. ২

২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল ২০০২-এ শেখ হাসিনার ভাষণ* (পুস্তিকা), এরপর আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০২।

৩. মতিউর রহমান নিজামী (কৃষি মন্ত্রণালয়) এবং আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়)। এরা দুজন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিল। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতাদানের জন্য বিভিন্ন সশস্ত্র প্রাইভেট বাহিনী গঠন, মানুষ হত্যাসহ অন্যান্য যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করার দায়ে আদালত বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় দেন। ২১শে নভেম্বর ২০১৫ মুজাহিদ ও ১০ই মে ২০১৬ নিজামীর ফাঁসির রায় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে কার্যকর করা হয়।

৪. নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ১৪৬টি আসন লাভ করে। সরকার গঠনের জন্য আরও ৫টি আসন প্রয়োজন ছিল।

৫. আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে বলা হয়েছিল, 'জাতীয় ঐকমত্যই হবে সরকার পরিচালনায় আমাদের নীতি।' বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬ : নির্বাচনি ইশতেহার।*

৬. দ্রষ্টব্য *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০২, পরিশিষ্ট ১;* আরও ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন : বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা,* ঢাকা ২০১২, পৃ. ১০৭-১২৩; ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি, পৃ.* ৩৭৩-৩৮১

৭. বিস্তারিত Harun-or-Rashid, 'Process of Marginalisation of Indigenous People in Their Homeland : A Study on CHT in Bangladesh,' *RINDAS Series of Working*

www.pathagar.com

Papers 21, Ryukoku University, Kyoto, Japan, pp. 1-15; আরও ড. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি*, পৃ. ৩৯৪-৪০২

৮. ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদে প্রথম নারীদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোট হয় এবং এতে ১৩ হাজারের মতো নারী পরিষদের সদস্য এবং কয়েকজন নারী-পুরুষ মিলে ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

৯. বঙ্গবন্ধু হত্যার ২১ বছর পর শেখ হাসিনার সরকারের সময় ১৯৯৬ সালের ২রা অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী মুহিতুল ইসলাম (সম্প্রতি প্রয়াত) ধানমন্ডি থানায় ২৩ জনকে আসামি করে হত্যা-মামলা দায়ের করেন। এর পূর্বে ১৪ই আগস্ট ফারুক, রশীদ ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুর গ্রেপ্তার হয়। ১৯৯৮ সালের ৮ই নভেম্বর ঢাকার দায়রা জজ গোলাম রসুল মামলার বিচার শেষে ২০ জন আসামির মধ্যে ১৫ জনের 'ফায়ারিং স্কোয়াডে' মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার রায় দেন। ২০০০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ মামলায় বিভক্ত রায় দেন এবং প্রচলিত বিধানসম্মত না হওয়ায় ফায়ারিং স্কোয়াডের পরিবর্তে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রায় কার্যকরের আদেশ দেন।

১০. ২০১১ সালের ২রা মে আমেরিকার নৌ-সদস্যদের একটি বিশেষ অপারেশনে পাকিস্তানে নিহত।

১১. একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে এ ধরনের সংগঠনের সংখ্যা ছিল ১১৪টি। আবুল বারাকাত, *বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি*, ঢাকা ২০১২, পৃ. ২২; আরও, শাহরিয়ার কবির, *বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদ*, ঢাকা ২০০৬, পরিশিষ্ট-২, পৃ. ১১০-১১২; Harun-or-Rashid, "Desecularisation and Rise of Political Islam in Bangladesh," *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities),* Volume 57, No. 1, June 2012, pp. 29-40

১২. Abul Fazl Huq, *Bangladesh Politics : The Problem of Stability,* Dhaka 2011, p. 254; আরও, Rounaq Jahan, *Political Parties in Bangladesh : Challenges of Democratization,* Dhaka 2015, p. 49

১৩. জামায়াত ৩১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৭টি আসন ও শতকরা ৪.২৮ ভাগ ভোট লাভ করে। জাতীয় পার্টি (নাজিউর রহমান) ১১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৪টি আসন ও ১.১২ ভাগ ভোট পায়। ইসলামী ঐক্য জোট ৬টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ২টি আসন ও শতকরা ০.৬৮ ভাগ ভোট পায়। দ্রষ্টব্য Abul Fazl Huq, *Bangladesh Politics,* p. 254

১৪. শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০০ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ঢাকা সফরে এসে তাঁর সঙ্গে আলোচনাকালে বাংলাদেশের মজুদ গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাব দেন। ৫০ বছরের রিজার্ভ নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল গ্যাস রপ্তানির কথা ভেবে দেখা যাবে, এর পূর্বে নয়–শেখ হাসিনার এরূপ অবদানের কারণে আওয়ামী লীগ বৃহৎশক্তির বিরাগভাজন হয় বলে অনেকে মনে করে থাকেন।

১৫. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০২*

১৬. দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, *নির্বাচনি ইশতেহার ২০০২*, পৃ. ১১ ও ২৮। এতে আরও বলা হয়েছিল, 'সরকার গঠনে সক্ষম হলে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের প্রথম কাজ হবে দলমত নির্বিশেষে সকলের সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে জনগণের জান-মাল ও সম্ভ্রম নিশ্চিত করা এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্যে আমরা যে কোন মূল্যে দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনব ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব। হত্যা,

www.pathagar.com

সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ধর্ষণের মত অপরাধ দমন করে আমরা দেশকে মানুষের বসবাসযোগ্য করে গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ।'

১৭. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০২*। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে আরও ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য জালাল উদ্দিন তালুকদার, আবদুল লতিফ মীর্জা, হাজী মকবুল হোসেন, হাজী মো. সেলিম, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা অসীম কুমার উকিল ও শফি আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, ছাত্রলীগের সভাপতি লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু প্রমুখ।

১৮. নির্বাচনের পর গোপালগঞ্জের রামশীলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থের লেখক, প্রয়াত বিচারপতি কে এম সোবহান, অধ্যাপক শামসুল হুদা হারুন, ডা. এস এ মালেক প্রমুখ ঐ আশ্রয় শিবির পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

১৯. আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে *শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০২*

২০. আয়োজকদের মধ্যে বর্তমান গ্রন্থের লেখকও ছিলেন। কনভেনশন সংক্রান্ত ডকুমেন্টস তার কাছে সংরক্ষিত।

২১. কনভেনশনে যোগদানে আগ্রহী সার্কভুক্ত কোনো কোনো দেশের প্রতিনিধিদের ভিসা ইস্যু করার ব্যাপারে জোট সরকারের পক্ষ থেকে নানা বাধার সৃষ্টি করা হয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০০২ জাতীয় প্রেস ক্লাবে কনভেনশন উপলক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছিল।

২২. বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় আপিল বিভাগে বিচারপতি স্বল্পতা এবং সরকার কর্তৃক নতুন বিচারপতি নিয়োগ না দেওয়ার কারণে দীর্ঘদিন মামলাটি ঝুলে থাকে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বিচার প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয়। সব প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন শেষে ২৮শে জানুয়ারি ২০১০ ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ফারুক ও রশীদসহ ৫ খুনীর ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়।

২৩. বর্তমানে বিএনপি'র সিনিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং লন্ডনে বসবাসরত।

২৪. সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপি-র প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর সমাধিস্থলে না যাওয়ায় খালেদা জিয়ার জোট সরকার ২০০২ সালের ২১শে জুন ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করে। উল্লেখ্য, এর মাত্র ৭ মাস পূর্বে বিএনপি-জামায়াত জোটই তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করেছিল।

২৫. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০২*

২৬. *ঐ*

২৭. বিশেষ এ কাউন্সিলে প্রায় ৫ হাজার কাউন্সিলর ও ডেলিগেট যোগ দেন। এ ছাড়া ঢাকাস্থ কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মী এতে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ এ কাউন্সিলের প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আমির হোসেন আমু। দলের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান কাউন্সিলে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। তখনকার ৬টি প্রশাসনিক বিভাগের পক্ষ থেকে ৬ জন দলীয় প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। অধিবেশনের সভাপতি শেখ হাসিনার ভাষণের মধ্য দিয়ে বিশেষ কাউন্সিলের সমাপ্তি ঘটে। দ্রষ্টব্য *জনকণ্ঠ*, ২৩ ও ২৪শে জুন ২০০০, পৃ. ১, ২, ১১

www.pathagar.com

২৮. বিস্তারিত, *সংবাদ*, ২৭শে ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১, ২

২৯. *সংবাদ*, ২৭শে ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১, ২

৩০. দফাগুলো ছিল, মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ অবিলম্বে হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও অন্যান্য অপরাধ বন্ধ করা; রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরিহার করে গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি দান; সকল প্রকার সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করা; সভা সমাবেশ, মিছিল-মিটিং-এ বাঁধাদান বন্ধ করা; জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় অবিলম্বে কার্যকর করা, জেল হত্যার বিচার ত্বরান্বিত এবং ইতিহাস বিকৃতি বন্ধ করা; শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করা; সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা; নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো; প্রশাসনে দলীয়করণ বন্ধ করা; উন্নয়ন-অনুকূল বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতি রোধ করতে স্বাধীন দুর্নীতি কমিশনের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া। *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০২*

৩১. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০২*

৩২. *ঐ*

৩৩. *ঐ*

৩৪. *সংবাদ*, ২৭ শে ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১, ২

৩৫. *ঐ*, ২৪ শে ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১, ১১; দ্রষ্টব্য *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ১৯৯৭ ও ২০১২*

৩৬. দ্রষ্টব্য *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ২০১২*

৩৭. তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

৩৮. *সংবাদ*, ২৭শে ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১, ২; *ঐ*, ২৯শে ডিসেম্বর ২০০২, পৃ. ১, ১১; গঠনতন্ত্রে এই প্রথম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা হয়।

৩৯. তাঁরা হলেন ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, কাজী জাফর উল্লাহ, আসাদুজ্জামান নূর, বেগম আইভী রহমান, নাজমা রহমান, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, সাবের হোসেন চৌধুরী, বি এম মোজাম্মেল, অসীম কুমার উকিল, অধ্যাপক আলী আশরাফ, শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সৈয়দ আবুল হোসেন, ড. আবদুর রাজ্জাক, হাবিবুর রহমান সিরাজ, কর্নেল ফারুক খান, ইয়াফেস ওসমান, ড. হাসান মাহমুদ, দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুটুল, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, তালুকদার আবদুল খালেক, মোস্তফা রশিদী সুজা, মোস্তফা কামাল লোটাস, ওমর আলী, রহমতউল্লাহ

৪০. এঁরা হলেন আবদুল মান্নান, আবদুল মোমিন, অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, শামসুর রহমান খান শাহজাহান, আজিজুর রহমান, রহমত উল্লাহ চৌধুরী, ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন, আবুল হাসান চৌধুরী, এম এ মান্নান, ইমান উদ্দিন আহম্মদ, মতিউর রহমান তালুকদার, এডভোকেট রহমত আলী, ফজলুর রহমান খান, এ বি এম তালেব আলী, ফজলুল করিম, এডভোকেট ইউনুস আলী ও সিদ্দিক হোসেন।

৪১. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০২*

www.pathagar.com

অধ্যায় : বিশ

কাউন্সিল অধিবেশন ২০০৯ : দিনবদলের সনদ 'ভিশন ২০২১' ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার

গত কাউন্সিল (ডিসেম্বর ২০০২) থেকে সাড়ে ৬ বছর পর ২০০৯ সালের ২৪শে জুলাই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে আওয়ামী লীগের একদিনব্যাপী পরবর্তী ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] এ কাউন্সিল অনুষ্ঠানে বিলম্বের মূলে ছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ও সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে দেশের অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিপুল জয়লাভ শেষে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের সাড়ে ৬ মাসের মধ্যে আলোচ্য কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে সভাপতিত্ব ও এর উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। কাউন্সিলর-ডেলিগেট ছাড়াও বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এতে প্রতিবারের মতো এবারও কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

পটভূমি

গত কাউন্সিল (ডিসেম্বর ২০০২) ও বর্তমান কাউন্সিল (জুলাই ২০০৯) এ দুয়ের মধ্যবর্তী সময় ছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ৩ বছর ১০ মাস (২৭শে ডিসেম্বর ২০০২ থেকে ২৭শে অক্টোবর ২০০৬), সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছর (জানুয়ারি ২০০৭ থেকে জানুয়ারি ২০০৯) এবং শেখ হাসিনার মহাজোট সরকারের সাড়ে ৬ মাসের (৬ই জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ২৩শে জুলাই ২০০৯) শাসনকাল। প্রতিটি পর্যায় ছিল খুবই ঘটনাবহুল। পুরো সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে : বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অব্যাহত দুঃশাসন, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিশাল চালান আটক (২০০৪)[২], শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলা (২১শে আগস্ট ২০০৪), ধর্মের নামে উগ্র জঙ্গিগোষ্ঠীর সন্ত্রাসী তৎপরতা, ৬৩টি জেলায় পাঁচ শতাধিক সিরিজ বোমা হামলা (১৭ই আগস্ট ২০০৫), নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের পক্ষে আনতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা, চরম রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা, ১১ই জানুয়ারি ২০০৭ দেশে জরুরি অবস্থা জারি, ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন বন্ধ, বি-রাজনীতিকরণ, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার, মাইনাস টু ফর্মুলা, রাজনৈতিক

www.pathagar.com

দলে ভাঙন সৃষ্টি, সেনা নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘমেয়াদি করার নীল নকশা, সেনাশাসন নিয়ন্ত্রণ-বিরোধী আগস্টের (২০০৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলন, ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে ঢাকায় আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠান (২৮শে মে ২০০৮), ২৯শে ডিসেম্বরের (২০০৮) সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দিনবদলের রূপকল্প বা কর্মসূচি ঘোষণা, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোটের বিপুল বিজয় ও সরকার গঠন (৬ই জানুয়ারি ২০০৯), আওয়ামী লীগের নির্বাচনি কর্মসূচি ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের উদ্যোগ, ২৫শে ফেব্রুয়ারির বিডিআর বিদ্রোহ ইত্যাদি।

২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠিত হওয়ার দিন থেকে (১০ই অক্টোবর) সারাদেশে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ ও এর নেতা-কর্মী-সমর্থক, হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর গ্রেপ্তার, হত্যাসহ যে চরম দমন, নিপীড়ন, নির্যাতন শুরু হয়, সে অবস্থা জোট সরকারের পুরো শাসন আমল জুড়েই কমবেশি বিদ্যমান থাকে। সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। হত্যা, খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, স্থাপনা দখল ইত্যাদি জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এক কথায়, বাংলাদেশ পরিণত হয় সন্ত্রাসের এক 'অভয় অরণ্যে'। জোটের সন্ত্রাসীদের দ্বারা খুলনার আওয়ামী লীগ সভাপতি এডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম (২০০৩), নাটোর আওয়ামী লীগের নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজউদ্দিন (২০০৩), জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টার (২০০৪), আওয়ামী লীগের সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া (২০০৫) হত্যার শিকার হন। জোট সরকারের শাসন আমলে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের মোট ২১০০০ নেতা-কর্মীকে এভাবে হত্যা করা হয় বলে দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।[৩]

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শাসনকালে সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনা ছিল ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিন্যুর আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে দলের সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তি সমাবেশ'-এর ওপর গ্রেনেড হামলা, যাতে নারীনেত্রী ও দলের মহিলা সম্পাদিকা আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতা-কর্মী নিহত এবং পাঁচ শতাধিক আহত হন, যাঁদের মধ্যে অনেকে আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেন। এ হামলার মূল টার্গেট যে ছিলেন শেখ হাসিনা স্বয়ং, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকার বা সরকারের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ কোনো মহল ভিন্ন প্রকাশ্য দিবালোকে এরূপ আক্রমণের ঘটনা ঘটানো যে সম্ভব নয়, তাও নিশ্চিত।

জোট সরকারের শাসনের এ পর্বে তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদে দেশে ধর্মের নামাবলি পরিহিত ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জোটের সন্ত্রাসী ও এদের দ্বারা ঐ সময়কার অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের ১৭ই আগস্ট জামা'তুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) নামে একটি ধর্মভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাদের শক্তি প্রদর্শন করা।

www.pathagar.com

হত্যা, সন্ত্রাস, দুঃশাসনের পাশাপাশি দুর্নীতি, দলীয়করণ ইত্যাদি ব্যাপারেও জোট সরকার সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। তাদের ৫ বছরের শাসন আমলে বাংলাদেশ বিশ্বে পরপর চারবার এক নম্বর শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে কালিমা লিপ্ত হয়।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সবচেয়ে ক্ষতিকারক ভূমিকা ছিল অনেক আন্দোলন ও জীবনের বিনিময়ে অর্জিত সর্বজনগ্রাহ্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাংবিধানিক ব্যবস্থাটিকে কার্যত নস্যাৎ করে দেওয়া। সন্ত্রাস, দুঃশাসন ও ব্যর্থতার পাল্লা এতই ভারী ছিল যে, সুষ্ঠু স্বাভাবিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াত জোটের পুনরায় ক্ষমতায় আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত সে কারণেই এবং যেভাবেই হোক ক্ষমতায় ফিরে আসা নিশ্চিত করতে জোট সরকার বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি, নির্বাচন কমিশনে আজ্ঞাবহ লোক বসানো (এম এ আজিজ),[৪] নিজেদের দলীয় রাষ্ট্রপতি (ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদ)-এর মাধ্যমে নির্বাচন প্রভাবিত করা ইত্যাদি প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এর ওপর ছিল ১ কোটি ২২ লক্ষ ভুয়া ভোটার।

২০০৪ সালে জোট সরকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ বছরে উন্নীত করে।[৫] এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য ছিল বিএনপি-র সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও ঐ সময়ের (২০০৪ সালে) প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান যাতে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে পারেন। জোট সরকারের দুরভিসন্ধি বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা ছিল না। একদিকে দুঃশাসন, অন্যদিকে পরবর্তী নির্বাচনকে ঘিরে নীলনকশা। রাজনৈতিক মহল তো বটেই, সারাদেশের মানুষের মধ্যেও এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আন্দোলনের মুখে এসব আয়োজন ভেসে যায়। বিচারপতি কে এম হাসান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করতে বাধ্য হন।

বিএনপি-জামায়াত জোটের সর্বশেষ ভরসা ছিলেন তাদের মনোনীত রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদ। ২৭শে অক্টোবর ২০০৬ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার পদত্যাগ করে এবং পরের দিন ২৮শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ধাপসমূহ নিঃশেষ না করেই একই সঙ্গে নিজেকে এর প্রধান উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত করেন। সে সময় ঢাকার রাজপথে চলছিল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক পক্ষের মধ্যে গুলি ও পিটিয়ে মানুষ হত্যার মতো সহিংস ঘটনা। এমনই এক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোট এবং জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টিকে নিয়ে গঠিত মহাজোট প্রথমে ড. ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয়। কিন্তু তাঁর সরকারের চরম পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের কারণে শীঘ্রই সেখান থেকে তারা সরে আসে। সামান্যতম নিরপেক্ষতা দূরে থাকুক, ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদ বিএনপি-জামায়াত জোটের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাদের পক্ষে একতরফা নির্বাচনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছিলেন।[৬] এবার শুরু হয় প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন। ৮ ও ৯ই জানুয়ারি ২০০৭ বঙ্গভবন অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১০ই জানুয়ারি বঙ্গভবন

www.pathagar.com

কার্যত বাইরে থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে তিন বাহিনী প্রধানের হস্তক্ষেপে ১১ই জানুয়ারি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ২২শে জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল ঘোষিত হয়। সংঘটিত হয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুল আলোচিত ১/১১-র ঘটনা। শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের আরও কঠিন ষড়যন্ত্র।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত (১২ই জানুয়ারি ২০০৭) সরকার সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে পরিচিতি পেলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সেনা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত সরকার। অন্য সেনাশাসন আমলের ন্যায় শুরুতে এ সরকারও দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান পরিচালনা ও সংস্কার কর্মসূচির নামে এক প্রকার চমক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু শীঘ্রই তাদের আসল চেহারা প্রকাশ পেতে থাকে। তারা নিজেরাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এতৎসত্ত্বেও, কখনো কারণ ছাড়াই তারা রাজনীতিবিদ, ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, সরকারি চাকরিজীবী, উচ্চপদস্থ আমলাসহ সর্বস্তরের লোকজনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করে। এমনকি বিনা অপরাধে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য পর্যন্ত এদের গ্রেপ্তার-নির্যাতন থেকে রেহাই পাননি।

দুই বছরের মধ্যে ছবিযুক্ত ভোটার আইডি প্রণয়ন ও ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো কিছু প্রশংসনীয় কাজ তারা সম্পন্ন করে। তবে দীর্ঘ সেনা-শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল তাদের পরিকল্পনার মূলে। এ লক্ষ্যে তারা বিরাজনীতিকীকরণ, সংস্কারের নামে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি[৭] বড় এ দুই দলের অভ্যন্তরে ভাঙন সৃষ্টি, সেনাসমর্থক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা[৮], গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে মাঠে নামানো,[৯] ড. কামাল হোসেন-এর সহযোগিতা কামনা[১০] ইত্যাদি নানা প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। একই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া 'দুই নেত্রীই' দেশ-রাজনীতি-উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর বা বাধা এরূপ প্রচারণা নিয়ে হাজির হয়। সরকারের নেপথ্য সেনা কর্মকর্তাদের 'অপকর্মের' বিরুদ্ধে শেখ হাসিনাই প্রথম কথা বলেন। সেজন্য তাঁর ওপরই তাদের আক্রোশ ছিল বেশি। তিনি সন্তান-সম্ভবা কন্যাকে দেখতে যুক্তরাষ্ট্র গেলে (১৫ই মার্চ ২০০৭) তাঁর দেশে ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।[১১] একই সময় খালেদা জিয়াকেও জোর করে বিদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়, যা ছিল 'মাইনাস টু' ফর্মুলার অন্তর্গত। কিন্তু সকল বাধা-বিপত্তি, হুমকি উপেক্ষা করে ৭ই মে (২০০৭) শেখ হাসিনা ঢাকায় ফিরে আসেন।[১২] এরপর ১৬ই জুলাই তাঁকে গ্রেপ্তার করে শেরেবাংলা নগর সাব-জেলে বন্দি করে রেখে শুরু হয় বিশেষ আদালতে তাঁর বিচারকার্য। ২রা সেপ্টেম্বর খালেদা জিয়াকেও গ্রেপ্তার করে একই এলাকায় অপর একটি সাব-জেলে রাখা হয়।

সেনা নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় জাতীয় ক্ষেত্রে যখন একের পর এক এরূপ ঘটনা ঘটছিল, ঠিক সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে

www.pathagar.com

শুরু হয় জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার দাবির নামে বস্তুত সেনা-শাসন নিয়ন্ত্রণ-বিরোধী আগস্টের ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলন,[১৩] যা দ্রুত গতিতে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। সরকার ২২শে আগস্ট ২০০৭ ঢাকাসহ ৬টি বিভাগীয় শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণা এবং সন্ধ্যা ৭টা থেকে কারফিউ জারি করে। এই প্রথম ১/১১ সরকার সারাদেশে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে এবং প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগস্টের ঘটনা ছিল সেনা-নিয়ন্ত্রণ থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে একটি টার্নিং পয়েন্ট।

৯ই সেপ্টেম্বর (২০০৭) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে পরের দিন (১০ই সেপ্টেম্বর) থেকে সীমিত আকারে 'ঘরোয়া রাজনীতি'র অনুমতি দানের কথা ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর ভাষণে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন। নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা[১৪] নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা সংস্কার ও নতুন বিধিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে নভেম্বর মাসের শুরু থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু করেন। ৪ঠা নভেম্বর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল সংলাপে যোগ দিয়ে তাঁদের প্রস্তাব তুলে ধরেন।[১৫] আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনার মুক্তি ও জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারেরও দাবি করা হয়।

নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে এসব পদক্ষেপ সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত সরকার 'মাইনাস টু'র চিন্তা থেকে সরে আসছে বলে মনে হয়নি। এবার লক্ষ্য, দুই নেত্রীকে অযোগ্য কিংবা কারা অভ্যন্তরে রেখে অন্যদের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠান। ৩রা ডিসেম্বর (২০০৭) বন্দি অবস্থায় শেরেবাংলা নগরে স্থাপিত বিশেষ আদালতে শেখ হাসিনার বিচার শুরু হয়। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পরিষ্কার জানিয়ে দেন 'নো হাসিনা, নো ইলেকশন'। তিনি বারবার একই কথা বলতে থাকেন। ব্যবসায়ী আজম জে চৌধুরীর দায়েরকৃত তথাকথিত চাঁদাবাজির মামলায় বিশেষ আদালতে হাজিরা দিতে এসে ১৩ই জানুয়ারি ২০০৮ শেখ হাসিনা সেখানে সংক্ষিপ্ত এক বক্তব্যে মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানান।[১৬] এর ৪ দিন পর পুনরায় তাঁকে আদালতে আনা হলে এবার প্রয়োজনে তাঁকে ছাড়া হলেও 'ডিক্টেটরদের ঠেকাতে নির্বাচনে অংশ নিতে' তিনি দলের নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দেন।[১৭]

এদিকে জরুরি অবস্থা সত্ত্বেও বিভিন্ন মহল থেকে শেখ হাসিনার মুক্তির দাবি জোরালো হতে থাকে। এ ব্যাপারে গণস্বাক্ষর নেওয়া হলে শুধু ঢাকা শহরেই ২৫ লক্ষ মানুষ তাতে স্বাক্ষর দেয়।[১৮] অবশেষে ১২ই জুন ২০০৮ সরকার শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর খালেদা জিয়াও মুক্তি পান।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রায় দুবছর শেষে ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১৯] নির্বাচনে নিবন্ধনকৃত ৩৮টি দল অংশগ্রহণ করে বটে, তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-র মধ্যে। আগের নির্বাচনের (১লা অক্টোবর ২০০১) বিপরীতে এবার আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে পূর্বে গড়ে ওঠা ১৪ দলীয় ঐক্য জোটের সঙ্গে জেনারেল এইচ এম এরশাদের

www.pathagar.com

নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিকে যুক্ত করে মহাজোট (Grand Alliance) গঠন এবং নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। অপরদিকে, বিএনপি-র নেতৃত্বাধীন ৪-দলীয় জোটের সঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) ও জমিয়াতুল উলামায়ে ইসলাম এ দুটি দল যুক্ত হয়ে তারাও জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দল তাদের নির্বাচনি ইশতেহার প্রকাশ করে। আওয়ামী লীগের ইশতেহারকে 'দিনবদলের সনদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এতে আশু করণীয় হিসেবে পাঁচটি অগ্রাধিকার,[২০] ৫-বছর মেয়াদে করণীয় এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দিষ্টভাবে স্থান পায়।[২১] আওয়ামী লীগের এ নির্বাচনি ইশতেহার 'ভিশন ২০২১' বা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' (তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়া অর্থে) গড়ার কর্মসূচি হিসেবেও বহুল পরিচিতি পায়। এর বক্তব্য উপস্থাপনে নতুনত্ব ও বিষয়বস্তুর শুরুতে উভয়ই ভোটারদের, বিশেষ করে নবীনদের বিপুলভাবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, এই প্রথমবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এর বিপরীতে, বিএনপি-র নির্বাচনি ইশতেহার ছিল খুবই সাধারণ ও গতানুগতিক। তাদের নির্বাচনি আহ্বান ছিল 'দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও'।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৬০টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ২৩০টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৮.২৯ ভাগ লাভ করে।[২২] বাকি ৪০টি আসন মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টি, জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষে ছেড়ে দেয়। এসব দল ৩২টি আসন (এর ভেতর ২৭টি জাতীয় পার্টি) পায়।[২৩] সব মিলিয়ে মহাজোটের আসন দাঁড়ায় ২৬২টি এবং ভোট শতকরা ৫৫.৮৫ ভাগ। অপরপক্ষে, বিএনপি একা ২৫৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৩০টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩২.৯৫ ভাগ পায়। শরিকদের পক্ষে ছেড়ে দেওয়া ৪৩টি আসনের মধ্যে জামায়াত ২টি[২৪] ও জাতীয় পার্টি (নাজিউর রহমান) ১টি পায়। বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট মোট ৩৩টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৮.২৩ ভাগ লাভ করে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের ভূমিধস বিজয় অবাক করার মতো কিছু ছিল না। আওয়ামী লীগ এককভাবেই ৩০০ আসনের মধ্যে ২৩০টি আসন ও ৪৮.২৯ ভাগ ভোট লাভ করে। পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগের অনুকূলে। বিএনপি-জামায়াতের ৫ বছরের দুঃশাসন ও সেনা-নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছর উভয় সময়ে আওয়ামী লীগই জনজীবনের নিরাপত্তা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিল। ১/১১ এর পর নেপথ্য সেনা নায়কদের সেনা শাসন-নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘস্থায়ী করার নীল নকশার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনাই প্রথম প্রতিবাদ বাক্য উচ্চারণ করেন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তোলেন। প্রধানত তাঁর সাহসী ও অত্যন্ত দৃঢ়চেতা অবস্থানের কারণে সেনা নায়কদের বি-রাজনীতিকীকরণ, দুই নেত্রীকে জোর করে বিদেশে নির্বাসনে প্রেরণ, 'মাইনাস টু' ফর্মুলা ইত্যাদি পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। এর প্রভাব নির্বাচনের ফলাফলের ওপর পড়ে। তাছাড়া, কৌশলগত দিক থেকে আওয়ামী লীগ পূর্বের ভুল না করে এ নির্বাচনে

www.pathagar.com

জোটবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করে। উপরন্তু আওয়ামী লীগের ছিল 'দিনবদলের সনদ'-এর মতো একটি আধুনিক দৃষ্টি আকর্ষণীয় ইশতেহার, যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের তুলনায় বিএনপি ও এর নেতৃত্বাধীন জোট খুবই নাজুক অবস্থায় ছিল। তাদের ৫ বছরের সরকারের আমলে দুর্নীতি, দুঃশাসনের স্মৃতি বৈ অন্য কিছু নেই। নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য সেটিই যথেষ্ট। তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনকালে তাদের পক্ষে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পূর্বোল্লিখিত তাদের গৃহীত ব্যবস্থা তাদের প্রকৃত চরিত্র জনসম্মুখে উন্মোচন করে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোনো দায়িত্বশীল দলের নিকট এরূপ আচরণ কিছুতেই কাম্য নয়। তাছাড়া, সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচির নামে দলে ভাঙন সৃষ্টির প্রচেষ্টায় বিএনপি যতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল,[২৫] আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি।

নির্বাচনের পর ৬ই জানুয়ারি ২০০৯ শেখ হাসিনা দ্বিতীয় বারের মতো তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সরকার গঠনের ৫১তম দিনে ঢাকার বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) হেডকোয়ার্টার্সে সেনা অফিসারদের বিরুদ্ধে সীমান্তরক্ষীদের এক রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ দেখা দেয়। এতে ৫৮ জন সেনা কর্মকর্তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসীম ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার কারণে পরিস্থিতি দ্রুত সফলভাবে মোকাবিলা করে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। তাঁর সরকারের সাড়ে ৬ মাসের মাথায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আয়োজন করা হয়। এ সময়ে সরকারের মূল দৃষ্টি ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নামিয়ে আনা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করে জনজীবনে নিরাপত্তা বিধান করা।

সাংগঠনিকভাবে ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তখন ছিল বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ৫ম বর্ষ। কাউন্সিল অনুষ্ঠানের মতো পরিবেশ তখন আদৌ বিদ্যমান ছিল না। শেষবর্ষে এসে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে এবং দ্রুত তা এক চরম সংঘাতময় রূপ লাভ করে, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া সরকারের মেয়াদান্তে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও এর প্রস্তুতি দলের জন্য তখন মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দায়িত্ব শেষে দেশে সেনা নিয়ন্ত্রিত দুই বছরের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে নতুন সংকট দেখা দেয়। দেশে তখন জরুরি অবস্থা। সরকারের নেপথ্যের নিয়ন্ত্রকগণ 'মাইনাস টু' ফর্মুলা কার্যকর করতে উদ্যত। শেখ হাসিনা তখন প্রায় একবছর সাব-জেলে বন্দি ও বিশেষ আদালতে বিচারের সম্মুখীন। সেটি কাউন্সিলের সময় নয়, তা বলার প্রয়োজন পড়ে না। দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের একটি অংশ তখন দোদুল্যমান অবস্থায়। সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ২৮শে মে (২০০৭) যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। আটক অবস্থায় তিনি প্রধান উপদেষ্টার কাছে লেখা এক পত্রে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন এবং আওয়ামী লীগ 'আজ তার গণতান্ত্রিক চরিত্র হারিয়ে একনায়ককেন্দ্রিক দলে পরিণত হয়েছে' এ কথা উল্লেখ করে বন্দি অবস্থা থেকে তাঁর মুক্তির আবেদন করেন।[২৬] দলের এই চরম দুর্দিনে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান এবং মুখপাত্র হিসেবে

www.pathagar.com

দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যতম যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দলকে এগিয়ে নিয়ে যান।

চরম বৈরী পরিবেশ সত্ত্বেও ২০০৮ সালের ২৬শে মে তাঁরা ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের এক বর্ধিত সভা আহ্বান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ছবি ব্যবহার করে মঞ্চের ব্যানার তৈরি করা হয়। সকাল ১০টায় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। দলের সভানেত্রী সাব-জেলে বন্দি থাকায় তাঁর নির্ধারিত চেয়ার খালি রাখা হয়। উল্লেখ্য, অনুরূপ এক ঘটনা ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে পল্টনের এক জনসভায় ঘটেছিল। ৬-দফা কর্মসূচি প্রচারকালে পাকিস্তান নিরাপত্তা মামলায় সিলেট ও ময়মনসিংহ কোর্টে বঙ্গবন্ধুকে হাজিরা দিতে হওয়ায় প্রতিবাদস্বরূপ তাঁর চেয়ার শূন্য রেখে পল্টনের ঐ সভা নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠিত করেছিলেন।[২৭] যাহোক, বর্ধিত সভার মঞ্চে অন্যদের মধ্যে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, জাতীয় কমিটির সদস্য, উপদেষ্টামণ্ডলী, সাবেক সংসদ সদস্য এবং ঢাকা মহানগর, সহযোগী সংগঠন ও সকল জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে বর্ধিত সভা হওয়ার কথা থাকলেও আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন, বিশেষ করে ছাত্রলীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ ও যুব মহিলা লীগের অনেকে অনুষ্ঠান স্থলে ঢুকে পড়েন এবং বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী সভা স্থলের বাইরে অবস্থান করছিলেন। দলের সভানেত্রীর মুক্তির দাবিতে ভেতরে ও বাইরে তারা স্লোগান দিতে থাকেন। দলের প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান নূর ও উপ-প্রচার সম্পাদক অসীম কুমার উকিলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভায় জেলা পর্যায়ের অধিকাংশ নেতা তাদের বক্তব্যে শেখ হাসিনাকে ছাড়া 'সংলাপ ও নির্বাচন' কোনোটি নয় বলে মত দেন। অনেকে তাঁর মুক্তির দাবিতে স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তারবরণ, হরতাল-অবরোধ এমনকি গণআত্মাহুতির কর্মসূচি ঘোষণার দাবি জানান। কেউ-কেউ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে 'সন্দেহ ও অবিশ্বাস'-এর প্রসঙ্গও উত্থাপন করেন। রাত ৯টার দিকে সাব-জেল থেকে আইনজীবীদের মাধ্যমে বর্ধিত সভায় পাঠানো দলের সভানেত্রীর একটি বার্তা দলের অন্যতম যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম উপস্থিত সকলের উদ্দেশে পড়ে শোনান। শেখ হাসিনা তাঁর বার্তায় বর্ধিত সভায় নিজে উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁর নিজের মনের কষ্ট প্রকাশ করে তাঁর ওপর আস্থা না হারানো এবং নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন :

> দীর্ঘ এক বছর ধরে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে না। তবে আমার ওপর যেন নেতা-কর্মীরা আস্থা না হারান। দলের বর্ধিত সভা হচ্ছে। অথচ আমি অনুপস্থিত। সবাইকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করতে হবে... সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।[২৮]

তাঁর ও আওয়ামী লীগের ঐ মুহূর্তের রাজনৈতিক মূল লক্ষ্য এবং তা আদায়ে সবার যা করণীয়, সে সম্বন্ধে তিনি বার্তায় বলেন, 'আমি নির্বাচন চাই। নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেই হবে... নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র হতে পারে। এ জন্য দেশবাসীকে সজাগ থাকতে হবে।'

www.pathagar.com

রাত ১১টা পর্যন্ত বর্ধিত সভা চলে। এর আয়োজন শতভাগ সফল হয়েছিল। বিশেষ করে বন্দি অবস্থার মধ্যে থেকেও শেখ হাসিনা যে দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দেন, তা নেতা-কর্মীদের উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করে। অধিকন্তু সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেপথ্যের কলকাঠি নিয়ন্ত্রকদের জন্য এটি ছিল একটি স্পষ্ট বার্তা যে, 'নো হাসিনা, নো ইলেকশন'। তাছাড়া বেশিদিন এভাবে যে তাঁকে বন্দি করে রাখা যাবে না, সেটিও স্পষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থা দেশে দ্রুত জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভূমিকা রাখে, সন্দেহ নেই।

বন্দি অবস্থায়ও দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রচণ্ড সাহস ও দৃঢ়তা এবং তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের ইস্পাতদৃঢ় ঐক্যই ছিল এ সময়ে জিল্লুর রহমান ও সৈয়দ আশরাফের প্রেরণার উৎস। এভাবে জাতীয় জীবনে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি অতিক্রম করে এবং সংকট-সংকুল সাংগঠনিক অবস্থা কাটিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের সরকার গঠনের সাড়ে ৬ মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল।

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল

উদ্বোধনী অধিবেশন

২৪শে জুলাই ২০০৯ সকাল সাড়ে ১০টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানে নির্মিত প্যান্ডেলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়।[২৯] এতে সভাপতিত্ব করেন দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের দুঃশাসন এবং সেনা নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গ্রেপ্তার, মামলা, নানা ষড়যন্ত্র সফলভাবে মোকাবেলা করে ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর এ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ায় সারাদেশের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিপুল আনন্দ-উচ্ছ্বাস। এতে ১০ হাজার কাউন্সিলর ও ডেলিগেট এবং এর দ্বিগুণ নেতা-কর্মী যোগ দেন। কাউন্সিল অধিবেশন পরিণত হয় 'গণতন্ত্রের উৎসবে'।

প্রতিবারের মতো এবারও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবর্গ, জামায়াতসহ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত রাজনৈতিক দল বাদে অন্যসব দলের নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী, বরেণ্য ব্যক্তিত্ব, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্যান্ডেলে স্থান সংকুলান না হওয়ার আশংকায় পার্শ্ববর্তী বাণিজ্য-মেলার মাঠেও নেতা-কর্মীদের বসার জন্য অপর একটি প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারের কয়েকটি কক্ষে বড় পর্দায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাউন্সিলের কার্যক্রম প্রচারের ব্যবস্থা রাখা হয়।

কাউন্সিল উপলক্ষ্যে সমগ্র এলাকা অপূর্ব সাজে সাজানো হয়। প্রবেশমুখসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও নিকটবর্তী সড়কে নির্মাণ করা হয় একাধিক তোরণ। মূল মঞ্চের সম্মুখভাগে জলাধারে জাতীয় পতাকায় মোড়ানো বিশাল আকৃতির সুসজ্জিত নৌকা ছিল সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করার মতো। মঞ্চের পেছনে ডিজিটাল ব্যানারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান ও দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার ছবি ছাড়াও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মূল নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক (টাঙ্গাইল), জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানের ছবি শোভা পায়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিপুলসংখ্যক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, ডগ স্কোয়াড, সিসি ক্যামেরা, র‍্যাবের সার্বক্ষণিক মনিটরিং ছাড়াও শেখ হাসিনার বক্তৃতাদানের স্থানে বুলেট প্রুফ কাচে ঘেরা একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবছরের আয়োজনের আর একটি বিশেষ দিক ছিল আওয়ামী লীগের সংগ্রাম ও সাফল্যের ৬০ বছর পূর্তি। সকাল থেকেই প্যান্ডেলে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং মুক্তিযুদ্ধের উদ্দীপনামূলক সংগীত বাজছিল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ প্রায় সব কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সিপিবি-র সভাপতি মনজুরুল আহসান খান, সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু এমপি, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক ও শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ আফজাল, সাধারণ সম্পাদক নুরুর রহমান সেলিম, গণআজাদী লীগের সভাপতি হাজী আবদুস সামাদ, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, কমিউনিস্ট কেন্দ্রের যুগ্ম-আহ্বায়ক অসীত বরণ রায়। বিএনপি নেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলের নেতা বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। খালেদা জিয়া ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হলেও ৩-সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শেখ হাসিনার প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা বাণী নিয়ে উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত হয়।[৩০]

বরাবরের মতো, দলের সভানেত্রীর জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির পায়রা উড়িয়ে দেওয়া, সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ও জেলার নেতৃবৃন্দের সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, বেলুন ওড়ানো, জাতীয় সংগীত পরিবেশন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কাউন্সিলের বাহ্যিক উদ্বোধনী সম্পন্ন করে কাউন্সিলের উদ্বোধক ও অনুষ্ঠানের সভানেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। এ পর্যায়ে অজিত রায়ের পরিচালনায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের সংগীত ও গণসংগীত পরিবেশন করেন। অতঃপর দলের প্রচার সম্পাদক আসাদুজ্জামান নূর এমপি-র পরিচালনায় মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ শেষে দলের দপ্তর সম্পাদক আবদুল মান্নান খান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৫ই আগস্টের সকল শহিদ, জাতীয় চার নেতা এবং গত কাউন্সিল থেকে এ পর্যন্ত দলের নেতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের স্মরণে এক দীর্ঘ শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের পরিচালক আসাদুজ্জামান নূর এমপি কাউন্সিলের সাফল্য কামনা করে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শুভেচ্ছা বাণী পাঠানোর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

www.pathagar.com

বেগম সাজেদা চৌধুরীর স্বাগত ভাষণ

কাউন্সিল উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা উপ-কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন দলের প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক বেগম সাজেদা চৌধুরী। তিনি কাউন্সিলে স্বাগত ভাষণ রাখেন। তিনি তাঁর ভাষণে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বি-রাজনীতিকরণ, গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে কিছু সাক্ষীগোপাল 'তাঁবেদারি দল' সৃষ্টির চেষ্টা, 'মাইনাস টু ফর্মুলা', তা ব্যর্থ হলে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো, শেখ হাসিনাকে 'কেবল রাজনৈতিকভাবেই নয়, শারীরিকভাবেও নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা' ইত্যাদি বিষয় সবিস্তার তুলে ধরেন। কতিপয় নেতার তখনকার ভূমিকার সমালোচনা এবং তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের সাহসী ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন :

> সেই সময় যখন সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রয়োজন ছিল তখন কেউ কেউ দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন। তবে দলের অগণিত নেতা-কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনায় সহযোগিতা করেছেন।[৩১]

শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ

কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে এর উদ্বোধক ও সভার সভাপতি শেখ হাসিনা বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ৫ বছর ও পরবর্তী সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা, গণতন্ত্র ধ্বংসের নানা ষড়যন্ত্র এবং তাঁর নতুন সরকারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার ইত্যাদি তুলে ধরে উপস্থিত দলের নেতা-কর্মী ও কাউন্সিলরদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক একটি ভাষণ প্রদান করেন। এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে[৩২]:

সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শাসসুল হক, তর্কবাগীশসহ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন ও পরবর্তী বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে স্মরণ, ২০০১ সাল থেকে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও 'আওয়ামী লীগ ক্লিনজিং : অপারেশন', চরম প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও ২০০২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠান, হাওয়া ভবনের সিন্ডিকেট, জোট সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি ও দলীয়করণ, সে সময়ে দুর্নীতিতে বারবার বাংলাদেশের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ লালন, শাহ এ এম এস কিবরিয়া, আহসান উল্লাহ মাস্টার, মমতাজউদ্দিন ও মঞ্জুরুল ইমামসহ আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে হত্যা, তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা, ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা ও জঙ্গিবাদের বিএনপি নেত্রীই 'প্রধান পৃষ্ঠপোষক', ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ষড়যন্ত্র, বিচারপতি আজিজের মতো 'আজ্ঞাবহ ব্যক্তি'-কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা, ১ কোটি ২৩ লক্ষ ভুয়া ভোটার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দলীয়করণে বিএনপি-র নীল নকশা, দলীয় বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করতে বিচারপতিদের অবসরের বয়স সীমা বাড়ানো, বিএনপি-

www.pathagar.com

জামায়াত জোটের 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, বিএনপি-জামায়াতের যোগসাজশে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমদের সংবিধানের ধারা লঙ্ঘন করে নিজের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ, প্রতিবাদে উপদেষ্টাদের এক যোগে পদত্যাগ, আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের ষড়যন্ত্রের নির্বাচন বয়কট ও আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া, রাষ্ট্রপতির দেশে জরুরি অবস্থা জারি, নির্বাচনের পূর্ব-তফসিল বাতিল, নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, ছবিযুক্ত ভোটার আইডি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া অভিযান রাজনীতির বিরুদ্ধে অভিযানে পরিণত হওয়া, স্বার্থান্বেষী মহলের 'মাইনাস টু ফর্মুলা' কার্যকর করতে তৎপরতা, গোয়েন্দা সংস্থা সরকারি অর্থ ব্যয় করে 'দল ভাঙা-গড়ার খেলা', 'এই অপকর্মের বিরুদ্ধে' তাঁর (শেখ হাসিনা) প্রথম প্রতিবাদ, তাঁর সন্তানসম্ভবা মেয়েকে দেখতে বিদেশে যাওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, তাঁর দেশে ফিরে আসার ক্ষেত্রে বাধাদান, বিমান বন্দরে নামলে গ্রেপ্তার বা হত্যার হুমকি, ২০০৭ সালের ১৬ই জুলাই বিনা ওয়ারেন্টে তাঁকে গ্রেপ্তার, একের পর এক মামলা দায়ের, নির্জন সাব-জেলে মাসের পর মাস বন্দি রাখা, যারা নতি স্বীকার না করে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ, আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সাহসী ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা, তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের কারণেই দলভাঙার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ, তাঁর মুক্তির দাবিতে শুধু ঢাকা শহরেরই ২৫ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষরদান, ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে ২০০৮ সালের ২৬শে মে ঢাকায় আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা, আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই নির্বাচন দিতে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাধ্য হওয়া, ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বরের নির্বাচন, নির্বাচনে নৌকার পক্ষে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট, জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী (২০২১)-তে কেমন বাংলাদেশ চাই তার রূপকল্প ভিশন ২০২১, আওয়ামী লীগ ভোগে নয়, ত্যাগে বিশ্বাসী, 'আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের শাসক নয়, আমরা জনগণের সেবক', 'মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস সবচাইতে বড় সম্পদ', 'অসৎ পথে অর্জিত অর্থ-সম্পদ কিছুকাল ভোগ করা যায়, কিন্তু জনগণের ভালোবাসা পাওয়া যায় না', পূর্বের সরকার থেকে 'আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে', 'আদর্শবান, চরিত্রবান এবং ত্যাগী নেতা-কর্মীরাই পারে জনগণের কল্যাণ করতে ', 'যেন সরকারের প্রতিটি পয়সা জনগণের জন্য ব্যয় হয়', বিডিআর সদর দপ্তরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ৫৮ জন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা, বিরোধী দলের চেষ্টা দেশকে অস্থিতিশীল করা, বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা, বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে পারা, বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি, ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে পারা, বাহিনীসমূহের রেশনে সমতা আনা, 'সুখদুঃখের সাথী' ড. ওয়াজেদ মিঞাকে হারানো, সারের দাম কমানো, কৃষিতে ভর্তুকি, কৃষি সামগ্রীর মূল্য হ্রাস, ২০১২ সালের মধ্যে 'সবার জন্য খাদ্য' নিশ্চিত করা, 'জাল যার জলা তার' নীতি, গরিব মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, বয়স্ক ভাতা, ভিজিএফ কার্ড, 'একটি বাড়ি একটি খামার', গৃহায়ণ ও আশ্রয়ণ প্রকল্প, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে

www.pathagar.com

তোলা, গ্রামের মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা, ন্যাশনাল আইসিটি রোডম্যাপ, পল্লি অঞ্চলে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার, সারাদেশে ইন্টারনেট সুবিধা ছড়িয়ে দেওয়া, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সাইবার ক্যাফে ও কল সেন্টার, ২০১২ সালের মধ্যে ই-কমার্স, ২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্নেন্স, পর্যায়ক্রমে কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়া, নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ, পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সেশনজট কমানোর লক্ষ্য, কারিগরি শিক্ষার প্রসারে উপজেলা স্তরে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিকে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা, ঝরে পড়া সম্পূর্ণ বন্ধ করা, শিক্ষকদের জন্য স্থায়ী বেতন কমিশন এবং পৃথক চাকরি কমিশন গঠনের পরিকল্পনা, প্রতি পরিবারে অন্তত একজন কর্মক্ষম যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, নতুন শিল্প ও বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন, ২০১৩ সালে জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮ শতাংশ নির্ধারণ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি, প্রতি ৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃচালু ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পদ্মাসেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া, ঢাকা-চট্টগ্রাম চারলেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, ঢাকাসহ দেশের সবকটি মহানগরীর যানজট সমস্যার সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ, রেলওয়ের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, নদীর নিয়মিত ড্রেজিং, উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রবাসীদের কল্যাণ, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করার উদ্যোগ, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি ও ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি, সবার সাথে সমমর্যাদাভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি, ভারতের সাথে টিপাই মুখসহ সকল সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান, সংঘাত ও হানাহানির রাজনীতির চির অবসান, দেশে প্রকৃত সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েম, সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা, অন্য দলের এমপি-দেরও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি করা, সংসদ বর্জনের পথ পরিত্যাগ করে সংসদে যোগদান ও 'দায়িত্বশীল ভূমিকা' পালনের জন্য বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান, ৭ বছরের 'পুঞ্জীভূত জঞ্জাল' ৭ মাসে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়, মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে 'ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য' ইত্যাদি।

শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণের শেষের দিকে ২৯শে ডিসেম্বরের (২০০৮) নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেটকে জাতির জনকের চিরদিনের উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করে একই সঙ্গে তাঁর উন্নয়ন-ভাবনা ও নেতা-কর্মীদের করণীয় এভাবে তুলে ধরেন :

> আমরা চাই, একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। যেখানে প্রতিটি মানুষ সচ্ছল এবং সুন্দর জীবন পাবে। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা এমন একটি উন্নত দেশ গড়ে তুলতে চাই– যেখানে থাকবে না ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা কায়েম করা। সেই স্বপ্ন পূরণের সুযোগ আজ আমাদের সামনে। সেই লক্ষ্য নিয়েই দলের প্রতিটি কর্মীকে কাজ করে যেতে হবে। [৩৩]

www.pathagar.com

বিএনপি-জামায়াত জোটের পরিণতি থেকে 'আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে' নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে এ কথা বলে তাদেরকে যে-কোনো অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'দলের কোন পর্যায়ে কোন নেতা-কর্মীর ব্যক্তিগত লোভ-লালসা বা অন্যায় আচরণের কারণে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হলে তা কোনভাবেই বরদাশত করা হবে না। মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস সবচাইতে বড় সম্পদ।'[৩৪]

অতঃপর তাদের প্রতি শেখ হাসনির আহ্বান, 'আসুন, জনগণের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে কাজ করি। জাতিকে উপহার দেই প্রত্যাশিত ডিজিটাল বাংলাদেশ, আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র, বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা।'[৩৫]

দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন : সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ও আলোচনা, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধন, বাজেট পাশ এবং নেতৃত্ব নির্বাচন

মধ্যাহ্নের সামান্য বিরতির পর একইদিন দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্ব ও পরিচালনায় দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের ভেতরে শুরু হয়। এতে শুধু কাউন্সিলরগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমেই ছিল সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি ছিলেন দলের অন্যতম যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক। দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হলে সৈয়দ আশরাফ আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আবদুল জলিলের মুক্তির পরও তাঁর এ দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। বর্তমান কাউন্সিলের তিনদিন পূর্বে আবদুল জলিল দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ না থাকায় এক পত্র মারফত দলের সভানেত্রীর নিকট পদত্যাগ করেন।[৩৬] ২২শে জুলাই অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় তাঁর ঐ পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে সৈয়দ আশরাফের ওপর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১২২ পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ রিপোর্টে তিনি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমল ও সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরের ঘটনাবলি এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমের বিশদ বিবরণ তুলে ধরেন। বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কার ভয়-ভীতি ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তখন কীভাবে 'শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করার ষড়যন্ত্র' হয়, সারাদেশের নেতা-কর্মীরা এর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে ইত্যাদি তুলে ধরেন। চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ২৬শে মে ২০০৮ ঢাকায় আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠান ও তখনকার পরিস্থিতিতে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে সৈয়দ আশরাফ বলেন, 'আওয়ামী লীগের সারাদেশের নেতা-কর্মীরা ঝুঁকি নিয়ে বর্ধিত সভা করে। ওই সভা হয়েছিল বলেই শেখ হাসিনাকে আমরা ফিরে পাই।'[৩৭] তিনি ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের বিজয়কে গণতন্ত্রের বিজয় বলে চিহ্নিত করেন।

www.pathagar.com

জেলা নেতৃবৃন্দের আলোচনা

সময়ের স্বল্পতার কারণে জেলাভিত্তিক নেতৃবৃন্দের আলোচনার সুযোগ না থাকায় সভার সভানেত্রী ৭টি বিভাগ থেকে ৭ জনকে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানান। এভাবে যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁরা হলেন শেখ হারুন অর রশীদ (সভাপতি, খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ), বদর উদ্দীন কামরান (মেয়র, সিলেট), এ এইচ খায়রুজ্জামান লিটন (মেয়র, রাজশাহী), এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী (মেয়র, চট্টগ্রাম), আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ (বরিশাল বিভাগের পক্ষে), অধ্যক্ষ মতিয়ুর রহমান (ঢাকা বিভাগের পক্ষে) এবং মনসুর আহমেদ (রংপুর বিভাগের পক্ষে)।[৩৮] তাঁরা সকলে যে-কোনো মূল্যে শেখ হাসিনা ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বক্তাদের একজন ঢাকা মহানগরের বাইরেও দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক ত্যাগী নেতা আছেন উল্লেখ করে ভবিষ্যতে 'দল পরিচালনায় তাদের গুরুত্ব দেওয়া হবে' মর্মে শীর্ষ নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন।

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধন

দলের মৌলিক লক্ষ্যসমূহ অপরিবর্তিত রেখে প্রতি কাউন্সিলে ঘোষণাপত্রে কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন হয়ে আসছে। পরিবর্তিত অবস্থার বাস্তবতায় তা আবশ্যক হয়। ২০০৯ সালের কাউন্সিলও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বরং গত নির্বাচনে দিন বদলের সনদ 'ভিশন ২০২১' আওয়ামী লীগের ইশতেহার হিসেবে গৃহীত হওয়ার পর সেটি ছিল জরুরি। দলের ঘোষণাপত্রে সেসব পরিবর্তন বা সংযোজন-বিয়োজন আনা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল[৩৯]:

এক. আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯) থেকে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৭-২০০৮) পর্যন্ত দলের সংগ্রামী ভূমিকা ও ২০০৮ সালের নির্বাচনে দলের গৃহীত 'দিন বদলের সনদ' বা ইশতেহারে ব্যক্ত উন্নয়ন-ভাবনা অন্তর্ভুক্ত করে ঘোষণাপত্রের প্রস্তাব সাজানো হয়।

দুই. দলের ঘোষণা ও কর্মসূচি অংশে জাতির পিতার আজীবনের লালিত স্বপ্ন 'সোনার বাংলা'-র সঙ্গে শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলাকে একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ।

তিন. যে-কোনো অজুহাতে সংবিধান লঙ্ঘন, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ বা বিঘ্ন সৃষ্টির অপচেষ্টা 'প্রতিরোধ' করার সংকল্প।

চার. জাতীয় অগ্রাধিকারের পাঁচটি বিষয় হিসেবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যার সমাধান, দারিদ্র্য বিমোচন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা চিহ্নিত করা।

পাঁচ. রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার প্রদান।

ছয়. উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর তৎপরতা ও জঙ্গিবাদের হাত থেকে দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

www.pathagar.com

সাত. ১৯৭৩ সালের সংশোধিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্টের অধীনে অনতিবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য শুরু করা।

আট. ২০২১ সাল নাগাদ কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই বা ভিশন ২০২১ সংক্ষিপ্ত আকারে পরিশিষ্ট হিসেবে ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা।

গঠনতন্ত্র সংশোধন

কাউন্সিলে গঠনতন্ত্রেও কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল :[৪০]

১. আগামী ২০২০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে দলের কার্যনির্বাহী সংসদসহ সকল স্তরের কমিটিতে মহিলাদের জন্য ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ আসন থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

২. কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক দলের সকল ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করা;

৩. জাতীয় নির্বাচনে কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রণীত দলীয় সকল নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী সাধারণ সম্পাদক সত্যায়িত করে ৯০ দিনের মধ্যে তা নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা;

৪. সংসদ নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার দলীয় শাখা সম্ভাব্য প্রার্থীদের 'গুণাগুণ ও জনপ্রিয়তা' প্রভৃতি বিবেচনা করে প্যানেল আকারে দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের বিবেচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণের বিধান।

উল্লেখ্য, প্রথম তিনটি সংশোধনীতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর আওতায় গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়।

আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের এ অধিবেশনে দলের ৩ বছরের একটি বাজেট কোষাধ্যক্ষ এইচ এন আশিকুর রহমান তুলে ধরেন এবং তা পাস হয়।

নেতৃত্ব নির্বাচন

কাউন্সিল অধিবেশনের কার্যসূচির মধ্যে সর্বশেষে ছিল নির্বাচন। দলের সভানেত্রী নিয়ে কোনো কথা ছিল না। নেতা-কর্মী, কাউন্সিলর সবার নিকট তাঁর আসন বহু পূর্ব থেকেই স্থায়ী হয়ে আছে। জাতির জনকের কন্যা ছাড়াও তিনি নিজ নেতৃত্বগুণে তা অর্জন করেছেন। আলোচনা বা জল্পনা-কল্পনা ছিল সাধারণ সম্পাদক কে হবেন তা নিয়ে। আরও একটি বিষয়ে নেতা-কর্মীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সাধারণ ঔৎসুক্য ছিল, আর তা হচ্ছে সংস্কারপন্থি হিসেবে চিহ্নিত দলের কতিপয় জ্যেষ্ঠ নেতার ভাগ্য নির্ধারণ।

বিকেলের অধিবেশনে দলের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র এবং বাজেট পাসের পর সভানেত্রী শেখ হাসিনা পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে বরাবরের মতো মঞ্চ থেকে নেমে কাউন্সিলরদের সারিতে আসন গ্রহণ করেন। এরপর ৪টা থেকে ৫টা এক ঘণ্টা নেতৃত্ব নির্বাচন পর্ব চলে।[৪১] এ ব্যাপারে পূর্বেই গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী দলের প্রবীণ নেতা এম এ মান্নানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং এডভোকেট রহমত আলী

www.pathagar.com

ও আমজাদ হোসেনকে সদস্য করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মঞ্চে উঠে ঘোষণা করেন যে, কোনো পদে একের অধিক প্রার্থী থাকলে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ব্যালট পেপার ও স্বচ্ছ ব্যালট বক্সসহ সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হয়েছে। এ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনের সদস্য এডভোকেট রহমত আলী সভাপতি পদে প্রার্থিতা আহ্বান করলে, 'তখন কাউন্সিলররা সবাই দাঁড়িয়ে শেখ হাসিনা, শেখ হাসিনা বলে শ্লোগান দিতে থাকেন।' দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম সাজেদা চৌধুরী মঞ্চে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতি পদে শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করেন।[৪২] প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী প্রস্তাব সমর্থন করেন। কাউন্সিলররাও সমস্বরে এ প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং 'বিপুল করতালির মধ্যে শেখ হাসিনা ৬ষ্ঠ বারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হন।'[৪৩] এরপর এডভোকেট রহমত আলী সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থীদের নাম আহ্বান করেন। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম-এর নাম প্রস্তাব করেন এবং মতিয়া চৌধুরী এ প্রস্তাবও সমর্থন করেন। অন্য কোনো প্রার্থী না থাকায় সৈয়দ আশরাফও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। অতঃপর নবনির্বাচিত সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদক মঞ্চে গিয়ে আসন গ্রহণ করেন। বারবার তাঁকে সভানেত্রী হিসেবে নির্বাচিত করায় কাউন্সিলরদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, 'দুঃসময়ে দলের হাল ধরা নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামকে নিয়ে দলের কমিটি গঠন করবো। এককভাবে কমিটি করবো না।' তিনি এও বলেন যে, 'দলের দুঃসময়ে দায়িত্ব পালনকারী নেতাদের মূল্যায়ন করা হবে।'[৪৪]

সবশেষে, শেখ হাসিনা তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সংক্ষিপ্ত সমাপনী বক্তব্য রাখেন, যা ছিল খুবই গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ।[৪৫] তাঁর বক্তব্যের সারকথা ছিল : 'বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনেক ঘটনা ঘটেছে। তৃণমূল নেতাদের দৃঢ়তার কারণে দলকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসা গেছে', 'আপনারা আমাকে রক্ষা করেছেন', আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে সবসময় 'কর্মীরাই হাল ধরে, যা ছয় দফার সময়ে ঘটেছিল, এবারও ঘটেছে', 'দল ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণেই সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠা গেছে', 'জেলে থাকার সময় যখন তাঁকে আদালতে আনা হতো তখন তিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমানের কাছে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য প্রতিবারই চিরকুট পাঠাতেন' ইত্যাদি। বিগত দিনে আওয়ামী লীগে ভাঙন বা অনেকে দল ছেড়ে চলে গেলেও আওয়ামী লীগের কোনো ক্ষতি হয়নি কিংবা আওয়ামী লীগ দুর্বল না হয়ে বরং শক্তিশালী হয়েছে প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ হীরার টুকরো। যত কাটবে ততো জ্বলজ্বল করবে।' ১/১১-এর সময় সাব-জেলে বন্দি থাকাকালীন 'কে কী করেছেন তা দেখেছি' উল্লেখ করে দলের সংস্কারপন্থি হিসেবে খ্যাত নেতাদের প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন :

> আওয়ামী লীগ একটি পরিবার ... পরিবারে অনেকে ভুল করে। যারা ভুল করেছেন তাদের সঠিক পথে আনতে হবে। অতীতে যা ঘটেছে সে সব ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। কেউ অন্যায় করলে শাস্তি পায়। ...কর্মীদের মাধ্যমে তারা শাস্তি পেয়েছেনও।[৪৬]

www.pathagar.com

এরপর তিনি এই বলে শেষ করেন, 'আমি সবসময় মন বড় করে উদারভাবে চলি ... এখন ক্ষমা করার সময়, এখন শুধু ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা।'[৪৭]

কাউন্সিল অধিবেশনে সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বাকি ৭১ কর্মকর্তা ও সদস্যের মধ্যে ৪৩ জনের নাম ঘোষণা করা হয়।[৪৮] আরও পরে বাকি পদ পূরণ করা হয়। পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি নিম্নরূপ :

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য	:	সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন
		বেগম সাজেদা চৌধুরী
		আতাউর রহমান খান (কায়সার)
		এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন
		বেগম মতিয়া চৌধুরী
		শেখ ফজলুল করিম সেলিম
		ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর
		কাজী জাফর উল্লাহ
		রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু
		আবদুল লতিফ সিদ্দিকী
		সতীশ চন্দ্র রায়
		এডভোকেট সাহারা খাতুন
		ওবায়দুল কাদের
		আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু
সাধারণ সম্পাদক	:	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	:	মাহবুব-উল আলম হানিফ
		ডা. দীপু মনি
		জাহাঙ্গীর কবির নানক
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	আহম্মদ হোসেন
		মো. মিজবাহ উদ্দিন সিরাজ
		বি এম মোজাম্মেল হক
		আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম
		আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন
		খালিদ মাহমুদ চৌধুরী
		বীর বাহাদুর (জাহাঙ্গীর কবির নানকের স্থলাভিষিক্ত)
অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক	:	আ হ ম মোস্তফা কামাল (লোটাস কামাল)
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	:	সৈয়দ আবুল হোসেন
আইন বিষয়ক সম্পাদক	:	এডভোকেট আবদুল মতিন খসরু

www.pathagar.com

কৃষি ও সমবায় সম্পাদক	:	ড. মো. আবদুর রাজ্জাক
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	:	এডভোকেট আফজাল হোসেন
ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	ফরিদুন্নাহার লাইলী
দপ্তর সম্পাদক	:	এডভোকেট আবদুল মান্নান খান
উপ-দপ্তর সম্পাদক	:	মৃণাল কান্তি দাস
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	:	এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	:	নূহ-উল-আলম লেনিন
উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	:	অসীম কুমার উকিল
বন ও পরিবেশ সম্পাদক	:	ড. হাসান মাহমুদ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	:	স্থপতি ইয়াফেস ওসমান
মহিলা সম্পাদিকা	:	ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক[৪৯]	:	ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম
যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক	:	দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুটুল
শিক্ষা ও মানবসম্পদ সম্পাদক	:	নুরুল ইসলাম নাহিদ
শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক	:	লে. কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান
শ্রম ও জনশক্তি সম্পাদক	:	হাবিবুর রহমান সিরাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	আসাদুজ্জামান নূর
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সম্পাদক	:	ডা. বদিউজ্জামান ভূঁইয়া ডাবলু
কোষাধ্যক্ষ	:	এ এইচ এন আশিকুর রহমান

কার্যনির্বাহী সদস্য : মোহাম্মদ নাসিম, আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, মো. আলতাফ হোসেন, অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, শেখ হারুন অর রশিদ, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম, এ কে এম রহমতউল্লাহ, সৈয়দা জেবুন্নেছা হক, বেগম মনুজান সুফিয়ান, খায়রুজ্জামান লিটন, এডভোকেট ফজলে রাব্বী, শ্রী বিপুল ঘোষ, আবদুর রহমান, আখতারউজ্জামান, টিপু মুন্সি, মোস্তফা ফারুখ মোহাম্মদ, এম এ মান্নান, মজিবর রহমান মজনু, মির্জা আজম, এডভোকেট মমতাজ উদ্দিন মেহেদী, আখতার জাহান, ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, শ্রী সুজিত রায় নন্দী, আমিনুল ইসলাম আমিন, এ কে এম এনামুল হক শামীম।

এছাড়া এই কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে ৪১ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের ২০ জনের নাম ঘোষণা করা হয়।[৫০] তাঁরা হলেন ডা. এস এ মালেক, আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি, এইচ টি ইমাম, আমির হোসেন আমু এমপি, আব্দুর রাজ্জাক এমপি, তোফায়েল আহমেদ এমপি, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি, মো. আবদুল জলিল এমপি, মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ (অব.), দেওয়ান ফরিদ গাজী এমপি, এডভোকেট মো. রহমত আলী এমপি, প্রফেসর ড. আবদুল খালেক, প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, এম এ মান্নান, প্রফেসর ডা. আবদুল মান্নান এমপি, কাজী আকরাম উদ্দীন, এস এম নুরুন্নবী, এডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান, ড. আলাউদ্দিন আহমেদ ও ড. মশিউর রহমান।

www.pathagar.com

'দুঃসময়ে দলের হাল ধরা' সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম যে এবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন, তা প্রায় নিশ্চিত ছিল। তিনি তাঁর প্রাপ্য স্থানটিই পেয়েছেন। তবে নতুন কমিটিতে সংস্কারপন্থি হিসেবে চিহ্নিত নেতৃবৃন্দের স্থান কোথায় হয়, সেটিই ছিল সবার আগ্রহের বিষয়। যেমনটি ধারণা করা হয়েছিল, তেমনটিই ঘটেছে। সংস্কারপন্থি হিসেবে চিহ্নিত মধ্যম পর্যায়ের অনেকে[৫১] নতুন কমিটি থেকে সম্পূর্ণ বাদ পড়েন। দলের 'হেভিওয়েট' হিসেবে সর্বমহলে পরিচিত চার নেতা আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এঁদের প্রেসিডিয়ামের পরিবর্তে উপদেষ্টা পরিষদে স্থান হয়। সাংগঠনিক সম্পাদকের পুরো টিম পাল্টিয়ে নতুনদের জায়গা দেওয়া হয়। আর ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে দুঃসময়ে যাঁরা সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের অনেককে শেখ হাসিনা কাউন্সিলে তাঁর সমাপনী ভাষণে দেওয়া ঘোষণা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করেন।[৫২]

তিনটি প্রধান কারণে আওয়ামী লীগের এ কাউন্সিল অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক. ১/১১-র সময় দলের নেতৃত্বের এক অংশের মধ্যে তথাকথিত 'সংস্কার'-এর নামে যে ভিন্ন প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তা থেকে কীভাবে উত্তরণ ঘটবে সেটি বড় প্রশ্ন ছিল। অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে দলের প্রধান শেখ হাসিনা সে অবস্থা মোকাবেলা করে আওয়ামী লীগকে সুসংহত করতে সক্ষম হন। 'অতীতে যা ঘটেছে সেসব ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে' তাঁর এ অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি খুবই প্রাজ্ঞ ও বাস্তবধর্মী ছিল। দুই. দলের কর্মসূচি হিসেবে দিনবদলের সনদ 'ভিশন ২০২১' গ্রহণ। জাতির জন্য এটি ছিল উন্নয়নের রোডম্যাপ। আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে এর চেয়ে উত্তম কর্মপরিকল্পনা আর কিছু হতে পারে না। দেশের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের ইতিহাসেও এটি অপর একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য। তিন. '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি পূর্বে আওয়ামী লীগ উত্থাপন করেছে বটে, কিন্তু নির্বাচনি ইশতেহার ও দলের ঘোষণাপত্রে অঙ্গীকার হিসেবে তা এই প্রথম, যা এ অধ্যায়ের মূল আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে গৃহীত উদ্যোগ সম্বন্ধে জানা যাবে।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ২; *সংবাদ*, ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ২, ১১; আরও *ইত্তেফাক*, ২৪শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ২; *সংবাদ*, ২৩শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১; *সংবাদ*, ২৩শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১; *সংবাদ*, ৩১শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১

২. চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী ইউরিয়া সার কারখানার জেটি থেকে এ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়। কারখানাটি সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত। তখন শিল্পমন্ত্রী ছিল যুদ্ধাপরাধী ও জামায়াতের সভাপতি মতিউর রহমান নিজামী। মনে করা হয়, ভারতের আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন 'উলফা' কিংবা ইসলামি জঙ্গিদের জন্য অস্ত্রের এ চালানটি এসেছিল।

www.pathagar.com

৩. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনি ইশতেহার ২০০৮*, পৃ. ৩

৪. ১/১১-র পর ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক ২১শে জানুয়ারি ২০০৭ তিনি অপসারিত।

৫. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অক্টোবর ২০১১)*, পরিশিষ্ট ১৬, সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধনী) আইন ২০০৪, পৃ. ১৩৪-১৩৫

৬. যেমন মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা, বিতর্কিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজকে না সরানো, ভুয়া ভোটার তালিকা সংশোধন না করা। তার একতরফা ও পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের প্রতিবাদে ১১ই ডিসেম্বর (২০০৬) ৪ জন উপদেষ্টা একসঙ্গে পদত্যাগ করেন।

৭. গোয়েন্দা সংস্থা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বড় এ দুই দলে ভাঙন সৃষ্টির চেষ্টায় বিএনপি-র ক্ষেত্রে কিছুটা সফল হয়। এ দলের নেতৃত্বের বড় একটি অংশ রাতারাতি সেনাশাসকদের পক্ষে 'সংস্কারবাদী' হয়ে যান। ২৯শে অক্টোবর ২০০৭ খালেদা জিয়ার সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের বাসায় বিএনপি স্থায়ী কমিটির ১২ সদস্যের মধ্যে ৭ জনের উপস্থিতিতে এক বৈঠকে সাইফুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং দলের অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দীনকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করে একটি পাল্টা বিএনপি দাঁড় করার চেষ্টা হয়। বিএনপি-র সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল মান্নান ভূঁইয়াসহ আরও অনেকে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। তবে খালেদা জিয়ার বাইরে পাল্টা বিএনপি গঠন সহজ ছিল না। আওয়ামী লীগের তখনকার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান বিএনপি-র পাল্টা বিএনপি কমিটি গঠনকে 'মধ্যরাতের ক্যু' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। অপর বড় দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের একটি অংশের মধ্যে একই প্রবণতা প্রথম দিকে লক্ষ করা গেলেও তারা সংখ্যায় ছিলেন খুবই কম এবং শীঘ্রই সে পথ থেকে সরে আসেন। সারাদেশব্যাপী দলের নেতা-কর্মীরা ছিলেন শেখ হাসিনার পক্ষে ও সেনা শাসন-নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ।

৮. বিএনপি-র সাবেক অন্যতম যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আহমদ কোরেশীর দ্বারা প্রগতিশীল ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) নামে সেনাসমর্থক এরূপ একটি দল গঠনে গোয়েন্দা সংস্থার চেষ্টা ছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়।

৯. ১/১১-র শুরুর দিকে ১৮ই জানুয়ারি ২০০৭ ড. মুহাম্মদ ইউনূস নাগরিক শক্তি নামে সেনাসমর্থক একটি রাজনৈতিক দল/প্লাটফরম গঠনের ঘোষণা দিয়ে অফিস নিয়ে বসেন। কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে ৩ মাসের মধ্যে রণে ভঙ্গ দিয়ে অফিস গুটিয়ে নেন। দ্রষ্টব্য Rounaq Jahan, *Political Parties*, p. 56; আরও, ড. হারুন-অর-রশিদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : আগস্টের ঘটনা, গ্রেপ্তার-রিমান্ড ও কারাগারের দিনগুলি*, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ১৭৪। বইটি লেখকের বন্দি থাকাকালে লিখিত দিনলিপির ওপর ভিত্তি করে রচিত।

১০. ১/১১-র পরপর সেনাসমর্থক রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থা গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেনের সহযোগিতা কামনা করে তাঁকে নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'আমি বৃদ্ধ মানুষ, এক পা কবরে ...।' ২০০৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগস্টের ছাত্র-শিক্ষক বিক্ষোভের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়ে রিমান্ডে গোপন স্থানে চোখবাঁধা অবস্থায় যৌথ বাহিনীর

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসাবাদের সময় বর্তমান গ্রন্থের লেখককে কথা প্রসঙ্গে এ তথ্য জানানো হয়। ফেরদৌস আহমদ কোরেশী যে তাঁদের পক্ষে নতুন দল গঠনের চেষ্টা করছেন এবং শেখ হাসিনার পর এবার খালেদা জিয়াও যে গ্রেপ্তার হবেন (তিনি ২রা সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হন) এসব তথ্যও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ঐ সময় লেখককে জানান। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, হারুন-অর-রশিদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : আগস্টের ঘটনা, গ্রেপ্তার-রিমান্ড ও কারাগারের দিনগুলি*, ঢাকা ২০০৮ পৃ. ২৬

১১. শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র থাকাকালে আজম জে চৌধুরী নামে একজন ব্যবসায়ী কর্তৃক ৯ই এপ্রিল ২০০৭ তাঁর বিরুদ্ধে ৩ কোটি টাকার চাঁদাবাজি মামলা দায়ের করানো হয়। ২৩শে এপ্রিল তাঁর বিরুদ্ধে আরও দুইটি মামলা হয়। ৯ই ডিসেম্বর নাইকো দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার সঙ্গে শেখ হাসিনাকেও জড়িত করা হয়।

১২. শেখ হাসিনা প্রথমে ওয়াশিংটন থেকে লন্ডন আসেন। সরকারের পক্ষ থেকে সকল এয়ার লাইন্সকে তাঁকে ঢাকায় বহন না করার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। প্লেনে উঠতে গিয়েও তিনি ব্যর্থ হন। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বিষয়টি ব্যাপক প্রচার পায়। হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে, বিমান বন্দরে নামামাত্র গ্রেপ্তার করা হবে, এমনকি হত্যারও হুমকি দেওয়া হয়। বিস্তারিত *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ২০০৯*, এরপর *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০৯*

১৩. ২০০৭ সালের ২০শে আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ফুটবল খেলা দেখা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও মাঠ সংলগ্ন সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে সমগ্র ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ঐ ঘটনায় ২৩শে আগস্ট মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার বাসা থেকে যৌথ বাহিনীর লোকজন বর্তমান গ্রন্থের লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ড. আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করে চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। দুই দফা রিমান্ডসহ মোট ১১ দিন এভাবে কাটানোর পর ৫ মাস কারাবন্দি করে রাখে। একই ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর দুই শিক্ষকও (একজন শিক্ষক সমিতির সভাপতি) গ্রেপ্তার হন। এ সময় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেনাশাসন-নিয়ন্ত্রণ বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ জন শিক্ষককেও গ্রেপ্তার করা হয়। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে বন্দি করে বিশেষ আদালতে এক মামলায় বিচারের জন্য হাজির করা হলে তিনি সেখানে গ্রেপ্তারকৃত শিক্ষকদের সম্বন্ধে বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেউ অপমান করতে পারে না। পাকিস্তানিরা শিক্ষকদের হত্যা করেছিল। আর এ সরকার তাদের কারাগারে আটক রেখে নির্যাতন করছে। এটা খুবই দুঃখজনক। একই সঙ্গে জঘন্যও। আমি নিজেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলাম। তাই প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবেও শিক্ষকদের মুক্তি দাবি করছি।' *মানবজমিন*, ১৮ই জানুয়ারি ২০০৮; আরও ড. হারুন-অর-রশিদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : আগস্টের ঘটনা*, পৃ. ২২৫

১৪. ২০০৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন।

www.pathagar.com

১৫. আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবের মধ্যে ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ধর্মভিত্তিক কোনো দলকে নিবন্ধন না দেওয়া, যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে প্রার্থী হতে অযোগ্য ঘোষণা, নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনী মোতায়েন ইত্যাদি। এছাড়া দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তি এবং জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারেরও তারা দাবি জানান। আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। দ্রষ্টব্য ড. হারুন-অর-রশিদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : আগস্টের ঘটনা*, পৃ. ৯৬

১৬. ড. হারুন-অর-রশিদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : আগস্টের ঘটনা*, পৃ. ২১১

১৭. *মানবজমিন*, ১৮ই ডিসেম্বর ২০০৭; আরও ড. হারুন-অর-রশিদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : আগস্টের ঘটনা*, পৃ. ২২৫

১৮. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০৯*

১৯. নির্বাচনের প্রথম তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৮ই ডিসেম্বর (২০০৮)। বিএনপি-র পক্ষ থেকে তাদের প্রস্তুতির জন্য আরও সময় আবশ্যক দাবি করা হলে ২৯শে ডিসেম্বর তা পুনঃনির্ধারিত হয়।

২০. অগ্রাধিকারের ৫টি বিষয় ছিল (এক) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, (দুই) দুর্নীতি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা, (তিন) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যার সমাধান, (চার) দারিদ্র্য বিমোচন এবং (পাঁচ) সুশাসন প্রতিষ্ঠা। দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনি ইশতেহার ২০০৮*, পৃ. ৬-৯

২১. দ্রষ্টব্য 'রূপকল্প (ভিশন) অনুযায়ী কতিপয় লক্ষ্যমাত্রা' বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনি ইশতেহার ২০০৮*, পৃ. ২৪

২২. Abul Fazl Huq, *Bangladesh Politics*, p. 269; আরও, Rounaq Jahan, *Political Parties*, p. 58

২৩. এরশাদের জাতীয় পার্টি মহাজোটের শরিক হিসেবে প্রাপ্ত আসনের বাইরে আরও কয়েকটি আসনে প্রার্থী দেয়। মোট ৪৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জাতীয় পার্টি ২৭টি আসন ও প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬.৪৭ ভাগ পায়।

২৪. জামায়াত মোট ৩৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪.৪৮ ভাগ পায়

২৫. নোট ৭ দ্রষ্টব্য।

২৬. বিস্তারিত 'জলিলের পদত্যাগ', *সংবাদ*, ২২শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১। ২০০৭ সালের ৫ই আগস্ট আবদুল জলিলের স্ত্রী রেহানা জলিল এক সংবাদ সম্মেলনে সরকারের কাছে তাঁর স্বামীর মুক্তি দাবি করেন। প্রধান উপদেষ্টাকে লেখা আবদুল জলিলের এই মর্মে স্বাক্ষরকৃত আবেদনের কপি ঐ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, আবদুল জলিল তখন অসুস্থ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

২৭. হারুন-অর-রশিদ, *৬-দফা'র ৫০ বছর*, পৃ. ১৫০

২৮. বিস্তারিত *প্রথম আলো*, ২৭শে মে, ২০০৮, পৃ. ১, ১৭ ; আরও *ইত্তেফাক*, ২৭শে ২০০৮, পৃ. ১, ২, ৩, ১৫

www.pathagar.com

২৯. এ সংক্রান্ত বিস্তারিত, *ইত্তেফাক*, ২৪শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ২; *ইত্তেফাক*, ২৫শে ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ১, ২; আওয়ামী লীগের কাউন্সিল রূপ নেয় 'গণতন্ত্রের উৎসবে', *সংবাদ*, ২৫শে ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ১২, ২

৩০. দ্রষ্টব্য 'জাতীয় স্বার্থে এক হয়ে কাজ করতে এগিয়ে আসুন', *সংবাদ*, ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১। খালেদা জিয়া তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, 'আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আমি এ সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আওয়ামী লীগ একটি প্রাচীন রাজনৈতিক দল। এ জাতির উত্থান-পতন ও নানান ক্রান্তিকালে আমাদের একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে...।' পূর্বে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৩-সদস্যের এক প্রতিনিধি দল পল্টনে বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ কার্ড দিয়ে আসা হলে, বিএনপি-র স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, 'বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে যোগ দিতে পারেন, তবে যাওয়ার ব্যাপারে দল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে।' বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবকে আমন্ত্রণ জানানো সম্বন্ধে ব্যারিস্টার মওদুদ তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'বিরোধী দলের প্রতি সরকারি দলের এ আন্তরিকতায় রাজনীতির সংস্কৃতিতে এক নতুন উদাহরণের সৃষ্টি হলো।' দ্রষ্টব্য *সংবাদ*, ২৪শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১

৩১. *সংবাদ*, ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ২

৩২. বিস্তারিত *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০৯*; আরও *সংবাদ*, ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১

৩৩. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০০৯*

৩৪. *ঐ*

৩৫. *ঐ*

৩৬. 'জলিলের পদত্যাগ', *সংবাদ*, ২২শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১

৩৭. *সংবাদ*, ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ২

৩৮. *ঐ*

৩৯. সংকলিত। দ্রষ্টব্য *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র ২০০৯*; আরও *সংবাদ*, ২২শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১; *সংবাদ* ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১

৪০. সংকলিত। তথ্যসূত্র, *ঐ*

৪১. বিস্তারিত *সংবাদ* ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ২

৪২. সাজেদা চৌধুরী মঞ্চে গিয়ে প্রথমে বক্তৃতা দিতে শুরু করলে কাউন্সিলরগণ একযোগে তাঁকে বক্তৃতা রেখে সভাপতি পদে শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করার আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি তাই করেন। *সংবাদ* ২৫শে ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ১, ১১

৪৩. *সংবাদ*, ২৫শে ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ১, ১১

৪৪. দ্রষ্টব্য 'এখন শুধু ক্ষমা, ক্ষমা', *সংবাদ*, ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ২; *ইত্তেফাক*, ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ২

www.pathagar.com

৪৫. *সংবাদ*, ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ২; *ইত্তেফাক*, ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ২

৪৬. *ঐ*

৪৭. 'এখন শুধু ক্ষমা, ক্ষমা', *সংবাদ*, ২৫শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ২

৪৮. *সংবাদ*, ৩১শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১

৪৯. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদকের পদটি ২০০২ সালে দলের গঠনতন্ত্রে সৃষ্টি করা হয়। দ্রষ্টব্য *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ২০০২*

৫০. *সংবাদ*, ৩১শে জুলাই ২০০৯, পৃ. ১, ১১

৫১. এদের মধ্যে অন্যতম যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মুকুল বোস, তিন সাংগঠনিক সম্পাদক যথা সাবের হোসেন চৌধুরী, সুলতান মো. মনসুর আহমেদ, মাহমুদুর রহমান মান্না, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য খ ম জাহাঙ্গীর হোসেন, হাবিবুর রহমান খান-এর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক আবু সাইয়িদও নতুন কমিটিতে স্থান পাননি।

৫২. যেমন ফরিদুন্নাহার লাইলী পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পর্যন্ত না থাকা সত্ত্বেও ১/১১-র সময় দলের পক্ষে ভূমিকা পালনের কারণে দলের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকের পদ লাভ করেন। এ ছাড়া দল থেকে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে সংসদ সদস্য হন। মহিলা এমপি ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পী অপর উদাহরণ।

www.pathagar.com

অধ্যায় : একুশ

কাউন্সিল অধিবেশন ২০১২ : সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার

কাউন্সিল (২৪শে জুলাই ২০০৯) থেকে প্রায় সাড়ে ৩ বছর পর ২৯শে ডিসেম্বর ২০১২ আওয়ামী লীগের পরবর্তী ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।[১] এর উদ্বোধকও ছিলেন তিনি। এটি ছিল দলের ১৯তম কাউন্সিল অধিবেশন। দল তখন সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এটিই ছিল আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল আয়োজন। এ উপলক্ষ্যে সারাদেশে নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কাউন্সিলর-ডেলিগেট, নেতা-কর্মী ও আমন্ত্রিত অতিথি নিয়ে এতে প্রায় ৩০-৩৫ হাজার লোকের সমাগম ঘটে। কাউন্সিলে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। এক ঐতিহাসিক পটভূমিতে এ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

পটভূমি

২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত সময়টি ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের ৫ বছরের শাসন আমলের অন্তর্গত। এ সময়ে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বেশকিছু যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত হয়। সেসবের মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার আত্মস্বীকৃত খুনিদের ফাঁসির রায় কার্যকর করা (২৮শে জানুয়ারি ২০১০), ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন, দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর পর বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়া (১৩ই নভেম্বর ২০১০), জেনারেল জিয়ার সংবিধানের ৫ম সংশোধনী ও জেনারেল এরশাদের ৭ম সংশোধনী আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষণা (২০১০), আদালতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল (১০ই মে ২০১১), ৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনর্বহাল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলসহ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস (৩রা জুলাই ২০১১) ইত্যাদি। এছাড়া ঢাকা সিটি করপোরেশনকে উত্তর ও দক্ষিণ এ দুই ভাগে বিভক্ত করে দুটি সিটি করপোরেশনে রূপান্তরিত করা (২০১১), আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণ (১৪ই মার্চ ২০১২), বিশ্বব্যাংকের পদ্মাসেতুর ঋণ চুক্তি প্রত্যাহার (২৯শে জুন ২০১২), ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর বাংলাদেশ সফর (৬ই সেপ্টেম্বর ২০১২) এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ছিটমহল ও সীমান্তসমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ঐকমত্য এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আইন বহির্ভূতভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি-র পদে দীর্ঘদিন আসীন থাকা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাটিও ছিল বহুল আলোচিত। নানা ইস্যুতে বিএনপি-র আন্দোলনের চেষ্টা, হরতাল

www.pathagar.com

পালন, দীর্ঘ সময় ধরে সংসদ বর্জনের মতো ঘটনা তো ছিলই। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বরেণ্য রাজনীতিবিদ আবদুর রাজ্জাকের মৃত্যু (২৩শে ডিসেম্বর ২০১১) ছিল এ সময়ের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্যের হত্যাকাণ্ড ছিল জাতির জন্য গভীর ট্র্যাজেডি। ঐ হত্যাকাণ্ডের যাতে বিচার অনুষ্ঠিত হতে না পারে সেজন্য ঐ সময়ে ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোশতাক ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামে একটি কুখ্যাত আইন পাস করে (২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫)। এরপর জেনারেল জিয়া ক্ষমতাসীন হয়ে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে সেটিকে অন্তর্ভুক্ত করেন (৬ই এপ্রিল ১৯৭৯)। '৭৫-এর পর থেকেই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের সম্মুখীন করা ছিল আওয়ামী লীগের প্রধান দাবি। তা পূরণ করা দূরে থাকুক, ৭৫-পরবর্তী শাসকগোষ্ঠী খুনিদের নানাভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। এমতাবস্থায়, তখন এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য মামলা পর্যন্ত দায়ের করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য জাতিকে দীর্ঘ ২১ বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে সরকার গঠনে সক্ষম হলে প্রথম সুযোগেই শেখ হাসিনার সরকার কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইন বাতিল করে (১২ই নভেম্বর ১৯৯৬)। এভাবে বিচারের পথে প্রধান বাধা অপসারিত হয়। ১৯৯৮ সালের ৮ই নভেম্বর ঢাকার দায়রা জজ গোলাম রসুল বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারে ২০ জন আসামির মধ্যে ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড 'ফায়ারিং স্কোয়াডে' কার্যকর করার আদেশ দেন, যা পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ হাসিনার ঐ সরকারের আমলে উচ্চ আদালতেও মামলার বিচারকার্য অনেকটা অগ্রসর হয়।[২] কিন্তু ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠিত হলে মামলার বিচারে আর কোনো অগ্রগতি না হয়ে বরং তা ঝুলে যায়। বিচারপতি স্বল্পতার কারণে আপিল বিভাগে সমস্যা দেখা দেয় আর জোট সরকার ইচ্ছা করেই নতুন বিচারপতি নিয়োগ দান থেকে বিরত থাকে। এ বিচার অনুষ্ঠান আদৌ যে তারা চায়নি, তাদের এ অবস্থান তাই প্রমাণ করে। ২০০৮ সালের নির্বাচনোত্তর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তাঁর দ্বিতীয়বারের সরকার গঠিত হওয়ার পর মামলার বিচার প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক নতুন বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০০৯ সালের ১৯শে নভেম্বর বিচারপতি তফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বাধীন ৫ সদস্যের আপিল বিভাগ দীর্ঘ শুনানি শেষে রায়ে ১২ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন। সব প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন শেষে ২০১০ সালের ২৮শে জানুয়ারি ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধুর পাঁচ আত্মস্বীকৃত খুনি যথা কর্নেল ফারুক, লে. কর্নেল শাহরিয়ার রশীদ, লে. কর্নেল মহিউদ্দিন, মেজর বজলুল হুদা ও লে. কর্নেল এ কে এম মহিউদ্দিনের ফাঁসির আদেশ ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে কার্যকর করা হয়।[৩]

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের দাবির পাশাপাশি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মিলে গণহত্যার মতো জঘন্যতম অপরাধ তথা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, সেসব যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবিও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। ক্রমান্বয়ে এ দাবি এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে, ১৯৯২ সালে শহিদ জননী

www.pathagar.com

জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণআদালত নামে জনতার আদালতে কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের এক প্রতীকী বিচার এবং ঐ বিচারে তার অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য এ রায় ঘোষণা করে এর উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক বিচার অনুষ্ঠানের দাবি জানানো হয়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সব সময়ই সোচ্চার ছিল। ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের সুযোগ লাভ করে বটে, তবে তা ছিল দীর্ঘ ২১ বছর পর। আওয়ামী লীগ সরকারের সম্মুখে ছিল নানা চ্যালেঞ্জ। তাই সে সময়ে সরকারকে অনেক সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করা হয়।[৪] নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর ২৯শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।[৫] ২৪শে জুলাই ২০০৯ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) এ্যাক্টের আওতায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি দলের ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬] এবার শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচনি অঙ্গীকার পূরণে অগ্রসর হয়। ২০১০ সালের ২৫শে মার্চ আন্তর্জাতিক ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) এ্যাক্টের ধারাবলে বিচারপতি মো. নিজামুল হককে চেয়ারম্যান করে ৩ সদস্যের একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন, ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি আইনজীবী প্যানেল এবং ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্তকারী সংস্থা নিয়োগ দান করে পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে বিচারকার্য শুরু করা হয়।[৭] একই বছর যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, জামায়াতের নায়েবে আমীর দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, ২০১১ সালে বিএনপি নেতা ও সাবেক মন্ত্রী আবদুল আলীম এবং ২০১২ সালের ১১ই জানুয়ারি শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযম গ্রেপ্তার হয়ে বিচারের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধাপরাধীদের এ বিচার অনুষ্ঠান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এসব যুদ্ধাপরাধীর বিচার যাতে অনুষ্ঠিত না হতে পারে সেজন্য বিএনপি ও জামায়াতের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

আমাদের দেশে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিনের। ৭২ সালের সংবিধানে ব্যক্ত (অনুচ্ছেদ ১৭) 'একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার' লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বাধীনতার পরপর বঙ্গবন্ধু সরকার ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের ট্র্যাজেডির পর ঐ কমিশনের সুপারিশ (১৯৭৪) আর বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর বিভিন্ন সরকারের সময় অর্ধডজনের মতো শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিশন/কমিটি গঠিত হলেও এ ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি হয়নি। শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের এ সরকারের সময় ২০০৯ সালের ৬ই এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে ১৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির

www.pathagar.com

রিপোর্টের ওপর সর্বমহলের মতামতের ভিত্তিতে একটি শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হলে ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০[৮] সময়ের একটি বড় সাফল্য।

১৯৮১ সালের ৩০শে মে জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে একদল সেনা সদস্যের হাতে নিহত হলে বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর দুই সন্তানের জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মইনুল রোডের ১৬৮ কাঠার একটি বাড়ি এক টাকা মূল্যে ইজারা দেয়। এছাড়া গুলশানে ৩৩ কাঠার অপর একটি বাড়ি দেওয়া হয়। ১৯৮৪ সালে বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি'র চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব গ্রহণের পরও ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতেই বসবাস করে আসছিলেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার নতুন সরকারের আমলে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ ইজারা বাতিল করে বাড়িটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিকট হস্তান্তরে কয়েক দফা নোটিশ দেয়। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। হাইকোর্টে খালেদা জিয়ার পক্ষে দায়েরকৃত রিট আবেদন খারিজ হয়ে গেলে ১৪ই অক্টোবর ২০১০ তাঁকে বাড়িটি ছেড়ে দিতে হয়। আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহুল আলোচিত ঘটনাবলির একটি ছিল এটি।

২০১০ ও ২০১১ সালে উচ্চ আদালত বাংলাদেশের সংবিধান-সংক্রান্ত তিনটি ঐতিহাসিক রায়[৯] দেন, যা দেশের রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রথমত, ২০১০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে আনীত সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর ওপর এক রায়ে সংবিধানের মূল চেতনা ও কাঠামোর পরিপন্থি হওয়ায় এটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন। দ্বিতীয়ত, একই বছর ২৯শে ডিসেম্বর মহামান্য হাইকোর্ট জেনারেল এরশাদের সময় পাস হওয়া সংবিধানের ৭ম সংশোধনী (১০ই নভেম্বর ১৯৮৬)-কে একই কারণে অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন। তৃতীয়ত, ২০১১ সালের ১০ই মে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতার প্রশ্নে এক রিট আবেদনের ওপর দীর্ঘ শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী (২৬শে মার্চ ১৯৯৬)-এর মাধ্যমে প্রণীত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে মূল সংবিধানের অন্যতম স্তম্ভ 'গণতন্ত্র' অর্থাৎ জনগণের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন এ ধারণা ও আদর্শের পরিপন্থি হওয়ায় তা অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেন। এসব রায়ের আলোকে ২০১১ সালের ৩রা জুলাই শেখ হাসিনার সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল, চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনঃস্থাপন, জাতি হিসেবে বাঙালি, নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী এ সংজ্ঞা, ধর্মের নামে জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি নিষিদ্ধ, অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখল বা দখলের ষড়যন্ত্রকে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক শাস্তিযোগ্য অপরাধ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সকল অফিস ও দূতাবাসে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন ইত্যাদির বিধান করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে।[১০] এ ছাড়া তফসিল হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৬শে মার্চ (১৯৭১) প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ও ১৯৭১ সালের ১৪ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার কর্তৃক স্বাধীনতার সাংবিধানিক ঘোষণাপত্রকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

করা হয়।[১১] জেনারেল এরশাদের সময় সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে 'ইসলাম' (অষ্টম সংশোধনী, ৭ই জুন ১৯৮৮)-এর স্বীকৃতি অপরিবর্তিত থাকলেও একই সঙ্গে 'হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সম অধিকার নিশ্চিত করিবেন'– এ কথা ঐ অনুচ্ছেদে যুক্ত করা হয়।[১২] মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে পঞ্চদশ সংশোধনী একটি মাইলফলক।

২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল বিএনপি-জামায়াত জোট স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই কিছুদিনের মধ্যে নানা অজুহাতে তারা সংসদ অধিবেশনে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। ২০০৯ সালে সংসদের তিনটি অধিবেশনে মোট ৮৬ কার্যদিবসের মধ্যে তারা ৬৩ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকে।[১৩] পরের বছর তারা একটানা ৭ মাসে ৫০ কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে চলে।[১৪] অতএব অধিকাংশ সময় বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতেই সংসদের কার্যক্রম চলে। খালেদা জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি (২০১০), চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন (জুন ২০১০), বিএনপি-র সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলীর নিখোঁজ হওয়া (২০১২), গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি ড. ইউনূসের অপসারণ, বিশ্বব্যাংকের পদ্মাসেতুর ঋণ প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিএনপি এ সময়ে রাজনীতিতে ইস্যু তৈরি করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। বরং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সরকার সমর্থিত প্রার্থী ও পূর্বে তিনবার নির্বাচিত মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আলমের নিকট হেরে যান।

শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের সরকার গঠিত হওয়ার পর দেশের বৃহত্তম পদ্মাসেতু (৬.১৫ কিলো মিটার) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে এটিও আওয়ামী লীগের ইশতেহারে জনগণের নিকট দেওয়া অঙ্গীকার ছিল। বিশ্বব্যাংক প্রথম দিকে এ বাবদ ব্যয়ের সিংহভাগ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদানে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এক পর্যায়ে 'দুর্নীতির ষড়যন্ত্র হয়েছে' এ অভিযোগ এনে সেখান থেকে সরে যায়। এটি নিয়েও বিএনপি-জামায়াত জোট রাজনৈতিক ইস্যু বানানোর চেষ্টা করে।[১৫] কিন্তু যেখানে অর্থই ছাড় হয়নি এবং খোদ বিশ্বব্যাংকই দুর্নীতির অকাট্য কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেনি, সে অবস্থায় কল্পিত 'দুর্নীতির অভিযোগ' নিয়ে রাজনীতির মাঠে যে ইস্যু বানানো সম্ভব নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমান, খালেদা জিয়ার সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা হারিছ চৌধুরী, তাঁর সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল, বিদেশে অর্থ পাচার মামলায় খালেদা জিয়ার ছোটো ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর অনুপস্থিতিতে ৭ বছর কারাদণ্ড, বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে 'জিয়া চ্যারিটি অরফানেজ মামলা' ইত্যাদি এ সময়ে (২০১১) হয়। এ পর্যন্ত উল্লিখিত এসব ঘটনার কোনো কোনোটি (যেমন ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি, ইলিয়াস আলী)-এর বেলায় বিএনপি হরতালের মতো কর্মসূচিও পালন করে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধিতা ছিল বিএনপি ও জামায়াতের অভিন্ন ইস্যু। উভয় দলের নেতৃবৃন্দই এ মামলায় গ্রেপ্তার হয়। তবে, এ ব্যাপারে জামায়াতের অবস্থান

www.pathagar.com

যত প্রকাশ্য ছিল, নানা বিবেচনায় বিএনপি নিজেকে কিছুটা আড়াল করার চেষ্টা করে, অন্তত বিচারকার্য অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পর থেকে। প্রথম দিকে বিএনপি সরাসরি চেয়েছে এটি বন্ধ হোক। ২০১১ সালের ১৯শে অক্টোবর চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক প্রকাশ্য জনসভায় বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছিলেন যে, নিজামী-মুজাহিদ, সাঈদী, কামরুজ্জামান, কাদের মোল্লা ও বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী যুদ্ধাপরাধী নয়। তাদের মুক্তি দাবি করে তিনি বলেন, 'এঁদের স্বাধীনতা-বিরোধী বলে মিথ্যা মামলা দিয়ে আটক করা হয়েছে। আওয়ামী লীগই হলো স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি।'[১৬] ট্রাইব্যুনাল গঠন, বিচারকার্য 'আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড' রক্ষা করে 'নিরপেক্ষভাবে' হচ্ছে না–এ অভিযোগ তাদের বরাবরের। অপরদিকে, বিএনপি-র প্রচ্ছন্ন সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে জামায়াত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া বানচাল করতে হরতাল, ভাংচুর, বোমাবাজি, দেশের বিভিন্ন স্থানে আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা প্রভৃতি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদের সরকারের সময় প্রণীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী (৩রা জুলাই ২০১১) ছিল বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির জন্য মরণ আঘাতস্বরূপ। সহজ যুক্তি অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ সমাজব্যবস্থা রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে যত বেশি কার্যকর হবে, বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতি ততো বেশি দুর্বল হবে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির রাজনৈতিক ভিত তত বেশি সুদৃঢ় হবে। বিএনপি-জামায়াত জোটের সবচেয়ে কৌশলগত সীমাবদ্ধতা ছিল উচ্চ আদালতের একাধিক রায়, যার ওপর ভিত্তি করে পঞ্চদশ সংশোধনী প্রণীত। এ সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয় আপাতত বাদ রাখলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হওয়া কিছুতেই তারা মেনে নিতে পারছিল না, যদিও ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় (২০০৪) তারাই এর মৌলিক ভিত্তিকে নস্যাৎ করেছিল, যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বিরোধী শিবিরে অবস্থানকালে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা হয় ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি, অন্তত বিশ্বাসে। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধান থেকে বাতিল হলে ৬ ও ৭ই জুলাই ২০১১ বিএনপি-জামায়াত জোট ৪৮ ঘণ্টার হরতাল কর্মসূচি পালন করে। একই বছর ১০ই অক্টোবর থেকে তারা ৭টি বিভাগীয় শহর অভিমুখে রোড মার্চের নামে দেশের বিভিন্ন জেলায় গণসংযোগ ও জনসভার আয়োজন করে।[১৭] অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, জনগণের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার আবেদন পূর্বের মতো নেই, তবে বিএনপি-জামায়াত জোট এখনো আশা ছাড়ছে না। জাতীয় রাজনীতির এমনই এক অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল অধিবেশন।

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল

এক দিনব্যাপী আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন ২০১২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বিজয়ের মাসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ও বিকেল দুটি অধিবেশনে এটি ভাগ করা ছিল। সকালে ছিল উদ্বোধনী এবং বিকেলে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ, নেতৃত্ব নির্বাচন ইত্যাদি। এবার কাউন্সিলের মূলমন্ত্র ছিল : 'শান্তি,

www.pathagar.com

গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দিনবদলের প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।'[১৮]

কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের খালি জায়গায় একটি সুবিশাল প্যান্ডেল ও নৌকা সদৃশ মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। প্যান্ডেলের চারপাশ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সকল প্রবেশ মুখ ইত্যাদি স্থান ছাড়াও রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ব্যানার, ফেস্টুন, বঙ্গবন্ধু ও দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনার বড়ো বড়ো প্রতিকৃতি, আলোকসজ্জা ইত্যাদি দ্বারা বর্ণিল সাজে সাজানো হয়। মঞ্চের দুদিকে ছিল বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবি। মঞ্চের সামনে এক পাশে ছিল জাতীয় চার নেতা ও অপর পাশে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা তর্কবাগীশের ছবি। মঞ্চে নেতৃবৃন্দের আসনের পেছনে ছিল ডিজিটাল পর্দা, যাতে সরকারের ৪ বছরের সাফল্য তুলে ধরা হয়। প্যান্ডেলের ভেতরে ছাড়াও বাইরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ডিজিটাল পর্দার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিপুলসংখ্যক পুলিশ, এসএসএফ, সেনাবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা পুরো সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।[১৯]

উদ্বোধনী অধিবেশন

২৯শে ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে ৬ হাজার তিন শত কাউন্সিলর ও বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী, ডেলিগেট যোগ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধি, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পত্রিকার সম্পাদক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক দলের মধ্যে জামায়াত ও অন্যান্য স্বাধীনতা-বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত দলসমূহকে বাদ দিয়ে অন্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, সিপিবি-র রুহিন হোসেন প্রিন্স প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে একই সঙ্গে শেখ হাসিনার জাতীয় পতাকা উত্তোলন, এরপর পায়রা উড়িয়ে দেওয়া এবং দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ও ৭২টি সাংগঠনিক জেলার নেতৃবৃন্দের দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক কাজ সম্পন্ন হয়। তখন 'জয় বাংলা বাংলার জয়', 'শোনো একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে', 'বিজয় নিশান উড়ছে ওই' এ গানগুলো পরিবেশন করা হচ্ছিল।[২০]

পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠশেষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অন্যান্য কার্যসূচি শুরু হয়। প্রথমেই ছিল শোক প্রস্তাব। এটি উত্থাপন করেন দলের দপ্তর সম্পাদক আবদুল মান্নান খান। প্রস্তাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৫ই আগস্টের সকল শহিদ, জাতীয় ৪ নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহিদ, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় (২০০১-২০০৬) আওয়ামী লীগের নিহত ২১ হাজার নেতা-কর্মী,

www.pathagar.com

২১শে আগস্টের (২০০৪) গ্রেনেড হামলায় নিহত আইভি রহমানসহ অন্যান্য, বিগত কাউন্সিল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দলের যেসব নেতা, দেশি-বিদেশি বিশিষ্টজন মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর অভ্যর্থনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান বেগম সাজেদা চৌধুরী সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ[২১]

কাউন্সিল অধিবেশনের কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ। তাঁর এ ভাষণে সাধারণত পূর্ববর্তী সরকার বা শাসন আমলের সঙ্গে বর্তমানের তুলনামূলক চিত্র থাকে। এবারের ভাষণও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁর ভাষণের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা, যা দলের নেতা-কর্মীদের জন্য সবসময়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এবারের কাউন্সিলে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে তিনি তাঁর সরকারের প্রায় ৪ বছরের আমলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জন বা সাফল্য তুলে ধরার পাশাপাশি সরকার ও আওয়ামী লীগের উন্নয়ন-ভাবনা গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেন। এছাড়া আরও অনেক বিষয়ের ওপর ভাষণে আলোকপাত করা হয়। ভাষণের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হলো : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৭৫-এর ১৫ই আগস্টের অন্যান্য শহিদ, জাতীয় চার নেতা স্মরণ, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন নেতৃবৃন্দের প্রতি সম্মান, গত কাউন্সিলের পর থেকে দলের প্রয়াত নেতৃবৃন্দ যেমন উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য এম এ মান্নান, প্রেসিডিয়াম সদস্য আতাউর রহমান খান কায়সার, প্রেসিডিয়াম সদস্য আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু এমপি, সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদক আলমগীর কুমকুম, ডা. মতিউর রহমান এমপি (টাঙ্গাইল), সাবেক এমপি জালাল উদ্দিন তালুকদার (নেত্রকোনা), আওয়ামী লীগ নেতা ফেরদৌস জামান মুকুল (বগুড়া) প্রমুখকে স্মরণ, ১৯৭২-১৯৭৫ এ সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সরকারের অসাধারণ সাফল্য, ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আইন পাস, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল, ১৯৭৪ সালে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে মেরিটাইম আইন পাস, বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী 'অন্ধকারের ২১ বছর', জেনারেল জিয়ার সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর খুনিদের রক্ষা ও পুনর্বাসন, যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকে দেশে ফিরিয়ে আনা, স্বাধীনতা-বিরোধী শাহ আজিজকে মন্ত্রী বানানো, ২০০১ সালে জেনারেল জিয়ার স্ত্রী ও বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যুদ্ধাপরাধী নিজামী ও মুজাহিদকে মন্ত্রী বানিয়ে তাদের গাড়িতে 'লক্ষ শহীদের রক্তে ভেজা জাতীয় পতাকা' তুলে দেওয়া, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের (২০০১-২০০৬) প্রতিহিংসার রাজনীতি, ঐ আমলের সন্ত্রাস, হত্যা, খুন, ধর্ষণ, দুর্নীতি, দলীয়করণ, হাওয়া ভবন সিন্ডিকেট, আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতাদের হত্যা, ২১শে আগস্টের (২০০৪) গ্রেনেড হামলা, বিএনপি-জামায়াত জোটের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে দলীয়করণের অপচেষ্টা, রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদের ন্যক্কারজনক ভূমিকা, সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের (২০০৭-২০০৮) নতুন ষড়যন্ত্র, ১/১১-র পর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সাহসী ভূমিকা, ২০০৮-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ও সরকার

www.pathagar.com

গঠন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের ৫১তম দিনে বিডিআর বিদ্রোহ ও সেনা অফিসার হত্যা, তাঁর সরকারের প্রায় ৪ বছরের আমলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি (৪ বছর গড়ে ৬.৫০ শতাংশ), ১২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ, দারিদ্র্যের হার হ্রাস (৪০ থেকে ৩১.৫ শতাংশে), মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি (৬৬০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫৮ ডলারে উন্নীত), বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি (৩২৬৮ মেগাওয়াট থেকে তখন ৮০০০ মেয়াওয়াট), কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা, তাঁর পূর্ববর্তী সরকারের সময় (১৯৯৬-২০০১) প্রবর্তিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি বৃদ্ধি, গড় আয়ু বৃদ্ধি (তখন ৬৯ বছর), মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীকে বছরের প্রথমদিন বিনামূল্যে ২২ কোটির উর্ধ্বে বই বিতরণ (২০১৩ সালে এ সংখ্যা ২৭ কোটি), ৬টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩ হাজারের উর্ধ্বে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা, ২০ হাজার ৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ই-বুক, ই-টেন্ডার, ই-গভর্নেন্স, আইসিটি নীতিমালা, কালিয়াকৈরে হাই-টেক পার্ক, ৪ হাজার ৫০১টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু, শিক্ষা সহায়ক ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, যানজট নিরসনে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন গঠন, ১৪টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদন, জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুর সিটি করপোরেশন গঠন, নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০-এ উন্নীত করা, বিএনপি-জামায়াত সরকার কর্তৃক বন্ধ করা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভের নির্মাণ কাজ পুনরায় আরম্ভ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণের ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, বিশ্ব শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় বাংলাদেশের ভূমিকা, জাতিসংঘের অধিবেশনে শেখ হাসিনার 'শান্তির মডেল' উপস্থাপন, তিন বিঘা করিডোর ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার ব্যবস্থা, ভারতের সাথে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ, আন্তর্জাতিক সমুদ্র ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মিয়ানমারের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র বিরোধ নিষ্পত্তি ও ১ লাখ ১১ হাজার ৬৬৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা লাভ, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের (৩রা জুলাই ২০১১) মাধ্যমে স্বাধীনতার চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, কেয়ারটেকার সরকারের নামে ১/১১-র মতো পরিস্থিতি যাতে আর না ঘটতে পারে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তার ব্যবস্থা, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন ইত্যাদি।

যে-কোনো মূল্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠান ও বিচারের রায় কার্যকর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত এবং বিএনপি-জামায়াতের চলমান আন্দোলনের মূল লক্ষ্য যে যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা, সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেন :

> জাতি দেখেছে, বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে কীভাবে বিরোধী দলের নেত্রী যুদ্ধাপরাধী, বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের রক্ষার জন্য হরতাল দেয়, জ্বালাও-পোড়াও করে। মানুষের গায়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারে। তিনি চান লাশের প্রাচীর তৈরি করে যুদ্ধাপরাধী খুনিদের রক্ষা করতে। বগুড়ায় হরতালের মধ্যে রোগীবহনকারী অ্যাম্বুলেন্সে আগুন দেওয়া হয়েছে। হরতালের আগের রাতে বাসের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা গরিব ড্রাইভারকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।...জাতি এই দেশকে আর মৃত্যু-উপত্যকা

www.pathagar.com

> হিসেবে দেখতে চায় না। অতীতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। যুদ্ধাপরাধীদেরও রক্ষা করতে পারবেন না। বাংলাদেশের মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম আমাদের ম্যান্ডেট দিয়েছে এই মানবতাবিরোধী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচার করার। ইনশাআল্লাহ্ কোনো অপশক্তিই এদের রক্ষা করতে পারবে না।[২২]

নেতা-কর্মীদের বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ করে কীভাবে সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে মানুষের কল্যাণে আত্মনিবেদন করতে হয় সে শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রত্যেককে আদর্শবান হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন :

> জাতির পিতার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-তে আমরা দেখেছি তিনি কীভাবে লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে মানুষের জন্য রাজনীতি করেছেন।...বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী প্রতিটি নেতা-কর্মীর দায়িত্ব মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে তাদের কল্যাণের জন্য কাজ করা।...আদর্শবান, চরিত্রবান এবং ত্যাগী নেতা-কর্মীরাই একটি রাজনৈতিক দলের প্রাণ।[২৩]

সব হারিয়ে এখন আওয়ামী লীগই তাঁর ভরসার স্থল এবং বাংলার মানুষের কল্যাণে পিতার মতো যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে তাঁর সংকল্পের কথা ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন :

> এই আওয়ামী লীগই আমার শেষ এবং একমাত্র ঠিকানা। বারবার আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রহমত এবং আপনাদের ভালোবাসাই আমাকে দেশবাসীর কাছে ফিরিয়ে এনেছে। আমার পিতা বঙ্গবন্ধু জীবন দিয়ে গেছেন কিন্তু আপনাদের ভালোবাসার অমর্যাদা করেননি। ইনশাল্লাহ্ জীবন দিয়ে হলেও বাংলার মানুষের বিশ্বাস ও ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করব।[২৪]

সবশেষে নেতা-কর্মীদের প্রতি তাঁর আহ্বান, 'আসুন, সবাই মিলে দেশকে গড়ে তুলি। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষামুক্ত আধুনিক উন্নত ও সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে একসাথে কাজ করি।'[২৫]

বিকেলের অধিবেশন : সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, জেলা নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, নেতৃত্ব নির্বাচন

সকালের অধিবেশন শেষে মাঝে স্বল্প সময়ের বিরতি দিয়ে বিকেল সাড়ে ৩টায় শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে দিনের দ্বিতীয় ও শেষ অধিবেশন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে শুরু হয়। শুধু কাউন্সিলরদের জন্য এটি সংরক্ষিত ছিল।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম দলের সার্বিক বিষয় তুলে ধরে কাউন্সিলে তাঁর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্যের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে : 'আওয়ামী লীগের অধীনেই আগামী নির্বাচন', 'আওয়ামী লীগ সরকার এক এক করে দলের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন করছে', 'আগামী এক বছরের মধ্যে ইশতেহারের বাকি ওয়াদাগুলো পূরণ করা হবে', 'আওয়ামী লীগ জনগণকে ধোঁকা দেয় না', 'আওয়ামী লীগ যে কথা দেয় সে কথা রক্ষা করার চেষ্টা করে',

www.pathagar.com

'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার যে অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম সেটি বাস্তবায়ন করবো', 'আওয়ামী লীগ কখনো নির্বাচনে কারচুপি করে না', 'যে দলটি জনগণের অধিকারের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছে সে দল জনগণের কথার বাইরে যেতে পারে না' ইত্যাদি। আওয়ামী লীগের অধীনে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে সৈয়দ আশরাফের যুক্তি ছিল :

> বর্তমান সরকারের আমলে সবকয়টি স্থানীয় সরকার নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে। তাহলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না কেন? সংবিধান অনুযায়ীই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[২৬]

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। তাতে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যাওয়ায় পরিবর্তিত অবস্থায় সৈয়দ আশরাফের বক্তব্য অনুযায়ীই পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। বাস্তবে তাই ঘটে।

সৈয়দ আশরাফের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ৭২টি সাংগঠনিক জেলা কমিটির মধ্যে মাত্র ৮টি এ পর্যন্ত সম্মেলন করতে পেরেছে। আগামি দুই মাসের মধ্যে তিনি সকলকে সম্মেলন শেষ করার তাগিদ দেন। এরপর আগামী সংসদ নির্বাচনের আর মাত্র এক বছর বাকি এ কথা কাউন্সিলরদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করতে হলে দলকে শক্তিশালী করতে হবে। এজন্য সম্মেলনের বিকল্প নেই।'

জেলা পর্যায় থেকে যাঁরা বক্তব্য রাখার সুযোগ পান তাঁরা হলেন ডা. সিরাজুল আকবর (সাধারণ সম্পাদক, মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগ), শামসুর রহমান শরীফ ডিলু (সভাপতি, পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ), শওকত হোসেন হিরণ (সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগ) প্রমুখ।

ঘোষণাপত্র সংশোধন

পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাখতে এবং বাস্তব প্রয়োজনে আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে এবারও সংশোধনী আনা হয়। বিশেষ করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর এটি জরুরি হয়ে পড়ে। কাউন্সিলের এ সেশনে শেখ হাসিনা স্বয়ং প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ তুলে ধরেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[২৬] সংশোধিত ঘোষণাপত্রে 'বিএনপি-জামায়াত জোটের পাঁচ বছরের দুঃশাসন, নিপীড়ন-নির্যাতন', আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের ৪ বছরের উন্নয়ন ও সাফল্য এবং জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত শেখ হাসিনার শান্তির মডেল সবিস্তার অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে দলের ঘোষণাপত্রের যেসব স্থানে পরিবর্তন/সংযোজন দরকার সেটি করে ছাপিয়ে নতুন ঘোষণাপত্র নেতা-কর্মীদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও শেখ হাসিনা কাউন্সিলরদের বলেন।

আয়-ব্যয় হিসাব

দলের কোষাধ্যক্ষ এ এইচ এন আশিকুর রহমান গত কাউন্সিল থেকে এ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী তুলে ধরেন এবং তা গৃহীত হয়। তাতে দেখা যায় :[২৮]

www.pathagar.com

১. দলীয় ফান্ডে ৮ কোটি ২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা গচ্ছিত
২. বিভিন্ন প্রকাশনা ও তা বিক্রি বাবদ ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা আদায়
৩. পার্টি তহবিলে দান বাবদ ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা প্রাপ্তি
৪. চাঁদা আদায় বাবদ ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা লাভ

এছাড়া, ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিন্যুর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পাশে পার্টির জন্য ৪ শতাংশ জায়গা ক্রয় করা হয়েছে বলেও কোষাধ্যক্ষ তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

নেতৃত্ব নির্বাচন[২৯]

বিকেলের অধিবেশনের কার্যতালিকায় সর্বশেষে ছিল নেতৃত্ব নির্বাচন। এ পর্বের শুরুতে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে বরাবরের মতো কাউন্সিলরদের সারিতে আসন গ্রহণ করেন। নেতৃত্ব নির্বাচন পর্ব পরিচালনার জন্য পূর্বে এডভোকেট রহমত আলী এমপিকে চেয়ারম্যান এবং দলের অপর দুই নেতা এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন ও আ ক ম মোজাম্মেল হককে সদস্য করে ৩ সদস্যের একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছিল।

প্রথমে সভাপতি পদে প্রার্থিতা আহ্বান করা হলে প্রেসিডিয়ামের সাবেক সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম ঐ পদে শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করেন। তাঁর এ প্রস্তাব সমর্থন করেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। এরপর মাহবুব-উল-আলম হানিফ সাধারণ সম্পাদক পদে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম-এর নাম প্রস্তাব করেন এবং তা সমর্থন করেন সাবেক অপর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক। এভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনা ও সৈয়দ আশরাফ স্ব স্ব পদে পুনঃনির্বাচিত হন।

উল্লেখ্য, নির্বাচনি পর্ব শুরুর পূর্বে কাউন্সিলে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, শেখ হাসিনা আর সভানেত্রী পদে থাকতে চাইছেন না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক নাম আহ্বানের পূর্বক্ষণে উপস্থিত কাউন্সিলর এবং বাইরে অপেক্ষমাণ নেতা-কর্মীরা 'শেখ হাসিনা ছাড়া আর কাউকে সভাপতি পদে দেখতে চাই না' বলে স্লোগান দিতে থাকেন।

শেখ হাসিনার প্রতিক্রিয়া

দলের সভানেত্রী পদে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৭ম বারের মতো নির্বাচিত হওয়ায় কাউন্সিলরদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাৎক্ষণিক এক প্রতিক্রিয়ায় শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি এবার চেয়েছিলাম আপনারা নতুন নেতৃত্ব আনবেন। আমি পাশে থেকে সহযোগিতা করব।' কাউন্সিলরদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তিনি বলেন, 'আপনারা যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন তা মাথা পেতে নিলাম। কারণ সামনে নির্বাচন। এবার আমি দায়িত্ব নিলাম। তবে আগামীবার আপনাদের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করতে হবে। কারণ আমার তো বয়স হচ্ছে।'[৩০]

তিনি দলকে সুসংগঠিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে আগামী দুই মাসের মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে সকল ইউনিটের কাউন্সিল সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে সবাইকে সতর্ক করে বলেন, 'যারা সম্মেলন করতে ব্যর্থ হবে সেসব কমিটি বাতিল করা হবে।'

www.pathagar.com

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে এবং 'মুরুব্বিদের সঙ্গে আলোচনা করে' যত দ্রুত সম্ভব নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে বলেও তিনি জানান। তিনি প্রতিটি জেলা-উপজেলায় দলের স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রয়োজনে কেন্দ্র থেকে আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পরিশেষে, তিনি দলের নেতা-কর্মীদের বিরোধী দলের প্রতিটি অভিযোগের পাল্টা জবাব দেওয়ারও নির্দেশ দেন।

সৈয়দ আশরাফের আহ্বান

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম দ্বিতীয় বারের মতো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর কাউন্সিলরদের সামনে দেওয়া এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান এবং 'আওয়ামী লীগ একটি পরিবার', 'যখনই আওয়ামী লীগ এক হয়, পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই তখন আওয়ামী লীগকে পরাজিত করতে পারে' এসব উল্লেখ করে সকলের প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'অতীতের মতো আগামীতেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে হবে'।[৩১]

কাউন্সিল অধিবেশনের সমাপ্তির চার দিনের মধ্যে 'বড় ধরনের' পরিবর্তন ছাড়াই আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।[৩২] একই সঙ্গে উপদেষ্টা পরিষদের ৩০ জন সদস্যের নাম প্রকাশ এবং ১০ সদস্যের পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হয়। অতএব পরবর্তী তিন বছরের জন্য দলের বিভিন্ন পরিষদ ও পদে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ হলেন :

কার্যনির্বাহী কমিটি

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য	:	সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন
		বেগম সাজেদা চৌধুরী
		বেগম মতিয়া চৌধুরী
		আবদুল লতিফ সিদ্দিকী
		শেখ ফজলুল করিম সেলিম
		মোহাম্মদ নাসিম
		কাজী জাফর উল্লাহ
		সতীশ চন্দ্র রায়
		এডভোকেট সাহারা খাতুন
		ওবায়দুল কাদের
		নূহ-উল-আলম লেনিন
		ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন
সাধারণ সম্পাদক	:	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	:	মাহবুব-উল-আলম হানিফ

www.pathagar.com

		ডা. দীপু মনি
		জাহাঙ্গীর কবির নানক
সাংগঠনিক সম্পাদক		আহম্মদ হোসেন
		মো. মিজবাহ উদ্দিন সিরাজ
		বি এম মোজাম্মেল হক
		আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম
		আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন
		খালিদ মাহমুদ চৌধুরী
		বীর বাহাদুর
অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক	:	আ হ ম মোস্তফা কামাল (লোটাস কামাল)
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	:	ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী
আইন বিষয়ক সম্পাদক	:	এডভোকেট আবদুল মতিন খসরু
কৃষি ও সমবায় সম্পাদক	:	ড. মো. আবদুর রাজ্জাক
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	:	এডভোকেট আফজাল হোসেন
ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	:	ফরিদুন্নাহার লাইলী
দপ্তর সম্পাদক	:	এডভোকেট আবদুল মান্নান খান
উপ-দপ্তর সম্পাদক	:	মৃণাল কান্তি দাস
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	:	এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	:	ড. হাছান মাহমুদ
উপ-প্রচার সম্পাদক	:	অসীম কুমার উকিল
বন ও পরিবেশ সম্পাদক	:	শূন্য
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	:	স্থপতি ইয়াফেস ওসমান
মহিলা সম্পাদিকা	:	ফজিলাতুন্নেসা ইন্দিরা
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	:	ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম
যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক	:	দেওয়ান শফিউল আরেফিন টুটুল
শিক্ষা ও মানবসম্পদ সম্পাদক	:	নুরুল ইসলাম নাহিদ
শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক	:	লে. কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান
শ্রম ও জনশক্তি সম্পাদক	:	হাবিবুর রহমান সিরাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	আসাদুজ্জামান নূর
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সম্পাদক	:	ডা. বদিউজ্জামান ভূঁইয়া ডাবলু
কোষাধ্যক্ষ	:	এ এইচ এন আশিকুর রহমান

সদস্য : আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম, সিমিন হোসেন রিমি, এ এইচ খায়রুজ্জামান লিটন, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন (পরে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য), এডভোকেট সুভাষ চন্দ্র বোস, বেগম মনুজান সুফিয়ান, এ কে এম রহমতউল্লাহ, এডভোকেট ফজলে রাব্বী, এডভোকেট ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

www.pathagar.com

শম্ভু, এম এ মান্নান, মোস্তফা ফারুখ মোহাম্মদ, আবদুর রহমান, আখতারউজ্জামান, এডভোকেট মমতাজ উদ্দিন মেহেদী, র আ ম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী, আলাউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (নাছিম), মির্জা আজম, ড. আবদুস সোবহান গোলাপ, শ্রী সুজিত রায় নন্দী, আমিনুল ইসলাম আমিন, এ কে এম এনামুল হক শামীম, নসরুল হামিদ বিপু, জুনাইদ আহমেদ পলক।

উপদেষ্টা পরিষদ : ডা. এস এ মালেক, আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি, আমির হোসেন আমু এমপি, তোফায়েল আহমেদ এমপি, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি, মো. আবদুল জলিল এমপি, ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ (অব.), এডভোকেট মো. রহমত আলী এমপি, প্রফেসর ড. আবদুল খালেক, প্রফেসর ডা. আবদুল মান্নান এমপি, কাজী আকরাম উদ্দীন, এস এম নুরুন্নবী, এইচ টি ইমাম, ড. মশিউর রহমান, প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ, এডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান, ড. অনুপম সেন, প্রফেসর ড. হামিদা বানু, আবু নসর, ড. হোসেন মনসুর, অধ্যাপিকা সুলতানা শফি, ফকরুল ইসলাম মুন্সী, তোফাজ্জল হোসেন মুকুল, রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ জমির, গোলাম মওলা নকশাবন্দী, মির্জা জলিল, ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া, মে. জেনারেল (অব.) হাফিজ মল্লিক ও শিরিল শিকদার।

পার্লামেন্টারি বোর্ড : শেখ হাসিনা, বেগম সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, কাজী জাফর উল্লাহ, আবদুল জলিল, ওবায়দুল কাদের, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ।

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের পক্ষে বিশাল বিজয়কে 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার'সহ আওয়ামী লীগের ইশতেহারের অন্যান্য অঙ্গীকার ও কর্মসূচির প্রতি জনগণের ম্যান্ডেট হিসেবে দলের নেতৃত্ব মনে করেন। যুদ্ধাপরাধীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিচার অনুষ্ঠানের এটিই ছিল উত্তম সময়। দেশের সার্বিক উন্নয়নে সর্বমহলে বিপুলভাবে প্রশংসিত 'দিন বদলের সনদ' গ্রহণের পাশাপাশি শেখ হাসিনা এবার সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠানে মনোনিবেশ করেন। আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিলেও তা মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এ কাউন্সিলের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক ২০০৯ সালে প্রেসিডিয়াম থেকে বাদ পড়া সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও আবদুল জলিল উপদেষ্টা পরিষদ ছাড়াও নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়নদানের জন্য সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে চেয়ারপার্সন করে গঠিত ১১ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টারি বোর্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ বডিতে এঁরা সবাই সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।[৩৩]

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ২৯শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৯; *ইত্তেফাক*, ৩০শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৯; *সংবাদ*, ২৯শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৫; *সংবাদ*, ৩০শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৫

www.pathagar.com

২. দেখুন, বইয়ের অধ্যায় ১৯

৩. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত অপর ৭ খুনি হলো কর্নেল আব্দুর রশিদ, লে. কর্নেল ডালিম, লে. কর্নেল রাশেদ চৌধুরী, রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, কর্নেল আবদুল মাজেদ এবং লে. কর্নেল নূর চৌধুরী। এদের মধ্যে আজিজ পাশা বিদেশের মাটিতে মারা যায়। বাকি ৬ জন বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছে। তাদের মধ্যে নূর চৌধুরী ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার প্রথম সরকার গঠনের পূর্বমুহূর্তে সপরিবার কানাডায় চলে যায়। সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে কোর্টে আবেদন করলে নিম্ন আদালতে তার ঐ আবেদন না মঞ্জুর হয়। ফেডারেল আদালতে আপিল করলে অতি সম্প্রতি ঐ আপিলও বাতিল হয়ে যায়। কোর্ট রায়ে বলেন, 'ঐ রাতে [১৫ই আগস্ট] নিরীহ জনগণ, নারী শিশুর ওপর যে পরিকল্পিত সুসংঘটিত হামলা হয়েছে সে ষড়যন্ত্রে নূর চৌধুরীর যুক্ত থাকার সম্ভাবনা সন্দেহের উর্ধ্বে।' ফেডারেল আদালতের বিচারপতি তাঁর আদেশে আরও বলেন, 'দেশে [বাংলাদেশ] স্বচ্ছতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানী ও বিচার হয়েছে। আসামি সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও নূর চৌধুরীর পক্ষে আইনজীবী যথেষ্ট আইনী লড়াইয়ের সুযোগ পেয়েছেন। ফলে দেশে সুবিচার মিলবে না, নূর চৌধুরীর এমন দাবি ঠিক নয়।' *জনকণ্ঠ*, ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১, ২

৪. ইশতেহারের পাঁচটি অগ্রাধিকারের বিষয়ের মধ্যে ৫ নং আইটেম 'সুশাসন প্রতিষ্ঠা'-য় বলা হয়, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।' দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনি ইশতেহার ২০০৮*, পৃ. ৮

৫. প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন সিলেট-৩ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী।

৬. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র ২০০৯*, পৃ. ২৩

৭. প্রথমে একটি ট্রাইব্যুনাল দিয়ে শুরু হয়। ২০১২ সালে ট্রাইব্যুনাল-২ গঠিত হয়। এর চেয়ারম্যান ছিলেন বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবীর।

৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*

৯. Harun-or-Rashid 'Role of Judiciary in Political Development', pp. 61-64

১০. বিস্তারিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (সর্বশেষ সংশোধনীসহ), অক্টোবর ২০১১, পৃ. ১৩৬-১৫০

১১. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অক্টোবর ২০১১, পৃ. ১৫০-১৫৬

১২. দ্রষ্টব্য সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন ২০১১, ২ ক। রাষ্ট্রধর্ম, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অক্টোবর ২০১১, পৃ. ১৩৬

১৩. দ্রষ্টব্য 'এক বছরে যা ঘটেছে', *জনকণ্ঠ*, ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯

১৪. *জনকণ্ঠ*, ৩১শে ডিসেম্বর ২০১০

১৫. ২০১১ সালের ১৯শে অক্টোবর দেশের উত্তরাঞ্চলে ৪-দলীয় জোটের রোডমার্চ কর্মসূচি শেষে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া বলেন, '...দুর্নীতির কারণে পদ্মা সেতুর কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। কেননা, বিশ্বব্যাংক এদের দুর্নীতি ধরে ফেলেছে।' *প্রথম আলো*, ২০শে অক্টোবর ২০১১, পৃ. ১, ২

১৬. দ্রষ্টব্য *প্রথম আলো*, ২০শে অক্টোবর ২০১১, পৃ. ১, ২

www.pathagar.com

১৭. এসব জনসভায় বিএনপি ও ৪-দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে না হলে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।' *প্রথম আলো*, ২০শে অক্টোবর ২০১১, পৃ. ১, ২

১৮. *ইত্তেফাক*, ২৯শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৯; *সংবাদ*, ২৯শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১৫

১৯. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ২৯শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৯; *সংবাদ*, ৩০শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৫

২০. *সংবাদ*, ৩০শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৫

২১. পূর্ণ ভাষণ দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১৯তম কাউন্সিলে সভানেত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ২০১২, অতঃপর *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ২০১২*

২২. ২৭শে ডিসেম্বর ২০১২, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধনী ভাষণেও শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন হবেই। তারা উপযুক্ত সাজা পাবে।' একই ভাষণে বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে যুদ্ধাপরাধীদের 'রক্ষার' চেষ্টা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও মনের কথা বোঝার চেষ্টা করুন।' *সংবাদ*, ২৮শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১৬, ২; *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০১২*

২৩. *আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনার ভাষণ ২০১২*

২৪. *ঐ*

২৫. *ঐ*

২৬. সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের বক্তব্য দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ৩০শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৯

২৭. *ইত্তেফাক*, ৩০শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৯

২৮. *ঐ*

২৯. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ৩০শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৯; *সংবাদ*, ৩০শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৫

৩০. *ইত্তেফাক*, ৩০শে ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১, ১৯

৩১. *ঐ*

৩২. *সংবাদ*, ৩রা জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১, ১৫

৩৩. দলের সিনিয়র অপর এক নেতা ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক কাউন্সিলের এক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

অধ্যায় : বাইশ

কাউন্সিল অধিবেশন ২০১৬ : 'এখন সময় বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার'

গত কাউন্সিল (ডিসেম্বর ২০১২) থেকে প্রায় ৩ বছর ১০ মাস পর ২০১৬ সালের ২২ ও ২৩শে অক্টোবর দুদিনব্যাপী সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।[১] এটি ছিল দলের ২০তম কাউন্সিল অধিবেশন। এর উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই স্থানে এটি ছিল দলের দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশন। এর পূর্বে ২০১২ সালের কাউন্সিলও এ স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কাউন্সিল উপলক্ষ্যে সারাদেশ থেকে কয়েক হাজার কাউন্সিলর ছাড়াও বিপুলসংখ্যক ডেলিগেট ও নেতা-কর্মীর সমাবেশ ঘটে। অধিকন্তু ঢাকাস্থ বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি, বিদেশ থেকে আমন্ত্রিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গ, দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, জাতীয় পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পোদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ আমন্ত্রিত হয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বর্তমান সময়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ব্যতীত অন্যত্র আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের স্থান সংকুলান হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া, ভেন্যু হিসেবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। এখানে ছিল কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং পার্শ্ববর্তী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এর মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৬ সালের কাউন্সিলের একটি বিশেষত্ব হলো, এ-সময় দেশে আওয়ামী লীগের সরকার ক্ষমতায়। ২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগ পরপর দুই মেয়াদ সরকার পরিচালনা করছে। ২০১৯ সালের শুরুতে অনুষ্ঠেয় পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে এটিই যেহেতু দলের সর্বশেষ ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল, অতএব সে বিবেচনায় এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বস্তুত আলোচ্য কাউন্সিল ছিল পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের এক ধরনের পূর্ব প্রস্তুতিস্বরূপ। কাউন্সিলের মূলমন্ত্র নির্ধারিত হয় : 'শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছি দুর্বার, এখন সময় বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার।'[২] উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়াই যে পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মূল স্লোগান হবে, তা কাউন্সিলের মূলমন্ত্র থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান। এখন কাউন্সিলের সার্বিক পটভূমির প্রতি আলোকপাত করা যাক।

পটভূমি

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল ও বর্তমান কাউন্সিল (২০১৬)-এর মধ্যবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি হচ্ছে শীর্ষস্থানীয় ৬ যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির রায়

www.pathagar.com

কার্যকর করা, শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চ সৃষ্টি (২০১৩), হেফাজতে ইসলামের ঢাকার মতিঝিলের শাপলা চত্বরে অবস্থান ও তাণ্ডবলীলা চালানো (২০১৩), ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোটের অংশগ্রহণ না করে তা প্রতিহত করার নামে দেশজুড়ে সন্ত্রাস-নৈরাজ্য সৃষ্টি, নির্বাচনোত্তর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন, নির্বাচনের এক বছর পূর্তিতে বিএনপি-জামায়াত জোটের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের দাবিতে টানা ৯৩ দিন অবরোধ-পেট্রোল বোমা সন্ত্রাস, জঙ্গিগোষ্ঠীর হাতে বিদেশি নাগরিক হত্যা, ৫টি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠান (২০১৩)[৩] ও তাতে বিএনপি প্রার্থীদের জয় লাভ, ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম এ তিনটি বৃহৎ সিটি করপোরেশনের নির্বাচন[৪] অনুষ্ঠান (২০১৫) ও সরকার দলীয় প্রার্থীদের বিজয়, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশন (সিপিএ) ও ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ) এ দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ পদে বাংলাদেশের নির্বাচিত হওয়া,[৫] ২০১৮ সালকে টার্গেট ধরে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজে অগ্রগতি, বিএনপি-র কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়া (১৯শে মার্চ ২০১৬), ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফর (জুন ২০১৫) ও ছিটমহল বিনিময়সহ ১৯টি চুক্তি স্বাক্ষর, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং-এর বাংলাদেশ সফর (১৪ই অক্টোবর ২০১৬) এবং কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণ, চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চীনের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক জোন, ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়সহ দুই দেশের মধ্যে মোট ২৭টি সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পে প্রায় ২৪ বিলিয়ন ইউএস ডলারের আর্থিক সহায়তা চুক্তি ও কৌশলগত সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম-এর তিনদিনের (১৬-১৮ই অক্টোবর ২০১৬) বাংলাদেশে সফর, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির প্রভাব মোকাবেলা ও শিশুদের অপুষ্টি রোধে বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে মোট তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ঘোষণা ইত্যাদি।

২০১০ সালের ২৫শে মার্চ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে ট্রাইব্যুনাল গঠনের মধ্যদিয়ে ঐ বিচারকার্য শুরু হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ, আপিল রিভিউ ইত্যাদি সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে ১২ই ডিসেম্বর ২০১৩ ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে 'মিরপুরের কসাই' নামে কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী ও জামায়াতে ইসলামের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়। এটি ছিল কোনো যুদ্ধাপরাধীর প্রথম বিচারের রায় কার্যকর হওয়া। অনুরূপভাবে, অন্যান্য যুদ্ধাপরাধী যথা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ (২১শে নভেম্বর ২০১৫), বিএনপি নেতা ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী (২১শে নভেম্বর ২০১৫), জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল কামারুজ্জামান (২১শে এপ্রিল ২০১৫), জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী (১০ই মে ২০১৬) এদের সবার ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৬ জামায়াতের মূল অর্থযোগানদাতা, চট্টগ্রামের বদর বাহিনী প্রধান ও ডালিম হোটেলের জল্লাদ হিসেবে কুখ্যাত মীর কাসেম আলীকে কাশিমপুর কারাগারে ফাঁসির

www.pathagar.com

কাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। নিঃসন্দেহে জাতির অনাগত ভবিষ্যতের ইতিহাসে যুদ্ধাপরাধীদের এ বিচার অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এভাবে স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠান এবং সে বিচারের রায় কার্যকর করা যে সম্ভব হবে, তা ছিল অনেকেরই কল্পনার বাইরে। এ বিচারের বিরুদ্ধে বহির্দেশীয় এক ধরনের চাপও ছিল। বঙ্গবন্ধুকন্যা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার অসীম সাহস, দৃঢ়তা ও অঙ্গীকারের কারণেই যে এ বিচার অনুষ্ঠান ও রায় কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে, তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর পেছনে ছিল এদেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন। এ ক্ষেত্রে শাহবাগকেন্দ্রিক গণজাগরণ মঞ্চের নতুন প্রজন্মের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২০১৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে কাদের মোল্লার বিচারের রায়ে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে 'আমৃত্যু কারাদণ্ড' প্রদান করা হলে বিক্ষুব্ধ তরুণ সমাজের সদস্যরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঢাকার শাহবাগ চত্বরে জমায়েত হয়। তারা মামলার আপিল শুনানির বিধান করে কাদের মোল্লার প্রাপ্য শাস্তির জোড় দাবি তোলে। রাত দিন বিরতিহীনভাবে সেখানে অবস্থান নিয়ে সকল যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এভাবে গড়ে ওঠে গণজাগরণ মঞ্চ। অতিদ্রুত আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাতে যোগ দেয়। শাহবাগ চত্বর পরিণত হয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত লক্ষ জনতার শপথ গ্রহণের কেন্দ্রস্থলে। এমনই এক পরিস্থিতিতে সরকার ট্রাইব্যুনালের বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের উচ্চ আদালতে আপিল শুনানির বিধান করে সংসদে আইন পাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ আপিল বিভাগ কাদের মোল্লার মামলার বিচারে ফাঁসির রায় দেন, যা একই বছর ১২ই ডিসেম্বর কার্যকর হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে গণজাগরণ মঞ্চের তরুণ সমাজ যখন সোচ্চার, ঠিক সে সময়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার পরিচালক শাহ আহমদ শফী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ইযহারুল ইসলাম কর্তৃক কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত হেফাজতে ইসলাম নামে[৬] ধর্মান্ধ, প্রগতিবিরোধী ও চরম নারী বিদ্বেষী একটি সংগঠন মাঠে নামে। শাহবাগের বিদ্রোহী তরুণদের 'নাস্তিক ব্লগার' হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের ফাঁসির দাবিতে দেশজুড়ে মানুষের ধর্মানুভূতি জাগিয়ে তুলতে তারা সচেষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় তারা চরম প্রতিক্রিয়াশীল ১৩-দফা দাবিনামা[৭] উত্থাপন করে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে তাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে বিএনপি-জামায়াতের মদদপুষ্ট হয়ে যে তারা মাঠে নামে, তা শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে যায়। ২০১৩ সালের ৬ই এপ্রিল ১৩-দফা দাবিতে ঢাকার মতিঝিল শাপলা চত্বরে তারা প্রথমবার সমাবেশ করে। এর একমাস পর ৫ই মে সারাদেশ থেকে মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক, এমনকি শিশুসহ কয়েক হাজার হেফাজতি ঢাকা অভিমুখে লংমার্চ করে একই শাপলা চত্বরে সমবেত হয়ে অবস্থান নেয় এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনো অবস্থায় স্থান ত্যাগ না করার ঘোষণা দেয়। শাপলা চত্বরে প্রবেশ ও অবস্থানকালে তারা দোকান-পাট, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করে, বাইতুল মোকাররম চত্বরে

www.pathagar.com

অবস্থিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বইয়ের দোকানে আগুন দেয়, পিটিয়ে মানুষ হত্যা করে, সাংবাদিক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর আক্রমণ, গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা এক তাণ্ডবলীলা চালায়। বিএনপি-জামায়াত জোট প্রকাশ্যে তাদের প্রতি সমর্থন জানায়। তাদের সকলের লক্ষ্য ছিল সরকারের পতন ঘটানো। যাহোক, সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা ফোর্সের সহায়তায় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অবস্থানকারীদের ঢাকা শহর থেকে সরিয়ে দিয়ে সফলভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও এর মিত্র বনাম বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়ায়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে (৩রা জুলাই ২০১১) নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যাওয়ায় সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী ক্ষমতাসীন সরকারকে রেখেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ নির্বাচনের পূর্বে দেশের ৫টি সিটি করপোরেশনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীরা জয়যুক্ত হওয়ায় ধারণা করা হয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে বিএনপি-জামায়াত জোট শেষ পর্যন্ত সম্মত হবে। কিন্তু তারা তাদের পূর্বের দাবিতে অনড় থাকে। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের নিজের[৮] এবং এর পূর্বে তাঁর বিশেষ দূত অস্কার ফার্নান্দেজ তারনকো[৯] কারো কোনো প্রচেষ্টাই বরফ গলাতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-কে নির্বাচনে আনতে স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরে এসে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১০] এমনকি বিএনপি-কে নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান এবং স্বরাষ্ট্রসহ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ারও প্রস্তাব দেন। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ভিন্ন কোনো কিছুতেই সম্মত নয় বলে সাফ জানিয়ে দেয়। এমত পরিস্থিতিতে সরকার নির্বাচন নিয়ে অগ্রসর হয়। অপরদিকে বিরোধী জোট শুধু নির্বাচন বর্জনই নয়, তা প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে সারাদেশে হরতাল-অবরোধ, রাস্তা কেটে ফেলা, গাছ কেটে চলাচল বন্ধ করা, রেল লাইনের স্লিপার তুলে ফেলা, চলন্ত বাসে আগুন ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে সাধারণ মানুষ, পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপর আক্রমণ ও হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে চরম এক নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে।[১১] সংকট এমন রূপ পরিগ্রহ করে যে, রাজনীতির পণ্ডিতগণ পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। চতুর্দিকে আশঙ্কা এই বুঝি সেনাশাসন এল। হয় সেনাশাসন, না হয় নির্বাচন, এ দুই ভিন্ন বিকল্প কিছু তখন ছিল না। শেখ হাসিনার সরকার দ্বিতীয় বিকল্প অর্থাৎ নির্বাচনের পথই বেছে নেয়। সাংবিধানিক দিক থেকেও তা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এভাবে ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ছাড়া জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জাতীয় পার্টি বা জেপি (মঞ্জু), বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ (ইনু), বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনফ) ইত্যাদি দল ও কয়েকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী এতে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩৪টি আসন লাভ করে।[১২] অর্ধেকের বেশি আসনে (১৫৩) আওয়ামী লীগ ও অন্যদলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত

www.pathagar.com

হন।[১৩] প্রধান বিরোধী দল/জোটের নির্বাচন বর্জন ও তা প্রতিহত করতে সর্বগ্রাসী সন্ত্রাসী ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বিবেচনায় নির্বাচনি চিত্র এমনটি হওয়া ব্যতীত ভিন্ন কিছু হওয়ার কথা নয়। এখন অনেকেই স্বীকার করেন যে, প্রধানত শেখ হাসিনার সাহস, ধৈর্য, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার কারণেই দেশ সেদিন নিশ্চিত সেনাশাসনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

নির্বাচনোত্তর ১২ই জানুয়ারি ২০১৪ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় পার্টিসহ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের অন্যান্য শরিক দলের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে নতুন সরকার গঠিত হয়। মন্ত্রিসভায় মহাজোটের অন্যতম শরিক এইচ এম এরশাদের জাতীয় পার্টির ৩ জন সদস্য স্থান পান। এভাবে সরাসরি সরকারের অংশ হয়েও একই সঙ্গে রওশন এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির সংসদে বিরোধী দলের আসন গ্রহণ খুবই অভিনব।

যাহোক, নির্বাচন প্রতিহত করা বা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে নিজস্ব দাবিতে কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলা–বিএনপি-জামায়াত জোট এর কোনোটাই করতে সক্ষম না হওয়ায় রাজনৈতিকভাবে এরা এক মহাবিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়। এরশাদের শাসন আমল বাদ দিলে, ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর এই প্রথমবার বিএনপি সংসদে সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্বহীন, অথচ বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া স্বয়ং ৩ বারে সাড়ে দশ বছর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দলটি ১/১১-র সময় সাংগঠনিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরশাদের স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলন (১৯৮২-১৯৯০), এমনকি খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের সময় (১৯৯১-১৯৯৫) বিরোধী দলের নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি যতটা জনসমর্থন পেয়েছিল, পরবর্তীকালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার (২০০১-২০০৬) ও ১/১১-পরবর্তী সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের (২০০৭-২০০৮) নানা ঘটনায় ঐ জনসমর্থন যে অনেকটা হ্রাস পায়, সে হিসাব বিএনপি-জামায়াত জোটের ছিল বলে মনে হয় না। একই ইস্যুতে অনড়-অবিচল না থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে-কোনো বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ বা নমনীয় অবস্থান নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছে নির্বাচনে যাওয়া তাদের জন্য রাজনৈতিক দিক থেকে প্রাজ্ঞ ও বাস্তবমুখী হতো। কিন্তু নির্বাচনে না গিয়ে তা প্রতিহত করার নামে সারাদেশব্যাপী তারা যে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, তা ছিল মহা ভুল ও চরম হঠকারী। এর ওপর নতুন করে যুক্ত হলো ৫ই জানুয়ারির নির্বাচনের এক বছর পূর্তিতে ২০১৫ সালের ঐদিন থেকে দ্বিতীয় দফার চরম সহিংসতার বীভৎস রূপ, যা ৫ই জানুয়ারির নির্বাচন প্রতিহত করার নামে তাদের পূর্বের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের চেয়েও অধিক ভয়াবহ ও বিধ্বংসী ছিল। নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু, শিক্ষার্থী, পথচারী, যাত্রী, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সাধারণ মানুষ কেউ তাদের আক্রোশ থেকে রক্ষা পায়নি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিট পেট্রোল বোমার আগুনে দগ্ধ মানুষের পোড়াগন্ধে ভারী হয়ে ওঠে। অযৌক্তিক এ আন্দোলনকে উৎসাহিত ও বেগবান করতে বিএনপি নেত্রী নিজ বাসভবন ছেড়ে পুরো সময় গুলশানস্থ নিজ দলীয় কার্যালয়ে অবস্থান নেন। বিএনপি-জামায়াতের দ্বিতীয় দফার এ 'কর্মসূচি' পালনকালে দেড় শতাধিক লোক নিহত, বহু অগ্নিদগ্ধ ও অসংখ্য মানুষ আহত হন। আইন-শৃঙ্খলা

www.pathagar.com

রক্ষাকারী বাহিনীর ২০ জন সদস্য প্রাণ হারান। এসব কার্যকলাপের কারণে বিএনপি-জামায়াত আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

বস্তুত বিএনপি-জামায়াত জোটের দেশব্যাপী দ্বিতীয় দফার চরম সহিংসতা ও বিধ্বংসী কার্যকলাপের মূলে যতদূর না ছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি, তার চেয়ে বহুগুণে বেশি ছিল সরকারের পতন ঘটিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ এবং তাদের উভয় দলের শীর্ষ নেতাদের নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা। উল্লেখ্য, একমাত্র কাদের মোল্লা ছাড়া বাকি ৫ শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় তখনো কার্যকর হয়নি।

আদালতের রায়ে জামায়াত ইতোমধ্যে সন্ত্রাসী ও যুদ্ধাপরাধী দল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন হারিয়েছে। রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি দেশে প্রবল এবং বিষয়টি সরকারের জোর বিবেচনাধীন রয়েছে। এ দেশে অতীতেও জামায়াতের কোনো সম্ভাবনা ছিল না, বর্তমানেও নেই আর ভবিষ্যতে এর নামই মুছে যাওয়ার কথা। কেননা, কোনো স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে স্বাধীনতা-বিরোধী যুদ্ধাপরাধী দলের রাজনীতি চর্চার অধিকার থাকতে পারে না। অপরদিকে, বিএনপি রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে বলে প্রতীয়মান হয়। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির সংসদ নির্বাচন বর্জন করা সত্ত্বেও ২০১৫ সালের ২৮শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দলটি অংশগ্রহণ করে, যদিও নির্বাচনের দিন মাঝপথে এসে নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়ায়। ৭ বছর পরে হলেও ২০১৬ সালের ১৯শে মার্চ বিএনপি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এর ৬ষ্ঠ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত করে। বিএনপি-র প্রধান সমস্যা রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার অভাব। কোনো অবস্থায়ই দলটি পাকিস্তানি মন-মানসিকতা আর জামায়াতের সঙ্গ ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচ্ছন্ন রাজনীতির চর্চা বা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অন্য কথায়, পাকিস্তানি মন-মানসিকতা ও জামায়াতের মতাদর্শ দ্বারা এর নেতৃত্ব প্রায়সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন। সম্ভবত সে কারণেই যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডিত ও দণ্ড কার্যকর হওয়া দলের দুই নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আবদুল আলীম-এর বয়সে খুবই তরুণ দুই সন্তানকে বিএনপি-র নবগঠিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে পর্যন্ত স্থান দেওয়া হয়েছে।

ধর্মের নামে নতুন করে উগ্র জঙ্গিগোষ্ঠীর অধিকতর হিংস্রতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বর্তমান সময়ে জাতির সম্মুখে সন্ত্রাসবাদের আর এক উপসর্গ। একথা ঠিক যে, জঙ্গিগোষ্ঠীর সৃষ্টি নতুন নয়, যা পূর্বে (অধ্যায় ১৯) উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আত্মঘাতী হিসেবে এদের আবির্ভাব নতুন। গুলশান হলি আর্টিজানের জিম্মি হত্যার মর্মান্তিক ঘটনা (১লা জুলাই ২০১৬), মুসলমানদের ধর্মীয় ইদের দিন (৬ই জুলাই ২০১৬) কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় দেশের বৃহত্তম ইদের জামায়াতের সন্নিকটে পুলিশের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ ও হত্যা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকার কল্যাণপুর, রূপনগর, লালবাগ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের দুর্ধর্ষ জঙ্গি আস্তানা এরই প্রমাণ।

কথিত নাস্তিক ব্লগার হত্যার পাশাপাশি ধর্মীয় সংখ্যালঘু, মন্দিরের পুরোহিত, বৌদ্ধ ধর্মগুরু, গির্জার যাজক, বিদেশি নাগরিক এরা সবাই এখন এদের টার্গেট কিলিং-এর

www.pathagar.com

লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত। ঢাকায় ইতালীয় নাগরিক সিজার তাবেলা হত্যা (২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৫), রংপুরে জাপানি নাগরিক কুনিও হোশি হত্যা (৩রা অক্টোবর ২০১৫), গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোঁরায় জিম্মি করে ২০ জন বিদেশিকে হত্যা এরই ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয়।

তবে বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি-আদর্শ হচ্ছে সমন্বয় ও সম্প্রীতি। আমাদের রয়েছে সংশ্লেষাত্মক সংস্কৃতি (Syncretestic Culture) ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বা জঙ্গিবাদ বাংলাদেশের সমাজের যতটা অভ্যন্তরীণ, তার চেয়ে অধিক বহিরারোপিত। এর আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক উৎসমূলও তাই। এ সবকিছু বিবেচনায়, বাংলাদেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বা জঙ্গিবাদ যে কখনও স্থায়ী স্থান করে নিতে সমর্থ হবে না, সেকথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। উগ্র জঙ্গিগোষ্ঠী দমনে রাষ্ট্রীয় শক্তির যথার্থ প্রয়োগ এবং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত।

জাতীয় রাজনীতি ও জাতীয় জীবনের আলোচিত এসব বিষয় নিয়ে আওয়ামী লীগের ২০তম কাউন্সিলের পটভূমি রচিত।

কাউন্সিল অধিবেশন

আওয়ামী লীগের আলোচ্য কাউন্সিল উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত বিশাল প্যান্ডেল, নৌকা আকৃতির মঞ্চ, প্যান্ডেলের ভেতরে ও বাইরে ডিজিটাল পর্দা, ফেস্টুন, ব্যানার, উদ্যানের বিভিন্ন প্রবেশমুখ ও সড়কে তোরণ নির্মাণ, অনুষ্ঠান স্থলসহ ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সকল সড়ক, সড়কের আইল্যান্ড, বিশেষ করে বিমানবন্দর থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত সড়কটিতে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা ইত্যাদি সমভিব্যাহারে এক বর্ণিল সাজে অনুষ্ঠান স্থল ও এর আশপাশ, বলা যায় পুরো ঢাকা শহরকেই অপরূপ সাজে সাজানো হয়। সিসি ক্যামেরা বসিয়ে নিশ্চিত করা হয় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। অনুষ্ঠানের প্রচার ও পরিবেশনায় পূর্বের যে-কোনো সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহারে তা হয়ে ওঠে আরও বর্ণিল, আরও আকর্ষণীয়। সম্মেলনের পূর্বে কয়েকদিন ধরে বড়ো বড়ো এলইডি স্ক্রিনে দলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্জন ও উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরা হয়। আয়োজনের সর্বত্র পেশাদারিত্বের স্পর্শ ছিল লক্ষণীয়। সার্বিক ব্যবস্থাপনা যাতে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল হয় তা নিশ্চিত করতে দলের পক্ষ থেকে পূর্বেই বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক উপ-কমিটি গঠন করে দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়। নিয়োজিত করা হয় প্রায় ২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক। স্বাস্থ্য সেবার জন্য মোতায়েন করা হয় বেশ কয়েকটি মেডিকেল টিম। এবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আসন বিন্যাসেও ছিল বৈচিত্র্য। বিদেশি অতিথি, আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথি, স্ব স্ব জেলার কাউন্সিলর, সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এদের বসার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে পৃথকভাবে আসন বিন্যাস করা হয়। অনুষ্ঠানে ৬ হাজার ৫শ ৭০ জন কাউন্সিলর ছাড়াও সারাদেশ থেকে আগত ডেলিগেটস, দলের নেতা-কর্মী, আমন্ত্রিত অতিথি নিয়ে প্যান্ডেলের ভেতরেই ৩০ হাজার লোক আসন গ্রহণ করেন। এর বাইরেও প্রচুর সংখ্যক নেতা-কর্মী ও উৎসুক জনতা ডিজিটাল পর্দায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে। সব

www.pathagar.com

মিলিয়ে লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। কাউন্সিল উপলক্ষ্যে চতুর্দিকে সৃষ্টি হয়েছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। ঢাকা শহরের বাইরে এমনকি মফস্সল শহরে পর্যন্ত এর ঢেউ উপচে পড়ে এবং ঐ সব স্থানেও আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। কাউন্সিলর, ডেলিগেটস ও অতিথিবৃন্দের প্রত্যেককে শোক প্রস্তাব, শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ, অভ্যর্থনা উপ-কমিটির আহ্বায়কের ভাষণ, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা, উত্তরণ নামে দলের মুখপত্রের বিশেষ সংখ্যা, ২০১৪ সালের আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের (২০০১-২০০৬) শাসন আমল বনাম ২০০৯ সাল থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সাফল্য ও অর্জনের একটি তুলনামূলক চিত্র, বিএনপি-জামায়াতের আগুন সন্ত্রাসের ধারণকৃত সিডি ইত্যাদি সামগ্রী একটি ব্যাগে বিতরণ করা হয়। এছাড়া দলের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়।[১৪] উদ্বোধনী দিনের সন্ধ্যায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কোলকাতার শিল্পী কৌশিক-এর বালি দ্বারা তৈরি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিবেশনা ছিল খুবই মর্মস্পর্শী।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত নৌকা আকৃতির মূল মঞ্চের সম্মুখভাগে বড়ো আকারে একদিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অপরদিকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি রক্ষিত ছিল। মঞ্চের পেছনে স্ক্রিনের সমগ্র স্থান জুড়ে ১৫ই আগস্টের শহিদ বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে শহিদ জাতীয় চার নেতা এবং আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক (টাঙ্গাইল) ও আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এঁদের ডিজিটাল ছবি বসানো ছিল।

সকাল ১০টার পরপর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও কাউন্সিলের উদ্বোধক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঞ্চে এসে উপস্থিত হন। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সঙ্গে-সঙ্গে শেখ হাসিনা মঞ্চের এক প্রান্তে রক্ষিত জাতীয় পতাকা এবং দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। একই সময় ৭৩টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকগণ মঞ্চের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে রক্ষিত স্ট্যান্ডে দলের পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর শেখ হাসিনা ও সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বেলুন ও শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে দেন। এসব শেষে শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে কাউন্সিলের উদ্বোধন ঘোষণা করে নিজ আসন গ্রহণ করেন। মঞ্চে প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কার্যনির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দের জন্যও আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর-এর পরিচালনায় একদল শিল্পী 'আলোর অভিযাত্রা' নামে মনোজ্ঞ গীতিনৃত্য পরিবেশন করেন। অতঃপর দলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং উপ-সম্পাদক যথাক্রমে ড. হাছান মাহমুদ ও অসীম কুমার উকিলের পরিচালনায় উদ্বোধনী পর্বের অন্যান্য কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রথমে চারটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। এরপর দলের দপ্তর সম্পাদক আবদুল মান্নান খান ৪৮ পৃষ্ঠার মুদ্রিত পুস্তিকা থেকে শোকপ্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

www.pathagar.com

১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্য, জাতীয় চার নেতা, ২০০৪ সালের গ্রেনেড হামলায় নিহত নেতা-কর্মী এবং গত কাউন্সিল (২০১২) থেকে এ পর্যন্ত নিহত দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী, দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিবর্গ এবং দেশ-বিদেশে যেসব বরেণ্য ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের সকলের স্মরণে এ শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৫] এরপর সম্মেলন উপলক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা উপ-পরিষদের আহ্বায়ক ও প্রেসিডিয়াম সদস্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম দলের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।[১৬]

অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১২টি দেশের ৫৯ জন অতিথি বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।[১৭] তাঁদের মধ্যে ঝেং জিয়াও সং (চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের ভাইস-মিনিস্টার), ড. বিনয় প্রভাকর সহস্রবুদ্ধে এমপি (ভারতের বিজেপি-র সহ-সভাপতি), গোলাম নবী আজাদ (ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্যসভার বিরোধী দলীয় নেতা), বিমান বসু (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া- সিপিএম-এর পলিটব্যুরোর সদস্য), পার্থ চ্যাটার্জি (সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী), এডভোকেট মাজেদ মেনন এমপি (মেঘালয় ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির নেতা), প্রফুল্ল কুমার মহন্ত (আসাম গণপরিষদের নেতা ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী), জোরাম থাঙ্গা (মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট নেতা), জেনি রাথবোন (যুক্তরাজ্যের ওয়েলস সরকারের এসেম্বলি মেম্বার), দীপক ওবেরয় এমপি (কানাডার কনজার্ভেটিভ পার্টির নেতা), হিউ ম্যাকডরমট এমপি (অস্ট্রেলিয়ার লেবার পার্টির নেতা), খালিদ চৌহোকি এমপি (ইতালির ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা), সের্গেই ঝেলঝিনিয়াক (রাশিয়ার ইউনাইটেড রাশিয়া পার্টির নেতা), এ এইচ মোহাম্মদ হাশিম (শ্রীলঙ্কার ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির নেতা ও ধর্মমন্ত্রী), দীননাথ ডুঙ্গায়েল (ভুটানের তথ্য ও যোগাযোগমন্ত্রী), মিসেস ফুচ এমপি (অস্ট্রিয়ার সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা), রাম শর্মা মহত (নেপালি কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কাউন্সিল অধিবেশনে এঁরা প্রত্যেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এঁদের প্রত্যেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, ১৫ই আগস্টের ট্র্যাজেডির কথা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্য সীমা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস, উচ্চহারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, জঙ্গিবাদ নির্মূলে তাঁর অঙ্গীকার ও সাহসী ভূমিকা, নারী শিক্ষার প্রসার, উন্নয়নে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, ২১শে ফেব্রুয়ারির 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর স্বীকৃতি অর্জন, আন্তর্জাতিক ফোরামে শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ভূমিকা ইত্যাদি প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাঁর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৮] তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। অতিথিদের মধ্যে ভুটানের প্রতিনিধি তাঁর দেশ কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দানের (৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১) কথা, রাশিয়ার প্রতিনিধি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর চট্টগ্রাম বন্দরের মাইন অপসারণসহ

www.pathagar.com

বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা, ভারতের কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিআই (এম)-এর প্রতিনিধিগণ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিজেপি প্রতিনিধি ড. বিনয় প্রভাকর সহস্রা বুদ্ধে এমপি তাঁর বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'সত্যিকার জননেত্রী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি-র সভাপতি অমিত শাহ শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধি এ এইচ মোহাম্মদ হাশিম তাঁর দেশের রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা বাণী সম্মেলনে পাঠ করে শোনান।

কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত জামায়াতে ইসলামী ব্যতীত দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁর দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা কেউ যোগদান করেননি। তাঁদের দলের কোনো প্রতিনিধিও পাঠানো হয়নি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী (সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সভাপতি, বিকল্প ধারা বাংলাদেশ), মেজর এম এ মান্নান (মহাসচিব, বিকল্প ধারা), ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা (সাবেক মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয় জোট), আ স ম আব্দুর রব (সভাপতি, জেএসডি), মঞ্জুরুল আহসান খান (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য), মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম (সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি (জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও বর্তমান সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রী), জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু (জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সংসদে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ), রাশেদ খান মেনন এমপি (ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী), ফজলে হোসেন বাদশা এমপি (ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক), হাসানুল হক ইনু এমপি (জাসদ-ইনুর সভাপতি ও মহাজোট সরকারের তথ্য মন্ত্রী), শিরীন আক্তার এমপি (জাসদ-ইনুর সাধারণ সম্পাদক), শরীফ নূরুল আম্বিয়া (জাসদ-এর অপর এক অংশের সভাপতি), মঈনউদ্দিন খান বাদল এমপি (জাসদ-এর অপর এক অংশের নেতা), শেখ শহীদুল ইসলাম (জেপি-র সাধারণ সম্পাদক), নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী এমপি (তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান), আবদুল আউয়াল (তরিকত ফেডারেশনের মহাসচিব), দিলীপ বড়ুয়া (সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মন্ত্রী), এনামুল হক (ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক), ডা. শাহাদাত হোসেন (গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক), ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান (কমিউনিস্ট কেন্দ্রের নেতা) ও অসীত বরণ রায় (যুগ্ম-সম্পাদক, কমিউনিস্ট ঐক্য কেন্দ্র) প্রমুখ।[১৯]

শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডা. শাহাদাত হোসেন এবং কমিউনিস্ট ঐক্য কেন্দ্রের

www.pathagar.com

অসীত বরণ রায়। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, 'আওয়ামী লীগের ভবিষ্যতের ওপর দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে'। গণতান্ত্রিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক এক ধাপ এগিয়ে বলেন, 'এই সম্মেলন শুধু আওয়ামী লীগের নয়। এই সম্মেলন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল মতের।'[২০] উল্লেখ্য, এরা সবাই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটভুক্ত।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশের পর একই অধিবেশনে বিভিন্ন বিভাগের পক্ষ থেকে দলের একজন করে প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। তাঁরা হলেন হারুনুর রশীদ (খুলনা), শফিকুর রহমান (সিলেট), মমতাজ উদ্দিন (রাজশাহী), আব্দুস সালাম (চট্টগ্রাম), ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু (বরিশাল) ও চৌধুরী এমদাদুল হক (ঢাকা) এরা সাংগঠনিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক বক্তব্য রাখেন।[২১]

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

২২শে অক্টোবর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম পুস্তিকা আকারে ৮৮ পৃষ্ঠার একটি সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন।[২২] তাঁর এ রিপোর্টটি ৩ ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) যারা শহিদ হয়েছেন এবং ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ এবং তাঁর নিজের রাজনৈতিক বক্তব্য স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে বিগত কাউন্সিল (২০১২)-এর পর থেকে বর্তমান কাউন্সিলের পূর্ব পর্যন্ত দলের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কার্যক্রমের দিনপঞ্জি আকারে বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয়ভাগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর এ ৭টি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ৭ সাংগঠনিক সম্পাদকের প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে সৈয়দ আশরাফ তাঁর এ রিপোর্টটি পাঠ না করে এর গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ তুলে ধরেন। মুদ্রিত পুস্তিকা আকারে তাঁর রিপোর্টের প্রথম ভাগের বক্তব্য ও দলের সভানেত্রীর বক্তব্যের মধ্যে বহুলাংশে মিল থাকায় পুস্তিকা ও তাঁর রিপোর্টের প্রধান দিকসমূহ এখানে তুলে ধরা হলো : কাউন্সিলের পটভূমি ও এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পটভূমি, প্রতিষ্ঠার পর থেকে আওয়ামী লীগের সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও প্রতিটি আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন, আওয়ামী লীগের চলার পথ যে আদৌ 'কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না' সে কথা নেতা-কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া, শেখ হাসিনার তিনবারের সরকারের সাফল্য বা অর্জনসমূহ তুলে ধরা, যে-কোনো সংকটে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের সর্বাগ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া, তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাই দলের আসল শক্তি, আওয়ামী লীগ যে-কোনো সময়ের চেয়ে এখন শক্তিশালী, কোনো 'অশুভ শক্তির চর, সন্ত্রাসী, মাদকসেবী, অসৎ ও বিতর্কিত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ যেন দলের মধ্যে না ঘটে সে ব্যাপারে সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার' আহ্বান, 'দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে' দলীয় সকল স্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা, দলীয় ঐক্য ও সংহতিকে সর্বোচ্চ

www.pathagar.com

পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহার করে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা, কারো ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডে দল যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকা, বিরোধী দলের মিথ্যা অপপ্রচারের সঠিক জবাব দেওয়া, জঙ্গিগোষ্ঠীর অপতৎপরতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা, মহাজোটের ঐক্যকে তৃণমূল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা, আগামী নির্বাচনে বিজয়ের জন্য এখনই কাজে আত্মনিয়োগ করা, আওয়ামী লীগের মতো আত্মত্যাগ পৃথিবীর কোনো রাজনৈতিক দল করেনি বলে মন্তব্য, 'আমি আওয়ামী লীগের সন্তান', 'আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই এই আওয়ামী লীগকে স্তব্ধ করে দিতে পারে' এ ঘোষণা, 'আওয়ামী লীগ শুধু একটা রাজনৈতিক দল নয়, এটা অনুভূতি',[২৩] আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতে এ দেশে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে, এরপরও আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি এবং কোনো দিনই কেউ পারবে না, একথা ঘোষণা ইত্যাদি। এরপর কাউন্সিলরদের উদ্দেশে তাঁর জিজ্ঞাসা[২৪]–

- এদেশে গণতন্ত্র থাকবে, নাকি অনির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনা করবে।
- এ দেশ কি আবার উগ্র জঙ্গিগোষ্ঠীর বিচরণ ভূমি হবে, নাকি উদার গণতান্ত্রিক দেশ হবে।
- এদেশে কি আবার 'বিচারহীনতা'র সংস্কৃতি চালু হবে, নাকি আইনের শাসন চলবে।
- এ দেশ কি সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পরিণত হবে, নাকি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে এগিয়ে যাবে।

শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ

২২শে অক্টোবর কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল শেখ হাসিনার ভাষণ। তাঁর ৪৪ পৃষ্ঠার উদ্বোধনী ভাষণটি পুস্তিকা আকারে ছেপে বিতরণ করা হয়।[২৫] তিনি এটি পাঠ না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ৩৭ মিনিট ধরে তাঁর ভাষণ রাখেন। তাঁর সে ভাষণ ও পুস্তিকার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ ছিল এরূপ : মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহিদ, সম্ভ্রম হারানো ২ লক্ষ মা-বোন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহিদ, জেল হত্যার শিকার জাতীয় চার নেতা, ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নারীনেত্রী আইভি রহমানসহ নিহত ২২ জন নেতা-কর্মী, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দ, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের (২০০১-২০০৬) আমলে আওয়ামী লীগের নিহত ২১ হাজার নেতা-কর্মী, ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিহত করার নামে এবং মহাজোট সরকারের এক বছর পূর্তিতে ২০১৫ সালের শুরু থেকে ৩ মাসব্যাপী বিএনপি-জামায়াত জোটের চরম সন্ত্রাসী আক্রমণের যাঁরা শিকার তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ, বিপুলসংখ্যক বিদেশি প্রতিনিধি ও দেশি-বিদেশি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, পলাশী যুদ্ধের প্রায় দুশ বছর পর একই দিন (২৩শে জুন) আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক তাৎপর্য, আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের দীর্ঘ সংগ্রামী ভূমিকা ও অর্জন, আওয়ামী লীগের ইতিহাস আর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের

www.pathagar.com

ইতিহাস অভিন্ন সত্তায় পরিণত হওয়া, জাতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ অর্জন তার নেতৃত্বমূলে আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগকে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুর 'গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চারণের বেশে ঘুরে বেড়ান', ভাষা-আন্দোলনের প্রথম পর্বে বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার বরণ (১১ই মার্চ ১৯৫২), কারাগারে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর অনশন পালন, ২১শে ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালনে সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত (৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩) এবং এ ব্যাপারে সারাদেশে দলের ইউনিটসমূহকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ই (১৯৫৬-১৯৫৮) ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা, সরকারের অন্যান্য সাফল্য, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আইয়ুব সরকারের নতুন ষড়যন্ত্র, তাঁর (শেখ হাসিনা) প্রথম সরকারের সময় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ (১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯), ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ভূমিকা, ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে এনডিএফ জোটের বাইরে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, পাকিস্তান রাষ্ট্রে শিক্ষা, চিকিৎসা, সরকারি চাকরি, সামরিক বাহিনী ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের চিত্র, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর 'আমাদের বাঁচার দাবী' ৬ দফা পেশ, ৭ই জুনের (১৯৬৬) হরতাল এবং পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত হওয়া, এর পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার (৮ই মে ১৯৬৬) এবং তাঁর ও আরও ৩৪ জনের বিরুদ্ধে আইয়ুব সরকারের 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতা মামলা দায়ের ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার অনুষ্ঠান, আগরতলা মামলাবিরোধী ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও বঙ্গবন্ধুসহ সকলের নিঃশর্ত মুক্তিলাভ, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন এবং আওয়ামী লীগের বিজয় অর্জন, ক্ষমতা হস্তান্তরে নতুন সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া সরকারের ষড়যন্ত্র, ২-২৫শে মার্চ (১৯৭১) বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতো এখানকার সবকিছু পরিচালিত হওয়া, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতির নির্দেশনা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বক্ষণে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধের আহ্বান, ১০ই এপ্রিল (১৯৭১) বঙ্গবন্ধুকে প্রধান করে 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠন, ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে সরকারের শপথ গ্রহণ, ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন-পুনর্বাসনে আত্মনিয়োগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও সাফল্য, বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল আইনে (১৯৭২) যুক্তিযুদ্ধবিরোধী দালালদের বিচার শুরু, ধর্মভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ পাশ, ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের সময় যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণে সে দেশের সরকারের কাছে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা কামনা, সমুদ্র সীমা নির্ধারণে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু

www.pathagar.com

সরকার কর্তৃক মেরিটাইম আইন পাশ, একই বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড, এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতা, ক্ষমতা দখলকারীদের কর্তৃক তাঁকে (শেখ হাসিনা) ও শেখ রেহানাকে দেশে আসতে না দেওয়া, ১৯৮১ সালে তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তন, জিয়া সরকার কর্তৃক তাঁদের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেওয়া, রাস্তায় বসে মিলাদ পড়ানো, 'সেনাছাউনিতে বসে দলছুট রাজনীতিবিদদের নিয়ে' জেনারেল জিয়ার দল গঠন (১৯৭৮), ১৯৭৫ সালের ৩১শে অক্টোবর দালাল আইন বাতিল করে সাজাপ্রাপ্ত ১১ হাজার রাজাকার-আলবদরকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের হাত থেকে রক্ষার্থে কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইন (২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) জারি এবং খুনিদের বিদেশে বাংলাদেশের মিশনে চাকরি দেওয়া, জিয়া সরকার কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াত ও যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতি করার সুযোগ দান, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসার অনুমতি দান, স্বাধীনতা-বিরোধী শাহ আজিজ ও আব্দুল আলীমকে জেনারেল জিয়ার মন্ত্রী করা, জেনারেল জিয়ার অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা, জেনারেল জিয়ার স্ত্রী ও বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ-কে[২৬] মন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে সরকার গঠন (২০০১-২০০৬), বঙ্গবন্ধুর খুনি কর্নেল রশীদ ও বজলুল হুদাকে মধ্য ফেব্রুয়ারির (১৯৯৬) ভোটারবিহীন নির্বাচনে এমপি হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া, দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে জয়লাভ করে তাঁর (শেখ হাসিনা) নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর এ সরকারের সাফল্য বা অর্জন, ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি (১২ই ডিসেম্বর ১৯৯৬), পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি (২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭), ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ, তাঁর প্রথম সরকারের সময় গড়ে ৬.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকার, কুখ্যাত ইনডেমনিটি আইন বাতিল করে (১২ই নভেম্বর ১৯৯৬) ১৫ই আগস্টের খুনিদের বিচারের ব্যবস্থা, জেল হত্যার বিচার প্রক্রিয়া শুরু, প্রগতিশীল নারী নীতি (১৯৯৭), চার স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, দেশকে পুনরায় মুক্তিযুদ্ধের ধারায় ফিরিয়ে আনা, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের (২০০১-২০০৬) সারাদেশব্যাপী হত্যা-খুন ধর্ষণসহ সন্ত্রাসের তাণ্ডবলীলা, এদের হাতে ২১ হাজার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী হত্যা, তাঁকে (শেখ হাসিনা) হত্যার উদ্দেশ্যে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিন্যু আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা এবং তাতে নারী নেত্রী আইভি রহমানসহ ২২ জন নেতা-কর্মীর নিহত হওয়া, খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের দুর্নীতির আখড়া 'হাওয়া ভবন', বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে পরপর ৫ বার দুর্নীতিতে বাংলাদেশ 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' হওয়া, বিএনপি নেত্রীর জরিমানা দিয়ে কালো টাকা সাদা করা, জোট সরকারের সময় ১ কোটি ২৩ লক্ষ ভুয়া ভোটার তালিকাভুক্ত করা, বিএনপি-জামায়াত

www.pathagar.com

জোটের নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নানা অপচেষ্টা, বিএনপি-জামায়াত জোটের কারণে ১/১১-র সৃষ্টি, সেনা নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে (২০০৭-২০০৮) তাঁকে (শেখ হাসিনা) গ্রেপ্তার (১৬ই জুলাই ২০০৭) এবং শেরে বাংলা নগরে একটি সাব-জেলে প্রায় এক বছর বন্দি রেখে দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারের সম্মুখীন করা, তাঁর মুক্তির দাবি করে ঢাকা মহানগরের ২৫ লাখ মানুষের গণস্বাক্ষর, মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সে সময়কার সাহসী ভূমিকার প্রশংসা, ২০০৮ সালের ২৬শে মে আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় নেতা-কর্মীদের সেনাশাসনের বিরুদ্ধে এবং তাঁর আশু মুক্তি ও নির্বাচনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে 'মাইলফলক' হিসেবে আখ্যায়িত করা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করা, এক নির্বাচিত সরকার কর্তৃক আর এক নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, জাতির পিতার কাছ থেকে আদর্শ শিক্ষা 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চেতনা'-কে যে-কোনো বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে আওয়ামী লীগের শক্তির উৎস বলে উল্লেখ, ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির দশম সংসদ নির্বাচনের পূর্বে দেশের অন্যতম বিরোধী দল বিএনপি-র সঙ্গে সমঝোতার নানা উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা, ঐ নির্বাচন বয়কট ও প্রতিহত করার নামে এবং ২০১৫ সালের ৫ই জানুয়ারি সরকারের এক বছর পূর্তিতে নতুন করে ৩ মাস ধরে বিএনপি-জামায়াত জোটের লাগাতার সন্ত্রাসের তাণ্ডবলীলা, পেট্রোল বোমায় ২৩১ জন নিরীহ মানুষ হত্যা, সহস্রাধিক লোক আহত হওয়া, ২০ জন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যকে হত্যা, হাজার হাজার গাছ কেটে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি, শতশত যানবাহন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে তা ধ্বংস, হত্যা-সন্ত্রাস-ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলাকালীন পুরো সময় বিএনপি নেত্রীর নিজের বাসা ছেড়ে গুলশানে তাঁর পার্টি অফিসে অবস্থান ও সেখান থেকে সন্ত্রাসীদের হুকুম দান, তাঁর (শেখ হাসিনা) দ্বিতীয় (২০০৯-২০১৩) ও তৃতীয় মেয়াদের (২০১৪-) সরকারের বিভিন্ন সাফল্য ও অর্জন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সঙ্গে তাঁর সরকারের তুলনামূলক চিত্র, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই এমডিজি-র অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিশ্বের জন্য রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি, ৫টি সম্ভাবনাময়ী দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি, মানুষের মাথাপিছু আয় ১৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত, গড় আয়ু ৭১ বছর হওয়া, গত ৭ বছরে প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬.৬৭ শতাংশ হওয়া, বর্তমান বছরে প্রবৃদ্ধির হার ৭.১১ হওয়া, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ১২৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি, বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১৫ হাজার মেগাওয়াট, ২০২১ সালের পূর্বেই শতভাগ লোককে বিদ্যুতের আওতায় আনার পরিকল্পনা, রংপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা, কৃষিতে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষকদের জন্য ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা, নন-ইউরিয়া সারের মূল্য অর্ধেক কমিয়ে আনা, বর্গাচাষিদের জন্য কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্পসুদে বিনা জামানতে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা, এক দশকে কৃষি উৎপাদন ৩ গুণ বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বয়স্ক, বিধবা ও দুঃস্থ নারী,

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ভাতা প্রচলন এবং এর পরিমাণ বৃদ্ধি, শিক্ষার হার ৭১ শতাংশে উন্নীত, ৬ বছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ১৯৩ কোটি বই বিতরণ, ইতিহাস বিকৃতি রোধ করে জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা, ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, ১ লক্ষ ২০ হাজার শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ, ৩ হাজার ৫৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, ৪ হাজার ৫শ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২৩ হাজার ৩৩১টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু, প্রত্যেক উপজেলায় একটি সরকারি স্কুল ও একটি করে সরকারি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা, কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ এবং প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ১০০ উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের চলমান কার্যক্রম, দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ৩৮৯টি উপজেলায় তা স্থাপন, মহিলাদের জন্যও এরূপ প্রতিষ্ঠান, ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ৩৬৫টি কলেজ সরকারিকরণ, ১৬ হাজার ৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বর্তমানে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ঔষধ বিতরণ এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ দানের ব্যবস্থা করে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দোরগোড়ায় পৌছানো, ২৪টি নতুন সরকারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং হাসপাতালের বেড সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রতি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা, অটিস্টিক শিশুদের জন্য হাসপাতালে বিশেষ স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী ১ লক্ষ পরিবারের জন্য অচিরেই স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেল, ইলেকট্রিক ট্রেন ও পাতাল ট্রেনের নতুন প্রকল্প গ্রহণ, মাদারীপুরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার চলমান প্রকল্প, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, ৪৪টি বেসরকারি টেলিভিশন, ২২টি এফএম রেডিও এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও-র অনুমোদন দান, দুদক-কে শক্তিশালী করা, সাংবাদিকদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ, সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ এ দুভাগে বিভক্ত করা, ময়মনসিংহ-কে বিভাগ হিসেবে ঘোষণা, নিম্ন পর্যায় থেকে শহর পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠান, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, সামাজিক বনায়নে উৎসাহদান, জীববৈচিত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের সর্বক্ষেত্রে নারীর অবস্থান সুনিশ্চিত করা, উপজেলায় নারী ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি, মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৬ মাসে উন্নীতকরণ, জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণ, অন্য রাষ্ট্রে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহৃত হতে না দেওয়ার ঘোষণা, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ কঠোর হস্তে দমন এবং এর প্রতি জিরো টলারেন্স, কাউন্টার টেররিজম সেল গঠন, পেশাদার প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন, আর্মড ফোর্সেস গোল ২০৩০ নির্ধারণ, ঢাকা থেকে

www.pathagar.com

কেরানীগঞ্জে কারাগার স্থানান্তর, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে লং কোর্সের সঙ্গে মহিলা ক্যাডেটদের নিয়মিত কমিশন প্রদানের ব্যবস্থা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এ এই প্রথম মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের শীর্ষে অবস্থান, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা দানকারী বিদেশি বন্ধুদের ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা প্রদান, বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতার স্তম্ভ নির্মাণ, প্রতি জেলা ও উপজেলায় 'মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স' নির্মাণে বিনামূল্যে সরকারের জমি দান, মুক্তিযোদ্ধা, তাঁদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য চাকরিতে ৩০ ভাগ কোটা নির্ধারিত রাখা, মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স এক বছর বৃদ্ধি করে ৬০ বছর নির্ধারণ, সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন, ৩ হাজার ডাকঘরে ডিজিটাল সেবা প্রদান, ই-টেন্ডার ও ই-গভর্নেন্স চালু, গাজীপুরের কালিয়াকৈরে 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি' নির্মাণ, মাধ্যমিক পর্যায়ে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য, জাতিসংঘ কর্তৃক তাঁর (শেখ হাসিনা) 'শান্তির মডেল' সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ, দীর্ঘ ৪৪ বছর পর ভারতের সঙ্গে ছিটমহল সমস্যার সমাধান, মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমা চিহ্নিতকরণ, আরব বিশ্বের দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার, বাংলাদেশ-ভারত-নেপাল-ভুটান এ চার দেশের মধ্যে মোটর ভেহিক্যাল চুক্তি স্বাক্ষর, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বিরোধী দলের প্রতিনিধিসহ সংসদীয় কমিটি গঠন, সংসদ টেলিভিশন চালু, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও রায় কার্যকর করা, যুদ্ধাপরাধী সংগঠনকেও বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে আইন সংশোধন, যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষ অবলম্বন করায় বিএনপি-র সমালোচনা, যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় বিএনপি-জামায়াতের ষড়যন্ত্র এবং লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়, এমনকি এ ব্যাপারে ইসরাইলের লিকুদ পার্টির নেতার সঙ্গে বিএনপি-র এক নেতার বৈঠক, তাঁর (শেখ হাসিনা) পুত্র ও আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যার চেষ্টা, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের সংখ্যা নিয়ে বিএনপি নেত্রীর বিতর্ক সৃষ্টির অপচেষ্টা, সন্ত্রাসী ও জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রতি বিএনপি-জামায়াত জোটের পৃষ্ঠপোষকতা, একই দিন দেশের ৬৩টি জেলার ৫০০ স্থানে জঙ্গিগোষ্ঠীর বোমা হামলা (১৭ই আগস্ট ২০০৫), যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ও তা কার্যকর হওয়া বিএনপি নেতাদের সন্তানদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেওয়া, গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলা (১লা জুলাই ২০১৬) এবং সেখান থেকে ১৩ জন জিম্মিকে জীবিত উদ্ধারসহ স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম হওয়া,[২৭] সন্তানরা যাতে বিপথে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় দেশবাসীকে ধন্যবাদ, 'আওয়ামী লীগ জনগণের সংগঠন', জনগণের ভাষা একমাত্র আওয়ামী লীগই বুঝতে পারে, এরূপ মন্তব্য, 'আওয়ামী লীগ ভোগে নয়, ত্যাগে বিশ্বাসী', বঙ্গবন্ধুর জীবনই আওয়ামী লীগের আদর্শ, আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সেবক আর জনগণের কল্যাণই আওয়ামী লীগের ব্রত, 'রাজনীতি করতে হলে ব্যক্তিগত চাহিদা, লোভ-লালসা ত্যাগ করতে হবে', 'মানুষের আস্থা ও ভালবাসাই আমাদের শক্তি, সম্পদ', বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ, 'কাউকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে দেওয়া হবে

www.pathagar.com

না,' এলাকায় ফিরে গিয়ে জনগণের কাছে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্যের কথা তুলে ধরতে কাউন্সিলরদের প্রতি আহ্বান, পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নেতা-কর্মীদের এখনই কাজ শুরুর নির্দেশ, 'ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষামুক্ত অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার মধ্য দিয়ে... জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব' পালনের অঙ্গীকার, 'শোষিত-বঞ্চিতদের কথা শুনেছি পিতার কাছ থেকে', এলাকায় গিয়ে হতদরিদ্রদের তালিকা প্রস্তুত করতে নেতা-কর্মীদের প্রতি নির্দেশ, আওয়ামী লীগের লক্ষ্য সুদূরে অর্থাৎ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'আধুনিক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত' করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা কায়েম, 'বাংলাদেশ হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু বন্ধন', 'এখন সময় বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার' ইত্যাদি। ভাষণের শেষের দিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং দেশবাসীর কল্যাণে পিতার অনুসরণে তাঁর নিজ জীবন উৎসর্গের অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন :

> এই আওয়ামী লীগই আমার শেষ এবং একমাত্র ঠিকানা। সব হারিয়ে আপনাদের নিয়েই আমি বেঁচে আছি, আমার কোন ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া নেই। দেশের কল্যাণই আমার একমাত্র লক্ষ্য। বারবার আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রহমত এবং আপনাদের ভালোবাসাই আমাকে দেশবাসীর কাছে ফিরিয়ে এনেছে। আমার পিতা বঙ্গবন্ধু জীবন দিয়ে গেছেন, কিন্তু আপনাদের ভালোবাসার অমর্যাদা করেননি। ইনশাল্লাহ জীবন দিয়ে হলেও বাংলার মানুষের বিশ্বাস ও ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করব।[২৮]

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন : জেলা নেতৃবৃন্দের রিপোর্ট, ঘোষণাপত্র গ্রহণ, গঠনতন্ত্র সংশোধন, বাজেট পেশ ও নেতৃত্ব নির্বাচন

২৩শে অক্টোবর সকাল ৯:৩০টায় শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সংলগ্ন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে দলের দ্বিতীয় দিনের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয় এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তা চলে। শুধু কাউন্সিলরদের জন্য এ অধিবেশন সংরক্ষিত ছিল।

জেলা নেতৃবৃন্দের রিপোর্ট

৭৩টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ৪১টি জেলার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।[২৯] তাঁরা হলেন : বদরউদ্দিন আহমেদ কামরান (সিলেট), কামরুল হাসান (কিশোরগঞ্জ), বেনজীর আহমেদ (ঢাকা), এডভোকেট মতিউর রহমান (লালমনিরহাট), আব্দুল হাকিম হাওলাদার (পিরোজপুর), শহিদুল ইসলাম (যশোর), রেজাউল করিম রাজু (রংপুর), বাকী বিল্লাহ (জামালপুর), আনোয়ার সাদাত সম্রাট (পঞ্চগড়), আসাদুজ্জামান আজাদ (রাজশাহী), আজমত উল্লাহ খান (গাজীপুর), মোসলেম উদ্দিন (চট্টগ্রাম), আবু নঈম পাটোয়ারী দুলাল (চাঁদপুর), মতিউর রহমান (সুনামগঞ্জ), দীপঙ্কর তালুকদার (রাঙ্গামাটি), নূরুদ্দীন চৌধুরী স্বপন (লক্ষ্মীপুর), আল মাহমুদ স্বপন (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মমতাজুল ইসলাম (নীলফামারী), এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন (রাজশাহী), সামসুল আলম হীরক (গাইবান্ধা), এডভোকেট জহিরুল হক খোকা (ময়মনসিংহ),

www.pathagar.com

নেছার আহমদ (মৌলভীবাজার), সাদ কোরেশী (ঠাকুরগাঁও), ফজলুর রহমান ফারুক (টাঙ্গাইল), কাজল কৃষ্ণ (মাদারীপুর), মহিউদ্দীন আহমেদ (মুন্সিগঞ্জ), ফজলুল কাদের মজনু মোল্লা (ভোলা), মনসুর আহমেদ (সাতক্ষীরা), এডভোকেট চন্দন কুমার পাল (শেরপুর), গোলাম মহিউদ্দীন (মানিকগঞ্জ), সদর উদ্দিন খান (কুষ্টিয়া), এডভোকেট সিরাজুল মোস্তফা (কক্সবাজার) প্রমুখ। এঁদের সবার এক কথা ছিল, শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা, তাঁকে আজীবন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বদানের আহ্বান, দলের জন্য সৎ, যোগ্য ও বিশ্বস্ত নেতৃত্ব নির্বাচন, 'নতুন কমিটিতে কোনো মীর জাফর চাই না', সজীব ওয়াজেদ জয়কে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে দেখতে চাওয়া, 'আমাদের আগামী দিনের স্বপ্ন সজীব ওয়াজেদ জয়', নেতা-কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ইত্যাদি।[৩০]

ঘোষণাপত্র গ্রহণ

কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের বিকেলের অধিবেশনে দলের ৪৬ পৃষ্ঠার সংশোধিত ঘোষণাপত্র পেশ করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এটি উপস্থাপন করেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ঘোষণাপত্র উপ-পরিষদের আহ্বায়ক শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি। এর প্রধান দিকসমূহ হচ্ছে :[৩১] দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ, শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দেশের দুর্বার এগিয়ে চলা এবং বিশ্বে বাংলাদেশের 'নতুন ইমেজ' সৃষ্টি, ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের বিজয়ের মধ্য দিয়ে 'বাঙালি জাতির জন্য সম্ভাবনার 'এক স্বর্ণ দুয়ার' খুলে যাওয়া, বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা, আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়তে জ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার, নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিশুদিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, নারীর ক্ষমতায়নকে আরও এগিয়ে নেওয়া এবং সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা, প্রতিবন্ধী শিশু ও জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক জঙ্গিবাদ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও জিরো টলারেন্স, সকল ধর্ম, বর্ণ ও নৃ-গোষ্ঠীর সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা সমুন্নত রাখা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত শাসন কাঠামোর প্রতিটি স্তর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া, দারিদ্র্য বিমোচন করে 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'র অগ্রাধিকার, ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন, শিক্ষার্থীদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের সকল অপচেষ্টা প্রতিহত করা, ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা, ব্লু ইকোনোমি বা সমুদ্র সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, সকল ধর্মের মানুষের স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম পালন, রাজনীতিতে কোনোরূপ ধর্মের ব্যবহার না করা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার প্রদান, একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত, দেশপ্রেমিক গণমুখী

www.pathagar.com

প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং প্রবাসী বাঙালিদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা, আইটি শিল্পের উন্নয়ন, পর্যটন খাতের বিকাশ, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, এশীয় রেল ও জনপথের সঙ্গে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়া, গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ এবং চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দরের আধুনিকায়ন, 'সবার জন্য খাদ্য' নিশ্চিত করা, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র 'কর্ম-কমিশন' গঠন, নারী শিক্ষাকে আরও উৎসাহিত করা, শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস ও সেশনজট মুক্ত করা, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে এফিলিয়েটিং অথরিটি হিসেবে গড়ে তোলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা, ভারতের সঙ্গে অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের লক্ষ্যে পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগ গ্রহণ, ২০৩০ সাল নাগাদ সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করা, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা শতকরা ৩৩ ভাগে উন্নীত এবং পর্যায়ক্রমে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, রাজনৈতিক দলেও নারীদের জন্য সমসংখ্যক আসনের ব্যবস্থা, পর্যায়ক্রমে সর্বক্ষেত্রে শিশুশ্রম বন্ধ করা, অটিস্টিক শিশুদের সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, মর্যাদা ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকদের দুই বছরের জন্য 'ন্যাশনাল সার্ভিস'-এ নিযুক্ত করা, ২০২১ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, দেশের সর্বক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষা করা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা, লোক-সংস্কৃতি ও লোক-ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান, জাতীয় সংস্কৃতির সৃজনশীল বিকাশ, এনজিওদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক তৎপরতার প্রতি সমর্থন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের (এনজিও) অংশগ্রহণ না করা, সশস্ত্র বাহিনীকে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স গঠন করা, বিশ্বসভায় বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও কানাডাসহ উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতা জোরদার ও বিস্তৃত করা, রাশিয়া, চীন এবং আশিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গেও অনুরূপ সম্পর্ক ও সহযোগিতা জোরদার করা, যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতামুক্ত বিশ্বের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন ইত্যাদি।

গঠনতন্ত্র সংশোধন

কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের বিকেলের অধিবেশনে গঠনতন্ত্র উপ-পরিষদের আহ্বায়ক ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপি গঠনতন্ত্রের কতিপয় ধারার সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৩২] প্রধান সংশোধনীসমূহ নিম্নরূপ :

১. গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি চর্চা : গঠনতন্ত্রের অঙ্গীকার অংশে 'রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি স্তরের সকল প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রীতি-নীতির চর্চা ও অনুশীলন করা' বাক্যটি যুক্ত।

www.pathagar.com

২. সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে 'মৌলবাদ' শব্দটি যুক্ত হওয়া : অঙ্গীকারনামায় ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিলোপ সাধন এভাবে বাক্যটি পুনর্লিখন।

৩. অঙ্গীকারনামায় 'সন্ত্রাসের' পূর্বে 'জঙ্গিবাদ' শব্দটি যুক্ত করা : বাক্যাংশটি হবে এরূপ 'জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন।'

৪. অঙ্গীকারনামার শিশু অধিকার অংশে অটিস্টিক শিশুদের প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা : নতুন বাক্যাংশটি হবে 'বিশেষ করে অটিস্টিক শিশুদের অনুকূলে বিশেষ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা'।

৫. দলের গঠন প্রণালি অংশে সংযুক্তি : 'স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ড'। পূর্বে এটি ছিল না। দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন প্রচলিত হওয়া বিভিন্ন স্তরে দলের প্রার্থী মনোনয়নদানে এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হবে ১৯ জন। দলের সভানেত্রী এর সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে এর সদস্য সচিব হবেন।

৬. গঠন প্রণালিতে নতুন বিভাগের নাম সংযুক্ত করা : পূর্বের ৭টি বিভাগের সঙ্গে নতুন সৃষ্ট 'ময়মনসিংহ' বিভাগের নাম সংযুক্ত করা।

৭. জাতীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি : পূর্বের ১৭০ জনের স্থলে নতুন সংখ্যা হবে ১৮০ জন (৮১ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য+৭৮ জন সাংগঠনিক জেলার প্রতিনিধি+২১ সভানেত্রী কর্তৃক মনোনীত)।

৮. প্রেসিডিয়ামের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি : পূর্বের ১৫ সদস্যের স্থলে আলোচ্য কাউন্সিলে আরও ৪টি সদস্য পদ বৃদ্ধি করে ১৯ সদস্যে (সভানেত্রী+১৭ জন সদস্য+সাধারণ সম্পাদক) উন্নীত করা হয়।

৯. যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের পদ বৃদ্ধি : পূর্বের ৩টির স্থলে নতুন আরও একটি পদ সৃষ্টি করায় এখন এর সংখ্যা ৪।

১০. সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ বৃদ্ধি : ময়মনসিংহ নতুন বিভাগ হওয়ায় ৭টির স্থলে আরও ১টি পদ বৃদ্ধি করে এর সংখ্যা ৮-এ উন্নীত করা হয়।

১১. কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পদ বৃদ্ধি : পূর্বের ২৬ জনের স্থলে ২টি সদস্য পদ বৃদ্ধি করায় এর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮। সব নিয়ে কমিটির সদস্য সংখ্যা ৮১ (কর্মকর্তা ও প্রেসিডিয়াম সদস্যসহ)।

১২. নতুন চাঁদা ধার্য : সাধারণ সদস্যের বার্ষিক চাঁদা ২০ টাকা, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের মাসিক চাঁদা ১০০০ (এক হাজার) টাকা, দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের মাসিক চাঁদা ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা ও কাউন্সিল সদস্যের বার্ষিক চাঁদা ২০০ (দুই শত) টাকা ধার্য করা হয়।

বাজেট পেশ

আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ এ এইচ এন আশিকুর রহমান কাউন্সিলে দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও আগামী এক বছরের বাজেট পেশ করলে কাউন্সিল তা সর্বসম্মতিক্রমে

www.pathagar.com

পাশ করে।[৩৩] তাতে দেখা যায়, ২০তম কাউন্সিলের সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। আগামী এক বছরের জন্য বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে ১২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। প্রধানত সদস্যদের চাঁদা ও অনুদান থেকেই এ অর্থ সংগৃহীত হয়ে থাকে বলে তিনি কাউন্সিলকে জানান।

নেতৃত্ব নির্বাচন

কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের বিকেলের অধিবেশনে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৩৪] পূর্ববর্তী সময়ের কাউন্সিলের মতো এবার সাবজেক্ট কমিটিতে নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যাপারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতে হয়নি। এর অর্থ দাঁড়ায়, দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে সংগঠনে সর্বোচ্চ সংহতি প্রতিষ্ঠা লাভ। নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য পূর্ব থেকে ৩ সদস্যের একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত ছিল। এর প্রধান ছিলেন এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান এবং সাবেক সচিব রাশিদুল আলম এ দুজন এর সদস্য ছিলেন। শেখ হাসিনা কার্যনির্বাহী পরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনের হাতে ক্ষমতা দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে কাউন্সিলরদের সারিতে আসন গ্রহণ করেন। নির্বাচন কমিশন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থিতা আহ্বান করলে দলের জ্যেষ্ঠতম নেত্রী ও প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী সভাপতি পদে শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করেন এবং ইঞ্জিনিয়ার খোন্দকার মোশাররফ হোসেন তা সমর্থন করেন। আর কোনো প্রার্থী না থাকায় শেখ হাসিনা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক পদে ওবায়দুল কাদের-এর নাম প্রস্তাব এবং জাহাঙ্গীর কবির নানক তা সমর্থন করেন। অন্য কোনো প্রার্থী না থাকায় ওবায়দুল কাদেরও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। এরপর কাউন্সিলরগণ প্রেসিডিয়ামসহ কার্যনির্বাহী কমিটি ও অন্যান্য বডি-র সদস্যদের মনোনয়নের দায়িত্ব শেখ হাসিনার ওপর অর্পণ করেন। এ পর্যায়ে তিনি নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদককে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন এবং ৮ম বারের মতো তাঁকে সভানেত্রী নির্বাচিত করায় শেখ হাসিনা কাউন্সিলরদের ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি প্রেসিডিয়ামের ১৯ সদস্যের ১৬ জন, কার্যনির্বাহী কমিটির ৫ জন কর্মকর্তা, পার্লামেন্টারি বোর্ড ও স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। কাউন্সিলের এক সপ্তাহের মধ্যে কমিটিসমূহের আরও অনেক সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিটিসমূহের গঠন নিম্নরূপ :[৩৫]

কার্যনির্বাহী কমিটি

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা
সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য	:	বেগম সাজেদা চৌধুরী
		বেগম মতিয়া চৌধুরী
		শেখ ফজলুল করিম সেলিম
		মোহাম্মদ নাসিম

www.pathagar.com

		কাজী জাফর উল্লাহ
		এডভোকেট সাহারা খাতুন
		ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন
		সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
		শ্রী পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য
		নুরুল ইসলাম নাহিদ
		ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক
		লে. কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান
		শ্রী রমেশ চন্দ্র সেন
		এডভোকেট আব্দুল মান্নান খান
সাধারণ সম্পাদক	:	ওবায়দুল কাদের
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	:	মাহবুব-উল-আলম হানিফ
		ডা. দীপু মণি
		জাহাঙ্গীর কবির নানক
		আব্দুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক	:	আহম্মদ হোসেন
		মো. মিজবাহ্ উদ্দিন সিরাজ
		বি এম মোজাম্মেল হক
		আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম
		এ কে এম এনামুল হক শামীম
		আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন
		খালিদ মাহমুদ চৌধুরী
		ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল
অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক	:	টিপু মুন্সি
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	:	
আইন বিষয়ক সম্পাদক	:	এডভোকেট আবদুল মতিন খসরু
কৃষি ও সমবায় সম্পাদক	:	ফরিদুন্নাহার লাইলী
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	:	এডভোকেট আফজাল হোসেন
ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	:	শ্রী সুজিত রায় নন্দী
দপ্তর সম্পাদক	:	ড. আবদুস সোবহান গোলাপ
উপ-দপ্তর সম্পাদক	:	ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	:	এডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	:	ড. হাছান মাহমুদ
উপ-প্রচার সম্পাদক	:	আমিনুল ইসলাম
বন ও পরিবেশ সম্পাদক	:	দেলোয়ার হোসেন
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	:	ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সবুর

www.pathagar.com

মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা	:	ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক	:	এডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস
যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক	:	হারুনুর রশীদ
শিক্ষা ও মানবসম্পদ সম্পাদক	:	শামসুন নাহার চাঁপা
শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক	:	মো. আব্দুছ ছাত্তার
শ্রম ও জনশক্তি সম্পাদক	:	হাবিবুর রহমান সিরাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	:	শ্রী অসীম কুমার উকিল
স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সম্পাদক	:	ডা. রোকেয়া সুলতানা
কোষাধ্যক্ষ	:	এ এইচ এন আশিকুর রহমান

সদস্য : আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, মো. মমতাজ উদ্দিন, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম, এডভোকেট কামরুল ইসলাম, নুরুল মজিদ হুমায়ুন, এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন, সিমিন হোসেন রিমি, বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, নূরুল ইসলাম ঠান্ডু, র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, দীপঙ্কর তালুকদার, বদরুদ্দীন আহমেদ কামরান, আখতারউজ্জামান, এস এম কামাল হোসেন, মির্জা আজম, এডভোকেট নজিবুল্লাহ হিরু, আমিরুল ইসলাম মিলন, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম (মৌলভীবাজার), গোলাম কবির রব্বানী চিনু, এডভোকেট রিয়াজুল কবির কাওসার, পারভীন জামান কল্পনা, আনোয়ার হোসেন, ইকবাল হোসেন অপু, মেরিনা জাহান, ড. শাম্মী আহমেদ, মারুফা আখতার পপি, উপাধ্যক্ষ রেমণ্ড আরেং।

পার্লামেন্টারি বোর্ড

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা
সদস্য	:	বেগম সাজেদা চৌধুরী
		আমির হোসেন আমু
		তোফায়েল আহমেদ
		সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
		কাজী জাফর উল্লাহ
		শেখ ফজলুল করিম সেলিম
		সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
		অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ
		রশিদুল আলম
সদস্য সচিব	:	ওবায়দুল কাদের

স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ড

সভাপতি	:	শেখ হাসিনা
সদস্য	:	বেগম সাজেদা চৌধুরী
		আমির হোসেন আমু

www.pathagar.com

তোফায়েল আহমেদ
সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
কাজী জাফর উল্লাহ
শেখ ফজলুল করিম সেলিম
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ
অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ
রশিদুল আলম
মোহাম্মদ নাসিম
মাহবুব-উল-আলম হানিফ
ডা. দীপু মণি
জাহাঙ্গীর কবির নানক
ড. আব্দুর রাজ্জাক
লে. কর্নেল ফারুক খান
ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ

সদস্য সচিব : ওবায়দুল কাদের

উপদেষ্টা পরিষদ : ডা. এস এ মালেক, আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি, আমির হোসেন আমু এমপি, তোফায়েল আহমেদ এমপি, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি, আলহাজ্ব মো. ইসহাক মিঞা, এডভোকেট মো. রহমত আলী এমপি, এইচ টি ইমাম, ড. মশিউর রহমান, প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদ, এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন, রাজীউদ্দিন আহমেদ রাজু, ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, সৈয়দ আবু নসর এডভোকেট, শ্রী সতীশ চন্দ্র রায়, প্রফেসর ড. আবদুল খালেক, প্রফেসর ডা. রুহুল হক, কাজী আকরাম উদ্দীন, এডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান, ড. অনুপম সেন, প্রফেসর ড. হামিদা বানু, প্রফেসর ড. হোসেন মনসুর, অধ্যাপিকা সুলতানা শফি, এ এফ এম ফকরুল ইসলাম মুন্সী, রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ জমির, গোলাম মওলা নকশাবন্দী, মির্জা এম এ জলিল, ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া, মে. জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ মল্লিক, প্রফেসর ড. সাইদুর রহমান খান, ড. গওহর রিজভী, প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক, মো. রশিদুল আলম, স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, কাজী সিরাজুল ইসলাম, মকবুল হোসেন, চৌধুরী খালেকুজ্জামান ও সালমান এফ রহমান।

নেতৃত্ব নির্বাচন থেকে দেখা যায় যে, দলের গুরুত্বপূর্ণ বডি প্রেসিডিয়ামে ৭ জন নতুন সদস্য[৩৬] অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং ২ জন সদস্য বাদ পড়েছেন।[৩৭] কার্যনির্বাহী কমিটিতে পূর্বে যাঁরা উপ-সম্পাদকীয় বা সাধারণ সদস্য পদে ছিলেন, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণদের কয়েকজনকে নতুন কমিটিতে পূর্ণ সম্পাদকীয় পদে উন্নীত করা হয়েছে।[৩৮] সামগ্রিকভাবে কার্যনির্বাহী কমিটির সম্পাদকীয় ও সাধারণ সদস্য পদে তরুণ ও নতুনদের প্রাধান্য লক্ষ করার মতো। উল্লেখ্য, ২৮ জন সাধারণ সদস্যের মধ্যে ১৮ জনই নতুন।[৩৯] অনেক ক্ষেত্রে এটি তাঁদের কিংবা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের

www.pathagar.com

অবদানের স্বীকৃতি। এ বছর থেকে দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় কাউন্সিলে 'স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ড' গঠন নতুন সংযোজন।

এবারের কাউন্সিলের আর একটি উজ্জ্বল দিক হলো, কার্যনির্বাহী কমিটিতে পূর্বে যেখানে ৭৩ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জন ছিলেন নারী, সেখানে বর্তমানে ঘোষিত ৭৪ জন কর্মকর্তা ও সদস্যের মধ্যে ১৫ জন (শতকরা ২০ ভাগ) হচ্ছেন তাঁরা। স্মর্তব্য, ২০২০ সালের মধ্যে সংগঠনের সর্বত্র শতকরা ৩৩ ভাগ আসন নারী সদস্যদের জন্য রেখে জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধিত হয়। তবে শুধু আরপিও-র বাধ্যবাধকতার কারণে নয়, নীতিগতভাবেও আওয়ামী লীগ নারীর প্রতিনিধিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিকহারে তাদের অংশগ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী।[৪০] আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও উদ্যোগের কারণেই বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অধিক হারে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন ঘটেছে, যা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে ২০২০ সালের মধ্যে নারীর প্রতিনিধিত্বে আরপিও লক্ষ্যমাত্রা যে অর্জিত হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

কাউন্সিল-উত্তর কমিটি গঠন পর্বে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, সরকারি দায়িত্ব থেকে দলীয় নেতৃত্বকে যতদূর সম্ভব বাইরে রাখা, যাতে দল 'সরকারি দলে' পরিণত হয়ে নির্জীব বা নির্লিপ্ত হয়ে না পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে এরূপ বিভাজন বিধি আকারে ছিল। এ নীতি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করা হবে সরকার ও দল উভয়ের জন্য কল্যাণকর।

২০তম কাউন্সিলে সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয় ছিল শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি দলের নেতা-কর্মীদের শতভাগ আস্থা। তিনি নিজ নেতৃত্বগুণে তা অর্জন করেছেন। বর্তমান সময়ের মতো এত ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগ পূর্বে কখনও ছিল বলে মনে হয় না। আপনজন বলতে প্রায় সকলকে হারিয়ে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকেই তাঁর পরিবার হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আর দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরাও তাঁকে সেভাবে বরণ করে নিয়েছেন। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তাঁর পুত্র ও তথ্য-প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে তাঁদের উভয়ের সতর্কতা অবলম্বন, যা নেতৃত্বের বিচক্ষণতার পরিচয়বাহী ও প্রশংসনীয়। একথা স্বীকার্য যে, আলোচ্য কাউন্সিলের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দলের নেতৃত্ব নির্বাচনি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত শেখ হাসিনার প্রারম্ভিক ও সমাপনী ভাষণেও তা স্পষ্ট :

> সামনে নির্বাচন। জনগণের কাছে যেতে হবে। তৃতীয় দফা নির্বাচনে জয়লাভ করতে হলে জনগণের দোরগোড়ায় যেতে হবে। উন্নয়নের কথা বলতে হবে। ব্যাপক প্রচার করতে হবে। জনগণকে বোঝাতে হবে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে।[৪১]

আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের রাজনীতিতে সততা ও ত্যাগের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন :

www.pathagar.com

> আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর ত্যাগের আদর্শ ধরে রেখে দলকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে রাখতে হবে, নিজে কী পেলাম, সেটি বড় কথা নয়। দেশ ও জাতিকে কী দিতে পারলাম– সেটিই বড় কথা। টাকা পয়সা ও সম্পদ কিছুই থাকে না।[৪২]

আওয়ামী লীগের ৬৭ বছরের ইতিহাসে কোনো কাউন্সিল অধিবেশন এবারের মতো এতো জাঁকজমকপূর্ণভাবে এবং বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে পূর্বে আর কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। শুধু সরকারি ক্ষমতায় থাকার কারণে এমনটি হয়েছে, সেভাবে ভাবা ঠিক হবে না। ১৯৯৭ সালের কাউন্সিল অধিবেশনের সময়ও আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন ছিল। তখন কিন্তু এতটা উৎসবমুখর পরিবেশে তা অনুষ্ঠিত হয়নি। এর একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, তথ্য-প্রযুক্তি অবলম্বনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি এবং দলের নেতৃবৃন্দের আত্মবিশ্বাস।

আওয়ামী লীগের ২০তম কাউন্সিলের আরও একটি লক্ষণীয় দিক ছিল এর শৃঙ্খলা। উচ্চমানের পেশাদারিত্বের সঙ্গে অত্যন্ত সফল ও সুন্দরভাবে এ কাউন্সিল সম্পন্ন হয়, যা বিদেশি অতিথিদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মাধ্যমে কার্যত আওয়ামী লীগ নিজেকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে। আর এসব কিছু অর্জনের মূলে শেখ হাসিনার সৃজনশীল নেতৃত্ব। আলোচ্য কাউন্সিলের সামনে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠেয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বটে, তবে কিছুতেই তা একমাত্র লক্ষ্য নয়। কাউন্সিলে শেখ হাসিনার লিখিত উদ্বোধনী ভাষণেও তা স্পষ্ট। তিনি নির্বাচনের চেয়ে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা বা এর রূপরেখার কথাই বেশি করে তাতে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথায় :

> আমাদের লক্ষ্য আরও বিস্তৃত। সুদূর আগামীর বাংলাদেশ নিয়েই আমাদের সুদীর্ঘ পরিকল্পনা। তাই ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আধুনিক শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করতে চাই।[৪৩]

দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের দৃষ্টি এখন বহির্বিশ্বের দিকে প্রসারিত। সত্যিকার অর্থেই 'এখন সময় বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার'। আর সেটি হবে বাংলাদেশের জন্য নব যুগের সূচনা।

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তারিত *ইত্তেফাক*, ২২শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *ঐ*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *ঐ*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *ঐ*, ২৬শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *জনকণ্ঠ*, ২২শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২, ৪; *ঐ*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ৪; *ঐ*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২, ৪; *ঐ*, ২৬শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ৪; *সমকাল*, ২২শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৩; *ঐ*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৭; *ঐ*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৫; *ঐ*, ২৬শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২; *প্রথম আলো*, ২২শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২; *ঐ*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২; *ঐ*, ২৪শে অক্টোবর

www.pathagar.com

২০১৬, পৃ. ১, ২; ঐ, ২৬শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ৪; *The Daily Observer*, 22 October 2016, p. 1, 2; *ibid*, 23 October 2016, p.1, 2; *ibid*, 24 October 2016, p.1, 2

২. এটি চূড়ান্ত করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। *জনকণ্ঠ*, ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১

৩. সেগুলো হচ্ছে বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও গাজীপুর। প্রথম ৪টির নির্বাচন ১৫ই জুন এবং শেষেরটির নির্বাচন ৬ই জুলাই ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়।

৪. ২৮শে এপ্রিল ২০১৫ এই ৩ টি বৃহৎ সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৫. সিপিএ ও আইপিইউ-র সভাপতি পদে যথাক্রমে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ও সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি নির্বাচিত হন।

৬. ২০১০ সালে চট্টগ্রামের প্রায় ১০০টি কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে এটি গঠিত হয়।

৭. ১৩-দফা দাবির মধ্যে ছিল–আল্লাহ, রসুল ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান, শাহবাগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী স্বঘোষিত নাস্তিক এবং রাসুল-এর নামে কুৎসা রটনাকারী ব্লগার ও ইসলাম বিদ্বেষীদের সব অপপ্রচার বন্ধসহ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা, প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, মোমবাতি প্রজ্বালনসহ বিজাতীয় সংস্কৃতি বন্ধ, ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাতিল, সরকারিভাবে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা, দেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে ও কলেজ-ভার্সিটিতে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন বন্ধ, ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত এনজিও এবং খ্রিষ্টান মিশনারিগুলোর অপতৎপরতা বন্ধ ইত্যাদি।

৮. উদ্ভূত পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণভাবে নিরসনে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন দুই নেত্রীকে পত্র লেখেন ও টেলিফোনে কথা বলেন।

৯. জাতিসংঘের মহাসচিবের বিশেষ দূত হিসেবে ২০১২ সালের ৬ই ডিসেম্বর তিনি ঢাকা আসেন এবং আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের নেতৃবৃন্দসহ দুই শীর্ষ নেত্রীর সঙ্গে সমঝোতার প্রচেষ্টা নেন।

১০. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিজ উদ্যোগে ফোন করে তাঁর সরকারি বাসভবনে আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপি নেত্রী তাতে সাড়া না দিয়ে বরং নিজ অবস্থানে অনড় থাকেন।

১১. বিস্তারিত, সে সময়কার পত্রপত্রিকা দ্রষ্টব্য।

১২. অন্যান্য দলের আসন : জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ৩৪, জেপি (মঞ্জু) ২, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ৬, জাসদ (ইনু) ৫, বাংলাদেশ তরিকতে ফেডারেশন ২, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) ১, স্বতন্ত্র ১৬। Rounaq Jahan, *Political Parties*, p. 65

১৩. বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত : আওয়ামী লীগ ১২৭, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ২০, জেপি (মঞ্জু) ১, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ২, জাসদ (ইনু) ৩। Rounaq Jahan, *Political Parties*, p. 65

১৪. দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ২২শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১৬; *জনকণ্ঠ*, ২২শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ৯; প্রায় সকল দৈনিকে এটি প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

১৫. দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : শোক প্রস্তাব* (পুস্তিকা)।

১৬. দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : অভ্যর্থনা উপ-পরিষদের আহ্বায়কের ভাষণ* (পুস্তিকা)।

১৭. *সমকাল*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ২

১৮. *ইত্তেফাক*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *আমাদের সময়*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১১; *সমকাল*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ২, ১৫; *The Daily Observer*, 23 October 2016, p. 1, 2; *প্রথম আলো*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২

১৯. *ইত্তেফাক*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *সমকাল*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ২, ১৭

২০. *ইত্তেফাক*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ৪

২১. *ভোরের কাগজ*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ৩; *প্রথম আলো*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২

২২. দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট* (পুস্তিকা), এরপর *সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ ২০১৬;* আরও *ইত্তেফাক*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *সমকাল*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৫; *প্রথম আলো*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২; *The Daily Observer*, 23 October 2016, p. 1, 2

২৩. *ঐ*

২৪. *সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ ২০১৬*, পৃ. ১২

২৫. দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ* (পুস্তিকা), এরপর *শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ২০১৬*, আরও *ইত্তেফাক*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *সমকাল*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৭; *প্রথম আলো*, ২৩শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২

২৬. যুদ্ধাপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আদালত কর্তৃক বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয় এবং ১০ই মে ২০১৬ ও ২১শে নভেম্বর ২০১৫ ঐ রায় কার্যকর হয়।

২৭. এ ঘটনায় ১৭ জন বিদেশি নাগরিকসহ মোট ২২ জন হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

২৮. *শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ২০১৬*, পৃ. ৪২

২৯. *ইত্তেফাক*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২; *ইনকিলাব*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২; *জনকণ্ঠ*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২

৩০. *ঐ*

৩১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : সংশোধিত ঘোষণাপত্র* (পুস্তিকা)

৩২. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : গঠনতন্ত্র* (সংশোধিত); আরও *ইত্তেফাক*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *জনকণ্ঠ*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২

৩৩. *জনকণ্ঠ*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২

www.pathagar.com

৩৪. দ্রষ্টব্য *ইত্তেফাক*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *জনকণ্ঠ*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২; *ইনকিলাব*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ২; *সমকাল*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৩

৩৫. *ইত্তেফাক*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *ঐ*, ২৬শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *ঐ* ৩০শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯; *সমকাল*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৩; *সমকাল*, ২৬শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৩; *সমকাল*, ৩০শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১

৩৬. প্রেসিডিয়ামের নতুন ৭ জন সদস্য হলেন সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি, শ্রী পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য, নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি, লে. কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান এমপি, শ্রী রমেশ চন্দ্র সেন এমপি, এডভোকেট আবদুল মান্নান খান।

৩৭. প্রেসিডিয়াম থেকে বাদ পড়া দুজন সদস্য হলেন সতীস চন্দ্র রায় ও নূহ-উল-আলম লেনিন।

৩৮. যেমন সদস্য পদ থেকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে এ কে এম এনামুল হক শামীম, অনুরূপ সদস্য থেকে ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে সুজিত রায় নন্দী, উপ-প্রচার ও প্রকাশনা পদ থেকে সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে অসীম কুমার উকিল, উপ-দপ্তর সম্পাদক পদ থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক পদে এডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস।

৩৯. *ইত্তেফাক*, ৩০শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯

৪০. উদাহরণস্বরূপ ১৯৭৪ সালের আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে নারীদের জন্য কাউন্সিলরের শতকরা ১০ ভাগ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দ্রষ্টব্য বইয়ের অধ্যায় ১১।

৪১. *ইনকিলাব*, ২৪ শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১; আরও *ইত্তেফাক*, ২৪শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ১৯

৪২. *জনকণ্ঠ*, ২৪ শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ৪; আরও দ্রষ্টব্য *প্রথম আলো*, ২৫শে অক্টোবর ২০১৬, পৃ. ১, ৪

৪৩. *শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ২০১৬*, পৃ. ৪৪

www.pathagar.com

অধ্যায় : তেইশ
উপসংহার

আওয়ামী লীগ এ দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম ও ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠা থেকে বর্তমান পর্যন্ত এর রয়েছে সুদীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ ও সৃষ্টিশীলতার ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা আওয়ামী লীগের শ্রেষ্ঠ অর্জন। অন্যদিকে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ আওয়ামী লীগ দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এ দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-বেদনা, সাফল্য-সৃষ্টি, উন্নয়ন-অগ্রগতি, অর্জন সব কিছুর সঙ্গে নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছে এ দল। ৬৭ বছরের সময় পরিসরে আওয়ামী লীগ আজ নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান।

কাউন্সিল একটি রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা। এটি দলের জন্য পার্লামেন্টতুল্য। কাউন্সিল একটি দলের দর্পণ-স্বরূপ। এতে সময়ের পরিসরে সংশ্লিষ্ট দলের নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অন্য কথায়, সামগ্রিকভাবে ঐ দলের বেড়ে ওঠার সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠে। এ পর্যন্ত ৬৭ বছরে আওয়ামী লীগের ৬টি বিশেষ[১] এবং ২০টি নিয়মিত কাউন্সিলসহ মোট ২৬টি কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গড়ে প্রায় ৩ বছরে একটি নিয়মিত কাউন্সিল হয়েছে। শুরুর দিকে খসড়া গঠনতন্ত্রে বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের বিধান থাকলেও উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা করা দলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৫৫ সালে গৃহীত দলের পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্রে বার্ষিক কাউন্সিলের স্থলে দ্বি-বার্ষিক এবং ১৯৯২ সালে এসে ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের বিধান করা হয়, যা বর্তমানে বিদ্যমান। মোট ২৬টি কাউন্সিল অধিবেশনের মধ্যে ৬টি কাউন্সিল অধিবেশন (৩টি নিয়মিত ও ৩টি বিশেষ) একদিনব্যাপী[২] আর বাকিগুলো দুই থেকে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। দলের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, ১৯৯২ সালের পূর্ব-পর্যন্ত দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা অন্য কোনো কর্মকর্তার একই সঙ্গে সরকারি পদ গ্রহণে গঠনতান্ত্রিক বিধি-নিষেধ ছিল, যা এরপর থেকে তুলে দেওয়া হয়। অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ১৯৫৫ সালের কাউন্সিলে দলের আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী পেশ। ব্রিটিশ শাসন আমলে দলের বার্ষিক অধিবেশনে হিসাব বিবরণী পেশ ছিল নিয়মিত চর্চার বিষয়। ১/১১-র পর সংশোধিত আরপিও অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের জন্য হিসাব বিবরণী পেশ এখন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আলোচনা থেকে আরও দেখা যায় যে, ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করতেন দলের সভাপতি, আর উদ্বোধন করতেন আমন্ত্রিত বিশেষ কোনো অতিথি। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ শাসন আমলে এ ধরনের রেওয়াজ ছিল। আওয়ামী লীগের বেলায় ১৯৭০ সাল থেকে দলের সভাপতি একই সঙ্গে

www.pathagar.com

কাউন্সিল অধিবেশনেরও উদ্বোধক। আওয়ামী লীগের আর একটি ঐতিহ্য ছিল, কাউন্সিলের শেষের দিন বা পরবর্তী দিন জনসভার আয়োজন করা। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই রীতি অব্যাহত ছিল।[৩]

কাউন্সিল শুধু একটি দলের গড়ে ওঠার জীবন কাহিনিই নয়, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডভিত্তিক একটি জনগোষ্ঠীর জাতীয় মুক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উন্নয়ন-স্বপ্নের প্রতিনিধিত্বকারী আওয়ামী লীগের মতো রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে তা আরও অধিক কিছু। কার্যত আওয়ামী লীগের প্রায় প্রতিটি কাউন্সিলের মধ্যে জাতির এসব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাই হয়েছে বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও সংকল্প নিয়ে। আওয়ামী লীগ কখনোই সর্ব-পাকিস্তানভিত্তিক দল ছিল না, তেমনটি হতেও চায়নি। দলের আদর্শিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পীড়াপীড়িতে বঙ্গবন্ধু ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্য নেতৃবৃন্দ বিলম্বে 'পাকিস্তান আওয়ামী লীগ'-এর সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে সংযুক্ত হতে সম্মত হন বটে, তবে তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের 'গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচীর স্বীকৃতির' শর্তযুক্ত (গ্রন্থের অধ্যায় ২ দ্রষ্টব্য)।

আওয়ামী লীগের প্রতিটি কাউন্সিলই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এর মধ্যে কোনো কোনোটি যুগান্তকারী আর কোনোটি থাকছে জাতির ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে। ১৯৪৯ সালের রোজ গার্ডেনের কর্মী সম্মেলনে এ মহান প্রতিষ্ঠানের জন্ম। ১৯৫৩ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বিশেষ কাউন্সিলে সমমনা দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ৫৪-র নির্বাচনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালের কাউন্সিলে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে এটিকে অসাম্প্রদায়িকীকরণ অর্থাৎ ধর্মনির্বিশেষে সবার জন্য দলের সদস্যপদ উন্মুক্ত করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা ভাসানীর বামপন্থি অনুসারীদের নিয়ে ন্যাপ গঠনের পটভূমিতে ১৯৫৭ সালের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ১৯৬৪ সালের কাউন্সিলে এনডিএফ-এর বাইরে দলকে পুনরুজ্জীবিত করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর 'আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা' কর্মসূচি গ্রহণের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কার্যত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূচনা ঘটে। এটি ছিল আওয়ামী লীগ ও বাঙালির ইতিহাসে একটি টার্নিং পয়েন্ট। উল্লেখ্য, ৬-দফাভিত্তিক আন্দোলনের পথ ধরেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায় আমাদের প্রিয় স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলাদেশ। আওয়ামী লীগের ১৯৭০ সালের কাউন্সিল ছিল ৬-দফার ভিত্তিতে নির্বাচনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে বাঙালির বিজয় ছিনিয়ে আনার প্রস্তুতি ও আহ্বান। এ কথা সকলেরই জানা যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও ৬-দফা'র পক্ষে বাঙালিদের ম্যান্ডেট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে কীভাবে সহায়ক হয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭২ সালের কাউন্সিলে (৭-৮ই এপ্রিল) দলের নতুন নামকরণ হয় 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ' এবং বঙ্গবন্ধু ঘোষিত চার মূলনীতি বা আদর্শ–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র

www.pathagar.com

ও ধর্মনিরপেক্ষতা এর ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া ঐ কাউন্সিলে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনেরও শপথ নেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত দলের প্রথম কাউন্সিলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নামে দল পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন লাভ করে। ১৯৮১ সালের কাউন্সিলে শেখ হাসিনাকে তাঁর অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে সভানেত্রী নির্বাচিত করে দলের ঐক্য রক্ষা করা হয়। জেনারেল এরশাদের সেনাশাসন আমলে ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেওয়া হয়। দীর্ঘ ২১ বছরের সংগ্রাম শেষে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের সুযোগ পায়। এর ১০ মাসের মধ্যে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত দলের কাউন্সিলে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করা হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর স্বাধীনতা-বিরোধী জামায়াতে ইসলামীর দুই শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীকে অন্তর্ভুক্ত করে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার গঠন, দেশজুড়ে ঐ সরকারের সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম এমনই এক দুঃসহ পরিস্থিতিতে ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল ও শক্তির প্রতি ঐক্যের ডাক দেওয়া হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচন-পরবর্তী ২৪শে জুলাই ২০০৯ অনুষ্ঠিত দলের কাউন্সিলে শেখ হাসিনার দিনবদলের সনদ 'ভিশন ২০২১' নামে উন্নয়নের নতুন সোপান 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গৃহীত হয়। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচির পর সম্ভবত এটিই হচ্ছে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় কোনো যুগান্তকারী কর্মসূচি যা বাংলাদেশকে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি অবলম্বনে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত দলের কাউন্সিলের বিশেষত্ব হলো, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পাশাপাশি একই সঙ্গে এই প্রথম আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ও দলের ঘোষণাপত্রে 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার' ব্যক্ত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আজ স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর দেশে যুদ্ধাপরাধীদের একের পর এক বিচার অনুষ্ঠিত ও বিচারের রায় কার্যকর হচ্ছে, যা অনেকেরই কল্পনার বাইরে ছিল। এর মাধ্যমে রচিত হচ্ছে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির নতুন ইতিহাস। ২০১৬ সালের ২২-২৩শে অক্টোবর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সর্বশেষ কাউন্সিলের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, আত্মবিশ্বাস আর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে দৃঢ় পদে এগিয়ে যাওয়া।

আমাদের দেশে একটি সাধারণ অভিযোগ হলো, রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার অনুপস্থিতি আর দলের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পরিবারকেন্দ্রিকতা। অনেক পণ্ডিতের ধারণাও অনুরূপ।[৪] দেশের সামগ্রিক অবস্থা ও উন্নয়নের স্তর বিবেচনায় না এনে পাশ্চাত্যের মানদণ্ড দিয়ে এ দেশকে দেখা ও বোঝার চেষ্টা কতদূর সঠিক, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। গোপন ব্যালটে নেতৃত্ব নির্বাচন গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন স্বীকৃত একটি রূপ বা উপাদান, সন্দেহ নেই। তবে এটিই একমাত্র পন্থা নয়। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও গণতন্ত্রসম্মত। আমাদের পরিবার ব্যবস্থা, সমাজের ঐতিহ্য অনেকটা তাই। আওয়ামী লীগের ৬৭ বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৪ বছর দলের সাধারণ সম্পাদক ও

www.pathagar.com

৮ বছর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গঠনতন্ত্রের বিধান মেনেই ১৯৭৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেছিলেন। এর পূর্বে পাকিস্তান আমলে গঠনতন্ত্র মেনে স্বেচ্ছায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে (১৯৫৭) সংগঠনের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছিলেন। পুনরায়, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ১৯৮১ সাল থেকে গত ৩৫ বছর যাবৎ ৮ বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভানেত্রী পদে নির্বাচিত হয়ে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। গোপন ব্যালটেও যে ভিন্ন কিছু হওয়ার কথা নয়, তা বলার প্রয়োজন পড়ে না। পরিবার নয়, এখানে নেতৃত্বের দক্ষতা হচ্ছে যোগ্যতা। মনে রাখা আবশ্যক, শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠনে সমর্থ হয়। আর যেখানে প্রার্থীই থাকে না, সেখানে গোপন ব্যালটের প্রয়োগই-বা হবে কী করে।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়টি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য (বর্তমান ৭৩ জন) এবং প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের (৭২x২ = ১৪৪) নিয়ে গঠিত সাবজেক্ট কমিটিতে (মোট ২২৭ সদস্য) আলাপ-আলোচনা শেষে কাউন্সিলে পেশ ও সেখানে তা গৃহীত হয়। সাবজেক্ট কমিটিতে কখনো কখনো এ বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী ৩ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। কখনো ব্যালট পর্যন্ত প্রস্তুত রাখা হয়। নির্বাচন সংক্রান্ত আওয়ামী লীগের আর একটি চর্চা বা ঐতিহ্য হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচনের পর কাউন্সিল কর্তৃক দলীয় প্রধানকে অন্য কর্মকর্তাদের মনোনীত করার ক্ষমতা অর্পণ। এ ক্ষেত্রে রেওয়াজ হচ্ছে, দলীয় প্রধান এককভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক, প্রেসিডিয়াম বা সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, অন্য কথায়, 'মুরুব্বী'দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ প্রক্রিয়াকে কী বলে আখ্যায়িত করা যায়? এটিকে পারস্পারিক আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শভিত্তিক গণতন্ত্র বা Consensual Democracy হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় এটিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে।

নেতৃত্ব নির্বাচনের বাইরে, দলের নীতি নির্ধারণ, বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধন ও তা গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাউন্সিল সদস্যগণের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার গঠনতন্ত্র দ্বারা স্বীকৃত। বাস্তবে কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করে। এসব কমিটির সুপারিশ প্রস্তাব আকারে কাউন্সিলে পেশ করা হয় এবং তা প্রায়শই সম্পূর্ণভাবে এবং কখনো কিছুটা সংযোজন বিয়োজন শেষে গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে নীতি নির্ধারণী বিষয়ে গভীর আলোচনার বা বিতর্কের বেশ উদাহরণও রয়েছে। যেমন দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িকীকরণের বিষয়টি ১৯৫৩ সালের নিয়মিত কাউন্সিলে আলোচিত হয় এবং সময় তখনো হয়নি এই বিবেচনায় তা স্থগিত রেখে পরবর্তী কাউন্সিল পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে দলের নাম পরিবর্তনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (গ্রন্থের অধ্যায় ২ ও ৪ দ্রষ্টব্য)। ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারিতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিখ্যাত বিশেষ সম্মেলনে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ভাসানী ও

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মতবিরোধের ঘটনা সবার জানা রয়েছে (গ্রন্থের অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য)। কেউই দলের নেতৃত্ব ও মন্ত্রিত্ব একই সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন না, এ বিষয়টিও কাগমারি সম্মেলন ও এর চারমাস পর ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশনে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয় এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (গ্রন্থের অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য)। নীতি নির্ধারণী বিষয় ছাড়া কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদকের রাজনৈতিক রিপোর্ট ও সাংগঠনিক জেলাসমূহের নেতৃবৃন্দের রিপোর্ট পেশের সুবাদে কাউন্সিল সদস্যগণ অনেক আলোচনার সুযোগ পান। তবে পূর্বে অনেককে সে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হলেও সাম্প্রতিককালে সময়ের স্বল্পতাহেতু প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ থেকে একজন করে বক্তব্য রাখার নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে (গ্রন্থের অধ্যায় ৬, ১৫, ১৯, ২০ দ্রষ্টব্য)।

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে দলনির্ভর সরকার ব্যবস্থা। এতে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। সেক্ষেত্রে দলীয় কর্মসূচি, দলের নির্বাচনি ইশতেহার সরকারের বিভিন্ন কর্ম ও উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশে পরিণত হয়। বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের বেলায়ও তেমনটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ জোটনিরপেক্ষ নীতি ও বিশ্বশান্তির পক্ষ নেয়, যা আজ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি। ১৯৬৪ সালের কাউন্সিলে আওয়ামী লীগ উত্তরবঙ্গের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যমুনা নদীর উপরে পুল বা নদীর নিচ দিয়ে টানেল নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেতু-র বাস্তবায়ন। একই কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের অপর একটি প্রস্তাব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওপর সরকারি কঠোর নিয়ন্ত্রণ রোধ করে সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান (গ্রন্থের অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য)। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক 'বিশ্ববিদ্যালয় গণতান্ত্রিক আদেশ ১৯৭৩'-এর মাধ্যমে এ প্রস্তাবের সফল বাস্তবায়ন হয়। ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের যে কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়, সেই একই কাউন্সিলে 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রবর্তনের বিষয়টিও দলের ম্যানিফেস্টোতে অন্তর্ভুক্ত হয় (গ্রন্থের অধ্যায় ৭ দ্রষ্টব্য)। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-এর সংবিধানে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অংশ হিসেবে এটি গৃহীত। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে জেলা পর্যায়ের শাসন ব্যবস্থা নির্বাচিত পরিষদের ওপর ন্যস্ত এবং মহকুমাসমূহকে জেলায় রূপান্তরিত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় (গ্রন্থের অধ্যায় ৯, ১০ দ্রষ্টব্য)। এ কর্মসূচির প্রথম অংশটি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে এবং দ্বিতীয় অংশটি ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। ১৯৭২ সালের কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধুর চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত হয় (গ্রন্থের অধ্যায় ১০ দ্রষ্টব্য), যা একই বছর শেষের দিকে রচিত বাংলাদেশের সংবিধানে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে দিনবদলের সনদ 'ভিশন ২০২১' দলের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। বস্তুত এর মাধ্যমেই রচিত হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়নের সোপান ও বর্তমান উন্নয়নের অগ্রযাত্রা, যা আজ সারাবিশ্বে ভীষণভাবে প্রশংসিত। একই

www.pathagar.com

কাউন্সিলে ১৯৭৩ সালের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্টের অধীনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা দলের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রে গৃহীত হয় (গ্রন্থের অধ্যায় ২০ দ্রষ্টব্য)। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সাল থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ইতোমধ্যে শীর্ষস্থানীয় বেশ কয়েকজনের ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে।

আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। দলের সদস্য হওয়ার যোগ্যতার ক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালেই গঠনতন্ত্রে 'নারী-পুরুষ নির্বিশেষে' একথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে মহিলাদের জন্য কাউন্সিলরদের শতকরা ১০ ভাগ আসন সংরক্ষিত রাখার বিধান করে গঠনতন্ত্রে সংশোধনী আনা হয়। বর্তমানে শেখ হাসিনার হাতে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি একটি বিশেষ মাত্রা বা রূপ লাভ করেছে, যা দেশ-বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

আওয়ামী লীগের আর একটি বিশেষ দিক হলো, বিভিন্ন সময়ে অনেকে দল ছেড়েছেন বটে, কিন্তু আওয়ামী লীগকে ভাঙতে পারেননি। ১৯৫৫ সালে আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন 'যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রিসভায় যোগদান এবং একই বছর কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া প্রশ্নে দলের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি ও সিনিয়র নেতা আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে একটি গ্রুপের দল থেকে সরে যাওয়া, ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারি বিশেষ সম্মেলনে পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মওলানা ভাসানীর ভিন্নমত এবং এ থেকে ভাসানীর নিজ অনুসারীদের নিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন, ১৯৬৪ সালে প্রায়-নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া আইয়ুব-বিরোধী ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) ত্যাগ করে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের বিরোধিতা করে দলের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি ও বর্ষীয়ান নেতা আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে কিছু সদস্যের ঐক্যের নামে এনডিএফ-এর পক্ষ অবলম্বন, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর 'আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা' কর্মসূচি ঘোষণার পর দলের সভাপতি মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান প্রমুখের নেতৃত্বে সিনিয়র নেতৃবৃন্দের একটি অংশের আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম)-এ যোগদান, স্বাধীনতার পর ১৯৭৮ সালে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের কারণে আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে গিয়ে দলের প্রভাবশালী নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন, ১৯৮৩ সালে আওয়ামী লীগের বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী নিয়ে সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) গঠন, ১৯৯১-৯২ সালে আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ফোরাম/গণফোরাম গঠন ইত্যাদি ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় কিছু নেতা দল ত্যাগ করলেও দলের মূলধারা কখনো ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি।

আওয়ামী লীগ এ দেশে একটি অসাধারণ ব্যতিক্রমধর্মী রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠার ৬৭ বছর পর আজও এটি সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়ে দেশের উন্নয়নের অভিযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই

www.pathagar.com

আগস্টের ট্র্যাজেডি ও জাতির জনকের হত্যা, একই বছর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় জাতীয় চার নেতার হত্যা, ৭৫-পরবর্তীকালেও দীর্ঘ ২১ বছর বিরোধী দলে অবস্থানসহ ক্ষমতা দখলকারী শাসকগোষ্ঠীর হাতে চরম নির্যাতন-নিষ্পেষণ সহ্য করে কীভাবে এ দল টিকে থাকে আর শুধু টিকেই থাকে না, রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রায়-একচ্ছত্র নেতৃত্বের আসন করে নিতে সক্ষম হয়, সেটি রীতিমতো বিস্ময়কর। এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপে করা যায় :

এক. আওয়ামী লীগের সক্ষমতার একটি প্রধান দিক হলো এর রাজনৈতিক বাস্তববাদিতা (political realism)। যেমন ১৯৪৯ সালে দলের নামের সঙ্গে কৌশলগত কারণে 'মুসলিম' শব্দ রেখে যাত্রা শুরু, যদিও আদর্শ ও চেতনার দিক থেকে তখনই দলের নেতা-কর্মীদের অনেকেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। ১৯৫৩ সালে দলের কাউন্সিলে নাম পরিবর্তনের প্রসঙ্গ আলোচনায় আসে, তবে তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করার কথা বলা হয়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে এসে নাম পরিবর্তন হয়। ততদিনে ভাষা-আন্দোলন শেষে ৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি ঘটে। ১৯৬২ সালে যেসব রাজনৈতিক দল নিয়ে আইয়ুব-বিরোধী মঞ্চ এনডিএফ গঠিত হয়েছিল, আওয়ামী লীগ সেসব দলের মধ্যে ছিল। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর জোট হিসেবে এনডিএফ কার্যকারিতা হারালে কালক্ষেপণ না করে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে ঐ জোটের বাইরে দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এটি ছিল সঠিক সময়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত। এলএফও-এর অধীনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা রেখে ১৯৭০ সালের নির্বাচন দেওয়া হলে মওলানা ভাসানী ঐ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তা বর্জনের ঘোষণা দেন। পক্ষান্তরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত ছিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ। আওয়ামী লীগ ঐ নির্বাচনে '৬-দফা'র পক্ষে গণম্যান্ডেট লাভ করে, যা আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে খুবই সহায়ক হয়। পুনরায়, দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু না করে ২০১০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এর মধ্যে জনগণকে প্রস্তুত ও ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক আসনে বিশাল জয়লাভের পর এবার শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার বিষয়টি নিয়ে অগ্রসর হয়। ৭২-পরবর্তীকালে এ দেশের সমাজ-রাজনীতিতে যে বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটে, তার বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক আসন থাকার পরও প্রাজ্ঞজনের মতো শেখ হাসিনা সরাসরি ৭২-এর সংবিধান হুবহু পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করে পঞ্চদশ সংশোধনী (২০১১) দ্বারা রাষ্ট্র ও রাজনীতির সর্বজনীন রূপায়ণ করেন। এভাবে আওয়ামী লীগের বাস্তববাদী রাজনীতির আরও উদাহরণ দেওয়া যাবে।

দুই. জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সচেতনতার দিকটি বিবেচনায় রেখে সর্বদা দলের কর্মসূচি গ্রহণ। ১৯৫৭ সালেই মওলানা ভাসানী পাকিস্তানিদের উদ্দেশে বিদায় বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, বঙ্গবন্ধু আরও অপেক্ষা করে অতঃপর ৬৫-র পাক-

www.pathagar.com

ভারত যুদ্ধশেষে অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 'আমাদের বাঁচার দাবী ৬-দফা' কর্মসূচি পেশ করেন (যা মার্চ ১৯৬৬ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হয়)। এরপর ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন, ৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ই মার্চের ভাষণ শেষে যখন পাকিস্তানি বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নামে ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক সে মুহূর্তে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং জনগণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত না করে ২০০৮ সালের নির্বাচনে সেটি করে। তখন সার্বিক পরিস্থিতি ছিল দলের অনুকূলে।

তিন. আওয়ামী লীগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পরিবর্তনশীলতা (Responsiveness/Adaptability)। উদাহরণস্বরূপ, বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী ১৯৭৬ সালে জিয়ার সামরিক শাসন চলাকালে যখন স্বল্প পরিসরে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ আসে, তখন পরিবর্তিত অবস্থায় 'বাকশাল'-এর পরিবর্তে 'আওয়ামী লীগ' নামেই সংগঠন পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৭২ সালের কাউন্সিলে দলের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রে চার মূলনীতি বা আদর্শের মধ্যে 'সমাজতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে পরিবর্তিত অবস্থায় 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার অর্থে'– সমাজতন্ত্রের এ ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়। ৯০-এর দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, একই সময় পূর্ব ইউরোপসহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব হিসেবে পরিচিত দেশসমূহের ওলট-পালট ঘটনা, দুনিয়াজুড়ে মুক্তবাজার অর্থনীতি ও তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত প্রসার, এরূপ বাস্তব অবস্থায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'র লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে ১৯৯২ সালের কাউন্সিলে 'জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক নীতিমালা' গ্রহণ করে।

চার. একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক ভূমিকা লক্ষণীয়। জেনারেল জিয়ার অধীনে ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে মাত্র ৩৯টি আসন নিয়ে সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান গ্রহণ এবং এভাবে ধাপে-ধাপে অগ্রসর হয়ে অবশেষে ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের সুযোগ লাভ করে। জেনারেল এরশাদের ১৯৮৮ সালের নির্বাচন ও বেগম খালেদা জিয়ার মধ্য-ফেব্রুয়ারির (১৯৯৬) নির্বাচন এ দুটি ছাড়া আওয়ামী লীগের দীর্ঘ ইতিহাসে নির্বাচন বর্জনের কোনো নজির নেই। এর মাধ্যমে দলটির একটি স্থায়ী গণসম্পৃক্তি গড়ে ওঠে।

পাঁচ. দল হিসেবে তুলনামূলকভাবে আওয়ামী লীগের ধারণ ক্ষমতা অফুরন্ত। দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে একটি অংশের বের হয়ে গিয়ে ১৯৮৩ সালে বাকশাল গঠন, পুনরায় ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন এর একটি উদাহরণ। অপরদিকে, ১/১১ এর সময় দলের নেতৃত্বের একটি অংশ প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন না করে দোদুল্যমানতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের ব্যাপারে ২০০৯ সালের কাউন্সিলে দলের সভানেত্রীর বক্তব্য ছিল, 'এখন শুধু ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা'।

www.pathagar.com

ছয়. আওয়ামী লীগের উদ্ভাবনী ক্ষমতা (Ingenuity) লক্ষ করার মতো। যেমন ১৯৮১ সালে দল যখন নিশ্চিত ভাঙনের পর্যায়ে তখন প্রায় নাটকীয়ভাবে একদিকে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে তাঁর অনুপস্থিতিতে দলের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়, অপরদিকে জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয় প্রেসিডিয়াম বা সভাপতিমণ্ডলী।

সাত. কেবল অতীত আশ্রয়ী না হয়ে রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের বরাবর ভবিষ্যৎমুখী নীতি গ্রহণ। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার দিনবদলের সনদ 'ভিশন ২০২১' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আট. দলের সঙ্গে তারুণ্যের সংশ্লিষ্টতা। স্মর্তব্য, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার দেড় বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (৪ঠা জানুয়ারি ১৯৪৮), বর্তমান ছাত্রলীগ যার উত্তরাধিকারী। আর তারুণ্য মানেই শক্তি, গতি ও সৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে : 'ছাত্রলীগ এ দেশের গণসংগ্রামের জনক'। জেনারেশন গ্যাপ যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে দলীয় কাঠামোয় প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতৃত্বের সঙ্গে বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণদের সংযুক্ত করার অতীত ধারা বর্তমানেও আওয়ামী লীগ অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে। সর্বোপরি, দল পরিচালনায় আওয়ামী লীগের গতানুগতিক পদ্ধতির পাশাপাশি তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ লক্ষ করার মতো।

আওয়ামী লীগ আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির সমন্বয়, সমতা ও সম্প্রীতির মূল আদর্শ বা বৈশিষ্ট্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রগতিশীল রূপান্তরে সদা সচেষ্ট ছিল এবং এখনও আছে। ডান বা অতিবাম উভয় পন্থা পরিহার করে আওয়ামী লীগের পথ চলা। ধর্মসহ ভিন্ন মত ও পথের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা এর আদর্শ। অসাম্প্রদায়িকতা এর আদর্শিক রূপ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র, বঙ্গবন্ধুর কথায়, 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো' আওয়ামী লীগের অপর একটি মৌলিক আদর্শ বা নীতি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা থেকে উৎসারিত। এই চার মৌলিক আদর্শ (core values) নিয়েই বাঙালির সমাজ-রাজনীতির মূলধারা, আর সেই মূলধারার সার্থক প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ। এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, মূলধারার প্রতিনিধিত্বকারী দলে কোনোরূপ বিভাজন দলকে দুর্বল না করে উল্টো শক্তিশালীই করে এবং আওয়ামী লীগ এরও প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেশের বৃহত্তম, দায়িত্বশীল ও ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী লীগ শুধু দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেয় না, একই সঙ্গে দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরে পথ চলার অগ্রবর্তী চিন্তাও।

তথ্যনির্দেশ

১. ময়মনসিংহে (১৪-১৫ই নভেম্বর ১৯৫৩), কাগমারি, টাঙ্গাইল (৭-৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭), ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, ঢাকা (২৩ ও ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৮) ও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, ঢাকা (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫)।

www.pathagar.com

২. শুধু এক দিনব্যাপী নিয়মিত কাউন্সিল : ২৬শে ডিসেম্বর ২০০২ (পল্টন ময়দান, ঢাকা), ২৪শে জুলাই ২০০৯ (বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার), ২৯শে ডিসেম্বর ২০১২ (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)। শুধু একদিনব্যাপী বিশেষ কাউন্সিল : ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ (ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, ঢাকা)।

৩. যেমন ১৯৬৬ সালে কাউন্সিলে ৬-দফা কর্মসূচি গৃহীত হওয়ার পর এর তৃতীয় দিন (২০শে মার্চ) পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে বঙ্গবন্ধু তাঁর ৬-দফা কর্মসূচির ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। আবার ১৯৭০ সালের কাউন্সিলের একদিন পর (৭ই জুন) রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, যাকে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের 'নির্বাচন অভিযান শুরু' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

৪. Rounaq Jahan, *Political Parties*, pp. 114-119, 134-142

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : এক

রোজগার্ডেনে আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে যোগদানের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের আহ্বান, ১৯৪৯

আসন্ন পূর্ব্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগ কর্মী সম্মেলন যোগদান না করিবার জন্য জনসাধারণের প্রতি নেতৃবৃন্দের আবেদন

১৯৪৯ সালে রোজগার্ডেনে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার কর্মী সম্মেলনে যাতে কোনো মুসলমান বা মুসলিম লীগ কর্মী যোগদান না করে তার আহ্বান জানিয়ে তিন মুসলিম লীগ নেতা নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ, ইউসুফ আলী চৌধুরী ও সৈয়দ সাহেবে আলম সম্মেলনের দুইদিন পূর্বে পত্রিকায় একটি যৌথ বিবৃতি দেন। বিবৃতিটি আজাদ পত্রিকা থেকে হুবহু তুলে ধরা হলো।

ঢাকা ২১শে জুন

ঢাকা জেলা মোছলেম লীগের সভাপতি ঢাকার নওয়াব খাওয়াজা হাবিবুল্লাহ, পূর্ব্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগের সম্পাদক জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী এবং ঢাকা সিটি লীগের সভাপতি সৈয়দ সাহেবে আলম পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুসলমানদিগকে মোছলেম লীগ-বিরোধী কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকার আবেদন জানাইয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :

বিপক্ষের সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া যে শক্তিবলে মুছলমান খোদার রহমতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মূলে ছিল মুসলিম সংহতি। যে ত্যাগ, সহিষ্ণুতা আবশ্যক হইয়াছিল পাকিস্তান লাভ করিতে তাহা অপেক্ষা বহু বেশী ত্যাগ, সংহতি আবশ্যক আজ নবলব্ধ আজাদীকে রক্ষা করিতে। পাকিস্তান রোধ করিতে অসমর্থ হইয়া বিপক্ষগণ পাকিস্তানের শৈশবাবস্থায় সুযোগে পাকিস্তানকে ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা করিতেছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে পাকিস্তানের সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি করিবার দুরাশায় কাবুলকে নানাভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা হইতেছে। বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া একদিকে যেমন কমিউনিস্টগণ ধর্ম্মবিবর্জিত সাম্যবাদের প্রসারের চেষ্টা করিতেছে, অপরদিকে কতিপয় মুসলমান ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির দুরভিসন্ধিতে নানা প্রকার অবান্তর ক্ষণস্থায়ী চমকপ্রদ বিভ্রান্তিকর উক্তি ও প্রচার দ্বারা পাকিস্তানের সরল মুসলমানদের মনে বিভেদের বীজ বপন করিয়া তাহাদিগকে পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত ও নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং যেহেতু পাকিস্তানে মুসলমানগণ মুসলিম লীগকেই একমাত্র মুসলমানদের জাতীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেইহেতু

www.pathagar.com

মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য ইহারা মুসলিম লীগের নাম ব্যবহার করিতেছেন। মুসলিম লীগের শক্তি, মুসলিম সংহতিকেই যাহারা নষ্ট করিতেছেন তাহারা কখনই মুসলিম লীগপন্থি হইতে পারেন না এবং সেই জন্যই মওলানা আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানী সাহেবের দ্বারা আগামী ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে ঢাকায় মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনের নামে যে সভা আহূত হইয়াছে তাহার সহিত মুসলিম লীগের কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুতঃ ইহা দলগত স্বার্থ ও ক্ষমতালাভের জন্য মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টির দ্বারা মুসলমান সংহতি নষ্ট করিয়া পাকিস্তানের স্থায়ীত্ব এবং অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছে। ভাসানীর মওলানা সাহেবের এরূপ কার্য্যকলাপের নিন্দাবাদ করিয়া এবং তৎকর্তৃক আহূত সভার সহিত কোনও মুসলমান যাহাতে সম্পর্ক না রাখেন তাহার জন্য পূর্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিল ২০শে জুন তারিখের অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের প্রত্যেক মুসলমান ভাইকে আমরা পূর্ব্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলিম লীগ বিরোধী কার্য্যকলাপ ও সভা-সমিতি হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস যে, দেশের ও কওমের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের মুসলমান ভাইগণ লীগ বিরোধী কার্য্যকলাপ হইতে দূরে থাকিয়া মুসলিম সংহতি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন।

সূত্র : *আজাদ*, ২২শে জুন ১৯৪৯, পৃ. ৬

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : দুই

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর সাংগঠনিক রিপোর্ট, ১৯৫৩

পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ
কাউন্সিল অধিবেশন
সাংগঠনিক রিপোর্ট
১৯৫৩ সাল, ৩রা জুলাই, ঢাকা

প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৩ সালের ৩-৫ই জুলাই পুরান ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দলের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। এটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। এর মাধ্যমে তখনকার সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পাঠকবর্গ ঘনিষ্ঠ ধারণা লাভ করতে পারবেন। কোনোরূপ সম্পাদনা ছাড়া পুস্তিকা থেকে হুবহু এখানে পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

জনাব সভাপতি, মাননীয় কাউন্সিল সদস্যবর্গ

আওয়ামী মুসলীম লীগের বর্তমান অধিবেশনের গুরুত্ব যে কত বেশি আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সচেতন প্রচেষ্টা ও বলিষ্ট তৎপরতার মধ্যে দিয়াই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্মের পরে ইহাই আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল অধিবেশন। আমাদের আভ্যন্তরীণ সংকট ও আন্তজার্তিক দুর্য্যোগের ঘনঘটার মধ্যে এই কাউন্সিল অধিবেশনের গুরুত্ব অত্যাধিক। কিন্তু প্রত্যেক কাজেরই কার্য্যকারণ বিচার করিতে হয়। আর বিশ্লেষণ করিতে হয় পরিবেশের। এই পরিবেশকে পর্যালোচনা করিতে প্রয়োজন অতীত ও বর্তমানের ভিতর ও বাহিরের ঘটনা প্রবাহের। ইহার মধ্য দিয়া আমরা প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারি। এবং ইহাই ব্যাখ্যা করিতে পারে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তৎপরতা। ১৯৪৯ সালের ২৩শে ও ২৪শে জুনে গণদরদী মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকায় পূর্ব পাক আওয়ামী মুসলীম লীগের জন্মের পর দেশে গণমন ও সামাজিক অবস্থায় হইয়াছে গভীর পরিবর্তন। কিন্তু ১৯৪৯ সালে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ১৯৪৭ সালের ১৪ই অগাষ্ট মানুষের মনে যে স্বপ্নজাল সৃষ্টি করিয়াছিল, সরকারের হাতে উহা ব্যর্থ হইলেও মানুষ তখনও সরকারী ভাওতা সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সরকারও এই ব্যর্থতাকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি হইতে দূরে রাখিবার জন্য নূতন নূতন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে উন্মুখ। তারা কাশ্মীর, হায়দারাবাদ, জুনাগড়, সাম্প্রদায়িক বিভীষিকা সৃষ্টির মধ্য দিয়া মানুষের চিন্তাধারাকে অন্য পথে পরিচালিত করিতে চায়। মানুষও তখন আজাদী বিলুপ্তির আশঙ্কায় সরকারের

www.pathagar.com

প্রতি মোহমুক্তি গঠিতে [ঘটিতে] থাকলেও আন্দোলনমূখী হইয়া উঠে নাই। রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই বিরাট শূন্যতা ও গণমানসের শঙ্কিত নীরবতা দেশে ধীরে ধীরে ভীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল। জালেম সরকার এইবার তার ব্যর্থতাকে ঢাকিতে আরম্ভ করিল জুলুমের রাজত্ব। এই পরিস্থিতিতে দেশের চিন্তাজীবীরা জাগিয়া উঠিল। মুসলীম লীগ সরকারের ব্যর্থতা ও জুলুম, মুসলীম লীগের কোটারী প্রতিষ্ঠা ও সরকারী দালালী করিতে যাইয়া মুসলীম লীগের গণদুষমনিতে পাকিস্তান সংগ্রামের অনেক নেতাই এই সর্বনাশের প্রতিবাদ করিতে আগাইয়া আসিলেন। সংগঠনী তৎপরতা শুরু হইল। আমাদের অতীতের গতানুগতিক রাজনীতি, চেতনাবোধ ও বাস্তব পরিবেশের জন্য এই তৎপরতা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সরকার ও সরকার-বিরোধী এই প্রবাহ ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে মুখোমুখী দাঁড়াইলেও ইহা চিন্তাজীবী বনাম সরকারী সংঘর্ষই হইয়া রহিল। তখনও কর্মীরা উহাকে প্রকৃত গণরূপ দিতে পারে নাই। এই বিরোধ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় টাঙ্গাইল উপনির্ব্বাচনে। সর্ব প্রকারের অত্যাচারের মুখেও সম্মিলিত শক্তি সরকারকে রুখিয়া দাঁড়াইল। নির্বাচনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক শক্তি বুঝিল যে প্রতিক্রিয়ার দূর্গ লীগশাহীর খতম করিতে হইলে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা নয়– সংগঠিত তৎপরতাই প্রয়োজন। গণতান্তিক শক্তি এইও বুঝিল জমিদার জোতদার ও বড় বড় ধণীকরাই আজ তাদের স্বার্থে লীগ সরকারকে ব্যবহার করিতেছে। আর তাদের স্বার্থরক্ষা করিতেই সরকার রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিকভাবে সাধারণ মানুষের ভবিষ্যতকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের এই সচেতন প্রতিরোধ প্রচেষ্টাতেই ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলীম লীগের জন্ম। এই প্রগতিবাদী চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে বলিয়াই উপযুক্ত সময়ে না হইলেও ১৯৪৯ সালের ১১ই অক্টোবরের খাদ্য মিছিলের উপর সরকার হামলা করিয়া মওলানা ভাসানী, জনাব শামসুল হক, শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য বহু কর্মীকে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ রাখিয়াও গণতন্ত্রের দুষমন লীগ সরকার আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করিতে পারে নাই। অজস্র জনতার খাদ্য মিছিল প্রত্যক্ষ করিয়াও মরহুম লিয়াকত আলী সাহেব আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া আওয়ামী লীগকে বানচাল করিতে পারেন নাই। জেল-জুলুমের পরেও আওয়ামী লীগের অপ্রতিহত গতিতে ব্যাকুল হইয়া জনাব লিয়াকত আলী'র মত লোকও আওয়ামী লীগ নেতাদের 'শির কুচাল দেঙ্গে' ধ্বনি করিয়াও আওয়ামী লীগকে ভেঙ্গে দিতে পারেন নাই। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীর রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গণতান্ত্রিক শক্তিকে সাময়িক ভাবে দুর্বল করিলেও গণতান্ত্রিক শক্তি বুঝিয়াছে যে গণ-আন্দোলনকে ব্যাহত করিবার ইহা গণ-দুষমনদের একটী। হাতিয়ার মাত্র; আর তাদের এই হাতিয়ারকে ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়া। মানুষের এই চেতনাই ১৯৫০ সালের দাঙ্গার শিক্ষা।

পাকিস্তানের জন্মের পর হইতে ১৯৫০ সালের দাঙ্গা পর্যন্ত সরকারই সকল ব্যাপারে আক্রমণ চালাইয়াছে। গণতান্ত্রিক শক্তি আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা ও সংগঠিত উদ্যম ছাড়া তেমন কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি [সম্প্রীতি],

www.pathagar.com

ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ভাষা বর্ণ সংগ্রাম এবং ছাত্র ও অন্যান্ন [অন্যান্য] আন্দোলন আংশিক সফলতার বেশী সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। কিছুদিন পরেই সরকার বি.পি.সি. রিপোর্ট পেশ করিতে বাধ্য হয়। গোটা দেশ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়ে। সরকার রিপোর্ট প্রত্যাহার করে। বি.পি.সি. রিপোর্ট যতবারই পূর্ব পশ্চিমে বিভেদ বা মানুষে মানুষে স্বার্থ-সংঘাত সওগাত লইয়া আসিবে ততবারই উহা তীব্র গণ বিক্ষোভের মুখে ভাসিয়া যাইবে। মানুষের এই সচেতনতার পরিপূর্ণ বিকাশ ১৯৫২ সালের রক্তরাঙ্গা ফেব্রুয়ারীর ভাষা সংগ্রাম। মানুষ সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া রক্ত স্বাক্ষরে শপথ লিখিয়াছে জীবনের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা না পাইলে তাদের আন্দোলন থামিবে না। ১৯৪৯ সালের স্বাধীনতা লুপ্তির আশঙ্কা, সরকারের প্রতি মোহ, পাক-ভারত তিক্ত সম্পর্ক, হিন্দু-মুসলমানে একটা সন্দেহের ভাব ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতার অভাব এবং সাংগঠনিক শূন্যতার পরিবেশ আজ চির বিদায় নিয়াছে। আজ মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে সরকার বিরোধী। স্বাধীনতাকে স্বার্থক করিতে চায় জীবন ও জীবিকার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়া। জীবন ও জীবিকার লড়াইতে প্রত্যেকটী মানুষ বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে দুষমনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হইতে চায়। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধকে তারা সম্প্রদায়ে– সম্প্রদায়ে বিরোধ বলিয়া মনে করেন না। তার উপর আমাদের প্রতিবেশী ভারতের প্রভাব পড়িতে বাধ্য। ১৯৫৩ সালের এই পরিবর্তিত অবস্থায় ১৯৪৯ সালের সাংগঠনিক রূপকে অবশ্যই আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের মনে হয় আওয়ামী মুসলীম লীগের গভীর বাস্তবতাবোধই একদিন আওয়ামী লীগকে জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন করিয়া তুলিয়াছিল। আজও যেন আমরা আর একবার বাস্তববাদীবোধের পরিচয় দিয়া অগ্রগতি অব্যাহত রাখিতে পারে [পারি]। আশা করি আমরা সকলেই একমত যে, গোটা সরকার বিরোধী শক্তির ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব গ্রহণই আওয়ামী লীগের কর্ত্তব্য। বর্তমান অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ছাড়াছাড়িতে ফ্রান্সের কনভেনসনিষ্টদের মত অবস্থা যেন আমাদের না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে আমরা গোটা কাউন্সিলকে আহ্বান জানাইতেছি।

এতক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলনের গতিধারার সাধারণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া আওয়ামী লীগের অতীত ও বর্তমান সাংগঠনিক রূপায়ণের পরিণতির দাবীর প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এইবার কর্মসূচী ও তথ্যগত ভাবে আওয়ামী লীগকে আপনাদের সামনে উত্থাপিত করিব। পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দি পাক-ভারত মৈত্রী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলিয়াছিলেন পূর্বপাক আওয়ামী মুসলীম লীগের জন্মের পরে আওয়ামী মুসলীম লীগও সেই আওয়াজকে কর্মসূচীভুক্ত করে। অতঃপর পূর্বপাক আওয়ামী মুসলীম লীগ বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ, লাঙ্গল যার জমি তার ভিত্তিতে ভূমি বন্টন, জাতীয়করণের ভিত্তিতে শিল্পায়ন, প্রত্যেকের কাজের ব্যবস্থা–প্রত্যেকের স্বাস্থ্য, শিক্ষার নিরাপত্তার ভিত্তিতে এক কর্মসূচী গ্রহণ করে। কিন্তু আওয়ামী মুসলীম লীগ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল শুধু আভ্যন্তরীণ কর্মসূচীতে সব সমস্যার সমাধান হইবে না। বিশ্ব বর্ত্তমান অবস্থায় একান্ত পারস্পরিক হইয়া উঠিয়াছে। এই নির্ভরশীলতার প্রতি দৃষ্টি দিয়াই আওয়ামী মুসলীম লীগ উহার আভ্যন্তরীণ নীতির

www.pathagar.com

প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বৈদেশিক নীতি নির্দ্ধারিত করিয়াছে। আওয়ামী লীগ ঘোষণা করিয়াছে কমনওয়েলথ এর সাথে আমাদের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে। তারা আরও দেখিয়াছে কৃষ্টি ও শিল্পে তারা যে প্রগতিবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে উহা সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার একান্ত পরিপন্থি। তাই আওয়ামী লীগ কমনওয়েলথ ত্যাগই নহে- সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী জোটের সাথে সম্পর্কহীন সক্রিয় নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করিয়াছে। আওয়ামী মুসলীম লীগ এই নীতির অনুকূল শান্তি আন্দোলনেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব-পাক আওয়ামী মুসলীম লীগের সহসভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির সভাপতি ও এশিয়ার আঞ্চলিক শান্তি কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি। শান্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়া আওয়ামী মুসলীম লীগ যুগ যুগ ব্যাপী মানুষের প্রতিভা ও সাধনার প্রতিভূ মানব সভ্যতা রক্ষার জন্য বিশ্বধ্বংসী রণ পাগল সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। আওয়ামী মুসলীম লীগ আজ নীতিগতভাবে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির মহান নেতা। আওয়ামী মুসলীম লীগ গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে যে, সরকারী নীতির গতানুগতিক সমালোচনাই বিরোধী দলের কাজ নহে। বিরোধীদলকে প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই গণস্বার্থের ও গণসমৃদ্ধির পরিপূরক কর্মসূচী। সাম্রাজ্যবাদ কুক্ষিগত অবস্থায় বিরোধী দলের যে ভূমিকা ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে উহার ভূমিকা ও কর্ত্তব্যের বিস্তৃতি অবশ্যম্ভাবী। আর এই অবস্থার বিশেষ স্বীকৃতির মধ্যেই আওয়ামী মুসলীম লীগ নীতিগত ভাবে মুসলীম লীগ হইতে তফাৎ। মুসলীম লীগ আভ্যন্তরিণ নীতিতে সামন্তবাদী বলিয়াই বৈদেশিক নীতিতে সাম্রাজ্যবাদী; তাই তারা শান্তি ও প্রগতির দুষমন। আর তাদের এই বন্ধ্যানীতির জন্য দেশের পূণর্গঠন কার্য্য সম্ভব হইতেছে না। গোটা দেশ আজ দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি, বেকারী, আর্থিক ও সামাজিক সংকটে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। তাদের এই সংকট তাদেরকে উত্তরোত্তর সাম্রাজ্যবাদীদের করুণার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে। লীগ সরকার আজ আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে পর্য্যন্ত বিকাইয়া দিতে বসিয়াছে। পূর্বাহ্নেই আওয়ামী মুসলীম লীগ ঘোষণা করিয়াছিল সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে দেশের সংকটের সমাধান করিতে পারিলে সাম্রাজ্যবাদীরা কখনও এই দেশ ছাড়িয়া যাইত না। আওয়ামী মুসলীম লীগের সাবধান বাণী আজ প্রতিটী মানুষের কল্পনাকেই স্পর্স [স্পর্শ] করে নাই, প্রতিটি মানুষকেও উহার পক্ষে সংগঠিত প্রেরণার [প্রেরণায়] উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস যে আওয়ামী মুসলীম লীগের বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ কাউনসিল অধিবেশন উহার এই আদর্শবাদী নেতৃত্বের পরিপূর্ণ সাংগঠনিক রূপ দিতে তৎপর হইবেন।

এইবার সাংগঠনিক দিক লইয়া আমরা কয়েকটি কথা পাড়িব। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আজ পূর্ব বাংলার প্রতিটী জিলায় কেন অধিকাংশ ইউনিয়নেও আওয়ামী মুসলীম লীগ গঠিত হইয়ছে। বি.পি.সি. আন্দোলনের পরে ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়া সম্বিতহারা জাতি শহীদদের রক্ত প্রবাহের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা লাভ করিয়াছে, উহা একান্ত অনবদ্য। পূর্ব বাংলার অধিকার সচেতন চাষী, সজাগ মধ্যবিত্ত, জাগ্রত ছাত্র সমাজ, জীবন-জিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ যুবশক্তি আজ তাদের বর্তমান অবস্থার অবসান করিতে কর্ম চঞ্চল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাদের এই তৎপরতার সাংগঠনিক সুযোগ সম্বন্ধে আওয়ামী

www.pathagar.com

মুসলীম লীগ নিশ্চয়ই বিবেচনা করিয়া দেখিবে। ঢাকা সিটি হইতে আরম্ভ করিয়া সুদুর মফঃস্বল পর্য্যন্ত সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে আমরা নিশ্চয়ই সমালোচনা শুনিতেছি যে, আওয়ামী মুসলীম লীগ আদর্শগত ভাবে সকল স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিলেও উহার সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার জন্য সকলকে সমবেত করিতে পারিতেছে না। পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে এই কাউনসিল অধিবেশন এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন বলিয়া আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

সংগঠনের এই বিশেষ বিবেচনা ভিন্ন অন্যান্য দিকের প্রতিও আমাদের নজর দেওয়া দরকার। প্রত্যেকটী উচ্চ কমিটি হইতে নিম্ন কমিটি, প্রত্যেকটি নিম্ন কমিটি হইতে উচ্চ কমিটির সাথে আমাদের আরও দৃঢ় যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। প্রদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপক গণ-সংযোগ করিয়া আমাদের কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখিতেই হইবে যে, লীগ সরকার জনপ্রিয়তা হারাইলেও জনসাধারণকে এখনও আমরা পরিপূর্ণভাবে সংগঠন সচেতন করিয়া তুলিতে পারি নাই, অথচ মানুষের এই চেতনার উপরেই আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়া গণতান্ত্রিক শক্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

আমাদের কর্মসূচীতে আমাদের কাজ ও কর্তব্যের বিস্তৃত আলোচনা ও নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও উহার প্রয়াগ-দিকের [প্রয়োগ-দিকের] প্রতি দৃষ্টি দিয়া কর্মসূচীর উপর একটা আলোচনা করিতে চাই। এই আলোচনা আরম্ভের পূর্বে আমাদের কর্মসূচীর গোড়ায় যে মহান প্রেরণা কাজ করিতেছে সে সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও সংস্কৃতির নিরাপত্তার পরিপূর্ণ আশ্বাসই আমাদের কর্মসূচীর মূল প্রেরণা। সমাজের গতিধারা ও মানব সমাজের ক্রমবিকাশের প্রতি সর্তক দৃষ্টি দিয়া আমরা উপলব্ধি করিয়াছি যে, এই ত্রৈমন্ত্রের উপরই আমাদের সামাজিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আমরা আমাদের ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনের উপর আলোচনা করিতে যাইয়া আমাদের ঐহিক জীবনের বিকাশের পর্যালোচনা চালাইলে আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে কোন সংশয়েরই অবকাশ থাকিবে না। শোষক আর শোষিতের সংঘাত ভঙ্গুর ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শোষণের অস্ত্রগুলির উপর আক্রমণই আমাদের প্রথম কাজ। এই শোষণই মানুষকে মানুষের মর্যাদা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাকে করিয়া তুলিয়াছে শোষকের মুনাফার পণ্য। পণ্য হিসাবে নয়–মানুষ মানুষের পরিপূর্ণ মর্যাদা লইয়া বাঁচিতে চায়। আওয়ামী মুসলীম লীগ এই বাণী লইয়া বঞ্চিত মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই মানবিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার শপথই আওয়ামী মুসলীম লীগের কর্মসূচীর মধ্য দিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। আওয়ামী লীগ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে জাতির সম্পদের উপযুক্ত উৎপাদন ও বন্টনের মধ্যেই মানব মুক্তির এই মহান পথ নিহিত। বর্তমান সমাজ বিধানের গলদ ও উহার প্রতিশোধকের মধ্য দিয়াই উহার সংকটের অবসান করিয়া মানুষের সমৃদ্ধি রচনা করিতে হইবে। আওয়ামী মুসলীম লীগের কর্মসূচীর বিশ্লেষণ করিয়া আমরা এই কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে আওয়ামী মুসলীম লীগ এই মহান নীতিরই বাহক। আওয়ামী মুসলীম লীগ উহার ভূমি নীতি ঘোষণা করিয়া বলিয়াছে যে বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া লাঙ্গল যার জমি তার নীতিতে ভূমি বন্টন

www.pathagar.com

করিবে। এই ঘোষণায় এই কথা পরিস্কার হইয়া গিয়াছে যে, আওয়ামী লীগ ভূমি ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার শোষকের উচ্ছেদ করিয়া চাষীকেই প্রকৃত মালিক করিবে।

ইহাতে ভূমি বিকেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে উৎপাদিত পণ্যেরও কেন্দ্রীয়করণ ক্ষমতা লোপ পাইবে, উৎপাদনী তৎপরতা বৃদ্ধি পাইবে, সংগঠিত শিল্পায়িত উৎপাদনের পথ সুগম হইবে; উৎপাদনে মুনাফা লুটিবার প্রবৃত্তি হইতে মানুষের প্রয়োজনের সজাগ দৃষ্টি জাগিবে, সমাজের নিশ্চয়তা দেখা দিবে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িবে, রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের এই কথার সততা [সত্যতা] মুসলীম লীগ সরকারের তথাকথিত খেসারত দিয়া জমিদারী ক্রয় করিয়া জোতদার বহাল ও কৃষক উচ্ছেদ ব্যবস্থা হইতে পরিষ্কার হইয়া উঠে। সরকার জমিদারী ক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। ফল হইয়াছে- সূর্য্যাস্ত নোটিশে চাষীর উচ্ছেদ। কাছারীর অত্যাচারে চাষীর সর্বনাশ, কিছু সংখ্যক নূতন জোতদার সৃষ্টির ফলে লীগ সরকারের দলীয় ফায়দা, উৎপাদনের সীমাবদ্ধতার জন্য ও মুনাফা লোভের তাড়নায় খাদ্য সংকট, ৬০ কোটী টাকা খেসারতের ফলে চাষীর উপর কর বৃদ্ধি ও সরকারী ভান্ডার উজাড়।

আমরা ভূমি ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই। কিন্তু ভূমি ব্যবস্থার সাথে সাথে শিল্পায়ন প্রচেষ্টাও আমাদের সংগঠিত করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্যের বাজার, নিয়োজিত মূলধনের যোগান হিসাবে আমাদের দেশকে ব্যবহার করিয়াছে বলিয়াই আমাদের কৃষি ও শিল্পের এই দুর্গতি। আজও তারা আমাদের [আমাদেরকে] কমনওয়েলথের জোয়ালে জুড়িয়া ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী আতাতে ভিড়াইয়া আমাদের ভবিষ্যৎ পূর্ণ গঠনকে [পুনর্গঠনকে] ব্যাহত করিতেছে। আমাদের ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইবে যে, সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের শিল্পায়নকে সাহায্য করিয়া তাদের সর্বনাশ করিতে পারে না। একমাত্র পরিচালনা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ব্যাপারে তাদেরে সর্বময় কর্তৃত্ব দিলে তাদের নিজেদের শিল্পের সর্বনাশ না হয় এমন দুই একটি প্রতিষ্ঠান তারা গড়িলেও গড়িতে পারে। কিন্তু পরিচালনা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের কর্তৃত্ব তাদের হাতে দেওয়া যে কি ভয়াবহ তা আজ আমাদের দেশবাসীরা পারশ্য, মালায় প্রত্যেকটি দেশের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছে। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া আজ সরকারের উচিত ছিল স্টার্লিং পাওনা আদায় করিয়া জাতীয় শিল্প গড়িয়া তোলা। সরকার যে তার সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ঘেষা নীতির জন্য ইহা করিয়া উঠিতে পারে নাই লীগ সরকারের কাশ্মীর নীতি হইতে বর্ত্তমান খাদ্য নীতি পর্যন্ত পর্যালোচনা করিলে উহা পরিষ্কার হইয়া উঠে। দুই একটি ছিটা ফোটা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে দেখিয়া আমরা মোটেই যেন সরকারী ভাওতাও [ভাওতায়] বিভ্রান্ত না হই। আমাদের দেখিতে হইবে এই প্রচেষ্টা মূল শিল্প সৃষ্টির সহায়ক কি না এবং এই উৎপাদন ও বন্টনে সাধারণ মানুষের স্থান কোথায়। সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি বাদ দিয়াও কর্ণফুলী জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনার কোন কোন দিককে আমরা শিল্প বিচারের মাপকাঠীতে যাচাই করিতে পারিতাম। কিন্তু শুনা যাইতেছে বিসমিল্লায় গলদ ও স্বার্থের হানাহানিতে লক্ষ লক্ষ টাকা পানি হইয়া গিয়া কর্ণফুলীর পরিকল্পনা আজ বানচাল হইতে বসিয়াছে। এই সকল অপরিকল্পিত প্রচেষ্টার দুর্বলতার

www.pathagar.com

ও দুর্নীতি আওয়ামী লীগ পূর্বাহ্নে উপলব্ধি করিয়াই মূল শিল্পকে জাতীয়করণের আওতায় [আওয়াজ?] তুলিয়াছে। জাতীয় শিল্পের বিরাট সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিও আওয়ামী মুসলীম লীগ দিয়াছে। কিন্তু লীগ সরকার এই সম্ভাবনা ত দূরের কথা উহার স্বীকৃত কাঠামোতেও শিল্পকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। আমাদের বস্ত্র বিশেষ করিয়া তাঁত-শিল্প এক দারুণ বিপর্যয়ের মুখে। বস্ত্রের বিরাট বাজার থাকা সত্ত্বেও আজ মানুষ একদিকে বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণ করিতে না পারিয়া ফাঁসী দিয়া মরিতেছে, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ তাঁতী-পরিবার অনাহারে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। সরকারের বাণিজ্য নীতির দেউলিয়াত্ব আজ আমাদের এই ছোটখাট শিল্পকেও এমনি প্রচণ্ড আঘাত করিয়া দেশকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। তাদের এই নীতিই দেশ বিদেশে তিক্ত রাজনৈতিক সম্পর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। আর তারা ইঙ্গো-মার্কিন তাবেদার সাজিয়া কুলরক্ষায় নামিয়াছে। তাদের এই দীনতার জন্যই আমাদের কাগজ, চামড়া, ম্যাচ ও অন্যান্য শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। সরকারের এই বাণিজ্য ও শিল্প নীতির জন্যই তারা তাদের পথে পাটের কোন ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিতে পারিল না। তাদের নীতির জন্য একদিকে চাষী [চাষীর] সর্বনাশ হইল, অন্যদিকে পাটের বাজারও সংকুচিত হইল। ব্যবসায়ীদের চাষী ঠকানো ও বিদেশে মুনাফা লুটার অতিরিক্ত সুযোগ করিয়া দিয়াই সরকার পাটের ভবিষ্যৎ এমনি দুর্যোগপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। পাটের এই অবস্থায় শুধু চাষীরই সর্বনাশ হইবে না গোটা দেশেরও ভরাডুবি হইবে। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জ্জনে পাট অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। পাটের সর্বনাশে আমাদের মুদ্রা সংকট তীব্র হইতে বাধ্য। অথচ এই পাট নিয়াও সরকারের ক্ষমাহীন ব্যর্থতার অবধি নাই। তাই আওয়ামী মুঃ লীগ ঘোষণা করিয়াছে পাট শিল্পের জাতীয়করণ, দেশি বাজারে পাটের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ ও বিদেশি বাজারের সঙ্গতি রাখিয়া পাট সংক্রান্ত বাণিজ্যিক নীতি পরিচালনা।

সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও ভূমি নীতির আর বিস্তৃত পর্যালোচনায় না গিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি দিলেও সরকারী ব্যর্থতা প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে শোষণই সরকারী নীতির মূল উদ্দেশ্য। জমিদার কর্ত্তৃক প্রজা, মালিক কর্ত্তৃক শ্রমিক, শোষণের নীতিই লীগ সরকারের নীতি। লীগ সরকার রচিত বি.পি.সি. রিপোর্টের মধ্যেও তাদের এই রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই রিপোর্টেও লীগ সরকার এক অংশ অন্য অংশের উপর খবরদারী, জমিদারের জমিদারীতে ও মালিকের শোষণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়াছে। করিয়াছে বলিয়াই গোটা দেশ উহার বিরুদ্ধে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল। আওয়ামী মুসলিম লীগ এই বিরাট আন্দোলনের মধ্যে জাগ্রত মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবীর প্রতিনিধি হিসাবে সংগ্রাম চালাইতেছে। আওয়ামী লীগ দাবী করিয়াছে, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক। তাই বলিয়াই মুসলিম লীগ সরকার যখন সাম্রাজ্যবাদী কৌশলে ভাষা আন্দোলনকে ধ্বংস করিতে আসিল গোলাগুলি লইয়া, আওয়ামী মুসলিম লীগ তখন পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবীতে সংগ্রাম [সংগ্রামে] ঝাঁপাইয়া পড়ে। শীহদরা সরকারের খুন-পিপাসা মিটাইয়াছে। সরকার কিন্তু মানুষের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মিটাইতে পারে

www.pathagar.com

নাই। তাই আওয়ামী লীগের পবিত্র দায়িত্ব জাতির এই সংগ্রামকে সফল করা। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

ভাষা আন্দোলনের সময় গোটা পূর্ব বাংলার জনতার সাথে থাকিয়া আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগ্রাম করিয়াছে। ভাষা সংগ্রামকে সংগঠিত করিয়া আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। শহীদদের শপথকে আওয়ামী লীগ ভুলে নাই। আওয়ামী লীগ জেল জুলুমে কম নিষ্পেষিত হয় নাই। বৃদ্ধ গণনেতা মওলানা ভাসানী সাহেব সহ শত শত নেতা ও কর্মী কারাবরণ করিয়াছেন। কারাগারে মওলানা সাহেবের জীবনও সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আজও শত শত দেশপ্রেমিক কারাগারের অন্তরালে তিলে তিলে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ সরকারের এই শুধু বন্দীমুক্তি দাবী করে নাই ঘোষণাও করিয়াছে মুসলীম লীগ সরকার যে নীতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে উহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, ব্যক্তি ও গণ জীবনের উপর তাদের এই আক্রমণ মরণ কামড় মাত্র। তাই আওয়ামী মুসলিম লীগ ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার অপরাজেয় ঘাটি। আঃ মুঃ লীগ প্রত্যেকটী রাজবন্দীর আশু মুক্তিই চায় না, সমাজগত ভাবে বন্দী প্রত্যেকটী মানুষেরও প্রকৃত আজাদী প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। আওয়ামী মুঃ লীগ জানে সম্পদ বঞ্চিত মানুষের উদ্দেশ্যে লৌকিক গণতান্ত্রিক অধিকার ঘোষণা ভন্ডামী ছাড়া কিছু নয়। আর লীগ সরকার শোষণ ও স্বৈরাচারকে রক্ষা করিতে এই লৌকিক গণতন্ত্রের নামে বারবার জনসাধারণকে হামলা করিয়া উত্তরোত্তর সংকট সৃষ্টি করিতেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও সরকারী ব্যর্থতাকে ঢাকিবার জন্য চন্ডন নীতির স্টীম রোলার প্রত্যক্ষ করা যায়। নূতন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢালাই করিতে ব্যর্থ হইয়া পুরানো শিক্ষার মানকেও বাঁচাইতে না পারিয়া সরকার এক দারুণ শিক্ষা সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। অথচ শিক্ষার্থী ছাত্র সমাজ সার্বজনীন উন্নত শিক্ষার দাবীতে চঞ্চল। সরকার বহুবার গোলাগুলি জেল জুলুম দিয়া জবাব দিয়াও ছাত্রদের দাবী দমাইতে পারে নাই। আজ আবার সরকার সারা প্রদেশব্যাপী ছাত্র-শিক্ষক বিরোধের উস্কানি দিয়া গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ ও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র সংগ্রাম এই বিভেদ ও ব্যভিচারের মূর্ত্ত প্রতিবাদ। মুসলীম লীগ সরকারের এই ব্যর্থতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আওয়ামী মুঃ লীগ ঘোষণা করিয়াছিল- শিক্ষা সমাজ বর্জ্জিত নয়। মুসলীম লীগ সরকার যে সমাজের প্রতিনিধি ঐ সামাজিক সংকটের চাপই শিক্ষা ব্যবস্থায়ও প্রতিফলিত হইয়াছে। আঃ মুঃ লীগ তাই উহার কর্মসূচীতে শোষণ মুক্ত সমাজের কথাই ঘোষণা করে নাই– উহা প্রতিষ্ঠার শপথও ঘোষণা করিয়াছে।

আমাদের কর্মসূচীতে নীতিগত ভাবে যেসকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে কেবল আমাদের গত কয়েক বৎসরের কর্মের ভিত্তিতে উহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সকল কিছুর পর্যালোচনা অবশ্য আপাততঃ সম্ভবও নয়। আর দুই একটি জরুরী আশু সমস্যার উল্লেখ করিতে চাই। আমাদের দেশ আজ এক চরম খাদ্য সংকটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। প্রতিদিনই অনাহারজনিত মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ১৩৫০-এর লক্ষ লক্ষ গৃহ হারাই নহে শোষণের চাকায় দলিত যুগের ছিন্নমূল মানুষের সাথে বর্তমান সংকটে রিক্ত অজস্র মানুষ আজ রাস্তা ঘাটে ভিক্ষুকের মিছিলে সামিল হইতেছে। গ্রামে আর শহরে তারা ছিন্নপত্রের মত ভরিয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

এই রিক্ত মানুষের মূল্য কতখানি। রংপুর, মোমেনশাহী, খুলনা, বরিশাল ও অন্যান্য জায়গায় মানুষ খাদ্য আন্দোলনও গড়িয়া তুলিতেছে ভুখা মিছিল ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির মধ্য দিয়া। মরার পূর্বে বাঁচিবার জন্য মানুষের এই সংগ্রামকে শুধু আঃ মুঃ লীগ প্রত্যক্ষ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে না উহাকে মানুষের বাঁচিবার সংগ্রামে রূপান্তরিত করাও আঃ মুঃ লীগের কর্ত্তব্য। আমরা বিশ্বাস করি আঃ মুঃ লীগ কাউনসিল দেশের সামনে ইহার একটী সুষ্ঠ [সুষ্ঠু] কর্মপন্থা তুলিয়া ধরিবে।

বেকারীর অভিশাপে দগ্ধ দেশ আবার সরকারী হামলায় ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সরকারী নেতৃত্বের ছাটাই অভিযান সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে লক্ষাধিক লোককে ইতিমধ্যেই চাকুরি হারা করিতে যাইতেছে। স্বল্প-বেতন চাকুরিয়াদের মাহিনা হ্রাস প্রস্তাব মধ্যবিত্তের চির ঘাটতি বাজেটকে আরও ঘাটতি করিয়া তাদের অর্দ্ধাহারকে অনাহারে পরিণত করিবে। আঃ মুঃ লীগের এই কাউনসিল অধিবেশন নিশ্চয়ই এই ধ্বংস যজ্ঞের প্রতিরোধ কল্পে উপযুক্ত কর্মসূচী লইয়া আগাইয়া আসিবে। বাহিরের এই অর্ধাহার অনাহারের সাথে দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের দুর্বিসহ বন্দী জীবনের আশু মুক্তির একটা বলিষ্ঠ কর্মসূচি গ্রহণ করিতেও আমরা কাউনসিলকে আহবান জানাইতেছি।

আমাদের এই মহান কাউনসিল অধিবেশন সাংগঠনিক ও অন্যান্য ব্যাপারে এমন গভীর বাস্তব ধর্মী সিদ্ধান্ত করিবে যে, উহা আমাদের সংগঠনকে উদ্দীপিত, বিরোধীদের নিরস্ত ও সংশয়বাদীদের আমাদের সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক দুনিয়ার জন্য এক অমর ইতিহাস সৃষ্টি করিবে।

সূত্র : *পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন : সাংগঠনিক রিপোর্ট*, ১৯৫৩, কেন্দ্রীয় দফতর, ১৭ নং কাকুন বাড়ি লেন, ঢাকা হইতে প্রকাশিত ও প্যারামাউন্ট প্রেস লিমিটেড, ৯ নং হাটখোলা রোড, ঢাকা হইতে মুদ্রিত। আরও দ্রষ্টব্য, আবুল কাশেম, *আওয়ামী লীগ : ঐতিহাসিক দলিল*, পৃ. ৫০-৫৮

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : তিন

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, ১৯৫৫

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন
২১, ২২ ও ২৩শে অক্টোবর
১৯৫৫ সন

সাধারণ সম্পাদক
শেখ মুজিবুর রহমানের
বার্ষিক রিপোর্ট

১৯৫৫ সালের ২১-২২শে অক্টোবর পুরান ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের তিনদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন। এটি পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত হয়। বিষয়বস্তু বিবেচনায় এটি মূল্যবান দলিল। এতে সমসাময়িক সময়ের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থান পেয়েছে। স্মর্তব্য উল্লিখিত কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক করা হয়। পুস্তিকার বানান, বাক্য গঠন প্রায় অপরিবর্তিত রেখে রিপোর্টটি পুনর্মুদ্রিত হলো।

জনাব সভাপতি, বন্ধু কাউন্সিল সদস্যবর্গ ও মাননীয় অতিথিবৃন্দ।

আপনারা আমার আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন। বিগত দুই বৎসর পাকিস্তানের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক উত্থান পতনে প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং পূর্ব বাংলার অমর জনতার সেবায় একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত থেকে আজিকার এই কাউন্সিল সভায় আপনারা সমবেত হয়েছেন। এই অধিবেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। আওয়ামী লীগের এই বাৎসরিক কাউন্সিল অধিবেশনের রাজনৈতিক তাৎপর্য্য ও গুরুত্ব আপনাদের নিকট সুস্পষ্ট। আইনতঃ বৎসরে ন্যূনকল্পে একবার এই কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিগত ময়মনসিংহ অধিবেশনের পর ১৯৫৪ সালে কাউন্সিল সভা আহ্বান করা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। ইহার কারণও রয়েছে প্রচুর। মজলুম জনগণের ঐক্যজোট এই আওয়ামী লীগের অধিকাংশ কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দকে পূর্ববঙ্গের [পূর্ববঙ্গে] ৯২-ক ধারা প্রয়োগের সাথে সাথে কারা প্রাচীরের অন্তরালে কাটাতে হয়েছে, অনেকের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে, আবার অনেককে অন্তরীণ রাখা হয়েছে। পূর্ববাংলার অবিসম্বাদিত নেতা ও পূর্ববাংলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে প্রায় বৎসরাধিককাল পূর্ববাংলায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। সন্ত্রাসপূর্ণ ৯২-ক ধারার বিভীষিকার কথা নিশ্চয়ই আপনারা কেউ ভুলেন নি আর এও ভুলেননি যে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি ও পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বহুদিন যাবৎ মুমূর্ষু অবস্থায় জুরিখের হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে। শত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও গত বছর কাউন্সিল সভা ডাকা সম্ভবপর হয়নি। আপনাদের অনেকেরই মতো আমিও তখন জেলখানায় বসে এই শুভ দিনটির প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলাম। আজ আমরা বিচার করবো অতীতে কি করেছি, আর সেই সাথে কর্তব্য নির্দ্ধারণ করবো অনাগত ভবিষ্যতের। আগামী দিনের সুখ, ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ দেশ ও জাতি গঠণের কাজে নিজেদেরকে দৃঢ়প্রত্যয় সহকারে নিয়োজিত করার শপথ গ্রহণের এটাই মঙ্গল মুহূর্ত।

বন্ধুগণ, একটি রাজনৈতিক জোট হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগের ভূমিকা বর্ণনা করার পূর্বে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, কোন্ সামাজিক প্রয়োজনে এই দলের সৃষ্টি হয়েছিল এবং কি এর কর্ম্মসূচী। এই দুটি প্রশ্নের সম্যক ব্যাখ্যার মাধ্যমে আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ভূমিকা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলে যে প্রেরণায় এ দেশের মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তা হচ্ছে স্বাধীনতা, সুষ্ঠু গণতন্ত্র, প্রগতি, সমৃদ্ধি এবং শৃঙ্খলামুক্ত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে জাতির অবাধ বিকাশ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে সাধারণ মানুষের অন্তরে যে মহান কামনার বীজ লুকিয়েছিল, মুসলিম লীগ সরকার ব্যক্তিগতস্বার্থপরতার মোহে ফ্যাসিষ্ট দমননীতির দ্বারা উহা নির্মূল করার ব্যর্থ প্রয়াসে মেতে উঠে। পূর্ব বাংলার মজলুম জনতার একনিষ্ঠ সেবকরা সেদিন সেই অন্যায়কে নীরবে সহ্য না করে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ দলের সেই অপচেষ্টাকে প্রতিরোধের জন্য চরম বিপদের মাঝে ঝাপিয়ে পড়তে পিছপাও হয়নি। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস। পাকিস্তানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল এই মাসে। পূর্ব বাংলার তরুণ ছাত্ররা সেদিন প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য, পূর্ববঙ্গবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেদিন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের মাধ্যমে ছাত্ররাই প্রথম জীবন পণ করে প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখী হয়। সেদিনকার ছাত্র আন্দোলনে আমিও আপনাদের অনেকেরই মতো অংশ নিতে পেরেছিলাম বলে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করছি। তখন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ ব্যতীত স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ বিরোধী কোন প্রতিষ্ঠানই আর ছিল না। ছাত্র লীগের উদ্যোগেই তখন গন আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এরপর থেকে জালেম মুসলিম লীগ সরকার নিপীড়িত জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর প্রতিদিন হামলা চালিয়ে তাদের ঘৃণ্যরূপটি জনগণের সামনে খুলে ধরতে লাগলো। কৃষক বুঝতে পারলো, মুসলিম লীগ জমিদার প্রভূদের স্বার্থরক্ষক; মজুর বুঝতে পারল, মুসলিম লীগ বিদেশি একচেটিয়া পুজিপতিদের দালাল, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিরা একে বুঝলো অশিক্ষা, নিরক্ষরতা, কুসংস্কার

www.pathagar.com

ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পের ধারক ও বাহক এবং সমগ্র জাতি বুঝলো, মুসলিম লীগ পাকিস্তানের শান্তি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের দুশমন। মুসলিম লীগ এই দেশের মানুষকে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে চির আবদ্ধ রাখবার ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদ ও বিদ্বেষের বিষ ছড়ালো, জনতার ঐক্য ও সংহতিতে ফাটল ধরিয়ে এবং ভাষা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বুকে ছুরিকাঘাত করে আমাদের জাতীয় বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ালো। ইতিহাসের চাকাকে পশ্চাদমুখী করার লীগ চক্রান্তকে ব্যর্থ করার এবং পাকিস্তানকে একটি প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবার পবিত্র দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আর একটি শক্তি জন্ম নিল। ১৯৪৯ সনের ২৩ ও ২৪শে জুনে গণদরদী ও মজলুম জনগণের নেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ জন্ম হলো।

বন্ধুগণ, আওয়ামী লীগ জন্ম হওয়ার পর থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও উহার কর্মীগণ এক দিনের জন্যও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেনি। সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী মুসলিম লীগ সরকারের নূতন নূতন হামলার বিরুদ্ধে দুর্জয় সাহস নিয়ে আওয়ামী লীগকে প্রতিদিন মোকাবেলা করতে হয়েছে। অত্যাচার ও জুলুম শাহীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ যে জোরালো প্রতিবাদের ধ্বনি তুলেছিল তারই ফল স্বরূপ জনগণের মধ্যে এসেছিল নব নব চেতনা, নতুন আশা ও উদ্দীপনা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার বজ্র কঠিন শপথ। ভাইসব! এর ফলে আওয়ামী লীগকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি জনাব ভাসানী, আপনাদের সাধারণ সম্পাদক ও হাজার হাজার কর্মীকে জেল, কারাবাস, হাজতবাস করতে হয়েছে। হতে হয়েছে মামলার আসামী। সহ্য করতে হয়েছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, বহিষ্কারাদেশ প্রভৃতি অকথ্য জুলুম। এ সব আপনাদের জানা কথা উল্লেখ করে আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করবার ইচ্ছা আমার নেই।

ভাইসব! একথা আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে গণদাবীর বলিষ্ঠ আওয়াজকে উপেক্ষা করা যখন প্রতিক্রিয়াশীল ও গণ দুষমন মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল এবং দেশব্যাপী সভাসমিতি ও প্রতিবাদের ঢেউ খেলে গেল যার ফলে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের হাটে মাঠে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো তখন মুসলিম লীগ সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলায় সুদীর্ঘ আট বছর পর সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য হল। অত্যাচার, অবিচার, অনাচার এবং মুসলিম লীগ সরকারের কুশাসনে ও গণবিরোধী ভূমিকায় জনসাধারণকে এত অকথ্য নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল, দেশের আর্থিক কাঠামো এমনি ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, পূর্ব বাংলার জনতা তথা জাতি এমনি ভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল যে জনতা একদিনের জন্যও মুসলিম লীগ সরকারকে বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। তাই তারা সমস্ত লীগ বিরোধী দলগুলির সমন্বয়ে মুসলিম লীগকে পূর্ব বাংলার মাটি হতে উৎখাত করার জন্য একটি 'যুক্তফ্রন্ট' ঠন করবার আওয়াজ তুলেছিল। এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর তারিখে মোমেনশাহীর ঐতিহাসিক কাউন্সিল অধিবেশনে লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে মুসলিম লীগ জুলুম শাহীর মোকাবিলা করবার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ

www.pathagar.com

করবার পূর্বে মুসলিম লীগের প্রতি বীতশ্রদ্ধাজনিত মনোভাব হতে উদ্ভূত চিন্তাধারা প্রসূত লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন করবার ভাবাবেগ প্রশমিত করবার জন্যে আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু সহকর্মী এ-কথা আলাপ আলোচনার দ্বারা অনেক আওয়ামী লীগ কর্মী এবং নেতাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, আওয়ামী লীগের পক্ষে একটি তথাকথিত যুক্তফ্রন্ট গঠন করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। আমাদের এই মতের স্বপক্ষে তখন এই যুক্তি ছিল, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচনপূর্ব সাত বছরের মধ্যে একদিনের তরেও আমাদের সংগ্রামী ঐক্যজোট আওয়ামী লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বা তার পাশাপাশি দাড়িয়ে গণদাবীর স্বপক্ষে একটি কথাও বলে নি তাদেরকে হঠাৎ লীগ বিরোধী প্রতিষ্ঠান বলে রাতারাতি প্রচার করলেও আমরা কি করে তাদেরকে লীগ বিরোধী প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করবো এবং এরূপ জগাখিচুড়ি দল গঠন করলে তার ফল দাঁড়াবে এই যে, নির্বাচনপূর্ব সময়ে যারা নিজেদেরকে লীগ বিরোধী বলে প্রচারণা চালাবে ও বড়মুখে জনতার দাবী দাওয়া আদায় করবে বলে ঘোষণা করবে নির্বাচোনত্তর [নির্বাচনোত্তর] সময়ে তাদেরকেই হয়ত দেখা যাবে জনতার দাবীকে এড়িয়ে গিয়ে ব্যক্তি স্বার্থে তারা গণ দুশমন মুসলিম লীগের সাথে হাত মিলিয়াছে। অনেকেই সেদিন আমাদের এই মতকে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন- এবং আমাদের মতকে অহেতুক ও অমূলক বলে গণ্য করেছিলেন। এমনকি আমি যাতে এই তথাকথিত 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনে বাধা না দিই তজ্জন্য আমাকে জীবন নাশের ভয় দেখিয়ে বেনামী কয়েকখানা চিঠি দেওয়া হয়েছিল, উহা আজও আমার নিকট সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। এমনকি তখন আমার বিরুদ্ধে একটি প্রচারণা শুরু হয়েছিল যে আমি যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রবল বিরোধী। হয়ত আজিকার এই কাউন্সিল অধিবেশনের অনেকেরই কাছে এই প্রচারণা পৌঁছেছিলো। কিন্তু বন্ধুগণ, আমি যখন দেখলাম যে মুসলিম লীগ শাহীকে খতম করবার জন্যে জনগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ইহার জন্য যারা নির্বাচনের একদিন পূর্বেও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগ করে এসেছে তাদের গ্রহণ করতেও জনগণ প্রস্তুত কিন্তু মুসলিম লীগকে এক মুহূর্তের জন্যও বরদাস্ত করতে রাজী নয় তখন জনমতের রায়কে মাথা পেতে মেনে নিয়ে মোমেনশাহীর ঐতিহাসিক কাউন্সিল অধিবেশনের 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্তকে আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিলাম। আজ আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, ঐরূপ জগাখিচুড়ী তথাকথিত যুক্তফ্রন্ট গঠন করে আমাদের কোন লাভই হয়নি বরং সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট গঠনের ইতিহাস

বন্ধুগণ! এই প্রসঙ্গে একটি কথা আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে না দিলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। এটা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, জনাব ফজলুল হক পাকিস্তান সংগ্রামে আমাদের পাশে থেকে কোন দিন সাহায্য তো করেনই নি বরং পাকিস্তানের দাবীকে বানচাল করবার জন্যে, যে শক্তি দুর্জ্জয় বিক্রমে আমাদেরকে বাধা দিতেছিল তাদেরকে তিনি সর্বাতোভাবে [সর্বতোভাবে] সহায়তা করেছিলেন এবং আমাদের তদানীন্তন রাজনৈতিক শত্রুদের হাতের ক্রীড়নক রূপে তিনি কাজ করেছিলেন। শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যখন দশকোটি লোকের চির আকাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান বাস্তবে রূপায়িত হলো এবং

www.pathagar.com

এর ভিত্তিতে ভারত বিভাগ হয়ে দুটি সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হল, তখন তিনি পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ কর্তৃক নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান মুসলিম লীগের একজন সভ্য শ্রেণীভূক্ত হলেন। কায়েদে আজমের মৃত্যুর পর পূর্ববাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন রাতারাতি পাকিস্তানের বড়লাট পদে অধিষ্ঠিত হলেন এবং নমিনেশন যোগে নুরুল আমীন সাহেবকে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীত্বের গদিতে বসানো হলো। পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীত্বের গদিকে নিষ্কণ্টক করবার জন্যে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের তদানীন্তন সদস্য জনাব ফজলুল হককে পূর্ববাংলা সরকারের এডভোকেট জেনারেলের চাকরী দিয়ে তাহার পরিষদ সদস্যপদের ইস্তেফাপত্র [ইস্তফাপত্র] গ্রহণ করা হল। তারপর হতেই জনাব ফজলুল হক সুদীর্ঘকাল মুসলিম লীগ কর্তৃক নিযুক্ত এডভোকেট জেনারেল হিসেবে অত্যাচারী মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক প্রতিটি অত্যাচার ও অন্যায়কে সমর্থন দিতে গিয়ে আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্ম্মীদের প্রতি অন্যায় গ্রেফতারাদেশ হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলায় ন্যায় ও আইনগত বলে প্রমাণ করবার কোশেশ করেছেন। এরূপে পরোক্ষভাবে তিনি নির্বাচনের পূর্বে তাহার পদত্যাগ পর্য্যন্ত জুলুম শাহীর প্রতিটি কার্য্যকে আইনের গন্ডীর ভিতর দিয়ে সমর্থন জুগিয়েছেন। যখন মুসলিম লীগ সরকার গণদাবীর চাপে পূর্ববঙ্গ আইন সভার নির্বাচন ঘোষণা করলো তখন তিনি এডভোকেট জেনারেলের চাকুরী ছেড়ে রাতারাতি দেশপ্রেমিক বনে, তদানীন্তন মুসলিমলীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে শুরু করলেন। সরল প্রাণ জনসাধারণ হক সাহেবের এই রাজনৈতিক চাতুর্য্যপূর্ণ বিবৃতি দেখে ও শুনে কিছুটা বিভ্রান্ত হলো। ফল দাড়ালো এই যে, তিনি যেখানেই সভা করতেন সেখানেই বিপুল জনসমাবেশ [জনসমাবেশ] হ'ত। এর কারণ স্বরূপ একথা বলা যায় যে সুদীর্ঘ এগার বছর পরে তিনি যখন রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হলেন এবং সস্তা জনপ্রিয় বুলি আওড়াতে শুরু করলেন তখন জনসাধারণ ভেবে নিল যে তিনি তার এই জীবন সায়াহ্নে জনগণের খেদমত করতে করতে জীবনের বাকী কটি দিন বোধ হয় কাটিয়ে দিতে চান। হক সাহেবের সস্তা জনপ্রিয় উক্তি সমূহের জন্যে তাকে সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মনে করে জনগণ হক-ভাসানীর মিলন দাবী জানালো। কারণ জনগণ ভেবেছিল যে এই মিলনেই বোধ হয় জনগণের মুক্তি নিহিত। এমনি যখন দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ তখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে হক সাহেবের যে সামান্য সাঙ্গ পাঙ্গ তারই সঙ্গে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করেছিল তারা এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের যে সমস্ত সদস্য এই দেশের প্রত্যেকটি গণদাবী ও গণ আন্দোলনকে বানচাল করবার জন্য মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতিতে সক্রীয় অংশ গ্রহণ করেছিল অথচ রুটি গোস্তের বখরা নিয়ে গোলমাল হওয়ার ফলে নুরুল আমীন প্রভাবিত মুসলিম লীগ কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়েছিল তারা সুযোগ বুঝে জনাব হকের চারি পাশে জড়ো হতে লাগল। চাঁদপুরে আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত জনসভায় এবং ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় নিজে আওয়ামী লীগে যোগদান করার অভিপ্রায় জানিয়ে জনগণকে দলে দলে আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বান জানান সত্ত্বেও এই সব সাঙ্গ পাঙ্গদের ঘোরাফেরার ফলে উৎফুল্ল হয়ে জনাব হক নিজেই নূতন পার্টি গঠন করবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের আওয়ামী লীগের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ক্ষমতা লোভের

www.pathagar.com

বশবর্তী হয়ে একথাই চিন্তা করতে লাগল যে যদি জনাব হকের দ্বারা একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করান যায় এবং জনাব হকের চারি পাশে ঘোরা ঘুরি করে তার প্রিয়ভাজন হওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তারা ভেবেছিল হক সাহেব যদি নতুন পার্টি গঠন করেন তাহলে আওয়ামী লীগ ও হক সাহেবের পার্টি মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে, কারণ জনগণ হক-ভাসানীর মিলন চায়। অতএব নির্বাচনে যদি এই যুক্তফ্রন্ট দলের জয় হয় তাহলে হক সাহেবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকবে, কারণ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মন্ত্রীত্ব লোভী নন। সেই অবস্থায় আওয়ামী লীগের উপরোক্ত ব্যক্তিদের একটি ভবিষ্যৎ হিল্লা হতে পারে, কারণ তারা হক সাহেবের প্রিয়পাত্র। নিজ প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের মারফতেও যে উক্ত ব্যক্তিদের হিল্লা হতে পারে একথা তারা চিন্তা করতে সাহস করেনি কারণ তারা নামেই শুধু আওয়ামী লীগের সদস্য ছিল। কস্মিন কালেও তারা আওয়ামী লীগকে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার কোন চেষ্টাই করেনি বরং আওয়ামী লীগ কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেকটি গণ আন্দোলন থেকে তারা জেল জুলমের ভয়ে দূরে থাকত। তবুও তারা আওয়ামী লীগের সদস্য হয়ে ছিল কারণ মুসলিম লীগের নিকট তারা কখনও গ্রহণযোগ্য ছিল না। এরাই হক সাহেবের বাড়ীতে ঘুরা ফেরা করে একটা নূতন পার্টি গঠন করবার জন্য প্রেরণা যোগাতে লাগল, ফল দাড়াল এই যে, হক সাহেব রাতারাতি পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। এসব সত্ত্বেও জনগণের দুর্বার ইচ্ছা ছিল হক-ভাসানীর মিলন প্রতিষ্ঠা করা। তাই ২১ দফা সম্বলিত গণদাবীর এক সনদের স্বীকৃতির ভিত্তিতে হক-ভাসানীর মিলনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হোল।

এরপর এই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আরও কয়েকটি সদ্যগঠিত মুসলিম লীগ বিরোধী বলে কথিত রাজনৈতিক দলকে গ্রহণ করা হোল। ফলে জনগণ কর্তৃক ধিকৃত ও অবাঞ্ছিত কতিপয় লোক হক সাহেবের নিজস্ব পার্টির মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টে প্রবেশ করল কিন্তু এসব জেনে শুনেও তাদেরকে যুক্তফ্রন্টে গ্রহণ করতে হয়েছিল কারণ তাদের ছাড়া হক সাহেব যুক্তফ্রন্ট করতে রাজী ছিলেন না। কাজেই নির্বাচনের পূর্বে যে সমস্ত পার্টি রাতারাতি গজিয়ে উঠল তাদেরকে সমমর্য্যাদা দান করে সাত বছরের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান আওয়ামী মুসলিম লীগ জনতার দাবী যুক্তফ্রন্ট বাস্তবে রূপায়িত করল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে জনাব হক এই যুক্তফ্রন্ট গঠন করবার পর কাহারো সঙ্গে পরামর্শ না করে গোপনে নিজামে ইসলাম কর্তৃক রচিত দশদফা এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। নেজামে ইসলাম পার্টিভুক্ত বর্ত্তমান যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক মনোনীত পাকিস্তান গণপরিষদের জনৈক সদস্যের সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে উল্লিখিত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত একথা আমাদের জানা ছিল না। উক্ত চুক্তির শর্ত্তাবলী কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় দেখা গেছে যে উহার কয়েকটি ধারা হক-ভাসানীর নেতৃত্বে রচিত যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা ওয়াদার পরিপন্থি।

নির্ব্বাচন পর্ব্ব

বন্ধুগণ! যুক্তফ্রন্ট গঠনের পরই এল নির্বাচন পর্ব! নির্বাচনে দু'শ সাইত্রিশটি মুসলিম আসনে প্রার্থী মনোনয়নের জন্য গঠিত হল এক ষ্টিয়ারিং কমিটি। উক্ত কমিটিতে আওয়ামী লীগের, কৃষক শ্রমিক পার্টির ও নিজামে ইসলামের সমসংখ্যক সদস্য ছিল।

www.pathagar.com

এটা স্থির হয়েছিল যে, প্রত্যেকটি মনোনয়ন ত্যাগ ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে সর্ববাদী সম্মত হতে হবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নিজামে ইসলাম তাদের নিজেদের দলীয় লোকদেরকে বেশীরভাগ মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যেখানেই আওয়ামী লীগ সদস্যরা ত্যাগ ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রার্থী মনোনীত করার কাজে এগিয়ে এসেছে সেখানেই উপরোক্ত দল দুটি তাদের দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন না পেলে যুক্তফ্রন্ট ত্যাগের হুমকী দিয়েছে। জনতার দাবী যুক্তফ্রন্টের ঐক্য বজায় রাখবার জন্যও শুধু ২১-দফার দাবীকে ভবিষ্যতে রূপায়িত করবার আশা নিয়ে আওয়ামী লীগ তার নিজস্ব বহু ত্যাগী, যোগ্য ও নিঃস্বার্থ কর্মীকে বলিদান করে হক সাহেবের দলীয় লোকদেরকে মনোনয়ন দিতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি, ২৩৭টি মনোনয়নের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি জনাব ভাসানী সাহেব চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের জন্মদাতা ও প্রাণ জনাব আবদুল আজিজকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য একটিমাত্র অনুরোধ করা সত্ত্বেও জনাব হকের দলীয় লোকদের অন্যায় চাপে সেটাও দেওয়া সম্ভব হয়নি। এবং নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে যে কিভাবে টাকার ছাড়াছড়ি হয়েছিল সে ঘৃণ্য ও কুৎসিত ইতিহাস আমি আলোচনা করতে লজ্জাবোধ করছি। এরপর এলো নির্বাচনী প্রচারণার কাজ। জনাব হক তার দলীয় লোকদের এলাকা ভিন্ন আওয়ামী লীগের দলভুক্ত মনোনীত সদস্যদের দুই একটি এলাকা বাদে আর কোন এলাকাতেই সফর করেন নি। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপাতি জনাব ভাসানী ও আমাদের অন্যতম নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দলমত নির্বিশেষে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীদের এলাকায় নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত প্রচারণা চালিয়েছেন। জনাব হক যখন বরিশাল জেলায় নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকায় সফর করছিলেন তখন তদানীন্তন পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ আলীর গোপন আমন্ত্রণ পেয়ে বরিশাল জেলার নির্বাচনী সফর সূচী বাতিল করে তিনি রাজধানী ঢাকার বুকে ফিরে এলেন এবং মিঃ মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যে, জনাব হক উত্তর বঙ্গে কোন নির্বাচনী প্রচার চালাবেন না এবং হক সাহেবের দলের যে কয়জন লোক নির্বাচনে জয়ী হবে তাদেরকে নিয়ে জনাব হক মুসলিম লীগের বিজয়ী প্রার্থীদের সাথে মিলিত ভাবে পূর্ববাংলায় কোয়ালিশন সরকার কায়েম করবেন। জনাব হকের এই ঘৃণ্য গোপন চুক্তির কথা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের মুখপাত্র দৈনিক 'ডন' কাগজের মারফতে আপনারা অনেকেই হয়ত জানতে পেরেছেন। কিন্তু নির্বাচনের পরে দেখা গেল যে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২২টি আসনই যুক্তফ্রন্ট পার্টি দখল করেছে। জনাব হক এগার বছর পর্য্যন্ত জনগণের সঙ্গ থেকে দূরে থাকার ফলে একথা ভাবতে পারেন নি যে যুক্তফ্রন্ট পার্টি এইরূপ ঐতিহাসিক বিজয়ের অধিকারী হবে, এবং তিনি তা ভাবতে পারেন নি বলেই মিঃ মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে এরূপ এক গোপন আঁতাত করতে পেরেছিলেন।

নির্ব্বাচনোত্তর পরিস্থিতি

নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির প্রথম সভা মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হ'ল এবং জনাব হক সর্বসম্মতিক্রমে পালামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত

www.pathagar.com

হলেন। উক্ত সভায় পূর্ববর্ত্তী গণ-পরিষদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে, গণপরিষদকে ভেঙ্গে দেওয়ার দাবী জানিয়ে এবং পূর্ব পাকিস্তান হতে নির্বাচিত পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদেরকে সদস্যপদ ত্যাগ করার অনুরোধ জানিয়ে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর উথ্যাপিত [উত্থাপিত] প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। জনাব হক নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তার আত্মীয় ও তার দলভুক্ত পরিষদ সদস্য মিঃ আজিজুল হক, মিঃ আবু হোসেন সরকার ও নেজামে ইসলাম দলভুক্ত পরিষদ সদস্য মিঃ আশরাফউদ্দীন চৌধুরীকে নিয়ে এক ক্ষুদ্রায়তন মন্ত্রিসভা গঠন করে করাচী অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এইরূপে তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে আওয়ামী লীগ দলভুক্ত পরিষদ সদস্যদেরকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ না করে মিঃ মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন ফন্দি ফিকির আঁটতে করাচীতে উপস্থিত হলেন। করাচী যেয়েই জনাব ঘোষণা করলেন "মুসলিম লীগের সঙ্গে আমাদের সংগ্রামের অবসান হয়েছে।"

ভাইসব, একথা বোধ হয় আপনাদের স্মরণ আছে যে, যুক্তফ্রন্ট গঠন করার মুল উদ্দেশ্য ছিল গণদাবীর দুষমন জালেম মুসলিম লীগ সরকারকে কেন্দ্র এবং প্রদেশ থেকে নির্বাচনী যুদ্ধে পরাজিত করে কেন্দ্র এবং প্রদেশে যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম করে গণ দাবীর মহাসনদ একুশ দফাকে বাস্তবে রূপায়িত করা। কিন্তু জনাব হক শুধু প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হওয়ার পরই কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকারের হাতে থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জনগণের যে সংগ্রাম ছিল তার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। শুধু তাই নয় পাকিস্তান গণপরিষদের পূর্ব বঙ্গীয় সদস্যরা তাদেরকে পদত্যাগ করা সম্বন্ধে জনাব হকের কাছে উপদেশ চাইলে তিনি বলেছিলেন যে, "আমি এখনো গণপরিষদের সদস্য পদে ইস্তেফা দিই নি।" অর্থাৎ পরোক্ষ ভাবে তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে তারা যেন পদত্যাগ না করেন। এইভাবে তিনি স্বয়ং যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির প্রথম বৈঠকের সর্বম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের খেলাফ করেন। এর পরই তিনি ঢাকায় ফিরে এসে চিকিৎসার অজুহাতে কোলকাতায় চলে যান এবং তথায় বিভিন্ন সভায় আপত্তিকর ও রাষ্ট্রবিরোধী উক্তি করেন। ঢাকায় ফিরে এসে তিনি উপলব্ধি করলেন যে তার ঐ-সব উক্তিতে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং তিনি আরও জানতে পারলেন যে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার তার ঐসব উক্তির জন্য তার বিরুদ্ধে বিরূপ ভাবাপন্ন হয়েছে। নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে তিনি তাড়াতাড়ি তার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতির পরামর্শক্রমে স্থিরিকৃত হল যে একুশ দফাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য যুক্তফ্রন্টের ঐক্য আটুট রেখে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ শাহীর মোকাবিলা করতে হবে। কাজেই হক সাহেবের মন্ত্রিসভায় যোগদান করা আওয়ামী লীগের উচিত। এই কারণেই, আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছিল। কিন্তু গণদাবীর দুষমন প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ দল তাদের নির্বাচনী চরম পরাজয়ের গ্লানিকে দূরিভূত করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অপসারণ করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল। এবং আওয়ামী লীগ হক সাহেবের মন্ত্রিসভায় যোগদানের পনের দিনের মধ্যেই আদমজীর শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও হক সাহেবের কলিকাতার উক্তি সমূহকে কারণ স্বরূপ দাঁড় করিয়ে পূর্ব বঙ্গ

www.pathagar.com

মন্ত্রীসভা বাতিল করে ও প্রদেশ ৯২-ক জারী করে পূর্ব বাংলার সাড়ে চার কোটি নর নারীর বিজয়কে নস্যাৎ করে দিল।

৯২(ক) ধারার ফল

সব চাইতে বেশী মূল্য দিতে হল আওয়ামী লীগকে। আওয়ামী লীগের প্রায় বারশত কর্ম্মী ও নেতা এবং প্রায় তিরিশ জন পরিষদ সদস্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল। আপনাদের সাধারণ সম্পাদককে বন্দী করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হল এবং ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখে সংঘটিত এক ঘটনাকে অবলম্বন করে তার বিরুদ্ধে দাঙ্গার ও ডাকাতীর অভিযোগে এক মিথ্যা মামলা রুজু করা হল। শত শত কর্ম্মীর বিরুদ্ধে জারী হল গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং যাদেরকে গ্রেফতার করা গেল না তাদের সম্পত্তি বাড়ি ঘর বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হ'ল। আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি জনাব ভাসানী এই সময় শান্তি সফর উপলক্ষে লন্ডনে অবস্থান করছিলেন তাকে পাকিস্তানে প্রবেশাধিকার হতে বঞ্চিত করা হল। আমাদের অন্যমত নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দী বিগত নির্বাচনে অহঃরাত্র অনিদ্রা ও অনাহারে থেকে সারা পূর্ববঙ্গ ব্যাপী নির্বাচনী প্রচার কার্য্য চালানোর ফলে দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাপলক্ষে তখন জুরিখে মুমূর্ষু অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন। মজলুম জনগণের ঐক্য জোটের প্রতীক আওয়ামী লীগের যখন এইরূপ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা তখন আমাদের শ্রদ্ধেয় সহ সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খানই ৯২-ক ধারা জারীর বিরুদ্ধে, বেপরোয়া গ্রেফতারের বিরুদ্ধে এবং তদানীন্তন মুসলিম লীগ জুলুমশাহীর বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ তুলে বিপদনোন্মুখ জনগণের মনে সাহস সঞ্চার করেছিলেন। তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ সাড়ে চার কোটি নরনারীকে কুচক্রী মুসলিম লীগ সরকারের উস্কানীতে প্ররোচিত না হবার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। এই সময়ে জনতা জনাব হকের নেতৃত্বের অপেক্ষা করছিল, পূর্ববাংলার আইন পরিষদের দু'শ সাঁইত্রিশটি মুসলিম সদস্যের মধ্যে ২২২ জন সদস্যই যখন তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিল, শ্রদ্ধেয় মজলুম জননেতা ও আমাদের অন্যতম নেতা দূর দেশে বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় থেকেও তার প্রতি যখন শুভেচ্ছা জানিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, ধৈর্য্যধারণ করে ও বজ্রকঠিন শপথ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকলে ভবিষ্যত জয় যার করায়ত্ব ছিল; তিনি সব কিছু ভূলে [ভুলে] গিয়ে মিঃ মোহাম্মদ আলীর প্রেরিত দূতের মারফতে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ব্যাক্তি স্বার্থপরতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, যে মিঃ মোহাম্মদ আলী পূর্ব বাংলার জনগণের ঐতিহাসিক বিজয়কে নস্যাৎ করেছে, জনগণের একুশ দফা দাবী পূরণে ওয়াদাবদ্ধ জনপ্রিয় সরকারকে অপসারিত করেছে, পনের শ কর্ম্মী ও প্রায় চল্লিশ জনের মত পরিষদ সদস্যকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, মজলুম জনগণের নেতা মাওলানা ভাসানীকে দেশে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির তদানীন্তন নেতা জনাব হককে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা করেছে, আদমজী মিলের দাঙ্গা ঘটানোর মিথ্যে দুর্নাম পূর্ব বাঙ্গলার জনগণ ও জন প্রিয় সরকারের উপর চাপিয়েছে সেই মিঃ মোহাম্মদ আলীর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে পূর্ববাংলার জনগণের ললাটে কলঙ্ক লেপন করে রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করলেন।

www.pathagar.com

১৯৫৪ সনের বন্যা

দেশ যখন এইরূপ রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ে বিধ্বস্ত তখন আর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল। সর্বগ্রাসী বন্যার তান্ডব লীলায় প্রায় সারা পূর্ববাংলা ধ্বংসোন্মুখ। এই সময় আমাদের সহসভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান জনসাধরণকে সাহায্য দেওয়ার জন্য সরকারকে ও দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে আকুল আবেদন জানান। কিন্তু জনাব হক সেই সময় রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করলেও একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবেও বন্যাপীড়িত জনসাধারণকে সাহায্য দানের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে পারতেন। কিন্তু জনগণের এই চরম বিপদের দিনে জনাব হকের নীরব ভূমিকা সত্যিই বেদনা দায়ক। যে জনাব হক বন্যার মাত্র কয়েক মাস পূর্বে জনগণকে সেবার প্রতিশ্রুত [প্রতিশ্রুতি] দিয়ে জনগণের ভোট সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি সামান্য ৯২-ক ধারার এক ধাক্কায় সেই দুঃস্থ জনতার কথা ভুলে গিয়ে "আত্মজীবণী" লেখায় ব্যাপৃত হলেন বলে জানা গেল এটা বড়ই মর্মান্তিক।

প্রাক্তন গণ-পরিষদ বাতিল

বন্ধুগণ! এর পরই মুসলিম লীগ অধ্যুষিত আট বৎসর কাল দীর্ঘস্থায়ী প্রাক্তন গণপরিষদ যার সদস্যরা আট বৎসরের মধ্যে জনগণকে একটি গঠনতন্ত্র রচনা করে দিতে পারে নি, যার সদস্যরা শুধু ক্ষমতা দ্বন্দ্বে ও আত্ম কলহে লিপ্ত ছিল, যাদের আমলে স্বজনপ্রীতি, দুর্ণিতী [দুর্নীতি] সমাজের প্রতিস্তরে ঢুকে পড়েছিল, যাদের বন্ধা নীতির [বন্ধ্যা নীতির] ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্য্যস্ত হয়েছিল, যাদের জন্য পাকিস্তান থেকে গণতন্ত্র উৎখাত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং যে-জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ গণপরিষদের সদস্যদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল ও যে কারণে গণ পরিষদ বাতিলের দাবী পূর্ববাংলার তথা পাকিস্তানের প্রত্যকটি গণতন্ত্রকামীর কাম্য হয়ে উঠেছিল সেই গণপরিষদ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হঠাৎ একদিন বাতিল বলে ঘোষণা করলেন। অগণতান্ত্রিক পন্থায় গণপরিষদকে বাতিল করা হলেও যেহেতু উহা জনগণের কাম্য ছিল কাজেই গভর্ণর জেনারেলের এই ঘোষণাকে অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু পূর্ববাঙ্গলায় ৯২-ক ধারার শাসন চলতে থাকায় ও গণপরিষদ বাতিল করার ফলে দেশ এক শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলো। প্রত্যেকটি গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক কর্ম্মী ও নেতা এইরূপ একটি রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করতে লাগলো। এই সময় পাকিস্তানের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা ছিল– একটি মিলিটারী শাসন ও অপরটি গণতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। এমনি সময় আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী রোগমুক্তির পর দেশে ফিরে এলন। তিনি পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ণর জেনারেল দেশের শাসনকার্য্যে তার সক্রিয় সহায়তা দাবী করলেন। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী যখন দেখলেন যে, দেশ এক শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে, পূর্ববাংলায় ৯২ক ধারা চালু হওয়ার জন্য রাজনৈতিক কর্ম্ম তৎপরতা প্রায় বন্ধ, শত শত দেশ প্রেমিক ও রাজনৈতিক কর্ম্মী কারাগারে কালাতিপাত করছে, আওয়ামী লীগের সভাপতি দেশে প্রত্যাবর্তন করবার

www.pathagar.com

অধিকার থেকে বঞ্চিত, গনপরিষদ বাতিলের ফলে গবর্ণর জেনারেলের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত হচ্ছে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে হতাশার ভাব পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান, তখন তিনি দেশকে গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের ব্যাক্তিগত মান সম্ভ্রমের দিক না তাকিয়ে গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে সহযোগীতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি আরও ভাবলেন, দেশে যদি একবার মিলিটারী শাসন কায়েম হয়, তা হলে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন অনেক পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু এই সময় গভর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ আলী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন যে হয়ত বা তার প্রধানমন্ত্রীত্বের গদি হারাতে হতে পারে এবং তদস্থলে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন। কাজেই তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন এবং তিনি জনাব হককে **হয়ে মিঃ আলীর সাথে গোপন পরামর্শে লিপ্ত হলেন। যে মুহূর্তে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী পূর্ব পাকিস্তানের দাবীর স্বীকৃতির ভিত্তিতে গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে শাসন কার্য্যে সহযোগীতার কথা পরামর্শ করছিলেন সেই মুহূর্তে জনাব হক গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মিঃ মোহাম্মদ আলীর প্রতি যে তার পূর্ণ আস্থা আছে একথা তাঁকে জানালেন। ফলে পূর্ববাংলার দাবী দাওয়া আদায় করে গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে শাসনকার্য্যে সহযোগীতা করার যে পরিবেশ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী সৃষ্টি করেছিলেন জনাব হকের বিভেদমূলক আচরণের ফলে তা নষ্ট হয়ে গেল। তবুও শুধু গণতন্ত্রের খাতিরে ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং দেশে রাজনৈতিক অচবলাবস্থার নিরসনকল্পে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদান করলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থা না জানা থাকার ফলে এবং হক সমর্থক পূর্ববাংলার দৈনিকটির মিথ্যা প্রচারণায় কিছু কিছু লোক জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর এই কার্য্যকে ভুল পদক্ষেপ বলে মনে করলেন। জনাব হকের বিভেদ মূলক আচরণের পুরস্কার স্বরূপ মিঃ মোহাম্মদ আলী জনাব হককে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিনিধিরূপে মিঃ আবু হোসেন সরকারকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করলেন। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদান করার ফলে তারই প্রচেষ্টায় জনাব ভাসানীকে দেশে ফিরে আসতে দেওয়ার অনুমতি দিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হ'ল। ধীরে ধীরে রাজনৈতিক বন্দীরাও মুক্ত হতে লাগলো এবং দেশের হতাশাগ্রস্ত জনতার মধ্যে আবার আশার সঞ্চার হলো।

জনাব হকের উপর অনাস্থা

ভাই সব! জনাব হকের পর পর এতগুলি অপকর্মের পর একুশ দফা ওয়াদা খেলাফ করার পর ও মুসলিম লীগের সঙ্গে গোপন আঁতাত করার পর এবং বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির সভা আহ্বান না করায় যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির বহু সদস্য উক্ত পার্টির সভা আহ্বানের জন্য রিকুইজিশান দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। জনাব হক এই খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির এক সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় আলোচিত হওয়ার জন্য আপনাদের সাধারণ সম্পাদক জনাব হকের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবের এক নোটিশ দেন। আপনাদের ওয়ার্কিং কমিটি এই অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আওয়ামী লীগ দলভুক্ত প্রত্যেকটি পরিষদ

www.pathagar.com

সদস্যকে এই অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য আদেশ জারী করে এবং অন্যান্য দলভুক্ত পরিষদ সদস্যদের প্রতিও উক্ত মর্মে এক আবেদন জানায়। জনাব হকের মুসিবতের খবর পেয়ে তার গুপ্ত আঁতাতের নূতন বন্ধু পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলী হককে রক্ষা করবার জন্য পূর্ববাংলায় আগমন করেন। পার্লামেন্টারী পার্টির সভার নির্দিষ্ট দিনে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচিত হয় ও গৃহীত হয়। জনাব হকের স্থলে আপনাদের সহ সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান নেতা নির্বাচিত হন। কিন্তু মিঃ মোহাম্মদ আলী বহু পরিষদ সদস্যকে গোপনে ডেকে এই লোভ দেখান যে যদি তারা জনাব হককে সমর্থন করেন তবে পূর্ব বাংলায় পুনরায় পার্লামেন্টারী সরকার কায়েম করা হবে নচেৎ ৯২-ক ধারা বলবৎ থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে জনাব হক ও তার সাঙ্গ পাঙ্গরা অনেককে মন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রীর লোভ দেখাতে থাকেন ফলে অনেক পরিষদ সদস্য সভায় অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করা সত্ত্বেও জনাব হকের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে বিবৃতি দেন। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের আওয়ামী লীগ দলভুক্ত একশত উনত্রিশ জন পরিষদ সদস্যের মধ্যে পচানব্বই জন বাদে বাকী সমস্তই জনাব হক ও মিঃ আলীর ভাঁওতায় জনাব হককে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কয়েক ব্যক্তি এ-সব কুচক্রীদেরকে ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ নামার বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্রতিষ্ঠান হতে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয় এবং আওয়ামী লীগ পরিষদ সদস্যদিগকে আইন পরিষদে বিরোধী দলে আসন গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেন কারণ লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট লীগের অনুকূল যুক্তফ্রন্টে ইতিমধ্যেই পরিণত হয়েছিল।

কনভেনশন

এর পর বাতিল গণপরিষদের স্থানে শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন গঠনের প্রস্তাব নিয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী পূর্ববাংলায় আগমন করেন। বন্ধুগণ! কনভেনশন সম্বন্ধে বহু মিথ্যা প্রচার আমাদের বিরুদ্ধে হয়েছে এবং তার ফলে জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টিও হয়েছিল এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কাজেই জনগণের ভুল নিরসনের জন্য এ সম্বন্ধে আমাকে দু'একটা কথা বলতেই হবে। কনভেনশন ও গণপরিষদের ভিতর পার্থক্য এই ছিল যে, কনভেনশনের সদস্যদের শুধু একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল এবং উহা আইন পরিষদ রূপে কাজ করবার অধিকারী ছিল না। ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যদিগকে বাধ্যগত ভাবে কনভেনশনের সদস্য-নির্বাচিত না হলেও চলত। এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা কনভেনশনের নিকট দায়ী থাকত না। সেই হেতু ইহার একটি বিশেষ উপকারীতা ছিল যে কনভেনশনের সদস্যদের ক্ষমতাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এবং তারা দ্রুত একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে আত্ম নিয়োগ করতে পারত। ক্ষমতাশীন মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রভাব ইহার উপর থাকত না বলেই ইহার দ্বারা একটি সুষ্ঠু গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অপর পক্ষে গণপরিষদের দুইটি ক্ষমতা আছে যথা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও কেন্দ্রীয় আইন সভা হিসেবে কাজ করা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য দিগকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গণ পরিষদের সদস্য হতেই হবে এবং কেন্দ্রীয়মন্ত্রিসভা ইজার নিকট দায়ী থাকবে সেইহেতু এর একটি অসুবিধাও আছে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রিসভার প্রভাব এর ওপর পুরাপুরি খাটানো চলে

www.pathagar.com

এবং এর সদস্যগণ গঠনতন্ত্র প্রণয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে ক্ষমতা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে এবং একটি সুষ্ঠু গঠনতন্ত্রের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রভাবিত একটি গঠনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণ এড়াতেই জনাব সোহরাওয়ার্দী কনভেনশন গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। কনভেনশনের প্রস্তাবে উপরোক্ত সুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও আপনাদের ওয়ার্কিং কমিটি অনভেনশনের [কনভেশন] প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং পরবর্তী সময়ে যখন কনভেনশনের পরিবর্তে গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয় তখনই কেবলমাত্র উহা গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে সংখ্যা সাম্যের কথা না তুললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বন্ধুগণ। এ কথা আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে বিগত আট বছরে মুসলিম লীগ কুশাসনের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এত ভুল বুঝাবুঝির ও পারস্পরিক বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে যে, সংখ্যাসাম্য গ্রহণ করা ব্যতীত উভয় পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব ও ঐক্য গড়ে তোলা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কাজেই দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্যই আপনাদের ওয়ার্কিং কমিটি সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে আমরা শুধু কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ব্যাপারেই এই সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নেইনি, আমরা ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প চাকুরী অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে উভয় পাকিস্তানের সংখ্যা সাম্য নীতি মেনে নিয়েছি এবং উহা আদায়ের জন্য জীবন পণ চেষ্টার ত্রুটি করব না। কিন্তু জনাব হক ও তার দল এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য সস্তা বুলি আওড়িয়ে লোকচক্ষে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে হেয় প্রতিপন্ন করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজ তিনি এবং তার দল উহা মেনে নিয়েই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আসন গ্রহণ করেছেন।

নূতন গণপরিষদ গঠন

বন্ধুগণ! নূতন গণপরিষদ গঠনের ও উহার নির্বাচনের তারিখ ধার্য্য করে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল যখন চিকিৎসার জন্য জুরিখ চলে গেলেন সেই অবকাশে সুযোগ বুঝে মিঃ মোহাম্মদ আলী ভবিষ্যৎ প্রধামন্ত্রী হবার পথ সুগম করবার জন্য নূতন গণপরিষদে তাহার সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জনাব হকের মনোনীত মিঃ আবু হোসেন সরকারকে রাতারাতি পূর্ববাংলায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে পূর্ববঙ্গ থেকে ৯২-ক ধারার অবসান করেন, এবং করাচী যেয়ে আস্ফালন করে বলেন যে এবং আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের সভাপতি, সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের ধারক ও বাহক মিঃ মোহাম্মদ আলী একথা ভাবতেও পারেন নি যে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ একটি সুসংহত দল এবং উহা মন্ত্রীত্ব শিকারী বা ক্ষামতালোভীদের আড্ডা নয়। কাজেই তার আস্ফালন ও গর্ব ধূলিসাৎ করে দিয়ে আপনাদের আওয়ামী লীগের ৯৫ জন পরিষদ সদস্য একথা গণপরিষদ নির্বাচনে ও পূর্ববঙ্গ পরিষদের স্পিকার নির্বাচনে প্রমাণ করে দিয়েছে যে আওয়ামী লীগ একটি জনগণের প্রতিষ্ঠান এবং ইহা গণদাবী প্রতিভূ হিসেবে সমস্ত লোভ মোহ জয় করে যে কোন গণবিরোধী শক্তির মোবাবিলা করতে সাহস ও শক্তি রাখে। যাহা হউক অগণতান্ত্রিক পন্থায় আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভাকে প্রতিষ্ঠিত করলেও ৯২-ক

www.pathagar.com

ধারার অবসানকে আমরা মোবারকবাদ জানিয়েছিলাম এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে পল্টন ময়দানের জনসভায় পূর্ববঙ্গের সরকার– মন্ত্রীসভা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের স্পষ্ট নীতি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, জাতীয় প্রগতি ও বিকাশের স্বার্থে জাতির মুক্তি সনদ একুশ দফার বাস্তব রূপায়ণ অপরিহার্য্য। সরকার–মন্ত্রিসভা যতক্ষণ একুশ দফার এক দফাও কার্য্যকরী করতে চান ততক্ষণ আওয়ামী লীগ তার পক্ষে আছে। কিন্তু বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ একশ দফার প্রতিটি দফার বাস্তব রূপায়ণের দাবীতে জনসাধারণকে সংগঠিত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

কেন্দ্রে লীগ যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন গঠন

ভাইসব! নতুন গণপরিষদ গঠনের পর দেখা গেল যে পাকিস্তানে কোন মন্ত্রিসভা গঠন করতে হলে উহা কোয়ালিশনের ভিত্তিতে গঠন করা ছাড়া একদলীয় সরকার গঠন কোন দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ বা যুক্তফ্রন্ট গণপরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে স্থায়ী মন্ত্রিত্ব গঠন করতে পারে না। গণ পরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যগণ এক বৈঠকে মিলিত হয়ে মিঃ চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে উক্ত পার্টির নূতন নেতা নির্বাচিত করলো। ফলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ আলীর পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হবার পথ চিররুদ্ধ হল। গণপরিষদে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ-আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর সাথে আলোচনা শুরু করল। আওয়ামী লীগ পাঁচ দফা দাবীর স্বীকৃতির ভিত্তিতে উক্ত কোয়ালিশন গঠনে সম্মত ছিল। উক্ত দফাগুলো হচ্ছে।

(১) রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদ দুটি সর্ব সময়েই পাকিস্তানের উভয় অংশকে ভাগ করে দিতে হবে।

(২) পাকিস্তানের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে চলতে হবে।

(৩) মাত্র তিনটি বিষয় বাদে পাকিস্তানের উভয় অংশকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

(৪) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।

(৫) পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু করতে হবে।

এইসব গণদাবীর ভিত্তিতে যখন জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা চলছিল তখন হক ও তার সাঙ্গ পাঙ্গরা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী করতে ব্যর্থ মনোরথ হওয়ায় নিরাশ হৃদয়ে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের নিকট বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল ও গণ পরিষদে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা মিঃ চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে বিনাশর্তে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করতে রাজী হল। এই অবস্থায় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করে যুক্তফ্রন্ট দলের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনের আলাপ আলোচনা শুরু কর। পূর্ব বাংলার গণদাবী ধুলিসাৎ হতেছে দেখে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে আপনাদের সাধারণ সম্পাদক ও আরও অনেকে জনাব হকের নিকট এই

www.pathagar.com

প্রস্তাব পাঠালেন যে জনাব হক স্বয়ং যদি প্রধান মন্ত্রীত্বের প্রার্থী হন তাতে আওয়ামী লীগের গণপরিষদে তেরজন সদস্য জনাব হককে অকুণ্ঠ সমর্থন দেবেন। কারণ গবর্ণর জেনারেল যখন পশ্চিম পাকিস্তান হতে মনোনীত হয়েছেন তখন কিছুতেই প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ পূর্ব পাকিস্তানে না নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে দেওয়া ঠিক হবে না এবং উহাতে সংখ্যা সাম্যনীতিরও ব্যতিক্রম ঘটবে। জনাব সোহরাওয়ার্দীও অনুরোধ করে পাঠালেন যে জনাব হক বিনা শর্তে আত্ম সমর্পণ না করে নিজের দল ও আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে একটু দৃঢ় মনোভাব পোষণ করলেই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ পূর্ববাংলার দাবী দাওয়া মেনে নিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু জনাব হক এ কথায় কর্ণপাত না-করে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বেই লীগ-যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করে নিজে স্বরাষ্ট্র সচিবের পদ অলংকৃত করেন এবং এইরূপে পূর্ব বাংলার দাবী দাওয়ার মূলে কুঠারাঘাত করেন।

এই অশুভ আঁতাতের ফলে গণপরিষদে আওয়ামী লীগের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও, যে ৯২-ক ধারার বলে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ শাহী তাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিল সেই ৯২-ক ধারা নতুন নামে ৯৩ ধারা হিসেবে পুনরায় দেশের শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট হল। ২৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে যে করাচীকে কেন্দ্রীয় রাজধানী রূপে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং যে টাকার বেশীর ভাগ পূর্ববঙ্গ বাসীদেরকে দিতে হয়েছিল সেই শিল্পায়িত করাচী শহরকে পূর্ববাংলার অধিকার হতে বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ বলে ঘোষণা করা হ'ল; পশ্চিম পাকিস্তানে সমস্ত প্রদেশগুলোকে একত্রীভূত করে জনগণের মতামতের মূল্য না দিয়ে এক কলমের খোঁচায় বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্রের শাসনকে অব্যাহত রাখার জন্য এক ইউনিটে রূপান্তরিত করা হল; ঘৃণিত সীমান্ত রেগুলেশন এ্যাক্ট, বেঙ্গল রেগুলেশন এ্যাক্ট (১৯১৮) প্রভৃতি নিরাপত্তা আইন পাশ হল এবং বর্তমানে শাসকচক্রের তোগলকী মনোভাবের দরুন করাচী হ'তে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজধানী গাদাপে স্থানান্তরিত করার এক ষড়যন্ত্র চলছে। জানিনা এই অশুভ আঁতাতের ফলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্রে জনতার গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার সমূহ রক্ষিত হবে কি-না, অনাগত ভবিষ্যৎই এর সাক্ষ্য দেবে।

প্রতিষ্ঠানকে অসাম্প্রদায়িককরণ প্রসঙ্গ

বন্ধুগণ! একথা অনস্বীকার্য্য যে, যে সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয় তখনকার বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সংগঠনকে একটি "সাম্প্রদায়িক" প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হয়েছিল। মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের ধর্ম্মানুরাগের সুযোগে ইসলামকে হাতিয়ার করেই তার শাসন অব্যাহত রেখেছিল। জনগণও তখন লীগ সরকারের বিভ্রান্তি হতে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে সক্ষম হয়নি। এ অবস্থায় আমাদের সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক করা সম্ভব হলেও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবের মোকাবিলা করার কাজে তা ব্যর্থ হত। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আজ অবসান ঘটেছে। ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল পাকিস্তান বাসীর নিজস্ব রাজনৈতিক ঐক্য জোট হিসেবে গণ আন্দোলনে নেতৃত্ব

www.pathagar.com

করার মহান দায়িত্ব আজ আওয়ামী লীগ গ্রহণ করতে পারে এবং কায়েদে আযমের অমর বাণী "রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলিম আর মুসলিম থাকবে না এবং সবাই মিলে পাকিস্তানী জাতি হিসেবে পরিচিত হবে" ইহা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে একমাত্র আওয়ামী লীগ। আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে এ-কথা ঘোষণা করতে পারি যে, দেশের সকল ধর্ম্মের সকল বর্ণের এবং সকল ভাষাভাষী মানুষকে একটি গণপ্রতিষ্ঠানে সমবেত করার প্রয়োজন। বস্তুত, আওয়ামী লীগ দলকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য অবারিত করার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের প্রগতিশীল ভূমিকাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হব। অদ্যকার অধিবেশনে এই বিষয়টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

বন্ধুগণ! দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মোটামুটি একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এই বার বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার একটি চিত্র আমাদের সম্মুখে থাকা দরকার।

ভূমি ব্যবস্থা

বাস্তবিক পক্ষে বিগত ৮ বৎসরের মুসলিম লীগ শাসন জনসাধারণের আর্থিক জীবনে যে ভয়াবহ বিপর্য্যয় এনেছিল আজ পর্য্যন্ত সেই দুর্গতি, সেই নিপীড়ন অব্যাহত আছে। মুসলিম লীগ শাসনের জগদ্দল পাথরকে অপসারিত করে দেশবাসী আর্থিক উন্নয়নের যে স্বপ্ন রচনা করেছিল তাহা আজও সফল হয়নি। সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থাই পূর্ববঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের মূল প্রতিবন্ধক। বিনা খেসারত [খেসারত] জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন ও কৃষককে জমির মালিকানা স্বত্ব দান করাই সামন্তবাদী শোষণ অবসানের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু জনগণের দীর্ঘ দিনের আন্দোলনকে বানচালের জন্য এই ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী প্রথাকে নতুন ধাঁচে ঢালাই করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববঙ্গ ভূমি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনের জন্ম দেয়। ইহার ফলে কৃষক জমির মালিক হওয়ার পরিবর্তে সরকার জমির মালিক সেজেছেন এবং জমিদারের বদলে সরকার হয়েছে খাজনা আদায়কারী কর্তৃপক্ষ। সার্টিফিকেট প্রথার দ্বারা সরকার সূর্য্যাস্ত আইনের ন্যায় গরীব কৃষকদের বকেয়া খাজনা জোর জবরদস্তি করে আদায় করার নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে কৃষকের ঘর বাড়ী জোত জমি নিলামে উঠেছে। আর সেই অর্থে জমিদার পরগাছাদের ক্ষর খেসারত দিবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে বিনা খেসারতে শ বিলুপ্ত না করলে কৃষকের কোনই উন্নতি হবে না।

দেশি আধিপত্য আজও বিদ্যমান। গরীব চাষীরা পাটের সর্ব নিম্ন বর্তমান সরকার টাকার দাম কমিয়ে পাটের দাম বৃদ্ধির যে আশা র্থ হয়েছে। মোটকথা পাট শিল্পকে জাতিয়করণ [জাতীয়করণ] না ট রাষ্ট্রের সহিত সমপর্য্যায়ের ভিত্তিতে বাণিজ্য না করিলে পাট শিল্পের । এই জন্যেই যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচীতে পাট জাতীয়করণ দেওয়া হয়েছিল। মোটকথা বৈদেশিক বাণিজ্য একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ত্বের ফলে একদিকে যেমন বহুল পরিমাণে অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে, তেমনি

www.pathagar.com

পাট চাষীরা ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হতেছে, এবং পাটশিল্প হতে প্রাপ্ত আমাদের রাজস্বের হারও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতেছে।

শিল্পনীতি

দেশিয় শিল্পপতিগণ আজ এক বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন। একদিকে বিদেশিদের সহিত প্রতিযোগিতায় মারখেয়ে তারা পঙ্গু, আবার অন্যদিকে দেশের বাজারে অধিকাংশ ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যের কেনা বেচা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। দেশের প্রধান ক্রেতা কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী চরম আর্থিক সঙ্কটে বিপর্য্যস্ত, হাজার হাজার বেকার এই সঙ্কটকে আরও বৃদ্ধি করে চলেছে। দেশের শিল্পবাণিজ্য বিকাশের অভাবে এই সমস্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। সরকারের বন্ধ্যা শিল্পনীতি এই সমস্যা প্রতিরোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

শ্রমনীতি

যে সকল শিল্প পরিকল্পনা বর্তমানে হতেছে তাহাও কতিপয় ভাগ্যবান শিল্পপতিদের উদ্যোগে। ইহারা শ্রমিকের শ্রমমূল্য কমিয়ে এবং নির্মম শোষণ দ্বারা কোটি কোটি টাকা মোনাফা করছে অথচ শ্রমিকগণ তাদের নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যই বাজারে যেয়ে কিনিতে অপারগ হতেছে। শ্রমিক কর্মচারীরা স্ত্রী পুত্র কন্যা লয়ে বাঁচিবার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে এবং শোষণের যাঁতা কলে পিষ্ট হয়ে হতাশা গ্রস্থ ও নিজ কর্মে নিরুৎসাহ বোধ করছে।

সাংস্কৃতিক

জনগণের সাংস্কৃতিক মানের দিন দিন অবনতি ঘটছে। বিদেশি পুস্তিকাগুলি আমাদের দেশের সরলমতি যুবক যুবতীদের মন বিষাক্ত ও বিকৃত করছে। বিদেশ হতে আমদানীকৃত পুস্তিকা, ম্যাগাজীন, ছবি ইত্যাদি শুধু মাত্র যুদ্ধবাদী ও যৌনবিকৃতি মূলক চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। একটি সুস্থ্য সাংস্কৃতিক আবহাওয়া গড়িয়া তোলার ব্যাপারে সরকারের কোনই উদ্যোগ নেই।

শিক্ষানীতি

শিক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা কর্মসূচীতে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। আজ মাতৃ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন হয়নি, কচি ছেলে মেয়েদের স্কন্ধে ৩ চারিটি বিদেশি ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে চেপে রয়েছে। স্কুল কলেজের প্রচেষ্টাই নেই।

ছাত্রদের বেতন হ্রাস ও আবাস স্থলের ব্যবস্থা করার কোনই ইঙ্গ যাইতেছে না।

স্বাস্থ্য সমস্যা

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া পূর্ববঙ্গ সাংঘাতিকভাবে দুর্বল। গরীব জনসাধারণের বে খাদ্য না পেয়ে এবং অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় বাস করে শুধু মাত্র কলেরা ম প্রতি বৎসর হাজার হাজার নর নারী অকালে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়।

www.pathagar.com

বন্যা সমস্যা

বিগত দুই বৎসর দেশব্যাপী সর্বগ্রাসী বন্যা জনসাধারণের শান্তির নীড়কে চুরমার করিয়া দিয়াছে। বন্যার পরে আবার মহামারী। খাদ্য নাই বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজিবার স্থান নাই তবুও সরকার নির্বাক। এই সভ্যযুগে বন্যার হাত হতে রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়না ইহা শিশুও বিশ্বাস করবে না। আমরা পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, ভারতের সহিত সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা দ্বারা বন্যার হাত হতে দেশকে রক্ষা করা হউক। সে ব্যাপারে সরকার কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তাহা আপনারাও জানেন।

মৌলিক অধিকার

স্বায়ত্ত সাশন [শাসন] ও মাতৃভাষার অধিকার আজও পূর্ববঙ্গ বাসী পায় নাই। লীগ-যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকার এখনও জনসাধারণকে কোন রাজনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করিতে পারেনি। প্রদেশের মন্ত্রীসভা প্রদেশের সকল রাজনৈতিক নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন। আমরা সরকারের এই কাজকে অভিনন্দন জানাই। কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ যে সকল দেশ প্রেমিক কারা প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ছিল তাহাদের মুক্ত করার ওয়াদা দিয়াই যুক্তফ্রন্ট জনগণের ভোট নিয়াছে। অনেক গড়িমসি সত্ত্বেও সরকার রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়া জনগণের দীর্ঘ দিনের দাবীকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল ভিত্তি মতামত নির্বিশেষে সংগঠনের মতবাদ প্রচারের এবং সংবাদ পত্রের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ণ গ্যারান্টি আজ পর্যন্ত জনগণ পায় নাই। একুশ দফা কর্মসূচীর ১৪তম দফার মাত্র একটি অংশ রাজবন্দীদের মুক্ত করা। সুতরাং অবিলম্বে ১৪তম দফার অন্যান্য অংশগুলিকেও কার্যকরী করা হউক। আজ পর্যন্ত প্রায় অর্দ্ধশত সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দী রহিয়াছেন। তাহাদের মুক্ত করা যুক্তফ্রন্ট সরকারের অবশ্য কর্তব্য। যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা দীর্ঘদিন পর কারামুক্তি পেলেন তাহাদের পূনর্বাশনের [পুনর্বাসনের] সুব্যবস্থা করার নৈতিক দায়িত্ব সরকারেরই।

বৈদেশিক নীতি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ সরকারের দেউলিয়া নীতি আজও অনুসৃত হতেছে। বৈদেশিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দ্বিমুখী নীতি আমাদের মাতৃভূমিকে বিষাদের মুখে ঠেলে দিতেছে। সমাজ ব্যবস্থা নির্বিশেষে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সহিত সহ অবস্থান নীতিই পাকিস্তানের প্রগতি ও সমৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। আওয়ামী মুসলিম লীগ পাকিস্তানের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে আজ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বিশ্ব শান্তির আওয়াজ তুলবে।

আওয়ামী লীগ মহান দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন। জনসাধারণ আওয়ামী লীগের স্কন্ধে যে পবিত্র দায়িত্বভার অর্পণ করেছে আমরা অটল প্রত্যয় লইয়া তাহা পালন করিব।

সাংগঠনিক তৎপরতা

এই মহান সংকল্পকে বাস্তবায়িত করার একমাত্র হাতিয়ার হল সংগঠন। যে পরিমাণ সংগঠন এই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য দরকার তাহা আজও আমরা

www.pathagar.com

অর্জন করি নাই। একথা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই যে, আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আমাদের উপর বার বার হামলা চালিয়া যেতে সমর্থ হতেছে। কর্মীদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সংগঠনের শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধিই আমাদের পরিপূর্ণ সাফল্যের পথে আগাইয়া লইয়া যাইবে। অতীতে এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, কতিপয় সুবিধাবাদী ব্যক্তি আমাদের সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনুরূপ দুর্বলতা অভূতপূর্ব না হলেও সংগঠনের পক্ষে মারাত্মক। তাই আওয়ামী লীগকে দৃঢ় সংগঠনের উপর দাঁড় করিয়ে একটি সত্যিকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কাজকেই বর্তমানে আমরা প্রধানতম কর্তব্য বলে মনে করি। বিগত দুই মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের কর্মীরা অশেষ পরিশ্রম দ্বারা প্রদেশের সর্বস্থানে সাংগঠনিক কাজে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছে। ইতিমধ্যেই প্রদেশের সকল জেলার এবং শতকরা ২৫ ভাগ ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ সংগঠন হয়েছে। ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে আমরা প্রদেশের সকল ইউনিয়নে এমনকি সকল গ্রামেই আওয়ামী লীগের জান্ডা উড়াতে সক্ষম হব। এই মহান কাজে আপনারা সর্বশক্তি নিয়োগ করুন এবং দেশের প্রতিটি দেশ প্রেমিক কর্মীকে আমাদের ত্যাগ ও কর্মক্ষমতা দিয়ে আকৃষ্ট করে তুলুন।

বন্ধুগণ! আমার রিপোর্ট সমাপ্ত করার পূর্বে আমি আমার দেশবাসীর নিকট আবার আহ্বান জানাইতেছি। পূর্ববাংলার জনতার অটুট ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং দেশে সত্যিকার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আজ আপনারা দলে দলে আওয়ামী লীগে যোগদান করে জতির মুক্তির পথকে প্রশস্ত করুন। আওয়ামী লীগের পতাকা তলে পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর ও সকল ধর্মের জনতার মহান সমাবেশই আমাদের পবিত্র কর্মসূচীকে ও ওয়াদাকে বাস্তবে রূপদান করবার একমাত্র উপায়। দেশবাসীর হিম্মতের উপর, তাদের সততা ও সদিচ্ছার উপর অবিচল আস্থা রেখে আমরা আমাদের লক্ষ্য স্থলে পৌছাতে পারবো। আসুন আজ আমরা এই শপথ ও এই প্রত্যয় লয়ে আমাদের অধিবেশনের কাজ শুরু করি। বন্ধুগণ আপনারা দীর্ঘ সময় যাবত ধৈর্য্যধারণ করে আমার বক্তব্য শ্রবণ করবার জন্য আমি আবার আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আসন গ্রহণ করছি। খোদা হাফেজ।

পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের বার্ষিক
আয়-ব্যয়ের হিসাব

আয়	ব্যয়
১৯৫৩ সালের জুলাই হইতে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এককালীন দান ও চাঁদা বাবদ মোট আদায় = ১৪২৪৯।।০	১৯৫৩ সালের জুলাই হইতে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সভা, সফর, প্রচার, অফিস খরচ, কর্মচারীর বেতন বেতন ও বিবিধ খরচ বাবদ মোট ব্যয় = ১৫০১৪।৯ পাই

www.pathagar.com

অতএব : ১৫০১৪ ।৯ পাই ব্যয়
১৪২৪৯ । । পাই আয়
৭৬৪৯ ।৯ পাই ঘাটতি

সূত্র : প্রকাশক, অলি আহাদ, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, ৫৬, সিমসন রোড (সদরঘাট), ঢাকা
প্যারামাউন্ট প্রেস লিমিটেড, ১ নং হাটখোলা রোড, ঢাকা

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : চার

আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর জেনারেল সেক্রেটারির রিপোর্ট, ১৯৫৭

১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের কাগমারি বিশেষ সম্মেলনের ৪ মাস পর পুরান ঢাকার সাবিস্তান সিনেমা হলে ১৩ ও ১৪ই জুন দুইদিনব্যাপী দলের নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরের মাসে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠালাভ করে নতুন রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকস্তানে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায়। এমনই প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে পেশকৃত বঙ্গবন্ধুর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজাদ পত্রিকা থেকে এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্টে প্রতিষ্ঠানের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন :

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আজ একটি সমালোচনাকারী সরকার বিরোধী দল নয়, ইহা সমগ্র দেশের সরকার পরিচালনাকারী একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার আজ ক্ষমতায় আসীন। গতানুগতিক ভাবে এই সরকারের বিরূপ সমালোচনায় স্বার্থান্বেষী মহল আজ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সেই সমালোচনার সত্যাসত্য যাচাই করার চাইতেও আজিকার এই পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। বর্ত্তমান কোয়ালিশন সরকার জনগণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে কতখানি সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহার বিচার জনগণের হাতেই ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু যে কর্ম্মধারা ও আদর্শবাদ আমাদের দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্বন্ধে নিজেরা সম্যক অবহিত না হইলে আমাদের চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাগমারী সম্মেলনের পর আমাদের বিগত চারিমাসের কার্য্যকলাপের ক্ষুদ্র ইতিহাস, আপনাদের খেদমতে পেশ করিতেছি। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, তাহা জানি না। কাগমারীর শপথ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই তাই বিদায় লইতে চাহিয়াও শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

খাদ্য সমস্যা

এ-কথা সর্ব্বজনবিদিত যে, বর্তমানে আমাদের প্রধানতম সমস্যাই হইতেছে খাদ্য সমস্যা। আমি একথা বিশ্বাস করি, কোন গণতান্ত্রিক সরকার যদি জনসাধারণের খাদ্য সমস্যা সমাধান করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

www.pathagar.com

থাকিবার অধিকার সে সরকারের নাই। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার এই কঠিনতম সমস্যার সমাধান করার প্রচেষ্টায় কতখানি সার্থকতা অর্জন করিয়াছে, তাহার বিচার-বিবেচনার জন্যই সমস্ত ঘটনা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। এ কথা আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে, পূর্ব্ব বাংলার মোট জনসংখ্যা চার কোটি একুশ লক্ষ এবং এই জনসংখ্যার খাদ্যের প্রয়োজন একাশি লক্ষ চব্বিশ হাজার টন, কিন্তু আমাদের উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ বৎসরে আটাত্তর লক্ষ তেইশ হাজার টন; অতএব গড়ে প্রতি বৎসর ঘাটতির পরিমাণ তিন লক্ষ এক হাজার টন। এ তো গেল স্বাভাবিক অবস্থায় ঘাটতির হিসাব। কিন্তু বর্তমান বৎসরে এই ঘাটতি প্রায় ৯ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে (১) বন্যা, (২) অনাবৃষ্টি, (৩) অতিবৃষ্টি, (৪) পূর্বের তুলনায় জমির উৎপাদন শক্তির ক্রমাবনতি, (৫) সেচ ব্যবস্থার অভাব এবং (৬) অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্য্যোগই এই খাদ্য ঘাটতির জন্য মূলতঃ দায়ী। এই দুর্গতি আরও চরম আকার ধারণ করে যখন খাদ্যশস্য মওজুদকারীরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে স্বাভাবিক খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের খাদ্যঘাটতি পূরণের জন্য প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় তিন লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। আর এই বৎসর সেখানে আমদানী করিতে হইবে নয় লক্ষ টন।

একথা বোধ হয় আপনাদের স্মরণ আছে যে, গত বৎসর খাদ্যাভাবক্লিষ্ট জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারকে ২৬ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছিল এবং পূর্ণ রেশনিং, আংশিক রেশনিং, খয়রাতী দান ও লঙ্গরখানার মারফতে উক্ত আমদানীকৃত খাদ্যশস্য বিতরণ করিতে হইয়াছিল। ধীরস্থিরভাবে আজ আপনাদের চিন্তা করিতে হইবে যে, পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের বাৎসরিক আয় মাত্র ৩৩ কোটি টাকা বা তার কিছু বেশি। সেই সরকারকে যদি প্রতি বৎসর ৫৬ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়, তবে সেই সরকার করভারে কতটা জর্জ্জরিত হইতে বাধ্য এবং সেই সরকারের পক্ষে কোন রকম উন্নয়ন বা জাতিগঠনমূলক কাজ করা কতটা অসম্ভব। তবুও আপনাদের কোয়ালিশন সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে তার পাওনা ঋণ কড়ায় গন্ডায় আদায় করিয়া এবং আরও বিভিন্ন কার্য্য করিয়া অতি কষ্টের সঙ্গে সমস্ত কাজ চালাইয়া যাইতেছে। বিভিন্ন সংবাদ পত্রের মারফৎ নিশ্চয়ই আপনারা সব অবহিত হইয়াছেন যে, খাদ্যশস্য ঘাটতি শুধু পাকিস্তানের একারই একটা সমস্যা নয়, সারা বিশ্বে আজ খাদ্য অভাব দেখা দিয়াছে। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত সরকারের ইহা একটা বড় সমস্যা। আপনাদের প্রাদেশিক সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আমেরিকা, বার্মা, থাইল্যান্ড ও অন্য কোন দেশ হইতে খাদ্য পাওয়ার কোন প্রতিশ্রুতি পায় নাই ... কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিমাসে পূর্ব্ব পাকিস্তানে ... টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অতঃপর জনাব মুজিবুর রহমান কৃষি, শিল্প কর্পোরেশন, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন, ফিল্ম কর্পোরেশন গঠন, ব্যক্তি স্বাধীনতা, কারা সংস্কার, দক্ষতার সঙ্গে দুর্নীতিদমন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের কৃতিত্ব বর্ণনা করেন।

www.pathagar.com

কাশ্মীর ও বৈদেশিক নীতি

...বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে একটি খোলাখুলি কথা আপনাদের খেদমতে আমি পেশ করিতে চাই। যাহাকে ইংরেজীতে Foreign Policy বলা হয়, তাহার বাংলা করা হয় বৈদেশিক নীতি। নীতি ইংরেজী Policy নয়, Principle।

নীতি বা Principle থেকে কখনো বিচ্যুত হওয়া যায় না যদি তাহা Fundamental Principle বা মূলনীতি হয়। Policy অর্থ হচ্ছে কর্ম্মপদ্ধতি। কাজেই লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার জন্য প্রয়োজনবোধে Policy বা কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্তন করা চলে। তাই Foreign Policy না বলে আমাদের উচিত Foreign Relations শব্দ ব্যবহার করা। তাহা হইলে Policy বা Principle এর প্রকৃত অর্থ লইয়া ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ খুবই কম থাকে। এই সম্পর্কে ইংল্যান্ডের লর্ড পামারস্টোনের কথা স্মরণযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন– We have got no permanent friend, we have got no permanent enemy but we have got permanent interests. পাকিস্তানের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ও তার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিয়া আমাদের বৈদেশিক সম্পর্ক রদবদল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমাদের কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার দ্বারা যে পদ্ধতিতে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালিত হইতেছে তাহাতে দেখা যায় যে, বিশ্বের অধিক সংখ্যক জাতি আমাদেরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং আমাদের কাশ্মীরের দাবীর ন্যায্যতা উহারা স্বীকার করিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি বজায় রাখিয়াও কেন্দ্রে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সুযোগ্য নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা যে অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত দুনিয়ার বন্ধুত্ব ও সমর্থন লাভ করিয়াছেন, সেজন্য আমরা গর্বিত।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জনগণের প্রাণের দাবী। এ দাবী আমাদের আদায় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব না। তাই আমাদের অন্যতম নেতা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখিয়া পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী তাঁহার সরকার স্বীকার করেন কিন্তু পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে না পারিলে স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বর্তমান পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য একমত না হইলে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন অসম্ভব। কাজেই আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। ইতিমধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবীর পশ্চাতে পশ্চিম পাকিস্তানে জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংকট ও শৃঙ্খলা

এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনারা আমার সহিত একমত যে, আমরা আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিলাম তাহাদের লইয়া যাহারা ...গণতান্ত্রিক পন্থায় [দেশকে] একটা সুখী, সমৃদ্ধশালী সমাজব্যবস্থার উপর দাঁড় করাইতে ইচ্ছুক।

www.pathagar.com

... গণতন্ত্রে যাহাদের বিশ্বাস নাই, কোন এক বিশেষ আদর্শবাদের প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীল এবং যাহারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া শাসনক্ষমতা হস্তগত করিতে চায়, তাহাদের জন্য আওয়ামী লীগ সৃষ্টি হয় নাই এবং আওয়ামী লীগে কখনও তাহাদের স্থান হইতে পারে না। এক্ষণে এই বিশেষ দলের কর্ম্মধারা সম্পর্কে আপনাদের কিছু ধারণা দিতে চাই। যে দেশে এই দলের সোজা নাম অচল, সেখানে ইহারা প্রথমে চেষ্টা করে কোন না কোন জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্ম্মী হিসাবে প্রবেশ করিতে এবং কোন এক দুর্ব্বল মুহূর্তে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে দখল করিতে কিন্তু ইহাতে আপারগ হইলে তখন ইহারা চরম পন্থা গ্রহণ করে অর্থাৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসসাধনে তৎপর হয়। সর্ব্ব দেশে ইহাই এই দলের চিরাচরিত প্রথা। বড়ই পরিতাপের বিষয়, এমনই গুটিকতক লোক ছদ্মবেশে আজ আওয়ামী লীগে প্রবেশ করিয়া উহার ধ্বংসসাধনে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহারা মনে করে এদেশে মুসলিম লীগ জনগণের আস্থা হারাইয়াছে, নিজামে ইছলাম-কৃষক শ্রমিক পার্টি জনগণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার পর যদি পাকিস্তানের সর্ব্ববৃহৎ সুসংগঠিত ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে জনগণের আস্থা নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রদেশের দুঃখদৈন্যে ক্লিষ্ট নিরীহ জনতা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর বিশ্বাস হারাইবে এবং দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করিতে সুযোগ পাইবে। আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, এইসব ছদ্মবেশী শত্রুর হাত হইতে আমাদের প্রতিষ্ঠান ও দেশকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা আপনারা সজাগ থাকিবেন।

অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে আমাকে আজ বলিতে হইতেছে যে, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সহকর্ম্মী ও প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক সম্পাদক মিঃ অলি আহাদ আমাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনৈক্য, দলাদলি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া এক মারাত্মক খেলায় মত্ত হইয়াছিলেন।

ওয়ার্কিং কমিটি দুই দুইটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া গভীর চিন্তা-ভাবনার পর প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষা ও উহার মধ্যে ঐক্য পুনঃস্থাপনের মানসে প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কার করিয়াছে। ইহার ফলে দেখা গেল যে এই প্রতিষ্ঠানকে পুরাপুরিভাবে বানচাল করিয়া দিবার জন্য তিনি বিরামহীন চেষ্টা চালাইয়াছেন। আপনাদের বিভাগীয় ছয়জন সম্পাদকের মধ্যে চারজন সম্পাদক ও পাঁচজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তাহাদের স্ব স্ব পদ হইতে ইস্তেফা দিলেন। ফলে আপনাদের প্রতিষ্ঠান এক জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইল। আপনারা সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমার উপরে যে গুরুদায়িত্বভার অর্পণ করিয়াছেন, উহা প্রতিপালন করিতে যাইয়া প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকে রক্ষা করিবার জন্য আমি ওয়ার্কিং কমিটির এক বিশেষ সভা আহব্বান করি এবং উক্ত সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমাদের গঠনতন্ত্রের ৩৭(খ) ধারা মতে বিভাগীয় সম্পাদকের শূন্যপদ পূরণ করিয়া লওয়া হয়। আপনাদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের পুরাতন ও অভিজ্ঞ কর্ম্মীদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়াই উক্ত পদগুলি পূরণ করিয়াছি।

সর্ব্বশেষে আমার নিজের দুই একটি কথা বলিয়া যাই। আপনারা সবাই অবহিত আছেন যে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও আওয়ামী লীগের দুই প্রধানের নির্দেশে

www.pathagar.com

আমি মন্ত্রিসভায় যোগদান করি। কর্ম্মী হিসাবে আপনাদের পাশে থাকিয়া কাজ করা যেমন আমার জীবনের অন্যতম ব্রত, তেমনি নেতাদের নির্দ্দেশও আমার কাছে অনতিক্রমনীয় তাই স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্রের ৬৬ নং ধারাকে মর্য্যাদা দিতে যাইয়া আমি মন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ সম্পাদকের পদ হইতে এস্তেফা দেই। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী আমাকে পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। আর কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির প্রস্তাবক্রমে এবং সর্বসম্মতভাবে আমাকে ৭ই জুন মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিতে বলা হয়। আমি অবশ্য ১লা জুন পদত্যাগপত্র পেশ করি। তারপর পাকিস্তানের উজীরে আজমের নির্দ্দেশক্রমে ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের উজীরে আলার অনুরোধে আমাকে আজও মন্ত্রিত্বের কাজ চালাইয়া যাইতে হইতেছে। আজ এই সভায় তাঁহাদের নিকট আমার আরজ, তাঁহারা যেন আমাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ করার সুযোগ দেন ও আমার পদত্যাগপত্র অচিরেই গ্রহণ করেন।

সূত্র : *দৈনিক আজাদ*, ১৪ই জুন ১৯৫৭, পৃ. ২

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : পাঁচ

আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, ১৯৬৪

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর ১৯৬৪ সালের ৬-৮ই মার্চ তিনদিনব্যাপী এর প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন ঢাকার গ্রীনরোডের আমবাগানে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কাউন্সিলে দলের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে রিপোর্ট পেশ করেন, তা একটি ঐতিহাসিক দলিল। তাঁর রিপোর্টটি দৈনিক ইত্তেফাক থেকে পুনর্মুদ্রিত হলো।

গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ও ডেলিগেট অধিবেশনে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান নিম্নোক্ত রিপোর্ট পেশ করেন :

জাতীয় জীবনের এক যুগ সন্ধিক্ষণে আমরা এই সম্মেলনে মিলিত হয়েছি। আজ সবচেয়ে বেশী অনুভব করছি আমাদের প্রিয় নেতা আওয়ামী লীগের কর্ণধার, পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্রের অতন্দ্র সংগ্রামী বীর সেনানী মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অভাব– যিনি তাঁর সমগ্র কর্মজীবন, সমগ্র সাধনা পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা ও মজলুম জনগণের সেবায় উৎসর্গ করে দিয়ে ছিলেন। যে প্রতিভাবান উজ্জ্বল তারকা দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল সমগ্র উপমহাদেশের রাজনৈতিক আকাশকে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন, তাঁর নশ্বর দেহ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই; কিন্তু তিনি আমাদের জন্য যে কর্মপথ, নীতি ও আদর্শ রেখে গেছেন, তাঁর সে নীতি, আদর্শ ও কর্ম পথ আমাদেরকে পরিচালিত করবে ভবিষ্যতের পথে– আমাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামে। আমরা যদি তাঁর নির্দেশিত পথে এগিয়ে যেতে পারি তবে আমাদের কর্মের মধ্যে দিয়েই আমরা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব। সেটাই হবে নেতার প্রতি সবচেয়ে বেশি সম্মান দেখান, সেটাই হবে তাঁর সত্যিকারের স্মৃতি রক্ষা।

আওয়ামী লীগের ইতিহাস আপনাদের সংগ্রামের ইতিহাস। সে ইতিহাসের সঙ্গে আপনাদের নতুন করে পরিচয় করানোর চেষ্টার কোন অর্থ হয় না। আপনারা জানেন, কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। আপনারা জানেন, সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কত রকম প্রতিকূল অবস্থা ও বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে আপনারা আওয়ামী লীগকে দেশে সেরা ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পেরেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গণতন্ত্রের মূলনীতি যেদেশ থেকে যখন তখন মুষ্টিমেয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন মহলের ইঙ্গিতে নির্বাসন দেওয়া হয়, যেদেশে কথায় কথায় বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতা ও কর্মীবৃন্দকে জেলে আটক করা

www.pathagar.com

হয়, সেদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করা একটা বিরাট কাজ, একটা কঠোর কাজ। আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে জনকল্যাণকর ও সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত এর কোনোটাই সম্ভব হয়নি। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের এতদিনের সংগ্রামে বিফল হয়েছি। উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদের সামনে মাত্র দু'একটি বিষয়ের অবতারণা করব। দেশ বিভাগের পর যখন দেশ একনায়কত্বের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, যখন তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের সমালোচনা করলে "Opposition কা ছো কুচাল দেয়েঙ্গে" বলা হত, তখন সর্বপ্রথম আমরা এদেশে বিরোধী দল সৃষ্টি করি।

আমাদের প্রিয়নেতার সুষ্ঠু নেতৃত্ব, আর সংগঠনী ক্ষমতার ফলে আপনাদের দ্বারা এদেশে আওয়ামী লীগ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এদেশে আজ বহু রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ এবং জনসাধারণ সরকার ও সরকারী দলের সমালোচনা করছে এবং এ সমালোচনা করার যে তাদের অধিকার আছে এটা একটা স্বীকৃত বিষয় হলেও এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করায় আপনাদের ও আপনাদের প্রতিষ্ঠানের অবদান সবচেয়ে বেশী। এ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, এ অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কত সংগ্রাম, কত ত্যাগ আপনাদেরকে করতে হয়েছে– আপনাদের দুঃখ-দুর্দশা আর লাঞ্ছনার সে করুণ কাহিনী লেখা থাকবে পাকিস্তানের অতীত ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি, আওয়ামী লীগই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার নেতা ও কর্মীবৃন্দ সর্বপ্রথমে দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্যের প্রতি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে ও তার বাইরে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ ও এখানকার দরিদ্র কৃষকের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রাকে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও ধনী সম্প্রদায়ের স্বার্থে পশ্চিমাঞ্চলে ব্যয় করা হয়ে আসছে এবং বৈদেশিক ঋণ ও কেন্দ্র কর্তৃক অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় যে প্রায় সবই পশ্চিমাঞ্চলে করে আসছে যার ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাট বৈষম্য ও ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে একথাও দেশবাসীকে সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ শুনিয়েছিল। এই সব কথা বলার জন্য আপনারা কত জেল-জুলুম ও অত্যাচার ভোগ করেছেন। কিন্তু আজ এসব অন্যায়ের প্রতিকার এমন জোরাল গণদাবীতে পরিণত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সামরিক সরকার ও বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষও আজ বাধ্য হয়ে অন্ততঃ কাজে না হলেও মুখে আমাদের এসব অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য এই বৈষম্যের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কোন দোষ নেই। এর পেছনে রয়েছে মুষ্টিমেয় সংশ্লিষ্ট স্বার্থপর মহল। যা হোক এই বৈষম্য দূরীকরণের দাবীর স্বীকৃতিই আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সংগ্রামের সফলতার স্বীকৃতির সাক্ষ্য।

আজ আমরা প্রায় দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর পরে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান আকারের এই সম্মেলনে মিলিত হচ্ছি। কেন এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আমরা আজ এখনে মিলিত হচ্ছি, কিভাবে এই অবস্থান সৃষ্টি হল এবং এই দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছরে দেশে কত সব ঘাতপ্রতিঘাত আমাদের নেতা ও কর্মীদের জীবন ও প্রতিষ্ঠানকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিয়েছে,

www.pathagar.com

সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা আপনাদের সামনে পেশ করছি। আপনারা জানেন, ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর হঠাৎ শাসনতন্ত্র নাকচ করে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তন করা হলো। যে ইস্কান্দার মীর্জা রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে বসে ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক দল গঠনে ও তাদের কাজে অন্যায়ভাবে সর্বদা হস্তক্ষেপ করে দেশে স্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে বাধা দিতেন, যার প্রভাবে দেশে সুষ্ঠুগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, যিনি সব সময় অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে আজ একজনকে, কাল অপরজনকে প্রধান মন্ত্রিত্বের আসনে বসাতেন, সেই ইস্কান্দার মীর্জাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবের দোহাই এবং মরহুম শাহেদ আলী সাহেবের মৃত্যুর জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে দায়ী করে দেশের উপর সামরিক শাসন চাপিয়ে দেন। অথচ পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মরহুম লিয়াকত আলী খানকে প্রকাশ্য দিবালোকে মিলিটারী হেডকোয়ার্টার রাওয়ালপিন্ডি শহরে হত্যা করার জন্য দেশে সামরিক শাসন জারি করা হলনা, এমনকি হত্যাকারীকে অকুস্থলে পুলিশের লোক হত্যা করল, তারও কোনো বিচার হল না। আর সামরিক শাসন জারির পর মীর্জা সাহেবের অন্যায় আচরণের পিছনে যে সব সামরিক অফিসার ছিলেন তারা সামরিক শাসনজারির কয়েক দিনের ভিতরেই তাঁকে দেশ থেকে নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। কারণ, মীর্জা সাহেব রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়ে আসছিলেন, সেই হস্তক্ষেপ পরে এদের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হবে, এই ভয়ে এরা এই পথের কন্টক অপসারণ করেন। এটা সর্বকাল ও যুগের নিয়ম যে, যে অন্যায় পথ কেউ অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে সেই অন্যায় পথেই সে নিজেও একদিন অপরের শিকারে পরিণত হবে। সামরিক শাসন জারি করার পরে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ একচেটিয়া ভাবে রাজনৈতিক দলসমূহকে সবরকম দোষারোপ করতে লাগলেন এবং একথাও জোর গলায় প্রচার করতে লাগলেন যে, পাকিস্তানের ন্যায় অনগ্রসর দেশে রাজনৈতিক দলের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে নিরাপত্তা আইনে জেলে পুরা হল আর বহু সরকারী কর্মচারীকে সম্পূর্ণ আউট করে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল– এমনকি অনেক সরকারী কর্মচারীকে আটক করে জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। এখানে এই শাসন কর্তৃপক্ষ ক্ষান্ত হলেন না। এবডো ও প্রোডা করে বহু নেতাকর্মীকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হল। আমাদের অনেকের বিরুদ্ধে একের পর এক বহু মিথ্যা মামলা দায়ের করে সমগ্র সরকারী যন্ত্রের সকল প্রকার প্রভাব দ্বারা আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার কত চেষ্টা হল– তা' আপনাদের ভালভাবেই মনে আছে। আল্লাহর রহমতে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। শত চেষ্টা করেই বিচারে আমাদের কাউকে দোষী প্রমাণ করতে পারেনি।

অধিকার সচেতন জনগণ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে চায় না। তারা প্রবল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাদের দাবী নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে আন্দোলনের মারফত তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। তখন আবার একটি ফন্দি আঁটা হল, শাসনতন্ত্রের নামে দেশকে আর একটা ধোঁকা দেওয়ার জন্য। আইয়ুব সরকার একটা শাসনতন্ত্র জারি করলেন তাঁরই সৃষ্ট শাসনতন্ত্র কমিশনের মতামতের বিরুদ্ধে। বতর্মানে প্রচলিত সেই শাসনতন্ত্রকে শাসনতন্ত্রের প্রহসন বই অন্য কিছু বলা

www.pathagar.com

চলে না, সেটা আপনারা ভালভাবেই জানেন। যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা পাকিস্তানের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যে ভোটাধিকার দ্বারা পাকিস্তান অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল, আমাদেরকে সে ভোটাধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মৌলিক গণতন্ত্রের নামে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইউনিয়ন কাউন্সিলরকে দেশের একমাত্র ভোটাধিকার দিয়ে সমগ্র জাতিকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, জনসাধারণের এমন রাজনৈতিক শিক্ষা নেই যাতে তাদেরকে এই ভোটাধিকার দেওয়া চলে। সমগ্র জাতির পক্ষে এটা অত্যন্ত অবমাননাকর। যাদের ভোটে পাকিস্তান অর্জন সম্ভব হয়েছিল সরকারী কর্তৃপক্ষ তাদেরকে রাতারাতি অনুপযুক্ত নাগরিক বলে আখ্যা দিলেন। কারণ অত্যন্ত পরিষ্কার। জনসাধারণের হাতে এই অধিকার থাকলে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল আর দেশকে যেভাবে সেভাবে শোষণ ও শাসন করতে পারবে না। সে প্রমাণ তারা পেয়েছে ১৯৫৪ সনে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে। পূর্ণ মৌলিক অধিকার থেকেও দেশবাসীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান শাসনতন্ত্রে এমন সব ধারা সন্নিবেশিত আছে যাতে সমগ্র জাতিকে রাজনৈতিক পঙ্গুতে পরিণত করা হয়েছে। এমনকি, এক কলমের খোঁচায় তারা কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচী থেকে ইসলামাবাদ নামক এক নতুন জায়গায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছে এবং সে সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করছে। যেদেশের লোক বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভর করে চলেছে সে দেশে এত বিপুল ব্যয়ে রাজধানী স্থাপনের বিলাসিতা কেন? যে করাচীকে আমাদের এ অঞ্চলের দরিদ্র কৃষকের কষ্টার্জিত অর্থে গড়ে তোলা হয়েছে সে করাচীকেও তারা পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছে। অবিচারের একটা সীমা আছে। কিন্তু আমাদের উপর যে অবিচার করা হচ্ছে তার নমুনা দুনিয়ার ইতিহাসে নেই। কাজেই আমাদের সম্মুখে দীর্ঘ সংগ্রামের প্রয়োজন আছে। আপনাদের মনে আছে, এই গণবিরোধী শাসনতন্ত্র জারি করার পর্বে গণ আন্দোলনের ভয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল দেশের বহু সংখ্যক নেতা ও কর্মীকে জেলে আটক করেন। শুধু তাই নয়, যে মহান নেতার প্রচেষ্টা ও ত্যাগ ছাড়া পাকিস্তান হাসিল হওয়া সম্ভব হত না, পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে যার অবদান বর্তমানের সকল নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত অবদানের চেয়েও ঢের বেশী, সেই দেশপ্রিয় জাতীয় নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দীকেও তারা বিনা বিচারে জেলে নিয়ে যেতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হয়নি। কে জানে, হয়ত এই নির্মম আঘাতই তাঁর মৃত্যুকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। সুখের বিষয়, আমরা অনেকে সে সময় কারারুদ্ধ থাকলেও দেশের ছাত্রসমাজ ও জনতা সরকারের এই অন্যায় আচরণকে ক্ষমা করতে পারেনি। তারা দেশে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। সমগ্র দুনিয়া জানে এ আন্দোলন কতখানি সফলতার সাথে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। জনমতের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, তাদের এত বেশী কিছু আসে যায় না।

এই সময় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভিত্তির সূত্রপাত হল– "নয় নেতার বিবৃতি"র মারফত। তারপর আমাদের নেতা সোহরাওয়ার্দী সাহেব ও আমরা একে একে জেল থেকে মুক্ত হই এবং দেশে সেই সময়ই গণসংযোগ সৃষ্টির জোরালো আন্দোলন শুরু হয়। আমাদের নেতার নেতৃত্বে শাসনতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক রূপদানের দাবীতে। কিন্তু কারাবাসে নেতার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল। শীঘ্রই তিনি কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

www.pathagar.com

নেতার অনুপস্থিতিতে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কতখানি কাজ করতে পেরেছে সেটা আপনারা ভালভাবেই জানেন। অবশ্য গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ এ-কথাও স্থির করেছিলেন যে, তারা কোন দল পুনরুজ্জীবিত না করেই শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্রকরণের ভিত্তিতে কাজ করে যাবেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই কয়েকটি দলকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। তাছাড়া যে বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতার দ্বারা বিভিন্ন দলের লোকদের নিয়ে জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল সেই নেতা আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। তাছাড়া অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, একটি সংগঠিত সরকারী শক্তি, যার পিছনে রয়েছে দেশের সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, তার সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হতে হলে জাতীয় ফ্রন্ট বা প্লাটফরমের পেছনে ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যক। বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে এ-কথা আমাদের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী বহুদিন থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এ-দাবী জানিয়ে আসছিলেন।

আপনাদের মনে আছে, বিগত ১৯৬৩ সালের ৭ই এপ্রিল প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন জেলার প্রেসিডেন্ট, সম্পাদকবৃন্দ ও অন্যান্য নেতা ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে এক সম্মেলনে মিলিত হন। এই সম্মেলনে অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে রায় দেন এবং আমাদের নেতা মরহুম সোহরাওয়ার্দীর আগমনের ও তাঁর সম্মতির অপেক্ষায় শেষ সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখেন। এ-কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, ঐ সম্মেলনে আমাদের সহকর্মী জনাব আতাউর রহমান খান তাঁর বক্তৃতায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, পার্টির অধিকাংশ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তিনি সে সিদ্ধান্ত অম্লান বদনে মেনে নেবেন। অবশ্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দল পুনরুজ্জীবনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। সর্বশেষে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এক ম্যানিফেস্টো বের করেছেন, এরূপ ম্যানিফেস্টো শুধু রাজনৈতিক দলের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব। এই ম্যানিফেস্টো প্রকাশের পর জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে আর ফ্রন্ট বলা চলে না। এরূপ ম্যানিফেস্টো শুধু রাজনৈতিক দলেরই পরিচায়ক। অথচ এই ম্যানিফেস্টো প্রকাশের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারীর বা অন্য কোন নেতার সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা পর্যন্ত করা হয়নি। আমি বিশ্বাস করি, এবং আমার বিশ্বাস, আপনারাও আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, শুধু বিবৃতি ও প্রচার কায়েম দ্বারা প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতাসীনদের নিকট থেকে কোন দাবী আদায় করা সম্ভব নয়। আমরা সক্রিয় কর্মপন্থায় বিশ্বাসী। শুধু কতিপয় নেতার একতায় যে দেশের মুক্তি আসতে পারে এ নীতিতে বিশ্বাস করি না। গণদাবী আদায় করতে হলে শুধু কতিপয় নেতার তথাকথিত একতা নয়, জনগণের একতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর সেই জনগণের একতা শুধু সক্রিয় ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের একতার মধ্য দিয়েই সম্ভব নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে। এই জন্যই পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্তের সময় এটাও আমরা স্থির করেছি যে, শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্রীকরণের জন্য সম্মিলিত পুনরুজ্জীবিত দলগুলি একত্রে একটা ফ্রন্টের মাধ্যমে সংগ্রাম করবে। আমরা আশা করি, আমাদের পুরাতন সহকর্মীরা শীঘ্রই আমাদের সাথে এসে যাবেন।

www.pathagar.com

শহীদ সাহেবের মৃত্যুতে যখন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আর কোন নেতাই বিভিন্ন আর্দশ ও প্রোগ্রামে বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরিচালিত ও নেতৃত্ব দিবার জন্য থাকল না, তখন দল পুনরুজ্জীবিত করার দাবীর বিরুদ্ধে আর কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। পশ্চিম পাকিস্তানেও আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করা হল এবং সেখানে অন্যান্য পুনরুজ্জীবিত রাজনৈতিক দলের সাথে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ ও জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এখানকার পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আশা করি আমাদের পুরাতন সহকর্মীরা পুনরায় আমাদের সাথে ফিরে আসবেন।

একটা কথা এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, দীর্ঘ ১৬ বৎসরের পাকিস্তানের ইতিহাসে সব সময়ই দেখা গিয়েছে যে, যখন জনগণের কোন দাবী আদায়ের জন্য অগ্রসর হয়েছি, কেন্দ্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল আমাদের বিরুদ্ধে নানা রকম কুৎসা রটনা করেছেন এবং আমাদের উপর নানারকম অত্যাচার করে আসছেন। এমনকি ১৯৫৭ সালে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসন থেকে যখন সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ও অন্যায়ভাবে সরিয়ে দেওয়া হল তখনও আমরা নবগঠিত নুন সরকারকে কোনরকম ক্ষমতার অংশীদার না হয়েও সমর্থন জানাচ্ছিলাম শুধু একটি আশায় যে, ১৯৫৯ সনে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নুন সরকার তাদের কথা রেখে যখন সাধারণ নির্বাচনের যাবতীয় প্রস্তুতি একের পর এক সম্পন্ন করছিলেন এবং সাধারণ নির্বাচন অনিবার্য এবং এই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগ একদলীয় সরকার গঠনে সমর্থ হবে এবং সে অবস্থায় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল আর পূর্ব পাকিস্তানকে ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে শোষণ করতে পারবে না, তখনই সেই মহল চরম আঘাত হানল সামরিক আইন জারির মারফতে। আর এর প্রথম ধাক্কা এল আমাদের প্রতিষ্ঠান, আমাদের নেতা ও কর্মীবৃন্দের উপর। অত্যাচারের যে স্টিম রোলার চালানো হল ভুক্তভোগী হিসাবে সেটা আপনারা ভালভাবেই জানেন। এই সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ, এমনকি আইয়ুব খান সাহেব স্বয়ং কত না কটাক্ষ করেছিলেন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে। কিন্তু ইতিহাসের চাকা কারও অপেক্ষায় বন্ধ হয়ে থাকে না। আজ আইয়ুব খান সাহেব স্বয়ং একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের শুধু সভ্যই নহেন, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানও। একাধারে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আবার অন্য ধারে তিনি কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট। শুধু তাই নয়, তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত দেশ শাসন ও সরকার পরিচালনা সম্ভবপর নহে। এ বিষয়ে তিনি যে ভিন্নমত পোষণ করতেন সেই ভুল এতদিনে নাকি তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাই নাকি তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন। চমৎকার! এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের অবতারণা করে আমি আমার রিপোর্ট শেষ করছি। সেটা হল এই যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ ১৪/১৫ বছরের মধ্যে মাত্র দেড় বৎসরের জন্য আমরা কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানে কোয়ালিশন সরকার গঠনে সমর্থ হয়েছিলাম। দেশের শোষিত জনসাধারণের জন্য এই অল্প সময়ে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তেমন কিছু করা সম্ভব হয়নি। এর জন্য সে সময়ের প্রয়োজন যে সময়

www.pathagar.com

আমরা পাইনি। কিন্তু যে অল্প সময় আমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলাম সেই সময়ে যে শুভ সূচনা করেছিলাম সেটা রেকর্ডের বিষয়বস্তু। আমরা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ হিসাবে সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং কাউকেই বিনা বিচারে আটক করা হবে না, এই নীতি গ্রহণ করেছিলাম। পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষে আমরা প্রায় ৭৬ কোটি টাকার চাউল বিদেশ থেকে আনিয়েছিলাম। এখানে আমরা ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন, পাট কর্পোরেশন, ফিল্ম কর্পোরেশন, আভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল সংস্থা প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলাম। তাছাড়া ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রারম্ভিক সূচনা হিসাবে আমরা শিল্প ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র থেকে প্রদেশের হাতে এনেছিলাম। আমাদের বৈদেশিক নীতি ছিল "সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারও প্রতি কোন হিংসা নয়।" সামান্য দেড় বৎসরের মধ্যে শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে বিদেশে পাকিস্তানের মর্যাদা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল সেটা আপনারা ভালভাবেই জানেন।

আমরা এ-কথা মোটেই দাবী করি না যে, আমরা দেশের জন্য বিরাট একটা কিছু করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমরা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণ করতে পেরেছিলাম যে, একদলীয় সরকার গঠন করতে পারলে সাধারণ নির্বাচনের পর আমরা নিশ্চয়ই সেদিকে সফল হতে পারতাম।

সর্বশেষে, আসুন, আজ এ-শপথ গ্রহণ করি যে, যতদিন না পাকিস্তানের বুক থেকে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের পরাজয় ঘটবে, যতদিন না এদেশের গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে পারব, যতদিন না পাকিস্তানকে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করতে পারব, যতদিন না সমাজ থেকে শোষণের মূলোৎপাটন হবে, যতদিন না দেশের প্রত্যেক নাগরিক, দল, মত ও ধর্ম নির্বিশেষে অর্থনৈতিক মুক্তি ও আর্থিক প্রাচূর্যের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে, যতদিন না শ্রেণীবিশেষের অত্যাচার থেকে সমগ্র দেশ ও জাতিকে মুক্তি দেওয়া যাবে– ততদিন আমরা আমাদের নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশিত পথে সংগ্রাম চালিয়ে যাব। ন্যায় আমাদের কর্মনীতি, আমাদের আদর্শ! জয় আমাদের অনিবার্য।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ২, ৫

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ছয়

আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবাবলি, ১৯৬৪

১৯৬৪ সালের ৬-৮ই মার্চ ঢাকার গ্রীনরোডস্থ আমবাগানে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনদিনব্যাপী দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। উল্লেখ্য একই বছর ২৫শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ ভবনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির যে সভায় এনডিএফ জোটের বাইরে দলকে পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ঐ একই সভায় এ সব প্রস্তাব প্রথমে নেওয়া হয়েছিল। দৈনিক ইত্তেফাক থেকে হুবহু উদ্ধৃত করা হলো।

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র

সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবী জানানো হয়। ইহাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের প্রাধান্য ঘোষণা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণকে সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তাদান এবং নিম্নলিখিত নীতিসমূহ সন্নিবেশিত করার জন্য দাবী করা হয় :

ক) পাকিস্তানের দুই অংশের সমান উন্নয়ন, এবং দুই অংশের মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসন।

খ) সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানের দেশরক্ষার ক্ষমতা এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে ইহা সৈন্যবল ও সরঞ্জামের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে।

গ) ফেডারেল ধরনের পার্লামেন্টারী সরকার ব্যবস্থা।

ঘ) সংবাদপত্র ও সংগঠনের মারফত জনমত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা সহ জনগণকে রাজনৈতিক দল গঠন ও সংগঠনের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দান।

ঙ) বেআইনীভাবে গ্রেফতার ও বিনা বিচারে আটক রাখা হইতে অব্যাহতিদান এবং মৌলিক অধিকারকে বিচার বিভাগের এখতিয়ারে আনয়ন।

চ) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথকীকরণ।

সার্বজনীন ভোটাধিকার

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি নির্বাচনের মৌলিক ও প্রাথমিক অধিকার হইতে জাতিকে বঞ্চিত রাখার জন্য বর্তমান সরকারের চেষ্টায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সম্মেলনে অপর এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

সম্মেলনে অবিলম্বে জাতীয়, প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও অন্যান্য নির্বাচনমূলক সংস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন ও আশু নির্বাচনেও তাহা গ্রহণের জন্য দাবী জানানো হয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি

সম্মেলনে অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, জামাতে ইসলামীর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, রাজনৈতিক কর্মীদের উপর জারিকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা বাতিল ও তাঁহাদের বাজেয়াফত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ, জাতীয় সংবাদপত্রের উপর আরওপিত সকল বিধিনিষেধ অপসারণ, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স, নিরাপত্তা আইন, সীমান্ত অপরাধ দমন বিধি, রাজনৈতিক দল আইন, এবডো ও প্রোডো অর্ডিন্যান্স ও অন্যান্য বিধিনিষেধমূলক আইন রহিতের জন্য দাবী করা হইয়াছে।

কাশ্মীরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ সংগ্রাম

সম্মেলনে ভারতীয় উপনিবেশবাদের সশস্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে অধিকৃত কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য সংগ্রামরত জনগণের দুর্দশায় উদ্বেগ ও সহানুভূতি প্রকাশ করা হয় এবং নিরপেক্ষ গণভোটের মারফত অবিলম্বে তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার মানিয়া নেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়।

সম্মেলনে জাতিসংঘ সংস্থার অনিশ্চিত ও অকার্যকরী ভূমিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতকে ইহার প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য করানোর জন্য উক্ত সংস্থার প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে অধিকৃত এলাকার বীর কাশ্মীরীদের আজাদী সংগ্রামের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানানো হয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার নিন্দা

অপর কতিপয় প্রস্তাবে ভারত সরকার কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্য হইতে সংখ্যালঘু মুসলিম নাগরিকদের জোরপূর্বক বহিষ্কারের তীব্র নিন্দা করা হয়। ভারতের মুসলমান নাগরিকদের উপর বর্বর হামলা বন্ধ করার ব্যাপারে ভারতকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও বিশ্বের স্বাধীনতাকামী সকল রাষ্ট্রের দৃষ্টি বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট সম্মেলনের পক্ষ হইতে আহ্বান জানানো হয়।

প্রস্তাবে ভারত ও পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীব্র নিন্দা করা হয় এবং উভয় দেশের বিপন্ন সংখ্যালঘুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দাবী জানানো হয়। আওয়ামী লীগ সম্মেলন ভারত সরকারের নিকট পাকিস্তানে আশ্রিত দাঙ্গা-বিধ্বস্ত ভারতীয় মুসলমানদের স্ব স্ব ভিটায় পুনর্বাসন এবং তাহাদের ক্ষতিপূরণ করার জন্য দাবী জানায়। কিন্তু যে সকল উদ্বাস্তুর পক্ষে ভারতে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না পাকিস্তানে তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য সম্মেলন পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবী জানায়।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্মেলন ভারতের হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা সৃষ্টিকারী দুর্বৃত্তদের কঠোর হস্তে দমন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবী জানায়।

সম্মেলন পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করে এবং ভারতের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হইয়া দেশত্যাগী না হওয়ার জন্য তাহাদের প্রতি আহ্বান জানায়।

সালিসী আদালত

অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্মেলন এইরূপ দৃঢ় অভিমত পোষণ করে যে, সালিসী আদালত অর্ডিন্যান্স শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ নীতির পরিপন্থি। সম্মেলন আরও মনে করে যে, আইন ও আইনানুগ বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল নহে, এমন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকায় সালিসী আদালত হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সালিসী আদালতসমূহ গ্রাম্যরাজনীতির প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ায় সুবিচার ব্যাহত হইতেছে। কাজেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ও প্রতিনিধি সম্মেলন অবিলম্বে সালিসী আদালত অর্ডিন্যান্স রদ করার দাবী জানাইতেছে।

দল পুনরুজ্জীবন ও 'এন.ডি.এফ.'

সম্মেলনে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, পূর্ণ গণতন্ত্র এবং মৌলিক অধিকারসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সার্বজনীন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সচেতন জনমত সংগঠন ও গণদাবী প্রকাশের মাধ্যম রূপে কাজ করার জন্য সংগঠিত রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহাই আওয়ামী লীগ কাউন্সিলর ও প্রতিনিধিদের সুচিন্তিত অভিমত। তদুপরি, সম্মেলন মনে করে যে, দল পুনরুজ্জীবন বিরোধী নীতির ভিত্তিতে যে এন.ডি.এফ. গঠিত হইয়াছিল, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ফলে তাহার প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র লুপ্ত হইয়াছে এবং এন.ডি.এফ. এখন নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে। আওয়ামী লীগ সম্মেলন বিশ্বাস করে যে, গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ আদায় করার জন্য সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন; কাজেই সম্মেলন পুনরুজ্জীবিত রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা এবং ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা গ্রহণের ব্যাপারে কার্যকরী পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদককে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করিতেছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন উদ্বেগ প্রকাশ

আওয়ামী লীগ সম্মেলন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচ্চ মূল্য, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি, অত্যাধিক ট্যাক্সের বোঝা, পাট ও ইক্ষুসহ অর্থকরী ফসলের নিম্ন মূল্য প্রভৃতি কারণে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির দরুন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং সরকারের প্রতি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতি বিধান ও কৃষক যাহাতে অর্থকরী ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় তাহার নিশ্চয়তা সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক নীতি পুনর্নির্ধারণ, নগদ শুল্কসহ

www.pathagar.com

মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রবর্তিত সকল নির্যাতনমূলক ট্যাক্স বাতিল, সীমান্তের ৫ মাইল এলাকায় পাট উৎপাদনের উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার এবং পাট চোরাচালান প্রতিরোধকল্পে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায়। [এগুলো ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলো, ১১-২৬, ছিল নিম্নরূপ।]

(১১) একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন করিতে সক্ষম বলিয়া ধীরে ধীরে উহা প্রবর্তন, (১২) অবিলম্বে প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতনের স্কেল এবং মাধ্যমিক স্কুল ও বেসরকারী কলেজসমূহের শিক্ষকদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি, (১৩) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য জীবিকার পথ খোলা, (১৪) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য এক প্রস্তাবে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন দানের জন্য দাবী জানানো হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর আরওপিত বিধি-নিষেধমূলক অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহারের জন্যও দাবি জানানো হয়, (১৫) অবিলম্বে পে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও নিম্ন বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, (১৬) এক প্রস্তাবে শ্রমিকদের ধর্মঘটের উপর বাধানিষেধ আরওপের প্রতিবাদ ও উহা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়, (১৭) সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার সুপারি ও নারিকেল চাষীদের বিনা সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দান, (১৮) সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পরিকল্পনা কার্যকরী করা, (১৯) এক প্রস্তাবে করাচী হইতে ইসলামাবাদে কেন্দ্রীয় রাজধানী সরাইয়া নেওয়ার প্রতিবাদ জানানো হয়। করাচী রাজধানী উন্নয়নের পক্ষে অনুপযুক্ত হইলে সে ক্ষেত্রে ঢাকায় কেন্দ্রীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাবে পুনরায় দাবী জানানো হয়। (২০) জমির উপর স্বত্বের দলিল তৈরীর সময় অনেক ক্ষেত্রে ভুল থাকিয়া যাওয়ায় বহু দরিদ্র লোকের অসুবিধা সৃষ্টি হয় বিধায় দলিলপত্র সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের দাবী জানানো হয়, (২১) উত্তর বঙ্গের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাহাদুরাবাদের নিকটে যমুনা নদীর উপর পুল বা নদীর মধ্যদিয়া টানেল নির্মাণ, (২২) উভয় প্রদেশের জন্য পৃথক অর্থনীতির নীতিকে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি দান এবং ইহার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ, (২৩) পাশ্চাত্য কর্তৃক ভারতকে ব্যাপক সামরিক সাহায্য দানের ফলে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দাদের লইয়া আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত আঞ্চলিক বাহিনী গঠন, (২৪) দেশ ও বিশ্বশান্তির স্বার্থে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, (২৫) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক নিখোঁজ হওয়ায় এক প্রস্তাবে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয় এবং তাঁহার সন্ধান ও মানসিক চিকিৎসার জন্য কমিটি গঠনের দাবী জানানো হয় ও (২৬) বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিলম্বে যমুনা নদীর পশ্চিম তীর বরাবর রংপুর হইতে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ৯ই মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ১, ৫, ৬

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : সাত

'ক্ষমতা দখল নয়– দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবে' : আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা, ১৯৭০

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে ৪-৫ই জুন মতিঝিল ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতির যে ভাষণ দেন, তা দৈনিক ইত্তেফাক থেকে হুবহু এখানে মুদ্রিত হলো।

আওয়ামী প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করিয়াছেন যে, ক্ষমতা দখল নয়, বরং শোষিত বঞ্চিত দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবে।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণদানকালে শেখ সাহেব বলেন যে, ক্ষমতা চাহিলে বহুবার তা পদতলে লুটাইয়া পড়িত। কিন্তু আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ক্ষমতার নিরাপদ আসন নয়– গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠার বন্ধুর পথপ্রান্তের গন্তব্য স্থল। তিনি বলেন, জনগণ ছয়-দফা চায় কি না চায়, আগামী নির্বাচনে সেই প্রশ্নে গণভোটের শামিল। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ যদি ৬-দফার পক্ষে ভোট দেয়, আমরা বিশ্ববাসীকে দেখাইয়া দিব কি করিয়া দাবী আদায় করিতে হয়। শেখ সাহেব বলেন যে, ছয় দফা দাবী যখন দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছিল, তখন আমার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়– চেষ্টা করা হয় আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার। তিনি বলেন যে, এ ধরনের ষড়যন্ত্র মামলা যে দলের প্রধানের বিরুদ্ধে দাঁড় করান হয়, সাধারণতঃ সে দল টেকে না। কিন্তু আওয়ামী লীগের সংগ্রামী কর্মীরা আওয়ামী লীগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

নসরুল্লার সমালোচনা

নওয়াবজাদা নসরুল্লা খানের তীব্র সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, সহকর্মীদের অধিকাংশই আমি যখন কারাগারে সেই সুযোগে নওয়াবজাদা নসরুল্লা খান যুক্তফ্রন্ট গঠনের নামে আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি এবং আমাদের ডিসমিস করিয়া নতুন পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন করেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না, নেতা নেওয়া যায়, কর্মী নেওয়া যায় না, তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রক্তের।

গোলটেবিল প্রসঙ্গে

গোলটেবিল বৈঠকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, এই বৈঠকটি ছিল আসলে একটি চক্রান্ত। তিনি বলেন, একথা সহজেই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল যে,

www.pathagar.com

আইয়ুব বয়স্ক ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টারী সরকার সম্পর্কিত দাবী ছাড়া আর কিছু মানিবে না। আর এই চক্রান্তের সহযোগিতা করিতেছিলেন মওদুদী, নসরুল্লা, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং পর্দার অন্তরালবর্তী কিছু সংখ্যক ক্ষমতালোভী বাঙালী মীরজাফর। তিনি বলেন, গা বাঁচাইবার জন্যই অবশেষে আইয়ুব সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া কাটিয়া পড়ে।

গোলাম আজমের জবাবে

জামাতে ইসলামী নেতা অধ্যাপক গোলাম আজমের কঠোর সমালোচনা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব তাঁহার আসল পরিচয় তুলিয়া ধরেন। জনাব গোলাম আজম শেখ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন বলিয়া যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন উহার জবাবে শেখ সাহেব বলেন শুধু আপনি কেন অনেকেই অনেকবার আমাকে এই প্রস্তাব দিয়াছেন। কিন্তু দেশবাসী এবং ৬-দফার সঙ্গে বেইমানী করিয়া আইয়ুব খানের মন্ত্রী হওয়ার চাইতে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠকেই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া সে প্রস্তাব আমি নাকচ করিয়া দিয়াছি।

নুরুল আমীন সম্পর্কে

শেখ সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় পিডিপি প্রধান জনাব নুরুল আমীনের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহার মত এত বড় স্বেচ্ছাচারী এদেশে খুব কমই পয়দা হইয়াছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শামসুল হক নূরুল আমীনের কারাগারেই পাগল হইয়াছেন, মাতৃভাষা আন্দোলনে তাঁহার আমলেই সালাম-বরকতরা শহীদ হইয়াছে, রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের হত্যা করা হইয়াছে, ৩৩টি নির্বাচন ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে।

জনাব আতাউর রহমান খান ও জনাব সালাম খানের সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, তাহারা এবডো আদেশ প্রাপ্তির পর আর রাজনীতি করিব না বলিয়া আইয়ুব খানের নিকট মুচলেকা দিয়াছিলেন।

দলত্যাগী আওয়ামী লীগ নেত্রী মিসেস আমেনা বেগম প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, তিনি দলত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন। তাহার সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাতে তিনি স্বেচ্ছায় দল না ছাড়িলে আওয়ামী লীগ তাহাকে বহিষ্কার করিতে বাধ্য হইত।

দুইটি সমস্যা

কর্মীদের উদ্দেশে শেখ মুজিব বলেন, আমাদের সামনে এখন দুইটি প্রধান সমস্যা বিরাজমান। একটি ছয়দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রদান এবং দ্বিতীয়টি শোষকদের নির্মূল করা। এই উদ্দেশ্যে আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। তিনি বলেন, তবে অপর পক্ষ যদি অনবরত অনিয়মতান্ত্রিক কাজ করে জনগণেরও অনিয়মতান্ত্রিক হওয়ার অধিকার আছে।

www.pathagar.com

এল এফ ও প্রসঙ্গ

আইনগত কাঠামো আদেশের সমালোচনা করিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, ইহাতে পরিষদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করার মাধ্যমে, জনগণের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি বলেন, জনগণই দেশের মালিক। সুতরাং জনগণের নির্বাচিত পরিষদ হইবে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন– ইহার সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপের অধিকার কাহারও নাই।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের উদ্দেশে

পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উদ্দেশে শেখ সাহেব বলেন, আমি জানি, আপনারাও শোষক, জায়গীরদার আমলাতন্ত্রে এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে কি নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে কাল কাটাইতেছেন। আপনাদের বিরুদ্ধে নয়–আমার সংগ্রাম এই শোষক ও জালেমদের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, জায়গীরদার, জমিদার ও শোষককুলের দাসত্বের ভিত্তির ভাঙ্গিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ান, বাংলার জনগণ আমাদের সাহায্য করিবে।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ৫ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ১০

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : আট

'দাবী আদায়ের জন্য যারা প্রাণ দিল তাদের রক্তের ডাক যেন আপনারা ভুলিয়া না যান' : কাউন্সিলরদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বান, ১৯৭০

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে ৪-৫ই জুন মতিঝিল ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে উদ্বোধনী ভাষণ দেন, তা দৈনিক ইত্তেফাক থেকে হুবহু এখানে মুদ্রিত হলো।

আওয়ামী লীগ নেতা নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যের অভিসারী। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগের নেতা, কবরে শুইয়া তিনিই আমাদের নেতৃত্ব দিতেছেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগের ইতিহাস–বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ত্যাগ, তিতিক্ষা, আর জেল-জুলুম-নির্যাতন বরণের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস। সে ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়াইয়া আছে বহু রক্তের দাগ। সাধারণ নির্বাচনকে সম্মুখে রাখিয়া তাই আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মী ভাইদের প্রতি আমার আবেদন, এ রক্তের ডাক যেন আপনারা ভুলিয়া না যান। ভুলিবেন না, এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কত ভাই আমাদের রক্ত দিয়াছে, কত বোন বিধবা হইয়াছে, কত মায়ের কোল শূন্য হইয়াছে, কত মানুষের সোনার সংসার ছারখার হইয়াছে। যে বন্ধুরা বুকের রক্ত ঢালিয়া কারাগার বা সামরিক ছাউনির বন্দীনিবাস হইতে আমাদের ফিরাইয়া আনিয়াছেন, দেশের দাবী আদায়ের জন্য বাংলার শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জের পথঘাট রক্তে রঞ্জিত করিয়াছে, তাহাদের যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। তাহাদের রক্তের সঙ্গে কেহ যেন বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সাহস না পায়। –গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকার হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণদানকালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগারদের কর্তব্য নির্দেশ প্রসঙ্গে তুমুল করতালির মধ্যে ভাবগম্ভীর্যকণ্ঠে এই মর্মে উদাত্ত আহবান জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি দলীয় নেতা ও কর্মীদের প্রতিরোধে কষায়িত নেত্রে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন 'সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগে আত্মকলহ বা দলাদলির প্রশ্রয় দিতে পারে না।' 'দলাদলির ফ্যাশন' বরদাশত করিবার মত সময় আমাদের নাই। মন্ত্রী, এম, এন, এ, বা এম, পি, হওয়ার খায়েশে যদি কেহ আওয়ামী লীগে থাকিয়া থাকেন, তবে এখনও সময় আছে, স্ব-সম্মানে তাঁহারা আওয়ামী লীগ ত্যাগ করিয়া অন্য দলে যোগ দিতে পারেন। যাঁহারা আগাম প্রচার করিতেছেন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন তাঁর জন্য অবধারিত, মনোনয়নকালে এই প্রচারের জন্যই তাঁহাকে অযোগ্য গণ্য করা হইবে।

www.pathagar.com

কোথাও কোথাও নেতৃত্ব লইয়া কিছু কিছু দলাদলির চেষ্টা হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া আওয়ামী প্রধান তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন : এতদিন সবই আমি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখিয়াছি, কিন্তু আর নয়। এখন প্রয়োজন হইলে হাতের দশটি আঙ্গুলের মধ্যে নয়টি আঙ্গুল রক্ষা করিতে একটিকে যদি অপারেশন করিয়া বাদ দিতে হয়, তাহাতেও আওয়ামী লীগ আর দ্বিধাবোধ করিবে না। অতএব সাবধান।

পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে আগত আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ও শতকরা প্রায় একশতজন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে নানাবিধ শ্লোগান সম্বলিত পোস্টারে শোভিত সুদৃশ্য মণ্ডপের নীচে দাঁড়াইয়া আওয়ামী লীগ প্রধান পাকিস্তানের বিগত ২৩ বৎসরের রাজনীতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। দীর্ঘ ৮০ মিনিটের বক্তৃতায় শেখ সাহেব এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পর্যায়ে পর্যায়ে ছাত্র-যুবক-মেহনতী মানুষের অবদানের ইতিহাস ও *ইত্তেফাকের* প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেনের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নির্যাতন ভোগের কাহিনী বর্ণনা করিবার কালে সভামণ্ডপে যেমন করুণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তেম্নি কোমলে-কঠোরে, কখনও বা ভাবগম্ভীর কণ্ঠে তিনি যখন এক এক করিয়া আগামীদিনের পথ নির্দেশ দিতে থাকেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখে-মুখে প্রত্যয়দৃঢ় অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট হইয়া প্রতিভাত হইতে থাকে।

মুহূর্মুহু করতালি, হর্ষধ্বনি ও কখনওবা কণ্ঠবিদারী শ্লোগানের মধ্যে তিনি আওয়ামী লীগ ও ৬-দফার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের অপপ্রচারের জবাব দেন এবং আগামী নির্বাচনের প্রশ্নে সরকারের উদ্দেশে আওয়ামী লীগের বক্তব্য পেশ করেন। পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থে বিগত ২৩ বৎসরে পূর্ব পাকিস্তানের ত্যাগ স্বীকারের দফাওয়ারী বিবরণ দিয়া দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, জাতীয় সংহতির খাতিরে দিতে দিতে বাংলা শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আর দিবার মত তাহাদের কিছু নাই। এবার তাহাদের প্রাপ্য আদায়ের পালা। এবার আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার ফিরাইয়া পাইতে চাই– 'কলোনী' হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করিতে দিতে আমরা আর রাজী নহি।

ছয়-দফা বিরোধী অপপ্রচারের জবাবে পশ্চিম পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অপপ্রচারকারীদের নিকট এই জবাব পৌঁছাইয়া দিতে চান যে, তাঁহারা যত অপপ্রচার করিবেন আওয়ামী লীগ ও ৬-দফার জনপ্রিয়তা ততই বাড়িবে। কেননা, দেশবাসী জানে যে, এই অপপ্রচারকারীরাই তাহাদিগকে গত ২৩ বৎসর যাবৎ শোষণ করিয়াছে আর ৬-দফা তাহাদের এই শোষণের অবসান ঘটানোরই হাতিয়ার। জামাতে ইসলামীর ইসলাম বিপন্নের ধুয়ার উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে দেশের শতকরা ৯০ জন অধিবাসীই মুসলমান, সেদেশে ইসলাম বিপন্ন হইতে পারে, একথা বিশ্বাস করিবে কেবল তাহারাই যাহাদের নিজেদেরই ঈমান বলিতে কিছু নাই অথবা যাহারা ইসলামের নাম ভাঙাইয়া গোপন উদ্দেশ্য হাসিল করিতে চান। তিনি বলেন, ১৪০০ বৎসর ধরিয়া ইসলাম ঠিকই বাঁচিয়া আছে, বাঁচিয়া থাকবেও।

নির্বাচনের প্রশ্নে আসিয়া আইনগত কাঠামো নির্দেশের ২৫ ও ২৭ নম্বর ধারার উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ দুইটি ধারা প্রত্যাহারের জন্য আমরা প্রেসিডেন্টের নিকট দাবী জানাইয়াছি। তিনি আমাদের এ দাবী গ্রহণ করুন, আর না করুন,

www.pathagar.com

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ শরীক হইবেই। এ প্রসঙ্গে আমি প্রেসিডেন্টকে জানাইয়া দিতে চাই যে, আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতার উপরে আর কোন ক্ষমতা থাকতে পারে না, কেননা জনগণই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক।

শেখ মুজিব বলেন : নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের আপামর মানুষ যদি ৬-দফার পক্ষে ম্যাণ্ডেট দেয়, তবে কি করিয়া তাহা আদায় করিতে হয়, তাহা আমরা জানি।

তুমুল করতালির মধ্যে এক পর্যায়ে শেখ সাহের ঘোষণা করেন : আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের পথই তাহারা বাছিয়া লইয়াছে, কেননা, আওয়ামী লীগ দেশকে ধ্বংস করিতে চাহে না। নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সরকারী ও বেসরকারী সকল মহলকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, এবার যদি নির্বাচন না হয়, তাহা হইলে পাকিস্তানে আর কখনও নির্বাচন হইবে না।

তিনি বলেন, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে আমরা বিশ্বাসী একথা যেমন সত্য, তেমি প্রতিপক্ষ যদি অনিয়মতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকেন, তাহা হইলে জনগণেরও অনিয়মতান্ত্রিক পথে নামিবার অধিকার আছে।

শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় রাজনৈতিক নেতার নামোল্লেখ করিয়া কাউন্সিলরদের সম্মুখে তাহাদের 'অপকীর্তির' নানাবিধ ফিরিস্তি তুলিয়া ধরিয়া আওয়ামী লীগ ও ৬-দফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার হইতে বিরত থাকার জন্য তাহাদের প্রতি আহ্বান জানান।

ছাত্রলীগের সংগ্রামী ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শেখ সাহেব তুমুল করতালির মধ্যে বলেন, ছাত্রলীগ এদেশের গণসংগ্রামের জনক। স্বৈরতান্ত্রিক মুসলিম লীগ সরকারের দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশ যখন ছিল স্তব্ধ, তখন ছাত্রলীগই প্রথম গণজাগরণের প্রতিভূ হিসাবে বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। আজও ছাত্রলীগ তার সংগ্রামী ঐতিহ্যের পতাকা সমুন্নত রাখিয়া গণজাগরণের স্রোতকে তীব্র হইতে তীব্রতর গতিতে আগাইয়া লইয়া যাইতেছে। পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতির বিবরণ দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সে কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রের আজও শেষ হয় নাই। এই পর্যায়ে আদমজী জুট মিল অবিলম্বে চালু করার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন, মিল কেন বন্ধ রাখা হয়, তাহা আমরা জানি। ১৯৫৪ সালের ঘটনা আমরা আজও বিস্মৃত হই নাই। অতএব, নির্বাচন বানচালের কোন কারসাজি এদেশের মানুষ আর বরদাশত করিবেন না। তাই অবিলম্বে মিল চালু করিয়া শ্রমিকদের মতলবী কাজে ব্যবহার হইতে বিরত থাকুন। কর্মীদের প্রতি বক্তৃতার এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, প্রতিষ্ঠান বড় হইলে আত্মকলহ দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আত্মকলহ মীমাংসার জন্য যদি দলীয় সম্পাদককে ব্যস্ত থাকিতে হয়, তবে তাহা দুর্ভাগ্যজনক। দলের অভ্যন্তরে মতদ্বৈধতা থাকিতে পারে কিন্তু সে মতদ্বৈধতা যদি স্বার্থের হলাহলের রূপ পরিগ্রহ করে, তবে তাহা দুঃখজনক ও নিন্দার্হ। পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শোভনও নয়, সুন্দরও নয়। আমি যদি আওয়ামী লীগে থাকি আর আপনারা যদি আমাকে ভালবাসেন তবে আমি কুৎসা

www.pathagar.com

টনাকারীদের এই মুহূর্তে সাবধান হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই। শেখ সাহেব বলেন, কর্মী ভাইরা মনে রাখিবেন পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষাকাতর হইলে মানুষ কোনদিন উন্নতি করিতে পারে না। কর্মীদের আমি সুস্পপষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই, পারস্পারিক কুৎসা যেন আমি আর না শুনি আর যেন কোথাও আত্মকলহের দানা বাঁধিতে আমি না দেখি।

কর্মীদের সতর্ক করিয়া দিয়া শেখ সাহেব বলেন, "যদি মনে করেন ক্ষমতায় যাইবেন, তাহা ভুলও হইতে পারে। জনগণের যে সব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমার ভাইয়েরা বোনেরা অকালে জীবন বিলাইয়া দিয়াছে উহা আদায় না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন হউক বা না হউক আওয়ামী লীগকে প্রোগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।"

শেখ সাহেব তাঁহার সুদীর্ঘ ৮০ মিনিটব্যাপী বক্তৃতায় দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ছয় দফা দাবীর পটভূমি এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের বর্তমান দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সুবিচারের আশায় দেশবাসী একদিন দুঃসহ ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু বাইশ বছরের বলগাহীন শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের নিষ্ঠুর ছোবলে তাদের সব আশা ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ আমলে যে রাজনৈতিক অধিকারটুকু ছিল, মুসলিম লীগ এবং আইয়ুব আমলে উহাও কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। তিনি বলেন, ২২ বছরে গরীব আরও গরীব হইয়াছে, ধনী আরও ধনী হইয়াছে– সোনার এই দেশ আজ অন্তহীন হাহাকার ও নিঃসীম দুঃখের ভাগাড়ে পরিণত হইয়াছে। আওয়ামী প্রধান বলেন, এই অবস্থার অবসান ঘটাইয়া দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য স্বায়ত্তশাসন, সুখ-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্যই ছয় দফা দাবী পেশ করা হইয়াছে।

এ সংগ্রাম শোষকদের বিরুদ্ধে

শেখ মুজিব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়, শোষক, জায়গীরদার ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধেই আওয়ামী লীগের সংগ্রাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাকিস্তানের ২২টি শোষক পরিবারই পশ্চিম পাকিস্তানী। তিনি বলেন, "ছয় দফা" শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নয়–পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও। আমরা যা চাই, পশ্চিম পাকিস্তানীদেরও তা দিতে চাই। তবু শোষকরা বাঙালিদের দেশপ্রেমে সন্দেহ করে কেন, আমি বুঝিতে পারি না। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামও আওয়ামী লীগের সংগ্রাম। শেখ সাহেব দুঃখ করিয়া বলেন যে, ১৯৬৬ সালে লাহোরে এক বৈঠকে ছয়-দফা দাবী পেশ করিলে মওদুদী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহরা উহা আলোচনা করিতেও অস্বীকৃতি জানান। বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হয়, ৭ কোটি বাঙালীকে দাবাইয়া রাখার সাধ্য কাহারও নাই। তিনি বলেন, এই ছয়-দফার বিরুদ্ধে "গৃহযুদ্ধ" ও "অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের" মকিদানকারী আইয়ুব খান হইতে শুরু করিয়া মওদুদী, নসরুল্লাহ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, কাইয়ুম খান সবাই একই ভাষায় কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ১৯৬৬ সালের জুনে ৬-দফা দাবীতে আন্দোলনকারী শ্রমিকজনতার উপর নির্মম গুলীবর্ষণ হইতে শুরু করিয়া

www.pathagar.com

এপর্যন্ত ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, অপপ্রচার বা শক্তি ও নির্যাতন চালাইয়া কো আন্দোলন দাবাইয়া দেওয়া যায় না। বরং উহা নবশক্তিতে নূতন আগুন ছড়াইয় বিস্ফোরিত হয়।

এই জুলুমের অবসান চাই

প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর নির্বিচারে জুলুম চলিতেছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া শেখ সাহেব অভিযোগ করেন যে, নানা অজুহাতে তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনে অভিযোগ আনিয়া শাস্তি দেওয়া হইতেছে, অপরপক্ষে অন্যান্য দলের লোক অপেক্ষাকৃত বড় অপরাধ করিয়াও সামরিক আইনের আওতায় পড়িতেছে না। এই 'বৈষম্যমূলক আচরণের' উদাহরণদান প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন যে, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে বিপুল সংখ্যক কর্মীকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে এবং অনেকের বিরুদ্ধে মামলা ঝুলিতেছে। অথচ ফেনীতে আওয়ামী লীগ কর্মী শামসুকে ছুরিকাঘাতকারীদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনে অভিযোগ আনা হয় নাই। তিনি বলেন, সিরাজগঞ্জে সংঘটিত এক সংঘর্ষের দায়ে আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে সামরিক আইনে অভিযোগ আনা হইয়াছে, মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতিকে জামিন দিয়াও পরে উহা বাতিল করা হইয়াছে। কিন্তু কাইয়ুম খানের সমর্থকদের প্রচলিত সাধারণ আইন বলেই বিচার করা হইতেছে। তিনি বলেন, বার বার এব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াও ফল হয় নাই। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ কর্মীবাহিনী মার খাওয়ার জন্য সৃষ্টি হয় নাই। অনবরত জুলুম আর অবিচার সহ্য করাও দুঃসহ।

শেখ সাহেব বলেন, যদি কেউ ভাবিয়া থাকে যে, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের জেলে দিয়া গুলী করিয়া নির্বাচন বানচাল করা যাইবে তবে ভুল হইবে। এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীও নির্বাচন বানচালের চেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ প্রধান নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত সর্বশক্তি দিয়া প্রতিহত করার জন্য দলীয় কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। (অসমাপ্ত)

সূত্র : ইত্তেফাক, ৫ই জুন ১৯৭০, পৃ. ১, ১০

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : নয়

'দেশ গড়ার সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন' : আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান, ১৯৭২

১৯৭২ সালের ৬-৭ই এপ্রিল কাকরাইল আওয়ামী লীগ অফিসের সম্মুখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দুইদিনব্যাপী স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ রাখেন, ইত্তেফাক পত্রিকায় তার অংশবিশেষ ছাপা হয়। পত্রিকার পাতা থেকে তাঁর সে ভাষণ এখানে তুলে ধরা হলো।

জাতির জনক ও আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, বাংলার মাটি সোনার মাটি, বাংলার মানুষ সোনার মানুষ। ইহা হইতেই সোনার বাংলাদেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্বাধীনতা ও বিপ্লবোত্তর নূতন পরিবেশ ও পরিস্থিতির পটভূমিতে আহূত আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে গতকাল (শুক্রবার) বক্তৃতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, অপরিমিত ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে বিফল হইতে দেওয়া হইবে না।

যে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে তাহার চেয়েও অধিক ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমের মনোভাব লইয়া দেশ গড়া ও মানুষের সার্বিক মঙ্গলের জন্য আগাইয়া আসার জন্য বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। তুমুল করতালি ও উল্লাস ধ্বনির মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম, দেশবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, এই সরকার আওয়ামী লীগের সরকার। ইহা সরকারের আওয়ামী লীগ নহে।

আওয়ামী লীগ প্রধান কর্মী, নেতা এবং পরিষদ সদস্যদের সর্ব প্রকার লোভ ও লালসা ত্যাগ করিয়া দেশগড়া ও প্রতিষ্ঠানের কাজ করার উপদেশ দেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাইতে হইবে। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য তিনি কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। দলীয় কর্মী ও নেতাদের আত্মকলহ ভুলিয়া গিয়া দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য তিনি উপদেশ দেন। কোন কোন পরিষদ সদস্যকেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সতর্ক করিয়া দেন। আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, তাঁহার সরকারের মূলনীতি ও স্তম্ভ হইল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। এই নীতির ভিত্তিতেই আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালিত হইবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতা দানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুজাফফর ন্যাপ, কংগ্রেস, শ্রমিক

www.pathagar.com

সংস্থা, ছাত্র সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও উহার নেতাদের ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

চোর-ডাকাত-রাজাকারদের ধরাইয়া দিন

চোর, ডাকাত ও রাজাকারদের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ইহাদের দমন করা হইবে। ইহাদের ধরাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি আওয়ামী লীগ কর্মী ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

পররাষ্ট্র নীতি

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, তাঁহার সরকারের পররাষ্ট্র নীতি হইল স্বাধীন, সক্রিয় নিরপেক্ষতা, সকলের সহিত বন্ধুত্ব, সম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ এবং যুদ্ধ চুক্তি বিরোধী। বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সর্বদা সাহায্য করিবে বলিয়া বঙ্গবন্ধু জানান।

পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের বিষয় উল্লেখ করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আর তাহাদের আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন না। খুনী লুটেরা ও নারীধর্ষণকারী পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের কথা উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, তাহাদের বিচার করা হইবেই। বঙ্গবন্ধু জানান, তাহারা বাংলাদেশে যে জঘন্য ও অমানুষিক কাজ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের পাকিস্তানী বলিয়া দাবী না করার জন্য বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে পরামর্শ দেন। বিশ্ব আজ তাহাদের সকল অপরাধের বিষয় জানিয়াছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, তাহার আর বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। ভুট্টো অনেক দূরে আছেন, তাই নিরাপদে আছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান ও ভারতের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর প্রতি উপদেশ দেন।

বাংলাদেশের সম্পদ এদেশের মানুষের সম্পদ

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাউন্সিলার ও ডেলিগেটদের তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের সম্পদ এদেশের মানুষের সম্পদ। তিনি জানান এদেশে কাহাকেও ১ শত বিঘার বেশী জমি রাখিতে দেওয়া হইবে না। এই সিদ্ধান্তের দরুন কাহারো কাহারো অসুবিধা সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, জনসাধারণের নিকট প্রদত্ত আওয়ামী লীগের সকল প্রতিশ্রুতি পালন করা হইবে।

বাঙালী জাতীয়তাবাদের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, জাতীয়তাবাদ আমাদের আদর্শ। তিনি বলেন, ইহা স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্র এবং এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। কেউ কেউ উহাকে চরম উগ্র জাতীয়তাবাদ বলিতে পারেন। কিন্তু আমাদের এই জাতীয়তাবোধ জিয়াইয়া রাখিতে

www.pathagar.com

হইবে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের জনক আরও বলেন, জাতীয়তাবোধ ছাড়া কোন জাতিই স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে নাই।

"গণতন্ত্র আমরা দিবই"

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার সরকারের নীতির উল্লেখ করিয়া বলেন, আমরা মানুষকে গণতন্ত্র দিবই। তাঁহারা পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করিতে পারিবেন। শেখ মুজিবুর রহমান জানান, গণতন্ত্রের অর্থ যা খুশি তাই করা নয়। তিনি আরও জানান, গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করিয়া কেহ যদি কোন বিদেশি রাষ্ট্রের এজেন্ট হিসাবে দেশের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন, তাহাকে সেই লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারে না।

প্রত্যেক ইউনিয়নে সমবায় দোকান খোলা হইবে

কালোবাজারী ও দ্রব্যের উচ্চমূল্যের উল্লেখ করিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ইহারা দেশের মায়ায় জনগণের পাশে দাঁড়াইতে বা সাড়া দিতে পারে নাই। তিনি জানান, সরকার দেশের প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া ন্যায্যমূল্যের সমবায় দোকান খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত এইসব দোকান হইতে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হইবে। বঙ্গবন্ধু বলেন : আগামী ৭ দিনের মধ্যে জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস না করা হইলে সকল পাইকারী বিক্রেতার লাইসেন্স বাতিল করা হইবে।

দখল করা গাড়ী-বাড়ী ফেরত দিতে হইবে

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বে-আইনীভাবে দখল করা মোটর গাড়ী ও বাড়ীর উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহা তাহাদের ফেরত দিতে হইবে। অন্যথায় তাহাদের জেলে যাইতে হইবে বলিয়া বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলারদের জানান।

প্রত্যেক মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হইবে

আওয়ামী লীগ প্রধান কাউন্সিলারদের আরও জানান, প্রত্যেক মহকুমাকে ভবিষ্যতে জেলায় উন্নীত করা হইবে। প্রয়োজনবোধে কোন কোন মহকুমাকে পুনর্গঠন করা হইবে।

আমালাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করিতে হইবে

দেশের আমলাতন্ত্রীদের সাবধান করিয়া জাতির পিতা বলেন, তাহাদের মানসিকতার পরিবর্তন করিতে হইবে। তিনি জানান, আমলাতন্ত্রীদের মনোভাব পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া মানসিকতা পরিবর্তন পূর্বক এদেশের মানুষের সেবক হিসাবে কাজ করিতে ব্যর্থ হইলে হুক্কার খোল-কলিকা সবই বদলাইতে হইবে।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ৮ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১,৭, ৮

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : দশ

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব, ১৯৭২

১৯৭২ সালের ৭-৮ই এপ্রিল কাকরাইল আওয়ামী লীগ অফিসের সম্মুখে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দুইদিনব্যাপী প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ কাউন্সিলে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, ইত্তেফাক পত্রিকা থেকে তা এখানে তুলে ধরা হলো।

গত শনিবার আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মুজিববাদের সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানান।

কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই ব্যাপারে দলীয় গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধনের প্রয়োজন নাই।

অপর প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটিসমূহ গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

কাউন্সিল অধিবেশনে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

একটি পৃথক প্রস্তাবে বীরাঙ্গনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া তাহাদের দ্রুত ও সম্মানজনক সামাজিক পুনর্বাসনের কথা বলা হয়।

সরকারের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া জাতির পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আগাইয়া আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা

কাউন্সিল অধিবেশনের এক প্রস্তাবে বর্তমানের শোষণ, অবিচার, দুর্নীতি, কালোবাজারী এবং অন্যান্য সামাজিক অপরাধের মূলচ্ছেদ দ্বারা একটি সুখী ও শক্তিশালী সমাজ গঠনের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান হয়।

www.pathagar.com

পররাষ্ট্র নীতি

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির প্রতি অধিবেশনে পূর্ণ সমর্থন দান করা হয়। শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হয়।

উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে

কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ এবং শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বের যে-কোন অঞ্চলের জনগণ রুখিয়া দাঁড়াইলে আওয়ামী লীগ তাহার প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জানাইবে।

প্রস্তাবে বলা হয় যে, বিশ্বের যে-কোন অঞ্চলের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি জনতা সমর্থন যোগাইবে।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি অভিনন্দিত

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের এক প্রস্তাবে বাংলাদেশ-ভারত ও সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিকে অভিনন্দন জানানো হয় এবং বলা হয় যে, এই মৈত্রী চুক্তি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ও এই এলাকার সমস্যাদি সমাধানের সহায়তা করিবে।

বিশ্বের জনগণ ও সংবাদপত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা

সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি বিশ্বের যে সমস্ত দেশ, জনগণ এবং সংবাদপত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন দান করিয়াছিলেন, প্রস্তাবে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে বিশেষ করিয়া ভারতের জনগণ, সরকার এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান হয় এবং বলা হয় যে, বাংলাদেশ, ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

আটক বাঙ্গালীদের ব্যাপারে উদ্বেগ

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের এক প্রস্তাবে পাকিস্তানের শাসককে সেখানকার বাঙ্গালীদের সঙ্গে যে বর্বরোচিত ব্যবহার করিতেছে তাহার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং তাহাদের অবিলম্বে ফেরত দেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। এই ব্যাপারে পাক সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করিবার জন্য বিশ্বের জাগ্রত মানবসমাজ ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবী

বাংলাদেশে বিভিন্ন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী কাউন্সিল অধিবেশনে এক প্রস্তাবে তোলা হয় এবং বলা হয় যে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্ন ও পাকিস্তানে আটক নিরীহ বাঙ্গালীদের স্বদেশ ফেরত দানের প্রশ্ন এক নয়।

www.pathagar.com

রাজাকার ও দালালদের বিচারের দাবী

অধিবেশনের এক প্রস্তাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যে সমস্ত রাজাকার, আল বদর, আল শামস এবং শান্তি কমিটির সদস্যরা দখলদার বাহিনীর সাথে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করিয়াছিল, তাহাদের শাস্তি প্রদানের দাবী জানানো হয়।

দুষ্কৃতিকারীদের প্রতি কঠোর হুশিয়ারি

যে সমস্ত দুষ্কৃতিকারী দালাল, চরমপন্থি এবং তথাকথিত অতি প্রগতিবাদী সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটাইতেছে, এক প্রস্তাবে তাহাদের সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ১০ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৩

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : এগারো

আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো, ১৯৭২

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৩ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ১৯৭২ সালের ৭-৮ই এপ্রিল কাকরাইল আওয়ামী লীগ অফিসের সম্মুখে স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগের প্রথম দুইদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তাতে দলের 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ' নতুন নামকরণসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শের আলোকে নতুন ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এটি কাউন্সিল সভায় পেশ করেন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক-এর পাতা থেকে তা উদ্ধৃত করা হলো।

ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, পুলিস, ই.পি.আর. প্রভৃতি যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

উহাতে বলা হয় যে, এক যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু দেশ গঠনের সংগ্রাম এখনো শেষ হয় নাই। নির্জীব কুটির শিল্প, কল-কারখানা চালু এবং বেকার ও বুভুক্ষু জনতার পুনর্বাসনের মাধ্যমে সোনার বাংলায় শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আওয়ামী লীগের পাশে আসিয়া জনতা ১৯৭০ সনের নির্বাচনে যেভাবে দাঁড়াইয়াছিল, ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা-সংগ্রামেও তাই করিয়াছে এবং দেশ গড়িয়া তোলার দায়িত্ব পালনেও তেমনিভাবে সাড়া যোগাইবে।

শাসনতন্ত্রের মূলনীতি

জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র–এই চারটি আদর্শই হইবে শাসনতন্ত্রের মূলনীতি।

ইহাতে আরও বলা হয় যে সাবেক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক চাকুরীর বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, মহকুমাগুলিকে জেলায় পরিণত করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে।

অর্থনৈতিক আদর্শ ও কর্মসূচী

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নতি বিধানে সমাজতন্ত্রের দিকে আগাইয়া যাইতে হইবে। আমাদের নিজেদের সম্পদের উপর লক্ষ্য রাখিয়া সম্মুখের দিকে আগাইয়া যাইতে হইবে।

জাতীয়করণ ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ

গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে জাতীয়করণ করিয়া সরকারী পরিচালনাধীনে আনা হইবে। প্রয়োজন মোতাবেক অন্যান্য শিল্প ইউনিটগুলিকেও জাতীয়করণ করা হইবে।

www.pathagar.com

আয়কর ব্যবস্থা

আয়কর ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করা হইবে। সকল বকেয়া কর ও কৃষকদের ২৫ বিঘা জমির খাজনা মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

প্রতিটি ইউনিয়নে সমবায় ভিত্তিতে একটি করিয়া ন্যায্য মূল্যের দোকান স্থাপন করা হইবে, যেখান হইতে চাউল, গম, তৈল ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যাইবে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ

বাধ্যতামূলকভাবে আয় সীমিতকরণের জন্য নূতন করনীতি প্রবর্তন করা হইবে। বিলাস দ্রব্য ও বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও গ্রামীণ কুটির ও কৃষি শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

শিল্প ব্যবস্থা

নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্যাদির ও মৌলিক দ্রব্যের জন্য শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে, বিশেষ করিয়া তাঁতশিল্পকে সমবায়ের মাধ্যমে কাঁচামাল সরবরাহ, ঋণদান ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষি-বিপ্লব

সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে থানা ও ইউনিয়ন ভিত্তিতে কৃষিভাণ্ডার ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। আওয়ামী লীগ কৃষিব্যবস্থাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে।

ভূমি ব্যবস্থা

প্রত্যেক পরিবারের ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি নির্ধারিত থাকিবে, ২৫ বিঘার উপরে কোন খাজনা লাগিবে না। কৃষকরাই যাহাতে জমির প্রকৃত মালিক হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে পাট, আখ, তামাক, চা, বনজ সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, মৎস্য চাষ, ফলের চাষ, গৃহপালিত পশু ও ডায়েরী ফার্ম, বিদ্যুৎশক্তি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচব্যবস্থা, নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির উন্নতি বিধানে বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে বলিয়া জানানো হয়।

শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা

শ্রমিকদের উপযুক্ত বাসস্থান, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা, অসুস্থ শ্রমিকের বাৎসরিক এক মাসের বেতনসহ ছুটির সুবিধা ও ন্যায্যমূল্যের দোকান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। শ্রমিকরা পুঁজিবাদী মালিকদের শোষণ হইতে মুক্তি পাইবেন বলিয়া ইহাতে বলা হয়। মহিলাদের পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার দান, মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকারসহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্যকে গণমুখী করিয়া তোলা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলার ব্যবস্থাদিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আওয়ামী লীগ ম্যানিফেস্টোতে আলোকপাত করা হয়।

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ১০ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৩

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : বারো

'এক যুদ্ধের শেষ আর এক যুদ্ধের শুরু' : বিজয় দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের প্রাক্কালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে ভাষণ রাখেন। এটি ১৯৭৪ সালের ১৮-২০শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষ্যে দৈনিক ইত্তেফাক-এ ক্রোড়পত্রে ছাপা হয়। এটি বঙ্গবন্ধুর মহামূল্যবান একটি ভাষণ, যা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য পাঠ্য।

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আমি আপনাদের আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামীকাল ষোলই ডিসেম্বর, আমাদের জাতীয় দিবস। আরও স্পষ্ট কথায় বিজয় দিবস। লাখো শহীদের রক্তমাখা এই দিন। লাখো মা-বোনের অশ্রুভেজা এই দিন। আবার সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার এই দিন। এই দিন আমরা পরাধীনতার শিকল থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমার বাংলার মানুষ বিদেশি অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত হয়েছে। এই দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে বড় বেশী পবিত্র, বেশী গৌরব ও আবেগাপ্লুত। এইদিন আমরা শোকের সংগে স্মরণ করি আমাদের শহীদ স্বাধীনতা কামীদের। আবার এই দিন আমরা আনন্দ ও উৎসব করি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাফল্যের জন্য। এই দিন এক যুদ্ধের শেষ, আরেক যুদ্ধের শুরু। উনিশ শ একাত্তর সালের এই ডিসেম্বর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি। একই দিনে আমাদের দেশ গড়ার সংগ্রাম শুরু। স্বাধীনতা সংগ্রামের চাইতেও দেশ গড়ার সংগ্রাম বেশী কঠিন। দেশ গড়ার সংগ্রামে আরও ত্যাগ, আরও বেশী ধৈর্য, আরও বেশী পরিশ্রম দরকার। জনতার সংগ্রামে আমাদের ২৪ বছর লেগেছে। দেশ গড়ার সংগ্রামে আরও বেশী সময় লাগার কথা। কিন্তু আমরা একটু কষ্ট করি, একটু পরিশ্রম করি, সকলেই নিজের থেকে সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করি। সবচাইতে বড় কথা– সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকি, তা'হলে বিনা দ্বিধায় বলতে পারব, ইনশাআল্লাহ, কয়েক বছরেই আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

সংগ্রামী বন্ধুরা,

আজ আপনাদের কাছে আমি হাজির হয়েছি বাণী দেওয়ার জন্য নয়, ভাষণ দেওয়ার জন্য নয়, হাজির হয়েছি মনের কথা খুলে বলার জন্য। এর আগে কি নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম? চারিদিকে অসংখ্য নরকঙ্কাল, বুদ্ধিজীবীর লাশ, বীরাঙ্গনা মা ও বোনের হাহাকার, অচল কলকারখানা, থানা, আইন-আদালত পর্যন্ত বিধ্বস্ত, ব্যাঙ্কে তালা, ট্রেজারী খালি, রেলের চাকা বন্ধ, রাস্তা-ব্রিজ ধ্বংস, বিমান ও জাহাজ একখানাও নাই।

www.pathagar.com

যুদ্ধের জন্য অনেক ক্ষেতে ফসল বোনা সম্ভব হয়নি। পাট ঘরে ওঠেনি। নৌকা, স্টিমার, লঞ্চ, বাস, লরী, ট্রাকের শতকরা সত্তর ভাগ হয় নষ্ট, না হয় অচল। অনেকের হাতে তখন অস্ত্র। তাদের মধ্যে আছে বহু দুষ্কৃতিকারী। আমাদের প্রয়োজনীয় সৈন্য ছিল না। পুলিস ছিল না। জাতীয় সরকারের কাজ চালাবার মত দক্ষ অফিসারও ছিল না। তখন পাকিস্তানে বন্দী কয়েক লাখ বাঙ্গালী। ভারত থেকে ফিরে আসছে প্রায় এক কোটি বাঙ্গালী উদ্বাস্তু–যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদারদের অত্যাচারে দেশত্যাগ করেছিল। তখনই দরকার এদের জন্য রিলিফ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। ক্ষুধার্ত বাঙ্গালীকে বাঁচানোর জন্য চাই অবিলম্বে খাদ্য। ঔষধ চাই। কাপড় চাই। চারদিকে এই চাই চাই আর নাই নাই-এর মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু। উনিশ শো একাত্তর থেকে উনিশ শো তিয়াত্তর। সময় হিসাবে মাত্র দু'বছর। এই দু'বছরে আমরা কি পেরেছি আর কি পারি নাই, আজ তারও খতিয়ান এবং আত্মবিশ্লেষণের দিন। আমি বড় দাবী করি না। আমরা কোন ভুল করি নাই বা কোন কাজে ত্রুটি হয় নাই এমন কথাও বলি না। শুধু অনুরোধ করবো, আপনাদের চারপাশে পৃথিবীর আরও অনেক দেশের ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। আমেরিকা পৃথিবীর সব চাইতে ধনী দেশ। এই আমেরিকাকেও স্বাধীনতা লাভের পর দুই দুইটি গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়েছে। আজকের অবস্থায় পৌঁছতে আমেরিকার সময় লেগেছে প্রায় একশো বছর। সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি গড়ে তুলতে ত্রিশ বছর প্রত্যেকটি মানুষকে একটানা কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। সোভিয়েত বিপ্লবের পর প্রথম পাঁচ বছরে দুর্ভিক্ষে মারা গেছে অসংখ্য লোক। সমাজতন্ত্রের শত্রু অসংখ্য লোককে প্রাণদণ্ড দিতে হয়েছে। নয়া চীন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের পঁচিশ বছর পর এখনও খাদ্যে আত্মনির্ভর হয়নি। শ্রমিকদের অল্প মজুরী এবং বছরে দুই প্রস্থ কাপড় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমাদের প্রতিবেশী মিত্র রাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে এখনো চলছে গরীবী হটাও আন্দোলন।

পৃথিবীর এইসব বড় বড় দেশের পাশাপাশি এই ছোট এবং গরীব বাংলাদেশের কথা বাঙ্গালী হয়ে একবার ভেবে দেখুন। বিপ্লবের পর স্বাধীনতার শত্রু হিসাবে যারা অভিযুক্ত হয়েছিল তাদেরও আমরা হত্যা করি নাই, ক্ষমা করেছি। দুর্ভিক্ষে যাতে মানুষ না মরে তার চেষ্টা করেছি। ভিক্ষা করে হলেও বিদেশ থেকে খাদ্য এনেছি। বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল খালি ছিল। তবু পরণের কাপড়, রোগের ঔষধ আমদানীর চেষ্টা করেছি। এক কোটি উদ্বাস্তুকে ছ'মাসে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে যতটা সম্ভব রিলিফ পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব চাইতে কম সময়ে ভাঙা রাস্তা, রেলব্রিজ মেরামত করা হয়েছে। পাকিস্তানীরা যে ভৈরব সেতু ভেঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা খতম করতে চেয়েছিল, তা আবার তৈরী করা হয়েছে। আমি জানি না, রক্তাক্ত বিপ্লবের পর পৃথিবীর আর কোন দেশে সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন চালু করা হয়েছে কি-না। আমার জানা মতে হয়নি। বাংলাদেশে তা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার বিপ্লবের এক বছরের মধ্যে সংবিধান তৈরী করেছে। নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে। ভোট দেওয়ার বয়স একুশের বদলে আঠার বছর করে ভোটাধিকারের সীমানা বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের নিজস্ব বিমান এখন উড়ছে দেশ-বিদেশের আকাশে। তৈরী হয়েছে নিজস্ব বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

জাহাজ বহর। বি,ডি,আর, সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত। স্থলবাহিনী মাতৃভূমির উপর যে কোন হামলা প্রতিরোধে প্রস্তুত। গড়ে উঠেছে আমাদের নিজস্ব নৌ ও বিমান বাহিনী। থানা ও পুলিস সংগঠনের যে শতকরা ৭০ ভাগ পাকিস্তানী হানাদারেরা নষ্ট করেছিল এখন আবার তা গড়ে উঠেছে। জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে আইন ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে সরকার এখন আরও নজর দিতে পারবেন। একটা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে আবার গড়ে তোলার ব্যাপারে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আমাদের সাফল্য যেমন আছে তেমনি আছে ভুল-ভ্রান্তি। কিন্তু মাত্র দু'বছরের ভুল-ভ্রান্তির তুলনায় বাংলাদেশের সাফল্য ও অগ্রগতি আপনারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে একবার বিবেচনা করে দেখুন, এই আমার অনুরোধ। এই ভাঙা দেশকে গড়ার কাজে আমি আপনাদের কাছে বিশ-ত্রিশ বছর নয়, মাত্র তিন বছর সময় চেয়েছিলাম, এই তিন বছরে আমি আপনাদের কিছুই দিতে পারবো না। তবু তিন বছরের দু'বছরেই আমার চেষ্টা কতটা আন্তরিক ছিল, আপনারাই তা বিচার করে দেখবেন। বিপ্লবের পক্ষে আপনারা যে বিপুল আস্থা ও সমর্থন আমাকে দিয়েছেন, তাতে রেজিমেনটেশনের পথে দেশের মানুষের মুখ বন্ধ করে উন্নতির পন্থা আমি গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু আমি চেয়েছি আপনাদের সম্মতি ও নির্দেশ নিয়ে এই দেশের ভাগ্য ফেরাতে। দেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে সামজতন্ত্র কায়েম করতে। দেশের সকল ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসা এখন আপনাদের। কলকারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শতকরা আশি ভাগের মালিক আপনারা। এখন উৎপাদন বাড়িয়ে, সকলে মিলে কাজ করে একথাটাই বিশ্বের কাছে প্রামাণ করতে হবে, বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতার পবিত্র আমানত রক্ষার উপযুক্ত। সে তার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও প্রয়োগেও সক্ষম। গণতন্ত্রের অর্থ যা-খুশি বলা বা করা নয়। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা শুধু অসন্তোষ প্রচার করেন, অন্যের সমালোচনা করেন। কিন্তু আত্মসমালোচনা করেন না। বাংলাদেশকে আমরা যদি প্রকৃতই একটি শান্তিকামী শোষণমুক্ত দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির মনোভাব গ্রহণ করা দরকার।

প্রিয় বন্ধুরা,

ষোলই ডিসেম্বরের সঙ্গে আমাদের অনেক ব্যথা, বেদনা, আনন্দ, গৌরব এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত। এই দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রায় এক লাখ পরাজিত শত্রু আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আরও শক্তিশালী শত্রু। এই শত্রু হল, অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও দুর্নীতি। এই যুদ্ধের জয় সহজ নয়। অবিরাম এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং একটি সুখী-সুন্দর অভাবমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তবেই হবে আপনাদের সংগ্রাম সফল। আপনাদের শেখ মুজিবুরের স্বপ্ন ও সাধনার সমাপ্তি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একটি বছর ছিল ভাঙ্গা দেশটাকে কোন রকমে খাড়া করার সময়। নবজাত শিশু যাতে আঁতুড় ঘরে মারা না যায়, তার চেষ্টা করার সময়। এই সময় সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ও দুর্ভিক্ষ ঠেকানোর জন্য। এই এক বছরে আমরা আমাদের বন্ধু দেশগুলো থেকে যে

www.pathagar.com

সাহায্য পেয়েছি, তা আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। পাকিস্তানের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ সংস্থা, এমনকি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলেরও আমরা সদস্য। তাতেই প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আজ বাংলাদেশের পাশে। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে বড় বড় শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ হয়েছে। ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবস্থা সরকারের মালিকানায় আনা হয়েছে। পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা তুলে দেওয়া হয়েছে। এটাকে আমরা বলতে পারি শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের চেষ্টা। অন্যদিকে চলছে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা। ফলে বাংলাদেশে ধীর গতিতে হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্যাটার্ন বদলাতে চলেছে। একটা কৃষিনির্ভর আধাসামন্ত সামাজিক অবস্থা থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার চেষ্টায় আমরা নিযুক্ত রয়েছি। তবু বলবো, আমরা রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করেছি। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি এখনো অর্জন করতে পারি নাই। আমাদের এবারের সংগ্রাম অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম। আমি যে সুখী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি এবং দুঃখও বরণ করেছি সেই বাংলাদেশ এখনও আমার স্বপ্নই রয়ে গেছে। গরীব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন হাসি না ফুটবে, ততদিন আমার মনে শান্তি নাই। এই স্বাধীনতা আমার কাছে তখনি প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে– যেদিন বাংলাদেশে কৃষক, মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে। তাই আসুন, এইদিনে অভাব, দারিদ্র্য, রোগ-শোক ও জরার বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করি। সংগ্রাম ঘোষণা করি চোরাচালানী, কালোবাজারী, অসৎ ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারলে সোনার বাংলা গড়ার কাজ সফল হবে না। আর সোনার বাংলা গড়তে না পারলে ত্রিশ লাখ বাঙ্গালী যে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, সেই স্বাধীনতাও অর্থহীন হয়ে যাবে। স্বাধীনতা লাভের পরেও সমাজদেহের রন্ধ্রে যে অন্যায়, অবিচার ও শোষণের লীলাখেলা, দুর্নীতির রাজত্ব, তাকে উৎখাত করতেই হবে। আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য চিরদিন আপনাদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছি। আজো আমি আপনাদের সহযোদ্ধা হিসাবে আপনাদেরই পাশে আছি। দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করবো।

বন্ধুগণ, স্বাধীনতার প্রথম বছরে আমরা অনেক কঠিন কাজ শেষ করার চেষ্টা করেছি। একদিকে ঝড়, বন্যার তাণ্ডব, অন্যদিকে জিনিসপত্রের অভাব। তবু সরকার পূর্ণোদ্যমে রিলিফ ও টেষ্ট-রিলিফের কাজ চালিয়েছে। বীরাঙ্গনাদের পুনর্বাসনের কাজ করা হয়েছে। বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী, স্কুল, থানা, রাস্তা, ব্রিজ, হাসপাতাল মেরামত করা হয়েছে। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন আবার গড়ে তোলা হয়েছে। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অস্ত্র প্রায়ই উদ্ধার করা হয়েছে। মোটামুটি বিচার ব্যবস্থা, আইন ও শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বন্দর ও পোতাশ্রয় থেকে মাইন অপসারণ করা হয়েছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত রানওয়ে, বিমান বন্দর চালু করা হয়েছে। এক বছরেই একটি সংবিধান দেওয়া হয়েছে এবং সেই সংবিধানের আওতায় নতুন সাধারণ নির্বাচন করা হয়েছে। এ-সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ ছিল চার শো কোটি টাকার উপরে।

www.pathagar.com

উনিশ শো বাহাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর থেকে উনিশ শো তিয়াত্তরের ষোলই ডিসেম্বর। এই এক বছরেও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য কম নয়। এই সময়টা আমাদের সংবিধান চালু করার কাল। এ-সময় ভৈরব সেতু তৈরি হওয়ার ফলে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা বড় অসুবিধা দূর হয়েছে। উপমহাদেশে উত্তেজনা দূর করার জন্য দিল্লীচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীরা স্বদেশে ফিরতে শুরু করেছেন। চৌদ্দই ডিসেম্বর পর্যন্ত চৌষট্টি হাজারেরও বেশী বাঙ্গালী দেশে ফিরে এসেছেন। আমাদের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলছে। প্রথম পরিকল্পনাকাল শেষ হলে বাংলাদেশের শুধু অর্থনীতিতে নয় সামাজিক অবস্থাতেও একটা বড় পবির্তন হবে বলে আশা করি। গণশিক্ষার প্রসার এবং পর্যায়ক্রমে বিনা ব্যয়ে শিক্ষার সুযোগ বিস্তারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য এবং জনকল্যাণের খাতেও ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। শীঘ্রই সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তাতে শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আরও গণসংযোগ বাড়বে এবং গ্রাম পর্যায়ে গণপ্রতিনিধিরা দেশকে চালানোর সুযোগ পাবেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার নিজস্ব মর্যাদার আসনটি দখল করেছে। আটোয়ার কমনওয়েলথ সম্মেলন এবং আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ সম্মানিত সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি যুগোস্লাভিয়া ও জাপান সফর করেছি। সেখানেও দেখেছি বাংলাদেশের জন্য তাদের আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশকে গ্রহণ করে অধিকাংশ আরব ও আফ্রিকান দেশ তার সার্বভৌমত্বের প্রতি স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শন করে। আরব দেশগুলোর মধ্যে মিশর, ইরাক, মরক্কো, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, কুয়েত, ইয়েমেন, লেবানন, সিরিয়া, সুদান ও জর্দান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সাম্প্রতিক আরব-ইসরাইল যুদ্ধেও বাংলাদেশ আরব দেশগুলোর দিকে সংগ্রামী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে আরব দেশগুলোর জনসাধারণ বাংলাদেশকে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিশ্বের শান্তি ও স্বাধীনতাকামী সকল দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। বাংলাদেশ শুধু নিজেই মুক্তিসংগ্রামে সাফল্য অর্জন করে ক্ষান্ত নয়, বিশ্বের যে-কোন নিপীড়িত দেশ ও মুক্তি সংগ্রামীদের পাশে আমরা রয়েছি। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকার ও গিনিবিসাউকে আমরা স্বীকৃতি প্রদান করেছি। বাংলাদেশের রপ্তানির বাজার ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমরা যদি উৎপাদন বাড়াতে পারি, তা'হলে বিনা দ্বিধায় এ আশ্বাস আপনাদের দিতে পারি যে, আমাদের আমদানী-নির্ভর অর্থনীতির প্যাটার্ণ খুব শীঘ্রই পালটে যাবে এবং জিনিসপত্রের দাম কমানোও সম্ভব হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

মাত্র দুই বছরে আমরা কি করতে পেরেছি, না পেরেছি আপনারা বিচার করে দেখবেন। দেশে জিনিসপত্রের অসম্ভব চড়া দামের ফলে আপনাদের যে কষ্ট, তা আমি জানি। এই মূল্যবৃদ্ধি শুধু বাংলাদেশেই ঘটেনি, সারা বিশ্বে চলছে এই মূল্যবৃদ্ধির হিড়িক। আমাদের

www.pathagar.com

দেশে উৎপাদন কম। সেই সঙ্গে কিছু মুনাফাখোর ব্যবসায়ী, কালোবাজারী ও চোরাকারবারীর কারসাজি মিলে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। শ্রমিক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, মিলে, কলে-কারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে এ অবস্থার মোকাবিলা করুন। প্রতি বছর খাদ্য আমদানীর খাতে বৈদেশিক মুদ্রার একটা বড় অংশ চলে যায়। কৃষক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে সবুজ বিপ্লব সফল করে তুলুন। বাংলাদেশকে খাদ্যে আত্ম-নির্ভর করে তুলুন। ছাত্র ও যুব শক্তির প্রতি আমার অনুরোধ, নিজেদের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল। সেই সঙ্গে দেশ গড়ার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়। ব্যবসায়ীদের প্রতি আমার অনুরোধ, অতি মুনাফার লোভ সামলান। ব্যবসাকেও দেশ সেবার অঙ্গ করে তুলুন। সরকারী কর্মচারীদের প্রতি আমার নির্দেশ, দায়িত্ব পালনে আরও মন দিন। প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করুন। শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতি আমার আবেদন, দেশ গড়ার সংগ্রামে আপনারাও কিছুটা অংশ নিন। চিকিৎসক, কারিগরসহ সকল পেশাজীবীর কাছেও আজ আমার এই একই অনুরোধ।

যারা ধ্বংস করে, ধ্বংসাত্মক চেষ্টা চালায়, তারা শুধু সরকারের শত্রু নয়, দেশের এবং জনগণের শত্রু। তারা যে সম্পদ ও সম্পত্তি হরণ করে, ধ্বংস করে তা জনগণের সম্পত্তি। কোন পুঁজিপতি বা ব্যক্তি-মালিকের সম্পত্তি নয়। বিপ্লবের নামে যারা উচ্ছৃংখল স্বেচ্ছাচারে মাতেন, তারা বিপ্লবের মিত্র নন, জনগণেরও বন্ধু নন। আপনারা এই গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যারা দালাল আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের নাগরিক হিসাবে স্বাভাবিক জীবন যাপনের আবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অন্যের প্ররোচনায় যারা বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন; তারাও অনুতপ্ত হলে তাদেরও দেশ গড়ার সংগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

বন্ধুগণ, আমরা ইতিহাসের একটা বিরাট সঙ্কটকাল অতিক্রম করছি। এ সময় দরকার ধৈর্য, আত্মত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রম করার মনোভাব। বাংলাদেশ তিনশো বছর লুণ্ঠিত ও শোষিত হয়েছে। এর সমাজ ও অর্থনীতিতে হাজারো সমস্যা। রাতারাতি তা দূর করা যাবে না। সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ চাই। আর সকলকে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের ভাবী বংশধরদের এক সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ উপহার দিতে হবে। আগামীকাল ষোলই ডিসেম্বর, পবিত্র জাতীয় দিবস। আসুন, আজ আমরা সকলে মিলে দেশ গড়ার সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা।

সূত্র : ইত্তেফাক, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১৯

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : তেরো

'দেশের সার্বিক কল্যাণ ও দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য আরও ত্যাগ চাই, শ্রম চাই– চাই আত্ম-সমালোচনা, আত্ম-সংযম ও আত্ম-শুদ্ধি' : আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু, ১৯৭৪

১৯৭৪ সালের ১৮-২০শে জানুয়ারি কাকরাইলে আওয়ামী লীগ অফিসের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে দলের দুইদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশন। দেশে তখন কিছু দল ও গোপন সংগঠন রাজনীতির নামে সশস্ত্র তৎপরতা চালাচ্ছিল। এমনি পটভূমিতে বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলে যে উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন তা ইত্তেফাক-এর পাতা থেকে তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (শুক্রবার) দলীয় কর্মীদের দেশগড়ার এক নতুন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হইয়া শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতঃ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিবার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, "খোদাকে হাজের নাজের করিয়া প্রতিজ্ঞা করুন বাংলার মানুষের কাছে দাঁড়াইতে হইবে, শোষণের অবসান করিতে হইবে, হইবে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাইতে।"

তিনি বলেন, "দেশের স্বাধীনতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, দেশকে শোষণমুক্ত করিতে হইলে প্রয়োজন নিঃস্বার্থ কর্মীর আর, প্রয়োজন আত্মসংযম ও আত্মসমালোচনার। তাহাতেই দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে।

দুই চারজন মানুষের অন্যায়ের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস–উহার বদনাম হইতে দেওয়া যায় না। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন– "এই ধরনের লোকদের আওয়ামী লীগ হইতে উৎখাত করিয়া দিতে হইবে। দলকে কলুষমুক্ত করিতে হইবে।"

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণদান প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন : "লক্ষ লক্ষ বঙ্গ-সন্তানের রক্ত দিয়া অর্জিত এই স্বাধীনতাকে বাঞ্চাল করার জন্য দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্র হইতেছে, কিন্তু আওয়ামী লীগের জীবন থাকিতে কেউ এই স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করিতে পারিবে না।"

তিনি বলেন, "দীর্ঘ দুই বৎসর বৈদেশিক দালালদের 'অস্ত্র দিয়া বিপ্লব' করার হুমকি সহ্য করা হইয়াছে, কিন্তু ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। বঙ্গবন্ধু এইবার কঠোর হইবে।"

www.pathagar.com

তিনি বলেন : 'আমি স্বাধীনতার পর অস্ত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানাইয়াছিলাম। আওয়ামী লীগ কর্মীরা সেই ডাকে সাড়া দিয়াছিল। কিন্তু তোমরা কিছু অস্ত্র গোপন করিয়া রাখিয়াছিলে। আজ যদি আমি আওয়ামী লীগের হাতে অস্ত্র দিই তবে একটারও কল্লা থাকিবে না।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মুক্তির সংগ্রাম এখনও বাকী। মানুষ মুক্তি পাইবে সেইদিন যেদিন দেশে আসিবে অর্থনৈতিক মুক্তি।"

তিনি বলেন : আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর রহিয়াছে এই গুরুদায়িত্ব। শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী বলিয়া যাহারা নিজেদের দাবী করেন তাহারাই দেশে চোরাকারবার ও অন্যবিধ সমাজবিরোধী কার্যে লিপ্ত আছেন বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, "যাহারা চোরাকারবারে লিপ্ত, হঠকারিতা বিদ্যায় পারদর্শী এরা ঔষধের মধ্যে ঔষধ মিশ্রিত করিয়া নিরীহ জনগণকে ধোঁকা দেয়, তাহারা কৃষক-শ্রমিক-মজুর নয়। ইহা তাহারাই করিতে পারে যাহাদের পেটে বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে।"

তাই, তিনি দলীয় কর্মীদের আহ্বান জানান রুখিয়া দাঁড়াইতে ঘুষখোর আর দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'শুধু আইন ও শক্তি দিয়া দুর্নীতি দমন করা যায় না। ইহার জন্য জনমত সৃষ্টি করা প্রয়োজন।' বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন, 'স্বাধীনতা অর্জন করা যেমন কষ্টকর, তাহা রক্ষা করাও তেমনই কষ্টকর।' তিনি বলেন, 'চারটি স্তম্ভের (জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা) উপর ভিত্তি করিয়া যে নীতি আওয়ামী লীগ গ্রহণ করিয়াছে তাহা নির্ভুল। ইহা রক্ষা করার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী কর্মীদের।' তিনি বলেন, 'যদি কেহ তাহা পছন্দ না করেন, কোন একটিতে দ্বিমত পোষণ করেন তবে তাহার দল ত্যাগ করাই উচিত। নীতি ও আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। মানুষ মরিতে পারে, কিন্তু নীতি ও আদর্শের মৃত্যু নাই।'

গণঐক্যজোট, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীদের তিনি মুক্তভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তাহাদের আদর্শ এক, নেতৃত্ব এক, কর্মী এক এবং তাহাদের সম্মুখ রাস্তা তথা লক্ষ্য এক। জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনারা আমাকে মাফ করিয়া দিবেন। বিদেশ হইতে ভিক্ষা আনিয়া দেশ চালানো যাইবে না।" তিনি বলেন, "উৎপাদন বৃদ্ধি করুন, ভোগ করুন, গাভীকে মাইরেন না। দুধ খান।"

যাহারা অস্ত্র দিয়া মোকাবেলা করিয়া বিপ্লবের হুমকি দিতেছে বঙ্গবন্ধু তাহাদের উদ্দেশে বলেন, "রাতে একজন ঘুমাইয়া আছে, তাহাকে গুলী করিয়া মারিলে বিপ্লব হয় না। ইহা দাগী চোরের কাজ।"

তিন বলেন, তাহাদের কোন নীতি নাই, আদর্শ নাই, তাহারা সব ডাকাত। তাহাদের কার্যকলাপকে বিপ্লব বলা যায় না, ইহা বিপ্লবের বিকৃতি। গণবিপ্লব দ্বারা বিপ্লব হয় না। জনগণকে উপেক্ষা করিয়া দুই-দশটা লোককে হত্যা করিলে কিছুই অর্জিত হয় না। তিনি তাহাদের সোভিয়েট রাশিয়া, মিসর, অন্যান্য দেশ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের

www.pathagar.com

স্বাধীনতার ইতিহাস পড়িতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, তাহারা নাকি রাত্রে টেলিফোন করিয়া হুমকি দেয় তাহারা 'মাওবাদী' বলিয়া। "আমি বলি তোমরা চোরবাদী।"

বঙ্গবন্ধু বলেন, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পর পুনরায় দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। "যদি তোমরা ভোটে জিতিয়া আসিতে পার তবে আওয়ামী লীগ গদি ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু অগণতান্ত্রিক অধিকার ব্যবহার করিলে, বৈদেশিক কর্মীকে হত্যা করিলে তাহা কোন স্বাধীন দেশের সরকার বরদাশত করিতে পারেন না।"

কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "তোমাদের উপর দাবী আছে। তোমরা কি পারিবে না আমার এই কথা শুনিতে? পারিবে না কি তোমরা দেশের মানুষকে শান্তিতে ঘুমাইতে দিতে?"

রাজনীতিতে যাহারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিবার অপচেষ্টা করিতেছে তাহাদের কঠোর নিন্দা করিয়া তিনি বলেন, "তাহারা নীচ–যে মানুষকে ভালবাসে সে সাম্প্রদায়িক হইতে পারে না। আল্লাহর কাছে সব মানুষ সমান। যাহারা সাম্প্রদায়িক তাহারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, কারণ এক অন্যের পরিপন্থী।"

তিনি বলেন, বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি হইল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। তিনি বলেন, "চীনের সহিত আমরা বন্ধুত্ব কামনা করি, কিন্তু তাহার জন্য আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়া যাইবে না। তিনি চীন কর্তৃক জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপ্রাপ্তির প্রশ্নে ভেটো প্রদানেরও সমালোচনা করেন।"

স্বাধীনতা আন্দোলনে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন, "এই বন্ধুত্ব সহজে আসে নাই। দুর্দিনে যে কাছে থাকে সেই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা একে অন্যের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিব না। আমরা থাকিতে চাই পাশাপাশি বন্ধুরূপে।"

ইত্তেফাক, ১৯ জানুয়ারি, ১৯৭৪, পৃ. ১, ১২

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : চৌদ্দ

১৯৭৪ সালের ১৮-২০শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষ্যে

বঙ্গবন্ধুর বাণী

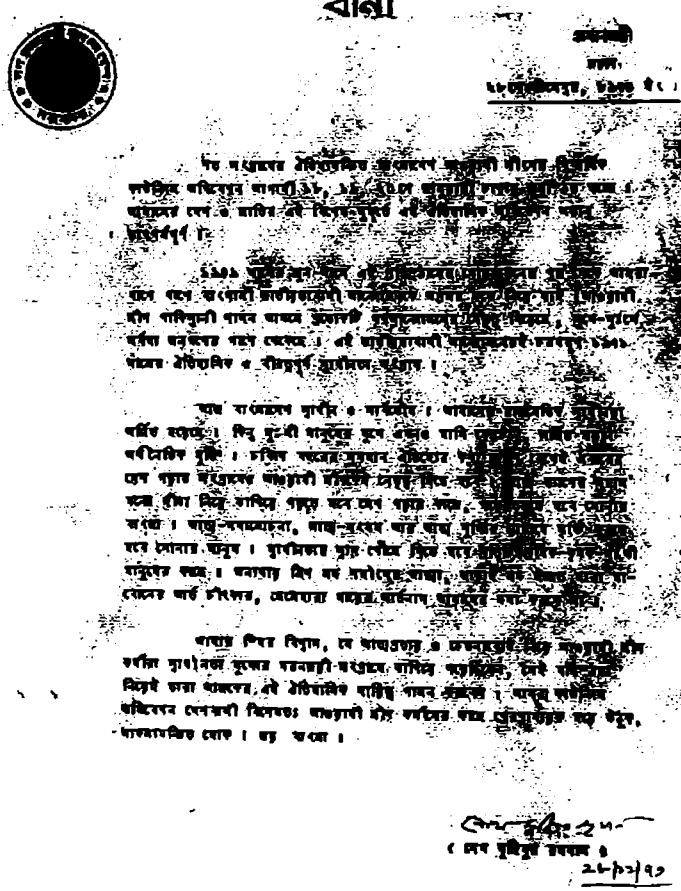

বাণী

সূত্র : *ইত্তেফাক*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৩

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : পনেরো

'উল্লসিত হওয়ার কারণ দেখি না' : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা, ১৯৮১

১৯৮১ সাল। আওয়ামী লীগের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব চরমে। ১৪-১৬ই ফেব্রুয়ারি মতিঝিলের ইডেন হোটেলে আয়োজিত দলের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল-কে সামনে রেখে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব চরম রূপ লাভ করে। সকলেরই ধারণা, দলের ভাঙন নিশ্চিত। এমনি এক অবস্থায় বলতে গেলে নাটকীয়ভাবে দলের দলের মধ্যের সব পক্ষ কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনাকে তাঁর অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত করেন। দল নিশ্চিত ভাঙনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। তখন শেখ হাসিনা দিল্লিতে নির্বাসনে। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর প্রতিনিধি নয়াদিল্লিতে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ এ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন, যা পরের দিন আজাদ পত্রিকায় 'আওয়ামী লীগ সভানেত্রী হওয়াতে উল্লসিত হওয়ার কারণ দেখি না', শিরোনামে ছাপা হয়। সাক্ষাৎকারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে তাঁর তখনকার মানস ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৩ বছর। পত্রিকার পাতা থেকে সাক্ষাৎকারটি হুবহু তুলে ধরা হলো।

নয়াদিল্লী, ২৭শে ফেব্রুয়ারি (বাসস)– শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বলেন যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট পদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাহাকে নির্বাচিত করাতে উল্লসিত হইবার কোন কারণ তিনি দেখেন না। গত বৃহস্পতিবার বাসস-এর সহিত এক সাক্ষাৎকারে ৩৩ বছর বয়স্কা শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের দুঃখজনক ঘটনাবলী দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে তাহাকে হতোদ্যম করিয়াছে। তিনি বলেন, রাজনীতি তাহার রক্তের সহিত মিশিয়া আছে। জন্মলগ্ন হইতেই রাজনৈতিক পরিবেশে তিনি লালিত। কিন্তু রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা তিনি কখনও মনে পোষণ করেন নাই। দুই সন্তানের জননী ও একজন পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞানীর পত্নী মিসেস হাসিনা আরও বলেন যে, দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি এই নুতন দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, এই দায়িত্ব তাহাকে জনগণের স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়নের সুযোগ করিয়া দিবে। দেশের বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেত্রী হিসেবে তাহার মনোভাব সম্বন্ধে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, সত্য কথা বলিতে কি ভাবাবেগ তাহার মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ছয় বৎসর পূর্বে তাহার পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হত্যার পর তাহারা কিছুতেই উল্লসিত হইতে পারেন না। উল্লেখ্য যে, তাহার ছোট বোন শেখ রেহানা লন্ডনে তাহার

www.pathagar.com

স্বামীর সহিত বসবাস করিতেছেন। বর্তমানে তিনি বড় বোনের নিকট বেড়াইতে আসিয়াছেন। শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগ্রহী কিন্তু দেশের পরিস্থিতি ও অবস্থার উপর ইহা নির্ভর করিতেছে বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন। দীর্ঘদিন বাহিরে অবস্থান করার পর তিনি দেশে ফিরিতে আশংকা অনুভব করেন। এই মুহূর্তে তিনি দলীয় নীতি সম্বন্ধে কোন কিছু না বলাকেই শ্রেয় মনে করেন। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তনকে তিনি গঠনমূলক বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, সভাপতিমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শের পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করিবেন। তিনি অবশ্য বলেন যে, সকলের সহিত বন্ধুত্ব, কাহারো সহিত শত্রুতা নয়– ইহাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হওয়া উচিত। একটি ক্ষুদ্র ও গরীব দেশ হিসাবে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন। দীর্ঘক্ষণ যাবৎ এই সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় শেখ হাসিনা সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ায় টেলিফোনে অভিনন্দন কল গ্রহণ করিতে ব্যস্ত থাকেন। তিনি বলেন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি ছাত্রলীগের একজন কর্মী ছিলেন এবং দেশের একজন সামান্য কর্মী হিসাবে তিনি কখনই এই দায়িত্ব চান নাই। তিনি আওয়ামী লীগ প্রধান নির্বাচিত হওয়াতে তিনি বরং আশ্চর্যই হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন। শেখ হাসিনা পুনরায় তাহার পিতার হত্যাকারীদের বিচার দাবী করেন। ১৯৭৫ সাল হইতেই শেখ হাসিনা ভারতে ও ছোটবোন শেখ রেহানা লন্ডনে বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

সূত্র : *আজাদ*, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ ১, ৮

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : ষোলো

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৪৯-২০১৬ : তারিখ ও স্থান

ক্রমিক	শিরোনাম	তারিখ	স্থান
১.	রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন ১৯৪৯	২৩-২৪শে জুন ১৯৪৯	রোজ গার্ডেন, কে এম দাস লেন, ঢাকা
২.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৩	৩-৫ই জুলাই ১৯৫৩	মুকুল সিনেমা হল, পুরান ঢাকা
৩.	ময়মনসিংহে বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৩	১৪-১৫ই নভেম্বর ১৯৫৩ (বিশেষ কাউন্সিল)	অলকা সিনেমা হল, ময়মনসিংহ
৪.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৫	২১-২৩শে অক্টোবর ১৯৫৫	রূপমহল সিনেমা হল, পুরান ঢাকা
৫.	বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৭	৭-৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ (বিশেষ কাউন্সিল)	কাগমারি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল
৬.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৭	১৩-১৪শে জুন ১৯৫৭	নিউ পিকচার হাউজ (সাবিস্তান সিনেমা হল), আরমানিটোলা, ঢাকা
৭.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৪	৬-৮ই মার্চ ১৯৬৪	আমবাগান, গ্রীন রোড, ঢাকা
৮.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৬	১৮-২০শে মার্চ ১৯৬৬	ইডেন হোটেল, মতিঝিল, ঢাকা
৯.	বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৭	১৯শে আগস্ট ১৯৬৭ (বিশেষ কাউন্সিল)	ইডেন হোটেল, মতিঝিল, ঢাকা
১০.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৮	১৯-২০শে অক্টোবর ১৯৬৮	ইডেন হোটেল, মতিঝিল, ঢাকা
১১.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭০	৪-৫ই জুন ১৯৭০	ইডেন হোটেল, মতিঝিল, ঢাকা
১২.	স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম কাউন্সিল ১৯৭২	৭-৮ই এপ্রিল ১৯৭২	কাকরাইল, ঢাকা (আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে)
১৩.	সংকট-সন্ধিক্ষণে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৪	১৮-২০ই জানুয়ারি ১৯৭৪	কাকরাইল, ঢাকা (আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে)
১৪.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৭	৩-৪ই এপ্রিল ১৯৭৭	ইডেন হোটেল, মতিঝিল, ঢাকা
১৫.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৮	৩-৫ই মার্চ ১৯৭৮	ইডেন হোটেল, মতিঝিল,

www.pathagar.com

			ঢাকা
১৬.	বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৮	২৩-২৪শে নভেম্বর ১৯৭৮ (বিশেষ কাউন্সিল)	ইডেন হোটেল, মতিঝিল, ঢাকা
১৭.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৮১	১৪-১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১	ইডেন হোটেল, মতিঝিল, ঢাকা
১৮.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৮৭	১-৩রা জানুয়ারি ১৯৮৭	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা
১৯.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯২	১৯-২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা
২০.	বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯৫	১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ (বিশেষ কাউন্সিল)	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা
২১.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯৭	৬-৭ই মে ১৯৯৭	আউটার স্টেডিয়াম, ঢাকা
২২.	বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ২০০০	২৩শে জুন ২০০০ (বিশেষ কাউন্সিল)	পল্টন ময়দান, ঢাকা
২৩.	কাউন্সিল অধিবেশন ২০০২	২৬শে ডিসেম্বর ২০০২	পল্টন ময়দান, ঢাকা
২৪.	কাউন্সিল অধিবেশন ২০০৯	২৪শে জুলাই ২০০৯	বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার, ঢাকা
২৫.	কাউন্সিল অধিবেশন ২০১২	২৯শে ডিসেম্বর ২০১২	ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা
২৬.	কাউন্সিল অধিবেশন ২০১৬	২২-২৩শে অক্টোবর ২০১৬	ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা

উৎস : লেখক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : সতেরো

আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ১৯৪৯-২০১৬

ক্রমিক	কাউন্সিল	সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
১.	রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন ১৯৪৯	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	শামসুল হক (টাঙ্গাইল)
২.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৩	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	শেখ মুজিবুর রহমান
৩.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৫	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	শেখ মুজিবুর রহমান
৪.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৭	আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ভারপ্রাপ্ত	শেখ মুজিবুর রহমান
৫.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৪	আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ভারপ্রাপ্ত	শেখ মুজিবুর রহমান
৬.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৬	শেখ মুজিবুর রহমান	তাজউদ্দীন আহমদ
৭.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৬৮	শেখ মুজিবুর রহমান	তাজউদ্দীন আহমদ
৮.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭০	শেখ মুজিবুর রহমান	তাজউদ্দীন আহমদ
৯.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭২	শেখ মুজিবুর রহমান	জিল্লুর রহমান
১০.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৪	এ এইচ এম কামারুজ্জামান	জিল্লুর রহমান
১১.	১৯৭৬	মহিউদ্দীন আহ্‌মেদ (ভারপ্রাপ্ত)	বেগম সাজেদা চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)
১২.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৭	সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন (সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক)	—
১৩.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৭৮	আবদুল মালেক উকিল	আব্দুর রাজ্জাক
১৪.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৮১	শেখ হাসিনা	আব্দুর রাজ্জাক
১৫.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৮৭	শেখ হাসিনা	বেগম সাজেদা চৌধুরী
১৬.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯২	শেখ হাসিনা	জিল্লুর রহমান
১৭.	কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৯৭	শেখ হাসিনা	জিল্লুর রহমান
১৮.	কাউন্সিল অধিবেশন ২০০২	শেখ হাসিনা	মোঃ আবদুল জলিল
১৯.	কাউন্সিল অধিবেশন ২০০৯	শেখ হাসিনা	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
২০.	কাউন্সিল অধিবেশন ২০১২	শেখ হাসিনা	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
২১.	কাউন্সিল অধিবেশন ২০১৬	শেখ হাসিনা	ওবায়দুল কাদের

উৎস : লেখক কর্তৃক সারণিকৃত

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : আঠারো

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬ : উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি ও উদ্বোধক

অধ্যায়	তারিখ	সভাপতি	উদ্বোধক
১.	২৩-২৪শে জুন ১৯৪৯	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	-
২.	৩-৫ই জুলাই ১৯৫৩	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	-
৩.	১৪-১৫ নভেম্বর ১৯৫৩ (বিশেষ কাউন্সিল)	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	-
৪.	২১-২৩ই অক্টোবর ১৯৫৫	মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
৫.	১৩-১৪ই জুন ১৯৫৭	আতাউর রহমান খান (প্রথম সহ-সভাপতি)	-
৬.	৬-৮ই মার্চ ১৯৬৪	মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি)	নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এমএনএ (পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি)
৭.	১৮-২০শে মার্চ ১৯৬৬	সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি	আবদুস সালাম খান (ঢাকা হাইকোর্ট বারের সভাপতি)
৮.	১৯-২০শে অক্টোবর ১৯৬৮	সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি	তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
৯.	৪-৫ই জুন ১৯৭০	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
১০.	৭-৮ই এপ্রিল ১৯৭২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
১১.	১৮-২০শে জানুয়ারি ১৯৭৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
১২.	৩-৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৭	মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমেদ (প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক)	সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন
১৩.	৩-৫ই মার্চ ১৯৭৮	সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন	বেগম মনসুর আলী

www.pathagar.com

১৪.	১৪-১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮১	আব্দুল মালেক উকিল	আব্দুল মালেক উকিল
১৫.	১-৩রা জানুয়ারি ১৯৮৭	শেখ হাসিনা	শেখ হাসিনা
১৬.	১৯-২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২	শেখ হাসিনা	শেখ হাসিনা
১৭.	১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ (বিশেষ কাউন্সিল)	শেখ হাসিনা	শেখ হাসিনা
১৮.	৬-৭ই মে ১৯৯৭	শেখ হাসিনা	শেখ হাসিনা
১৯.	২৬শে ডিসেম্বর ২০০২	শেখ হাসিনা	শেখ হাসিনা
২০.	২৪শে জুলাই ২০০৯	শেখ হাসিনা	শেখ হাসিনা
২১.	২৯শে ডিসেম্বর ২০১২	শেখ হাসিনা	শেখ হাসিনা
২২.	২২-২৩শে অক্টোবর ২০১৬	শেখ হাসিনা	শেখ হাসিনা

উৎস : লেখক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : উনিশ

আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী/ওয়ার্কিং কমিটি (প্রেসিডিয়ামসহ), ১৯৪৯-২০১৬

ক্রমিক	সন	কর্মকর্তা	সদস্য	সহ-সভাপতি[১]	প্রেসিডিয়াম[২]	মোট
১.	১৯৪৯	১১	২৯	৫	-	৪০
২.	১৯৫৩	১২	৩৫	৫	-	৪৭
৩.	১৯৫৫	১২	২৫	৩	-	৩৭
৪.	১৯৫৭	১২	২৫	৩	-	৩৭
৫.	১৯৬৪	-	-	-	-	-
৬.	১৯৬৬	১২	২৫	৩	-	৩৭
৭.	১৯৬৮	১৩	-	৩	-	-
৮.	১৯৭০	১৩	২৬	৩	-	৩৯
৯.	১৯৭২	১৩	৩১	৩	-	৪৪
১০.	১৯৭৪	১৪	২৪	৩	-	৩৮
১১.	১৯৭৭	-	৪৪[৩]	-	-	৪৪
১২.	১৯৭৮	২০	৩৪	৬	-	৫৪
১৩.	১৯৮১	২৬	২৭	-	১২ (১০+১+১)	৫৩
১৪.	১৯৮৭	৩২	২৭	-	১৪ (১২+১+১)	৫৯
১৫.	১৯৯২	৩৭	২৮	-	১৫ (১৩+১+১)	৬৫
১৬.	১৯৯৭	৩৮	২৯	-	১৫ (১৩+১+১)	৬৭
১৭.	২০০২	৪৭	২৬	-	১৫ (১৩+১+১)	৭৩
১৮.	২০০৯	৪৭	২৬	-	১৫ (১৩+১+১)	৭৩
১৯.	২০১২	৪৭	২৬	-	১৫ (১৩+১+১)	৭৩
২০.	২০১৬	৫৩	২৮	-	১৯ (১৭+১+১)	৮১

উৎস : লেখক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

১. কর্মকর্তাদের সংখ্যার মধ্যে সহ-সভাপতি/প্রেসিডিয়াম সদস্যগণকে অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হয়েছে।

২. দলের সভানেত্রী, সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকারবলে) ও সদস্যদের নিয়ে প্রেসিডিয়াম-এর গঠন দেখানো হয়েছে।

৩. সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনকে আহ্বায়ক করে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : বিশ

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য, ১৯৪৯-২০১৬

কাউন্সিল	সদস্য চাঁদা	মহিলা সম্পাদক	কত সময় ব্যবধানে কাউন্সিল	প্রেসিডিয়াম সৃষ্টি	উপদেষ্টা পরিষদ গঠন
১৯৪৯	ছিল না	ছিল না	বার্ষিক	-	-
১৯৫৩	ছিল না	ছিল না	বার্ষিক	-	-
১৯৫৫	১ আনা[১]	সেলিনা বানু এমএলএ	বার্ষিক[২]	-	-
১৯৫৭	১ আনা	মিসেস মেহেরুন্নেসা খাতুন	দ্বি-বার্ষিক	-	-
১৯৬৪	১ আনা	ঐ	দ্বি-বার্ষিক	-	-
১৯৬৬	১ আনা	মিসেস আমেনা বেগম	দ্বি-বার্ষিক	-	-
১৯৬৮	১০ পয়সা	ঐ	দ্বি-বার্ষিক	-	-
১৯৭০	১০ পয়সা	বদরুন্নেসা আহমেদ	দ্বি-বার্ষিক	-	-
১৯৭২	২৫ পয়সা	বেগম সাজেদা চৌধুরী	দ্বি-বার্ষিক	-	-
১৯৭৪	২৫ পয়সা	ঐ	দ্বি-বার্ষিক	-	-
১৯৭৭	২ টাকা	ছিল না[৩]	দ্বি-বার্ষিক	-	-
১৯৭৮	২ টাকা	আইভি রহমান	দ্বি-বার্ষিক	-	-
১৯৮১	২ টাকা	ঐ	দ্বি-বার্ষিক	প্রেসিডিয়াম	-
১৯৮৭	২ টাকা	ঐ	দ্বি-বার্ষিক	প্রেসিডিয়াম	-
১৯৯২	২ টাকা	ঐ	দ্বি-বার্ষিক[৪]	প্রেসিডিয়াম	উপদেষ্টা পরিষদ
১৯৯৭	২ টাকা	ঐ	ত্রি-বার্ষিক	প্রেসিডিয়াম	উপদেষ্টা পরিষদ
২০০২	৫ টাকা	ঐ	ত্রি-বার্ষিক	প্রেসিডিয়াম	উপদেষ্টা পরিষদ
২০০৯	১০ টাকা	ফজিলাতুন নেছা ইন্দিরা	ত্রি-বার্ষিক	প্রেসিডিয়াম	উপদেষ্টা পরিষদ
২০১২	১০ টাকা	ঐ	ত্রি-বার্ষিক	প্রেসিডিয়াম	উপদেষ্টা পরিষদ
২০১৬	২০ টাকা	ঐ	ত্রি-বার্ষিক	প্রেসিডিয়াম	উপদেষ্টা পরিষদ

উৎস : লেখক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

১. ১৯৫০ সালের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একজন কাউন্সিলরের বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ ছিল ২ টাকা। ২০১৬ সালে কাউন্সিলর প্রতি বার্ষিক চাঁদা ২০০.০০ (দুই শত) টাকা ধার্য করা হয়।

২. ১৯৫৫ সালের কাউন্সিলে দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়।

৩. ১৯৭৭ সালে কাউন্সিলে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনকে আহ্বায়ক করে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। সে কারণে মহিলা সম্পাদক বা অন্য কোনো সম্পাদকীয় পদ ছিল না।

৪. ১৯৯২ সালের কাউন্সিলে ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়।

www.pathagar.com

তথ্য উৎস ও গ্রন্থপঞ্জি

ক. দলিলপত্র

শামসুল হক এমএলএ *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টো, ১৯৫০, ঢাকা*

শেখ মুজিবুর রহমান *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী, ১৯৫৫,* পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা

— *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন : সাংগঠনিক রিপোর্ট* ১৯৫৩, প্যারামাউন্ট প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

— *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন : বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৫৫,* প্যারামাউন্ট প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

— *আওয়ামী লীগ বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে জেনারেল সেক্রেটারীর রিপোর্ট* ১৯৫৭, (সূত্র : *আজাদ*, ১৪ই জুন ১৯৫৭)

— *আওয়ামী লীগ বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট* ১৯৬৪, (সূত্র : *ইত্তেফাক*, ৭ই মার্চ ১৯৬৪)

— 'কাউন্সিলরদের প্রতি আওয়ামী লীগ প্রধানের উদাত্ত আহ্বান' ১৯৭০, (সূত্র : *ইত্তেফাক*, ৫ই মার্চ ১৯৭০)

— 'আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর আহ্বান' ১৯৭২ (সূত্র : *ইত্তেফাক*, ৮ই এপ্রিল ১৯৭২)

— 'এক যুদ্ধের শেষ আর এক যুদ্ধের শুরু', বিজয় দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ১৯৭৩, (সূত্র : *ইত্তেফাক*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪, ক্রোড়পত্র)

— 'আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু' ১৯৭৪, (সূত্র : *ইত্তেফাক*, ১৯ই জানুয়ারি ১৯৭৪)

আওয়ামী লীগ *পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ১৯৬৪ সালের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী,* (সূত্র : *ইত্তেফাক*, ৯ই মার্চ ১৯৬৪)

— 'আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাব' ১৯৭২ (সূত্র : *ইত্তেফাক*, ১০ই এপ্রিল ১৯৭২)

— 'আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো' ১৯৭২ (সূত্র : *ইত্তেফাক*, ১০ই এপ্রিল ১৯৭২)

বঙ্গবন্ধু '১৯৭৪ সালের ১৮-২০শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর বাণী', (সূত্র : *ইত্তেফাক*, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৭৪)

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা — 'আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হওয়াতে উল্লসিত হওয়ার কারণ দেখি না', বাংলাদেশে সংবাদ সংস্থার সঙ্গে শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার, নয়াদিল্লি, ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ (সূত্র : *আজাদ*, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ — *রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৮১ : নির্বাচনী ইশতেহার*

— *দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন '৮৭ : সভানেত্রীর ভাষণ*

— *কাউন্সিল '৮৭ : ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা (সাজেদা চৌধুরী)-এর রিপোর্ট : ৮১ থেকে ৮৬*

— *১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনী ইশতেহার*

— *জাতীয় কাউন্সিল : সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট*

— *অর্থনৈতিক নীতিমালা ১৯৯২*

— *বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) শেখ হাসিনার ভাষণ : আমাদের রাজনীতির লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ সাধন এবং অর্থনৈতিক মুক্তি*

— *জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬ : নির্বাচনী ইশতেহার*

— *ত্রি-বার্ষিক জাতীয় কাউন্সিল '৯৭ : সভানেত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ*

— *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০১*

— *ত্রি-বার্ষিক জাতীয় কাউন্সিল ২০০২ : সভানেত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ*

নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮

— *কাউন্সিল ২০০৯ : সভানেত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ*

— *ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র ২০০৯*

— *১৯তম জাতীয় সম্মেলন ২০১২: সভানেত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ*

— *এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ : নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*

— *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : শোক প্রস্তাব*

— *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : অভ্যর্থনা উপ-পরিষদের আহ্বায়কের ভাষণ*

— *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট*

— *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ*

— *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : সংশোধিত ঘোষণাপত্র*

— *২০তম জাতীয় সম্মেলন ২০১৬ : গঠনতন্ত্র* (সংশোধিত)

খ. পত্রিকা

আজাদ	১৯৪৯-১৯৮১
ইত্তেফাক	১৯৬৪-২০১২
সংবাদ	১৯৬৬-১৯৬৮
	১৯৭৪-২০১২
ইনকিলাব	১৯৯৭

www.pathagar.com

জনকণ্ঠ	২০১৬
দৈনিক পাকিস্তান	১৯৬৭
প্রথম আলো	২০০৮
Evening Standard (London)	1971
The Bangladesh Times	1991
The Pakistan Observer	1964

গ. প্রবন্ধ (বই/জার্নাল)

Ahmed Shafiqul Haque and Muhammad Yeahia Akhter

"Militarization and Opposition in Bangladesh : Parliamentary Approval and Public Reaction", *The Journal of Commonwealth and Comparative Politics*, 27:2 (July 1989), pp. 172-84

Harun-or-Rashid, "Role of Judiciary in Political Development : The Bangladesh Perspective," *The Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Haumanities)*, Diamond Jubilee Volume 2011, pp. 53-66

"Process of Marginalisation of Indigenous People in Their Homeland : A Study on CHT in Bangladesh," *RINDAS Series of Working Papers 21*, Ryukoku University, Kyoto, Japan, pp. 1-15

"Desecularisation and Rise of Political Islam in Bangladesh," *The Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Haumanities)*, Volume 57, No. 1, June 2012, pp. 29-40

Nurul Islam 'Concept of Two Economies : "First Encounter with the Pakistani Establishment," *Making of A Nation Bangladesh : An Economist Tale*, Dhaka 2003, Chapter 2, pp. 23-25

Rehman Sobhan "Politics of Food and Famine in Bangladesh", *Economic and Political Weekly* (Bombay), 1 December 1979

ঘ. বই

অলি আহাদ	*জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫*, ঢাকা ১৯৮২
আবু আল সাইদ	*আওয়ামী লীগের ইতিহাস*, ঢাকা ১৯৯৩
আবুল বারাকাত	*বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি*, ঢাকা ২০১২
আবুল মনসুর আহমদ	*আমার-দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা ১৯৭৫
এমাজউদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত)	*বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র : প্রাসঙ্গিক চিন্তা-ভাবনা*, ঢাকা ১৯৯২
কর্নেল শওকত আলী	*সত্য মামলা আগরতলা*, ঢাকা ২০১২
গোলাম আকবর চৌধুরী	*বাংলাদেশের রাজনীতি ও আওয়ামী লীগের ভূমিকা*, ঢাকা ১৯৭৭

www.pathagar.com

ড. আবুল কাশেম (সংকলিত ও সম্পাদিত)	*বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ – ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা ২০০১
নূহ-উল-আলম লেনিন (রচিত ও সম্পাদিত)	*বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল*, ঢাকা ২০১৫
বদরুদ্দীন উমর	*পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৭০
মণি সিংহ	*জীবন সংগ্রাম*, অখণ্ড সংস্করণ, ঢাকা ২০১৫
মহিউদ্দিন আহমদ	*জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ে রাজনীতি*, ঢাকা ২০১৪
মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত)	*বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, ঢাকা ২০০০
মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার (সম্পাদিত)	*হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মৃতিকথা*, ঢাকা ১৯৮৮
মোহাম্মদ হাননান	*বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৭১*, ঢাকা ১৯৯৯
শাহরিয়ার কবির	*বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদ*, ঢাকা ২০০৬
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	*জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*
শেখ মুজিবুর রহমান	*পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী-১৯৫৫*
	অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ইউপিএল ২০১২
সাহিদা বেগম	*আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন*, ঢাকা ১৯৯৯
সিমিন হোসেন রিমি (সম্পাদিত)	*তাজউদ্দীন আহমদ : ইতিহাসের পাতা থেকে*, ঢাকা ২০০০
সৈয়দ আবুল মকসুদ	*মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*, বাংলা একাডেমী ১৯৯৪
হারুন-অর-রশিদ	*বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, ঢাকা ২০০১
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : আগস্টের ঘটনা, গ্রেপ্তার-রিমান্ড ও কারাগারের দিনগুলি, ঢাকা ২০০৮
	বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন : বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা, ঢাকা ২০১২
	বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পুনর্পাঠ, ইউপিএল ২০১৩
	'আমাদের বাঁচার দাবী': ৬-দফা'র ৫০ বছর, বাংলা একাডেমি ২০১৬
হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত)	*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৮-৭১)*, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮২

www.pathagar.com

Abul Fazl Huq	*Bangladesh Politics : The Problem of Stability*, Dhaka 2011
Abul Hashim	*In Retrospection*, Dhaka 1974
Abdul Latif Masoom	*Dilemmas of a Military Ruler : A Political Study of Zia Regime*, Dhaka 2000
Harun-or-Rashid	*The Foreshadowing of Bangladesh : The Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1906-1947*, UPL 2003
HR Talukdar (ed.)	*Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, Dhaka 1987
Jalal Feroj	*Democracy in Bangladesh : Conflicting Issues and Conflict Resolution*, Bangla Academy, Dhaka 2012
Kamruddin Ahmad	*A Social History of Bengal*, Dacca 1970
Muhammad Abdul Hakim	*Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum*, Dhaka 1993
Najma Chowdhury	*The Legislative Process in Bangladesh : Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, University of Dhaka 1980
Nurul Islam	*Making of A Nation Bangladesh : An Economist Tale*, UPL 2003
Obaidul Huq	*Bangabandhu Sheikh Mujib : A Leader with a Difference*, second edition, Dhaka 1996
Rehman Sobhan	*From Two Economies to Two Nations : My Journey to Bangladesh*, Dhaka 2015
Rounaq Jahan	*Political Parties in Bangladesh : Challenges of Democratization*, Dhaka 2015
S A Karim	*Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy*, Dhaka 2005
Shamsul Huda Harun	*The Making of the Prime Minister : H.S. Suhrawardy in an Anagram Polity* 1947-1958, National University 2001
Shyamali Ghosh	*The Awami League 1949-1971*, Dhaka 1990
Talukder Maniruzzaman	*The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*, Dhaka 1980

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

৬-দফা ৮৭, ৮৯-৯১, ৯৪-৯৯, ১০৪, ১০৮, ১১০-১১১, ১১৫, ১১৬ (নোট ৭), ১১৯, ১২১-১২২, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৩১-১৩৩, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১
কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর ব্যাখ্যা ৯০-৯১
জেনারেল আইয়ুবের প্রতিক্রিয়া ১০৩-১০৪, ৪৪১
৭ই জুনের হরতাল ১০৩-১০৪
৭-দলীয় জোট ২২১, ২২৭, ২৩৮ (নোট ৯), ২৪৩
৮-দলীয় জোট ২৩৮ (নোট ১৬), ২৪৩
১৫ দলীয় জোট ২২১, ২২৫, ২২৭, ২৩৭ (নোট ৭)
৩২ নম্বর ধানমন্ডি ৭৪, ৮১, ৮৯, ১৫২ (নোট ৩), ১৮৬, ২২৪, ২২৮, ৩৬১, ৪৩১
৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ২৪৭, ২৯২
অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম ২৪৯
অধ্যক্ষ মতিউর রহমান ৩০৫ (নোট ৯), ৩২৫
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল হাই ১২৩
অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামান ২৮২, ৩০৬
অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ ১২৩
অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ২৫৯, ২৮৩, ৩০২
অধ্যাপক আবদুল হাই ৪৫, ৫৩
অধ্যাপক আলী আশরাফ ৩০১, ৩০৬ (নোট ৩৯)
অধ্যাপক আহসাব উদ্দিন আহমদ ৪৫
অধ্যাপক ইউসুফ আলী ৯৫, ১৩০, ১৬৭, ১৭৯, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০৪, ২১৫, ২১৬
অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদ ৩২৫, ৩৪৬, ৩৭২, ৩৭৩
অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী ১৮৫, ২০০
অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ১৪১, ১৫৯, ১৬০
অধ্যাপক মোহাম্মদ হানিফ ১৮৫, ২০০, ২১৩, ৩০২
অধ্যাপক হামিদুর রহমান ১৩১, ২১৬
অপারেশন সার্চলাইট ১৩৮, ১৩৯, ৩৮৫
অমিত শাহ ৩৫৮
অলকা সিনেমা হল ১৯
অলি আহাদ ৫১-৫৪, ৫৭, ৬৩, ৬৪, ৪২২
অসীত বরণ রায় ৩১৬, ৩৫৮
অহিদুজ্জামান (ঠান্ডা মিয়া) ২৫
অহিদুর রহমান ১৫৭
অস্কার ফার্নান্দেজ তারনকো ৩৫২
আ ক ম মোজাম্মেল হক ৩৪৩
আ স ম আব্দুর রব ১৫৮, ১৭৫, ২০৬, ২০৮, ২৪৪, ২৫৮
আই এস কুলিচেনকো ১৬২
আইয়ুব খান ৩০, ৪২৯
ক্ষমতা দখল ৭১-৭২
মৌলিক গণতন্ত্র ৭২, ৮৭, ৮৮, ১৯০
এবডো ও প্রোডো আইন ৭২
রাজনৈতিক দলবিধি ৭৩
হ্যাঁ না ভোট ৭২
আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ৭২, ৭৮
বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ১০৩, ১০৮, ১১০, ১১১, ৩৬১
৬-দফা সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া ১০৩, ১০৪, ৪৪১
পতন ১২২
আখতারউজ্জামান ২৮৩, ৩০১
আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু ৩০২, ৩২৪, ৩৩৯
আগরতলা মামলা ১০৩, ১২১, ১২২, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৩১, ৩৬১
অভিযুক্তদের বিচারে ৩ সদস্যর ট্রাইব্যুনাল ১০৮
ট্রাইব্যুনালে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ১১৬ (নোট ৭), ১১৯ (নোট ৩৫)
আছমত আলী খান ১৩, ১৭
আজমত উল্লাহ খান (গাজীপুর) ৩৬৬
আজিজ আহমেদ ৫৪, ৬৪

www.pathagar.com

আজিজুর রহমান আক্কাস ১৫২, ১৭৯, ১৮৫, ১৯৭, ২০০, ২১৫, ২১৬
আতাউর রহমান খান ১৩-১৫, ২০, ২২, ২৫, ৫৪, ৫৫, ৩৯৪
সংক্ষিপ্ত জীবনী ৮ (নোট ১০)
রোজ গার্ডেনের কর্মী সম্মেলনে সভাপতিত্ব ৩
আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি ৪
গ্রান্ড ন্যাশনাল কনভেনশনে সভাপতিত্ব ১১
আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ৫১-৫৩, ৫৫, ৫৬, ৬১
এনডিএফ ৭৫, ১০৫, ১২৫, ৩৯৪
পিডিএম ৩৮৪
আতাউর রহমান খান (কায়সার) ২৩৬, ২৫৮, ২৮৩, ৩০১, ৩০২, ৩২৪, ৩৩৯
আনসার আলী ১৩৫, ২০০
আনোয়ার চৌধুরী ১৬৭, ২৩৬
আনোয়ার হোসেন ৩৭২
আন্দ্রে গ্রোমিকো ২৪৯
আপেল মাহমুদ ১৪১
আব্দুর রউফ ১৫২, ১৯৮, ২০০ (নোট ৩১), ২৫৯
আবদুর রব ওরফে বগা ১৩
আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ১৯১, ২৯৪
আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ৫৪, ৬২, ৬৩, ৭০, ৭৫, ৮০, ৮১, ৮৬, ৯৬, ৯৯, ১০৬, ১১৬
আব্দুর রহমান ১৬, ১১৬ (নোট ১২), ৩৭১
আবদুর রহিম ১৫১
আব্দুর রাজ্জাক ১৩১, ১৫১, ১৬৭, ১৯১, ১৯৪-১৯৭, ১৯৯ (নোট ৩০), ২০১, ২০৫-২০৮, ২১২-২১৪, ২১৮ (নোট ৪০), ২১৯, ২২৪, ২২৫-২২৬, ২৩৯ (নোট ২১), ২৪০ (নোট ২৯), ২৫৮, ২৬২ (নোট ১৭), ২৮২, ৩০০, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩৯, ৩৪৮ (নোট ৩৩), ৩৬৮
আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ১৫১
আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক ১৬৭
আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ১৯৬, ২১৩
আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ (১৯৮১) ২০৭, ২০৮
বাকশাল গঠন ২১৪, ২১৯
আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার ২২৫
বাকশালের সাধারণ সম্পাদক ২২৬
আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন ২৪৭
আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ২৫৮, ২৮২, ৩০০
আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ৩২৬, ৩৩৯
আবদুল আউয়াল ৫, ৮, ১৬, ৪৭, ৩৫৮
আবদুল আজিজ ১৩, ১৭, ৪০৬
আবদুল আলীম ৩৩৪, ৩৫৪
আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম ২৩৬, ২৮৩
আবদুল গফফার খান ৭১
আব্দুল জব্বার খদ্দর ৪৫, ৬৪
আবদুল জলিল ২১৪, ২৩৫, ২৫৬, ২৫৮, ২৭৬, ২৮৩, ২৯৫, ৩০০, ৩০১, ৩২০, ৩২৫, ৩২৯, ৩৪৬
আবদুল বারী ৪৫, ৬৪
আব্দুল মতিন ১৫৭
আবদুল মমিন তালুকদার ৯৫, ৯৭, ১৫২, ১৭৯, ১৮০, ১৯৬, ২১০, ২১৩, ২৩৯, ২৪০, ২৫৯, ২৮২, ২২৫
আব্দুল মালেক উকিল ১৮০, ১৯১, ১৯৪-১৯৭, ২০১, ২০৫, ২০৬, ২০৯, ২১০, ২১২, ২১৩
আবদুল মান্নান ১৩১, ১৩৫, ১৭৯, ১৮৫, ১৯০, ১৯১, ১৯৫, ২১৩, ২৩৯, ২৫৮, ২৮২, ২৮৩, ৩০৬
আবদুল মান্নান (শ্রমিক লীগ) ১২৩, ১৩১, ১৫২
আবদুল মোমেন ৯৬, ১১৩, ১১৪, ১১৬
আবদুল লতিফ সিদ্দিকী ৩০২, ৩০৬, ৩২৪, ৩৪৪
আবদুল হাই (যশোর) ১৭
আবদুল হাকিম ১৮৫
আব্দুল হান্নান ১৬৩, ১৬৭
আবদুল হামিদ ১৭
আবদুল হামিদ চৌধুরী ৫, ৮, ৬২, ৬৪, ৭৫
আব্দুল্লাহ আল হারুন ১৮৮, ২০০
আবদুস সালাম খান ১৩, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১, ৪৬, ৯৫, ১২৫, ৩৮৪
আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি ১০
আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণের বিরোধিতা ৩৮

www.pathagar.com

আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান ৩১, ৪৭
আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার ২৮, ১১৬ (নোট ১২)
আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের উদ্বোধক (১৯৬৬) ৮৭, ৯০
পিডিএম নেতা ১০৫, ১০৬, ১১৭ (নোট ১৬ ও ১৭)
আবু নসর ২৬৮, ৩৪৬
আবু সাঈদ সাগর ২৩৬
আবু হামেদ শাহাবুদ্দিন ২৯৫
আবু হোসেন সরকার ২৭, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৫১, ৪০৭, ৪১০, ৪১২
আবুল হোসেন ১০৪
আবুল মনসুর আহমেদ ১৩, ১৫, ১৬, ১৯-২১, ২৩, ২৫, ২৬, ৪৫, ৫৪, ৫৯, ৬২, ৬৮, ৭১, ৭৫
আব্দুস সামাদ আজাদ ৪৫, ৫৩, ৬৬, ১৯০, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৭, ২১২, ২১৩, ২২৬, ২২৭, ২৩৫, ২৩৯, ২৫৭, ২৫৮, ২৬১, ২৮২, ২৯৪, ৩০০
আব্দুস সালাম ৩৫৯
আবদুস সালাম ওরফে বারিন দত্ত ১৪১
আবদুস সালাম খান ১০, ১৩, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১, ৪৫, ৪৭ (নোট ১০), ৮৭, ৮৯, ৯৫, ১০৫, ১১৬ (নোট ১২), ১১৭ (নোট ১৬-১৭), ১২৪
আবুল কাশেম ১৫২, ১৭৯, ১৮৫, ২০০
আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি ৩২৫, ৩৪৬, ৩৭৩
আবুল হাসান চৌধুরী ২৫৮, ২৮৩, ৩০৬
আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ৩০২, ৩২১, ৩২৫, ৩৪৫, ৩৭২
আবুল হাশিম ১, ৮, ১৬
আবুল হোসেন ৪৭, ১০৪
আমজাদ হোসেন ৪৫, ৫৪, ৬৪, ৮৫, ৯৭, ১৯০, ৩২২
আমির হোসেন আমু ২১৩, ২৫৭, ৩০০, ৩০৫ (নোট ২৭), ৩১৪, ৩৪৬, ৩৭২
আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ২০০২-এর অভ্যর্থনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ২৭৫-২৭৬, ২৯৫
যুগ্ম সম্পাদক ১৯৬, ২১৩, ২৩৫, ২৩৯
প্রেসিডিয়াম সদস্য ২৫৮, ২৮২, ২৯৪, ৩০০
উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ৩২৫, ৩২৬, ৩৪৬, ৩৭৩
পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য ৩৪৬, ৩৮২
স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য ৩৭২
আমিনুল হক চৌধুরী ৪৫, ৬৪
আমেনা বেগম ৯৬, ১০৬, ১১২, ১১৪, ১১৭ (নোট ১৫), ৪৩৪
আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা (১৯৬৬) ৯৬, ১১৪
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ১০৬, ১১৭ (নোট ১৫)
আলমাস আলী ৫, ১৬, ৪৭
আল্লামা রাগীব আহসান ৩
আলী আমজাদ খান ৪
আলী আহমেদ খান এমএলএ ৩
আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ২৯১, ৩০৩, ৩৩৪, ৩৩৯, ৩৫০, ৩৬২
আলেক্সী কোসিগিন ২০৭
আসাদুজ্জামান আসাদ ১২২, ১২৪
আসাদুজ্জামান খান ১৭৯, ১৮৫, ১৯১, ১৯৯, ২০৬, ২৪৯
আসাদুজ্জামান নূর ৩০৬, ৩১৪, ৩১৬, ৩৫৬
আহসান উল্লাহ মাস্টার ৩০৮, ৩১৭
ইউনুস আলী এডভোকেট ১৯৮, ২৩৬, ২৫৯, ২৮৩, ৩০৬
ইউসুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহন মিয়া ২১
ইডেন হোটেল ৮৪, ৮৭, ৮৯, ১১৭, ১১৯, ১৭৪, ১৮০, ১৮৩, ১৮৮, ১৯১, ২০১, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২১০, ২২৬, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৬১
ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স ১৭৪, ১৭৭, ২৫৩ বাতিল ২৬৮, ২৭২, ২৮৮, ৩৬২
ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ৩০২, ৩০৬, ৩২৫, ৩৪৪, ৩৭০
ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম (ট্রাইব্যুনাল) আইন (১৯৭৩) ১৫৬, ৩২১, ৩৩৪, ৩৬১, ৩৮৩
ইমাম উদ্দিন আহমেদ ২৫৯, ২৮৩
ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী ২৪৯
ইয়াফেস ওসমান ৩০১, ৩০৬, ৩২৫, ৩৪৫, ৩৭৩
ইয়ার মোহাম্মদ খান ৩-৫, ১৬, ৪৫, ৫৩

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া খান ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৫, ১২৭, ১৩২, ১৩৯, ১৪২, ১৫৩, ২২৮, ৩৬১, ৩৮৫
উচ্চ আদালতের রায়
জেনারেল জিয়ার ৫ম, এরশাদের ৭ম এবং খালেদা জিয়ার ত্রয়োদশ সংশোধনী আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষণা ও বাতিল ৩৩২, ৩৩৫
এ এইচ এন আশিকুর রহমান ২৮৩, ৩০১, ৩২২, ৩২৫, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৬৯, ৩৭১
এ এইচ এম কামারুজ্জামান ৭৫, ১০৩, ১০৬-১০৭, ১১২-১১৩, ১২৮, ১৩০-১৩১, ১৫২-১৫৩, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৬, ১৭৯, ১৯০, ১৯১, ৩১৬
নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ১০৩, ১০৬, ১১২
নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ১৩১
আওয়ামী লীগ সভাপতি ১৬৭
এ এইচ খায়রুজ্জামান লিটন ২৯৮, ৩০২, ৩২০, ৩৪৫, ৩৭২
এ এফ এম ফকরুল ইসলাম মুন্সী ৩৪৬, ৩৭৩
এ এস এইচ কে সাদেক ২৫৯, ৩০০
এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ২৬৩, ৩০৫, ৩৫৮
এ কে এম রফিকুল হোসেন ৩৯, ৭৫
এ কে ফজলুল হক ৩, ৫, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৪, ৪৭, ৪৯,
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন ২৭, ৪৭
কোলকাতা সফর ও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক উক্তির অভিযোগ ২৯, ৯৪
মন্ত্রিসভা বাতিল ২৯
অনাস্থা প্রস্তাব ৩১
পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৩১
এ কে ফয়জুল হক ১২৩
এ কে মুজিবর রহমান ১৯৭, ২১৫
এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী ২৬৭, ২৬৮, ২৮০, ২৯৮, ৩০২, ৩০৬, ৩২১, ৩৩৬
এ বি এম তালেব আলী ১৮৫, ২০৫, ২১৩, ২৩৬, ২৪০, ২৫৯, ২৮০, ২৮৩, ৩০৬
এইচ টি ইমাম ৩২৫, ৩৪৬, ৩৭০
এডভোকেট আবদুর রহমান খান ১৩, ১৭, ৯৫, ৯৬
এডভোকেট আবদুল মতিন খসরু ৩২৪, ৩৭১
এডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন ২০০, ৩২৪, ৩৪৩, ৩৭০, ৩৭৩
এডভোকেট গাজিউল হক ২৫৯, ২৬২
এডভোকেট ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ শম্ভু ২১৮, ৩৪৫, ৩৬৯
এডভোকেট ফজলে রাব্বী ৩০২, ৩২৫, ৩৪৫
এডভোকেট রহমত আলী ১৬৭, ১৭০, ১৯০, ২০০, ২৫৯, ২৭৫, ৩০৬, ৩২২, ৩২৩, ৩২৫, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৭৩
এডভোকেট রিয়াজুল কবির কাওসার ৩৭২
এডভোকেট সাহারা খাতুন ২৮৩, ৩০১, ৩২৪, ৩৪৪, ৩৭০
এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম ৮১, ১৮৫, ২৩৫, ৩৭৩
এডভোকেট সিরাজুল হক ১৯৭, ২০০, ২৩৫, ২৩৬
এডভোকেট সৈয়দ রেজাউর রহমান ২০০, ৩২৫, ৩৪৬, ৩৭৩
এনডিএফ ৭১, ৭৩-৭৮, ৮১, ৮২, ১০১, ১০৫, ১১৫, ১৮৬, ৩৬১, ৩৮০, ৩৮৪, ৩৮৫, ৪৩১
এম আর সিদ্দিকী ৯৫
এম এ ওয়াহাব ১৮৫
এম এ জি ওসমানী ১৪৩, ২০১, ২০২
এম এ মান্নান ২৫৯, ২৮৩, ৩০৬, ৩২২, ৩২৫, ৩৩৯, ৩৪৫
এম এ রশিদ ৯৬, ১১৬
এস এম ইউসুফ ১৯৬, ২২৪, ২২৫, ২৩৬, ২৩৯
এস ডব্লিউ লকিতুল্লাহ ১৭, ৯৭
ওআইসি ১৫৬
ওবায়দুল কাদের ২৩৬, ২৫৯, ২৮৩, ৩০০, ৩০১, ৩২৪, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৭০, ৩৭৩
ওমর আলী ১৮৫, ২৩৬, ৩০২, ৩০৬
ওসামা-বিন লাদেন ২৮৯
ওয়াবনার জারইউনস্কি ১৬২, ১৬৩
কর্নেল তাহেরের ফাঁসি ১৭৮
কর্নেল ফারুক ১৭৭, ২৩৮, ২৪৩, ২৬১, ৩৩৩
কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান ৩২৫, ৩৪৫, ৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৭

www.pathagar.com

কর্নেল রশিদ ১৭৭
কর্নেল (অব.) শওকত আলী ১১৭, ১৯১, ২১২, ২২৬
কফিলুদ্দিন চৌধুরী ২৫
কমরেড মণি সিং ১৫৯, ১৬০, ২০৬, ২৪৯
কমান্ড্যান্ট মানিক চৌধুরী ১৯৬
কমিউনিস্ট পার্টি ২৭ (নোট ২৫), ৫২
নিষিদ্ধ ২৮, ৩০, ৫২
কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ ৩২৫, ৩৪৬, ৩৭৩
কাজী গোলাম মাহবুব ৪৫, ৬৪
কাজী জহিরুল কাইয়ুম ১৫১, ১৬৭, ১৭৯, ১৮৫, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২৪৯
কাজী জাফর আহমদ ২০২
কাজী জাফর উল্লাহ ৩০১, ৩০২, ৩০৬, ৩২৪, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৭০, ৩৭২
কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ ১২৩, ১৩১
কাজী মোজাম্মেল হক ১৬৭, ১৯৬, ২০৩, ২১৬
কাজী সিরাজুল ইসলাম ৩৭৩
কাদের মোল্লা ৩৩৭, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৪
কামরুজ্জামান ৩৩৭
কামরুদ্দীন আহমেদ ৮, ৪৫, ৬৪
কিশোরী ইয়াসমিন ২৬৫, ২৬৭, ২৭৭
কৃষক শ্রমিক পার্টি ২১, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৫, ৪৭, ৫১, ৭১
কে এম ওবায়দুর রহমান ৯৬, ১১৪, ১১৬, ১৩০, ১৫২
'কেবিনেট অব ট্যালেন্টস' ২৮, ৩০
কোরবান আলী ১৬, ১৫১, ১৬৭, ১৯১, ১৯৪, ১৯৭-২০০, ২১২, ২১৩, ২৩৯
ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম ৩২৫, ৩৪৫
ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ১৩০, ১৫৩, ১৭৬, ১৮০, ১৮১, ১৯০, ১৯১, ৩১৬
খ ম জাহাঙ্গীর ২৩৫, ২৩৬, ২৩৯, ২৫৯, ২৮৩, ৩০২, ৩৩১
খন্দকার মোশতাক আহমেদ ১৩, ২১, ৪৭, ৯১, ৯৬, ১১৩, ১১৮, ১৩০
আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সম্পাদক ৪
মুক্তিযুদ্ধকালে ষড়যন্ত্র ১৭৬
১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ও ক্ষমতায় আরোহণ ১৭৬, ১৭৭
খয়রাত হোসেন ৩, ৫, ১১, ১৬, ৪৫, ৫৯, ৭৫
খাজা আহমদ ৭৭
খাজা নাজিমুদ্দীন ২, ১১, ১২, ৪০৪
খান আবদুল ওয়ালী খান ১০৭, ১২১
খান আবদুল গাফফার খান ৬৩
খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া ২৪৯, ৩৭৩
খালেদ মোশাররফ ১৭৭, ১৭৮
খালেদ মোহাম্মদ আলী ১৯৮, ২০০, ২১৫
খালেদা জিয়া ২৪৩, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৫০, ২৫৩, ২৭৬, ২৯৬, ৩০৫ (নোট ২৪), ৩০৭, ৩১০, ৩১১, ৩১৬, ৩৩৬
সরকারের পতন ২৭২, ২৭৪, ৩০৯
বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গঠন (২০০১-২০০৬) ৩০৮
যুদ্ধাপরাধী নিজামী ও মুজাহিদকে নিয়ে সরকার গঠন ২৯১, ৩৩৯, ৩৬২, ৩৮১
বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ও সন্ত্রাসের রাজত্ব ২৬৫, ২৯২, ৩০৯
হাওয়া ভবন ২৯৩, ২৯৭, ৩৬২
ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে বিদায় ৩৩২, ৩৩৫
যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষাবলম্বন ও বিচারের বিরোধিতা ৩৩৭
ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাশ ২৭২, ২৭৩
মধ্য ফেব্রুয়ারি (১৯৯৬) ভোটারবিহীন নির্বাচন ৩৮৬
জনতার মঞ্চ ২৭৩
জোট সরকারের চতুর্দশ সংশোধনী ৩০৯
খেলাফতে রব্বানী পার্টি ২৫
খোন্দকার আব্দুল মালেক শহীদুল্লাহ ১৫৮
খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন ৩১৬, ৩৩০
খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ১৯১
গণজাগরণ মঞ্চ ৩৫০-৩৫১
গণতন্ত্রী দল/পার্টি ২৫, ২৭ (নোট ২৫), ৫২, ৬৫
গণতান্ত্রিক যুবলীগ ২, ৫২, ৭৭
গণবাহিনী ১৭৫, ১৭৮
গাউস খান ২০৭
গাজী গোলাম মোস্তফা ১৩০, ১৫২, ১৫৫, ১৬০, ১৬৭, ১৯০, ১৯৯
গুলশান হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলা ৩৫৫, ৩৬৫
গোলাম আযম ২৫৩

www.pathagar.com

জেনারেল জিয়ার শাসনকালে পাকিস্তানি
পাসপোর্টে দেশে আসার সুযোগ লাভ
২৪৭, ৩৩৯, ৩৬২
জামায়াতের আমির নির্বাচিত হওয়া ২৪৭
যুদ্ধাপরাধে বিচার ২৪৭, ৩৩৪
গোলাম নবী আজাদ ৩৫৭
গোলাম মওলা নকশাবন্দী ৩৪৬, ৩৭৩
গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখর ১৯, ২০
গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন ১০, ১১
জ্ঞানী জৈল সিং ২৬৭
চারু মজুমদার ১৫৮
চৌধুরী খলেকুজ্জামান ২৯
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ৩০-৩২, ৩৪, ৪৯, ৫১
চৌধুরী হারুনর রশীদ ২২৭
ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচি ১১৯-১২১,
২১৬ (নোট ১৯), ২৯৭
জন পি কালাহান ২৯
জহিরুল ইসলাম ১৯৮, ২০০, ২৩৬
জহুর আহমেদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম) ৪৫, ১৫২
জহুর আহমেদ চৌধুরী (রাজশাহী) ৪৫, ৬৪
জসিমুদ্দিন আহমদ ১৭, ৫৮, ৬৪
জয়প্রকাশ নারায়ণ ২০৭
জাতীয় চার নেতার গ্রেপ্তার ১৭৪, ১৭৬
নির্মম হত্যাকাণ্ড ১৭৭, ১৮১, ১৯১, ২২১,
২৪৯
হত্যাকাণ্ডের বিচার ২২৯, ২৩৩
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১৫৫
প্রতিষ্ঠা ১৫৮, ১৭০ (নোট ১১), ১৭১ (নোট
২৫)
প্রতিষ্ঠাকালীন নেতৃত্ব ১৫৮
ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ১৭৪-১৭৮
গণকণ্ঠ ১৫৮
জাহানারা ইমাম ২৪৭, ২৫০, ২৬২, ২৬৭
জাহানারা ইমামের উদ্যোগে নাগরিক
আন্দোলন ২৪৭, ২৫০, ২৬২ (নোট ১৪,
১৫, ১৬), ২৬৭
জাহেদুর রহিম ৮৯
জি এম সৈয়দ ৬৩, ২৬৭
জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ ১২, ১৯
জিম ইয়ং কিম ৩৫০
জিল্লুর রহমান ১৫৩, ১৫৫, ১৭৭, ১৭৯,
১৮৪, ১৯০, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২৩৫,
২৩৯, ২৫৮-২৬০, ২৬৭, ২৭৫-২৭৭,
২৮২-২৮৪, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৪, ৩০৫,
৩১৫, ৩২৭
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ১৫১,
১৬৭, ২৫৮, ২৮৩
আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ
সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ ১৬০, ১৬১,
২৭৬, ২৭৭, ২৯৮
জিল্লুর রহমান বনাম ড. কামাল হোসেন ২৫৯,
২৬০
আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ২১৩,
২৩৫, ৩০০
আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ৩১৩
জুলফিকার আলী ভুট্টো ১১৯, ১২১, ১৩৮,
১৩৯, ১৪২, ২৯২, ৪৪৪
জেনারেল ইয়াহিয়া খান
ক্ষমতা গ্রহণ ১২২
আইনগত কাঠামো আদেশ বা এলএফও
(১৯৭০) ১২০, ১২২, ১২৫, ১২৭, ১৩২,
১৩৪, ৩৮৫,
জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা ১৩৯
জেনারেল এরশাদ ২২৪, ২৩৮, ২৪৪
ক্ষমতা দখল ২১৫, ২২০
হ্যাঁ না ভোট ২২১
সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্ব দাবি ২২০,
২২১, ২২৩
রাষ্ট্রপতি পদে আসীন ২২০
প্রশাসনের সামরিকীকরণ ২২১, ২২৯
জেলা পরিষদ বিল ২৪২
বঙ্গবন্ধুর খুনি বজলুল হুদাকে নির্বাচনে
অংশগ্রহণ ও নির্বাচিত হতে সুযোগ দান
২৪৪
হাইকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ ২২০, ২৪৪
রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ২৪২, ২৪৪, ৩৩৫
এরশার বিরোধী আন্দোলন ২৪২-২৪৫
তিনজোটের অভিন্ন রূপরেখা ২৪২
পতন ২৪২
জেনারেল জিয়ার উত্থান ১৭৪
সংবিধানের প্রস্তাবনা ও চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি
পরিবর্তন ১৮৮, ১৮৯
হ্যাঁ না ভোট ১৮৮, ১৯০
রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ১৮৭

www.pathagar.com

জিয়া বনাম ওসমানী ২০১, ২০২
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (১৯৭৮) ২০২
স্বাধীনতা-বিরোধী শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী করা ২০৩, ৩৩৯, ৩৬২
শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে দেশে আসার সুযোগ দান ২৪৭
ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে নিহত ১২০
ঝেং জিয়াও সং ৩৫৭
টিক্কা খান ১৪২
টিপু বিশ্বাস ১৫৭, ৩৪৪, ৩৭১, ৩৭৩
টিপু মুন্সি ৩২৫, ৩৭১
ড. অনুপম সেন ৩৪৬, ৩৭৩
ড. আনিসুজ্জামান ২৬২
ড. আহমদ শরীফ ২৬২
ড. আব্দুর রাজ্জাক এমপি ৩০৬, ৩৬৮, ৩৭৭
ড. আবদুল মজিদ খান ২২১, ২২২, ২২৭
ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ৩০৯, ৩১০, ৩৩৯
ড. এ টি এম শামসুল হুদা ৩১১, ৩২৮
ড. ওয়াজেদ মিঞা ৩১৮
ড. কামাল হোসেন ১৪৭, ২১২, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২৩৮, ২৩৯, ২৪২, ২৪৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬৩, ৩১০, ৩২৭, ৩৮৪, ৪৪৯
ড. কুদরত-ই-খুদা ১৫৫, ১৫৬, ২৩৪, ২৫৯, ২৭৫, ৩৩৪
শিক্ষা কমিশন ১৫৫, ১৫৬, ২৩৪, ২৬৯, ৩৩৪
ড. গওহর রিজভী ৩৭৩
ড. নিলীমা ইব্রাহিম ১৫৫
ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ৩০৭, ৩১০, ৩১১, ৩২৬
ড. মনমোহন সিং ৩৩২
ড. মশিউর রহমান ৩২৫, ৩৪৬, ৩৭০, ৩৭৩
ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর ৩০২, ৩০৬, ৩৪৬, ৩৭৩
ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৩১০, ৩২৭, ৩৩২
নাগরিক শক্তি ৩১০, ৩২৭ (নোট ৯)
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১২৩
ড. মোহাম্মদ সেলিম ২৮৩
ড. শামসুজ্জোহা ১১৯, ১২২, ১২৪, ২৪৫
ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ৩২৫, ৩৭৫
ডা. আলাউদ্দীন ১৭৯, ১৮৫, ১৯৭, ২০০, ২৩৫, ২৩৬, ২৫৮
ডা. আসাবুল হক ৯৫, ১৬৭, ২১৬
ডা. এস এ মালেক ৩০৫, ৩২৫, ৩৪৬, ৩৭৩
ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান ৩৫৮
ডা. দীপু মণি ৩২৪, ৩৪৪, ৩৭১
ডা. মাযহার উদ্দিন আহমেদ ১৬, ৪৫, ৬৪
ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ২৫৯, ২৮৩, ৩০১
ডা. শামসুল আলম মিলন ২৪৫
ডা. শাহাদাত হোসেন ৩৫৮
ডা. সিরাজুল আকবর ৩৪২
ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর মৃত্যু ৭১, ৭৮
ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি (ডাক) ১১৯, ১২১
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন (১৯৯৪) ২৬৫, ২৬৬, ২৭৯
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বিভক্তি ৩৩২
তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ৭০, ৭২, ৭৫, ১০৩, ১০৪, ১০৮, ১০৯, ১১৮, ১২৩, ১২৪
তাজউদ্দীন আহমদ ৯৭, ১০০ (নোট ১১), ১০৩, ১০৪, ১৫২, ১৬৬, ১৬৭
আওয়ামী লীগের সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি সম্পাদক (১৯৫৫) ৪৫, ৬২, ৬৪
আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ৮১
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ৯৬, ১১৩, ১১৪, ১৩০
গ্রেপ্তার ১১৬ (নোট ৭)
আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে রিপোর্ট পেশ ১১৯, ১২৪, ১৪১-১৪৪
মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ১৩৮, ১৪০
বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী ১৬৪
তালুকদার আবদুল খালেক এমপি ২৯২, ৩০২
তাসখন্দ চুক্তি ৮৭, ৮৮, ১০৪
ত্রি-দলীয় ঐক্যজোট ১৫৬, ২২০
তোফায়েল আহমেদ ৮৬, ২০৬, ২০৭, ২১২, ২১৩, ২৩৯, ২৪৯, ৩১৪, ৩২৬
ডাকসুর সহ-সভাপতি ও ছাত্রলীগের সভাপতি ১২১
আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের অগ্রনায়ক ১২৩
আওয়ামী লীগের কাউন্সিলরদের কাছে তাঁকে বঙ্গবন্ধুর পরিচয় করিয়ে দেয়া ১২৩
আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্য ১৫২, ১৬৮

www.pathagar.com

গ্রেপ্তার ১৭৭, ১৯০, ২৯১
আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ১৯৬, ২০৬, ২১৩, ২৩৫
আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ২৫৮, ২৮২, ৩০০
আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ৩৪৬, ৩৭৩
আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য ৩৪৬, ৩৭২
স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য ৩৭২
দায়রা জজ গোলাম রসুল ২৮৯, ৩০৪, ৩৩৩
দিলীপ বড়ুয়া ৩১৬, ৩৩৮, ৩৫৮
দ্বি-জাতিতত্ত্ব ৩৬, ৪০, ৪৯, ২৫৩
দীপঙ্কর তালুকদার (রাঙ্গামাটি) ৩৬৬, ৩৭২
'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব' ৯৭, ১০২
দেওয়ান ফরিদ গাজী ১৫২, ১৭৯, ১৮৫, ১৯১, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২১৫, ২১৬, ২২৬, ২৩৬, ২৩৮, ২৫৯, ২৮৩, ৩২৫
দেলোয়ার ২২২, ২২৭, ২৩৮
দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ৩৩৪
ধর্মীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯৭, ৩০৭, ৩০৮, ৩৫০, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৯, ৩৬০
নওয়াবজাদা খাজা হাবিবুল্লাহ ৩, ৩৮৯
নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ৮১
আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের উদ্বোধন (১৯৬৪) ৭০, ৭৫
নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি ৭০, ১০৫
লাহোরে বিরোধী দলের কনভেনশন (১৯৬৬) ৮৮
কনভেনশনের সাবজেক্ট কমিটিতে বিবেচনার জন্য ৬-দফা গৃহীত না হওয়া ৮৯, ১০০
আওয়ামী লীগ ভাঙনের অপচেষ্টা ১০৫, ১২৬, ৩৮৪, ৪৩৫
পিডিএম গঠন ১০৫
নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী এমপি ৩৫৮
নরেন্দ্র মোদী ৩৫০, ৩৫৮
নয় নেতার 'বিবৃতি' ৭৩, ৭৮, ৪২৭
নাজমা রহমান ৩০১, ৩০৬
ন্যাপ প্রতিষ্ঠা ৫১, ৬৩
'আইয়ুবের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ১০৩
ভাঙন ১০৭
নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ৪২, ৬৩, ৬৭, ১০৩, ১০৬, ১২৮, ১৩১
নিচিতা এ সাকাতা ১৬২
নিজামে ইসলাম ২১, ২৫, ২৭, ৩৩, ৪৭, ৭৩, ১২১, ৪০৫, ৪০৭
নুরুর রহমান ৫২, ৭৫
নুরুল আমিন ২০, ৭৫, ১০৫, ১২৫, ৪০৪, ৪৩৬
নুরে আলম জিকু ১৫৮, ১৭০, ২৯৫
নুরুল ইসলাম চৌধুরী ৯৬, ১১৬, ১৭৯, ১৮৫, ২০০
নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৪৯, ২৮৩, ৩০১, ৩২৫, ৩৪৫, ৩৭০, ৩৭৭
নুরুল ইসলাম মঞ্জু ১৫২
নুরুল ইসলাম ভাণ্ডারী ১৬৮, ৩৫৮
নুরুল মজিদ হুমায়ুন ২৮৩, ৩৭২
নুরুল হক এমপিএ ৯৫, ১১২-১১৪, ১৫২, ১৬৩, ১৭০, ১৯৯
নূর চৌধুরী ৩৪৬, ৩৪৭
নূরে আলম সিদ্দিকী ২০৩, ২০৪, ২১৬
পদ্মাসেতু ৩১৯, ৩৩২, ৩৩৬, ৩৬৪
পটুয়া কামরুল হাসান ২৪৯
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) ১০৩, ১০৫-১০৭, ১০৯, ১১২, ১১৫, ১১৭ (নোট ১১৬ ও ১৭), ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ৩৮৪
পাকিস্তান পিপলস পার্টি ১১৯, ১২১, ১৩৫ (নোট ৯), ১৩৮
পার্থ চ্যাটার্জি ৩৫৭
পিসিলা রাজ ২৯২
পীর হাবিবুর রহমান ৪৫, ১০৩, ১০৮
পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য ৩৭০, ৩৭৭
পুলিন দে ২৩৫, ২৩৬, ২৫৮, ২৮২
পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ৫২
প্রগতিশীল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৩২৭ (নোট ৮)
প্রফুল্ল কুমার মহন্ত ৩৫৭
প্রফেসর ডা. আবদুল মান্নান এমপি ৩২৫, ৩৪৬
ফকরুল ইসলাম মুন্সী ৩৪৬, ৩৭৩
ফজলুর রহমান ফারুক (টাঙ্গাইল) ৩৬৬
ফজলুল করিম ১৭৯, ১৮৫, ১৯৬, ২১৪, ২৩৬, ২৪০, ২৮৩, ৩০৬
ফজলুল কাদের চৌধুরী ২৭
ফজলুল হক আমিনী ২৯০

www.pathagar.com

ফজলুল হক বিএসসি ১৬৮, ১৭৯, ২০০, ২৩৫, ২৩৬, ২৫৮, ২৮৩
ফজলুল হালিম চৌধুরী ২৬৩
ফণিভূষণ মজুমদার ১৫২, ১৬৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮৫, ১৯৭, ২০০, ২১৩, ২২৭
ফয়েজ মোহাম্মদ ১১৪, ১২৩, ১৩১
ফাতেমা জিন্নাহ ৮৭-৮৮, ১৩৩
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টার ৩০৭, ৩১৫, ৩২০
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্বদান ২, ১০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার ২
আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ৩-৪
ভাষা আন্দোলনে কারাবন্দি ১০
১৯৪৯ সাল থেকে ২ বছরের অধিক একনাগারে কারাগারে ১১
এগারো দিনের অনশন ১১
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ১২, ১৩, ৯৬
কাউন্সিলে রিপোর্ট পেশ (১৯৫৩) ১৩
দলের অসাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে অবস্থান ১৫
পার্টির সাধারণ সম্পাদক হওয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ১৫-১৬
পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত ১৬
যুক্তফ্রন্ট গঠন সম্বন্ধে অবস্থান ১৯-২১, ৪০৩-৪০৭
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় যোগদান ২৯
মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ৫১, ৫৮, ১৬৮, ১৭২ (নোট ৪৬), ৩৮২
ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ২৮, ৩৩, ৪১০-৪১১
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার ৩০
কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ১০, ১৩, ৩৩, ৩৬, ৫৫, ৫৯, ৭৭, ৮০, ৮৫ (নোট ১১), ৮৬ (নোট ২৬, ৩০), ৪০০-৪১৮ (পরিশিষ্ট তিন), ৪১৯-৪২৩ (পরিশিষ্ট চার), ৪২৪-৪৩০ (পরিশিষ্ট পাঁচ)
পুনরুজ্জীবন ৭০, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৮১, ৮৪, ১০০ (নোট ৮), ১০৫, ১১৫, ১৬৫, ১৮৬, ৪৩৩
পুনরুজ্জীবনের পক্ষ-বিপক্ষ ৭৪-৭৫
গ্রেপ্তার ১০, ১১, ১৩, ৩০, ৩১, ৭০-৭২, ৭৮, ১০৩, ১০৪, ১১৪, ১১৫, ১১৬ (নোট-৭), ১১৯, ১২৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪২
৬-দফা কর্মসূচি ৩৯, ৪১, ৮৭, ৮৯-৯১, ৯৪-৯৯, ১০০ (নোট-২, ৮, ১৬, ১৭), ১০৩-১০৮, ১১৫, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৯
সভাপতি নির্বাচিত হওয়া ৮৭
আগরতলা মামলা বা রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য ১৪৬, ১৬১
ট্রাইব্যুনালে বক্তব্য ১০৭,
উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও কারামুক্তি ১১৯, ১২২
'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত ১১৯, ১২২
আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে ভাষণ ৩৭, ৯৮, ১২৪, ১৩২, ১৪৪-১৪৬, ১৫৯, ১৬১-১৬২, ১৭২ (নোট ৪৬), ৪৩৫-৩৪৭ (পরিশিষ্ট সাত), ৪৩৮-৪৪২ (পরিশিষ্ট আট), ৪৪৩-৪৪৮ (পরিশিষ্ট নয়), ৪৫৭-৪৫৯ (পরিশিষ্ট তেরো)
নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ১৩১
প্রথম নির্বাচনি (১৯৭০) জনসভা ১৩১-১৩৪
জয় বাংলা স্লোগানের ব্যাখ্যা ১৩২-১৩৩
মওদুদী জামায়াতের কঠোর সমালোচনা ১৩২
অসহযোগ আন্দোলন ১৪২, ৩৮৫
৭ই মার্চের ভাষণ ১৩৯, ৩১৬, ৩৮৫
স্বাধীনতা ঘোষণা ১৩৮, ৩৩৫, ৩৬১
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ১৪১, ১৫৭, ৩৬১
এমপিদের গ্রামে যাওয়ার নির্দেশ ১৪৫
জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ ৪৫১-৪৫৬ (পরিশিষ্ট বারো)
সভাপতির পদ থেকে বিদায় ১৬৭
খুনিদের ফাঁসির রায় কার্যকর ৩৩২-৩৩৩, ৩৪৭ (নোট ৩)
'ছাত্রলীগ এদেশের গণসংগ্রামের জনক' ১২৪, ৩৮৭, ৪৪০
নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের সমালোচনা ৪৩৬ (পরিশিষ্ট সাত)
গোলাম আযমের জবাবে ৪৩৭ (পরিশিষ্ট সাত)
নূরুল আমীনের সমালোচনা ৪৩৭ (পরিশিষ্ট সাত)
এবডো সম্পর্কে ৪৩৭

www.pathagar.com

'এক যুদ্ধের শেষ আরেক যুদ্ধের শুরু' ৪৫২-৪৫৭ (পরিশিষ্ট বারো)
কাউন্সিল উপলক্ষ্যে (১৯৭৪) বাণী ৪৬১ (পরিশিষ্ট চৌদ্দ)
১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮১, ১৯১, ২১১, ২৫২, ২৬৭, ৩৩৩, ৩৬১, ৩৫৬
বদরউদ্দিন আহমেদ কামরান (সিলেট) ৩২০, ৩৬৬, ৩৭২
বাহাউদ্দিন চৌধুরী ৯৬
বান্দুং সম্মেলন ৪১
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
প্রতিষ্ঠার পটভূমি ১-৩
আহসান মঞ্জিল বনাম মুগলটুলী পার্টি হাউজ ১
রোজ গার্ডেনে কর্মী সম্মেলন ৩, ৭
মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা ৩, ৩৮৯-৩৯০
প্রতিষ্ঠাকালীন নেতৃবৃন্দ ৪-৫, ৮ (নোট ১২)
শামসুল হক প্রণীত 'মূলদাবী' ৫-৬, ৪৩
প্রতিষ্ঠাকালীন খসড়া গঠনতন্ত্র ৬-৭
রাজনীতির মূলধারা ৭, ৩৮৭, বইয়ের ভূমিকা
আর্মানীটোলা ময়দানে প্রথম জনসভা ১১
শর্তসাপেক্ষে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে সংযুক্তি ১২, ১৮ (নোট ৭)
কাউন্সিলে (১৯৫৩) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ১৩-১৪ (পরিশিষ্ট দুই)
অসাম্প্রদায়িকীকরণ প্রশ্নে কাউন্সিলে বিতর্ক ১৫-১৬
যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রসঙ্গে কাউন্সিলে বিতর্ক ১৯-২৩, ৪০৩-৪০৫
যুক্তফ্রন্ট গঠন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ২২
নির্বাচনি ইশতেহার (১৯৫৪) ২২-২৪
চুয়ান্নর নির্বাচনের ফলাফল ২৫
কাউন্সিলে সোহরাওয়ার্দীর উদ্বোধনী ভাষণ (১৯৫৫) ৩২-৩৩
কাউন্সিলে (১৯৫৫) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ৩৩-৩৫ (পরিশিষ্ট তিন)
কাউন্সিলে (১৯৫৫) ভাসানীর ভাষণ ৩৫-৩৬
অসাম্প্রদায়িকীকরণ ৩৬-৩৯, ৪২, ৩৮২, ৪১৪-৪১৫
অসাম্প্রদায়িকীকরণ প্রশ্নে কাউন্সিলে ভোটাভুটি ৩৮-৩৯
অসাম্প্রদায়িকীকরণের বিরোধীদের রিকুইজিশন নোটিশ ৩৯
যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ ৩৯-৪০
নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দলের সদস্যপদ উন্মুক্ত ৪৩
বার্ষিক কাউন্সিলের স্থলে দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল ৪৪, ৪৬
পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন ৪৪
আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ৪৪-৪৫
দলের কর্মকর্তাদের একই সঙ্গে সরকারি পদ গ্রহণে বিধিনিষেধ ৪৫
কাউন্সিলে দলের আয়-ব্যয় হিসাব বিবরণী ৪৫, ৪৬, ৪১৮-৪১৯
দ্বিতীয় গণপরিষদ নির্বাচনে (১৯৫৫) আওয়ামী লীগের ফলাফল ৪৭ (নোট ১৫)
কাগমারী সম্মেলন ৫১, ৩৮২-৩৮৩
উদার গণতান্ত্রিক বনাম বামপন্থি ধারা ৫১-৫৩
পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দী বনাম ভাসানী ৫১, ৫৯-৬০
কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান পার্টির মন্ত্রিসভা ৫২
অলি আহাদের বহিষ্কার ৫৩-৫৪
কাউন্সিলে (১৯৫৭) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ৫৫-৫৮ (পরিশিষ্ট চার)
বঙ্গবন্ধুর অলি আহাদকে বহিষ্কারের কারণ ব্যাখ্যা ৫৭-৫৮
আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধুর যোগদান ও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ৫৮-৫৯, ৬২
কাউন্সিলে সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতির ব্যাখ্যা ও ভোটাভুটির ফল ৫৯-৬০
সভাপতির পদ থেকে ভাসানীর পদত্যাগ ৬২-৬৩
আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্য ৫৫-৫৬
আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ৭০, ৭৩-৭৪
নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ৭৫
পুনরুজ্জীবনের পক্ষ বিপক্ষ ৭৪-৭৫
শাহ আজিজুর রহমানের যোগদান ৭৭
আঞ্চলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ ৭৯
কাউন্সিলে (১৯৬৪) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ৭৭-৮০ (পরিশিষ্ট পাঁচ)

www.pathagar.com

কাউন্সিলে (১৯৬৪) গৃহীত প্রস্তাবাবলি ৮২-৮৪, ৪৩২-৪৩৫
যমুনা নদীর ওপর সেতু/টানেল নির্মাণের প্রস্তাব (১৯৬৪), ৮৩, ১৪৯, ৪৩৫
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ (কাউন্সিল ১৯৬৪) ৮২, ৮৪, ৯৮
কাউন্সিল (১৯৬৬)-এর উদ্বোধনী সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' ৮৭, ৮৯
কাউন্সিলে (১৯৬৬) বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা বিশ্লেষণ ৯১-৯৫
এনডিএফ প্রশ্নে ভিন্নমত ১০৫-১০৬
পিডিএম প্রশ্নে আওয়ামী লীগে বিভাজন ১০৩
পিডিএম প্রশ্নে বহিষ্কার ১০৩, ১০৬
কাউন্সিলে (১৯৭০) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ১২৩-১২৪
কাউন্সিলে (১৯৭০) বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ১২৪-১২৭ (পরিশিষ্ট সাত ও আট)
সাম্যবাদী অর্থনীতি প্রবর্তন ১২৮
৬-দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনা ১২৮
মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা ১২৯, ১৪৫, ১৪৭, ১৬০, ১৭৬, ২২১, ২৬১ (নোট ৬), ৩৮৩, ৪৪৫ (পরিশিষ্ট এগারো)
৬-দফার প্রশ্নে গণম্যান্ডেট ১৩৮
কাউন্সিলে (১৯৭০) গৃহীত কর্মসূচি ১২৮-১২৯
স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম কাউন্সিল ১৩৮
কাউন্সিলে (১৯৭২) বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ১৪৪-১৪৬ (পরিশিষ্ট নয়)
কাউন্সিলে (১৯৭২) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ১৪১-১৪৪
নতুন ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি (১৯৭২), ১৪৭-১৪৮
কাউন্সিলে (১৯৭২) গৃহীত প্রস্তাব ১৪৯-১৫০
দলের নতুন গঠনতন্ত্র (১৯৭২), ১৫০
১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয় ১৩৮
মুক্তিযুদ্ধকালে ওয়ার্কিং কমিটির সভা ১৪৩
পররাষ্ট্রনীতি ১৪৫
দল ও সরকারের সম্পর্ক ১৪৬, ১৫০
দলের নাম পরিবর্তন ১৫১
অনিচ্ছাসত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ গ্রহণ ১৫১
বঙ্গবন্ধুর সরকারের সম্মুখে চ্যালেঞ্জসমূহ ১৫৫-১৫৬
বঙ্গবন্ধু সরকারের সাফল্য ১৫৬-১৫৭
নির্বাচনে (১৯৭৩) বিজয় ১৫৭
চীনপন্থি সংগঠনসমূহের সশস্ত্র তৎপরতা ১৫৭-১৫৮
কাউন্সিলে (১৯৭৪) বঙ্গবন্ধুর উদ্বোধনী ভাষণ ১৬১-১৬২, (পরিশিষ্ট তেরো)
কাউন্সিলে (১৯৭৪) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ১৬০-১৬১
আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে (১৯৭৪) গৃহীত প্রস্তাব ১৬৪-১৬৬
গঠনতন্ত্র সংশোধন (১৯৭৪) ১৬৬
মহিলাদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ কাউন্সিলরের আসন সংরক্ষণ ১৬৬
সভাপতির পদ থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণ ১৬৭-১৬৯, ১৭২ (নোট ৪৬)
৭৫-পরবর্তী আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন ১৭৪, ১৭৮-১৮০, ৩৮০
দল হিসেবে সরকারের অনুমোদন লাভ ১৭৮
মিজানুর রহমান চৌধুরীর সাংগঠনিক রিপোর্ট (১৯৭৭) ১৮১-১৮২
কাউন্সিলে (১৯৭৭) গৃহীত প্রস্তাব ১৮৩-১৮৪
জোহরা তাজউদ্দীনকে আহ্বায়ক করে সাংগঠনিক কমিটি ১৮৪-১৮৫
৭৫-পরবর্তী আওয়ামী লীগে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ১৯০, ১৯২
বেগম মনসুর আলীর কাউন্সিল (১৯৭৮) উদ্বোধন ১৯২
কাউন্সিলে (১৯৭৮) বেগম সাজেদা চৌধুরীর ভাষণ ও রিপোর্ট ১৯২
কাউন্সিলে (১৯৭৮) সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনের ভাষণ ও রিপোর্ট ১৯২-১৯৩
সভাপতি আব্দুল মালেক উকিল বনাম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক ১৯৬-১৯৮, ২০০ (নোট ৩১)
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (১৯৭৯) অংশগ্রহণ ২০১, ২০২-২০৩
মিজানুর রহমান চৌধুরীর পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন ২০৩-২০৫, ২১৬ (নোট ১৩)
মিজান চৌধুরী ও তাঁর অনুসারীদের আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার ২০৪
সম্মেলনে (১৯৮১) শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা বাণী ২০৭

www.pathagar.com

কাউন্সিলে (১৯৮১) আব্দুর রাজ্জাকের সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ২০৭-২০৮
কাউন্সিলে (১৯৮১) সভাপতি আবদুল মালেক উকিলের ভাষণ ২০৯
কাউন্সিলে (১৯৮১) আমন্ত্রিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাষণ ২০৮-২০৯
কাউন্সিলে (১৯৮১) গঠনতন্ত্র সংশোধন ও প্রেসিডিয়ামের সৃষ্টি ২০৯-২১০
কাউন্সিলে (১৯৮১) প্রস্তাব গ্রহণ ২১১
নেতৃত্ব নিয়ে চরম কোন্দল ২১২-২১৩
ঐক্যের প্রতীক শেখ হাসিনা ২১২-২১৩, ২১৪
অনুপস্থিতিতে শেখ হাসিনার পার্টির সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়া ২১২-২১৩
দলের সভানেত্রী হওয়ার নেপথ্য কাহিনি ২১২-২১৩, ২১৭-২১৭, (নোট ৩৯, ৪০)
সভানেত্রী হওয়ার পর শেখ হাসিনার প্রতিক্রিয়া ২১৪
কাউন্সিলে (১৯৮৭) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ২২৭-২২৮
কাউন্সিলে (১৯৮৭) শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ২২৮-২৩২
আব্দুর রাজ্জাক ও মহিউদ্দীন আহমেদের 'বাকশাল' নামে ভিন্ন দল গঠন ২১৯, ২২৪-২২৬
বাকশালের আওয়ামী লীগে একীভূত হওয়া অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার ভাষণ ২৪০ (নোট ৩২)
১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ ও ফল ২৪৫-২৪৬
কাউন্সিলে (১৯৯২) শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ২৪৯-২৫১
কাউন্সিলে (১৯৯২) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ২৫২-২৫৪
কাউন্সিলে (১৯৯২) জেলা নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ২৫৪-২৫৫
কাউন্সিলে (১৯৯২) নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ ২৫৫-২৫৬
ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ২৫৬
মিরপুর ও মাগুরার উপ-নির্বাচন ২৬৬
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি ২৬৫, ২৭০
বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে (১৯৯৫) শেখ হাসিনার ভাষণ ২৬৮-২৭০
কাউন্সিলে (১৯৯৫) জেলা নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ২৬৭-২৬৮
কাউন্সিলে (১৯৯৭) গঠনতন্ত্র সংশোধন ২৮১
১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভ ২৭৪
২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন ২৭২, ২৭৪
কাউন্সিলে (১৯৯৭) শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ২৭৭-২৭৯
কাউন্সিলে (১৯৯৭) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ২৭৬-২৭৭
বিরোধী দলসমূহের সংসদ সদস্যদের একযোগে পদত্যাগ ২৭২-২৭৩
২০০১ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ফল ২৯০-২৯১
কাউন্সিলে (২০০২) রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা বক্তব্য ২৯৫-২৯৬
কাউন্সিলে (২০০২) শেখ হাসিনার ভাষণ ২৯৬-২৯৮
কাউন্সিলে (২০০২) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ২৯৮-২৯৯
ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে বর্ধিত সভা (২৬শে মে ২০০৮) ৩০৮
ডিসেম্বর ২০০৮ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং বিশাল বিজয় অর্জন ৩০৮
কাউন্সিলে (২০০৯) শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ৩১৭-৩২০
কাউন্সিলে (২০০৯) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ৩২০
কাউন্সিলে (২০০৯) জেলা নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ৩২১
বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ২১ হাজার নেতা-কর্মী হত্যা ৩৩৮
কাউন্সিলে (২০১২) শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ৩৩৯-৩৪১
কাউন্সিলে (২০১২) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ৩৪১-৩৪২
কাউন্সিলে (২০১২) আয়-ব্যয় হিসাব পেশ ৩৪২-৩৪৩
কাউন্সিলে (২০১৬) বিদেশি অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য ৩৫৭
কাউন্সিলে (২০১৬) সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ৩৫৯-৩৬০

www.pathagar.com

কাউন্সিলে (২০১৬) শেখ হাসিনার উদ্বোধনী ভাষণ ৩৬০-৩৬৬
কাউন্সিলে (২০১৬) জেলা নেতৃবৃন্দের রিপোর্ট ৩৬৬-৩৬৭
কাউন্সিলে (২০১৬) গৃহীত ঘোষণাপত্র ৩৬৭-৩৬৮
কাউন্সিলে (২০১৬) গঠনতন্ত্র সংশোধন ৩৬৮-৩৬৯
কাউন্সিলে (২০১৬) বাজেট পেশ ৩৬৯-৩৭০
আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু ৩৮১-৩৮২
আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শেখ হাসিনা ৩৮২
আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধুর চার মূলনীতি ৩৮৩
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) ২০৪, ২০৭, ২১৪, ২১৯, ২২৫, ২২৬, ২৩৬, ২৩৮, ২৪৭, ২৬২, ৩৮৬
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা ১৯০, ২০১
নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ৩০৯
বিএনপি-জামায়াত জোটের চরম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ৩০৭-৩০৯
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
ভারতের ভূমিকা ১৩৮, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪
সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ১৪০, ১৪৩
যুক্তরাজ্যের ভূমিকা ১৪০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন ১৪৩
জয়দেবপুরে প্রতিরোধ ১৪২
পরামর্শ কমিটি গঠন ১৪৩
বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি ১৪৯, ১৫৬, ৪৪৭
বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৪৪, ২৪৯, ১৫৭
বিচারপতি আবদুর রউফ ২২৬
বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ১৯০, ২২০, ৩৩৫
বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ২৮৯
বিচারপতি এ এফ এম আহসান উদ্দীন ২২০
বিচারপতি এম আর কায়ানী ৭৬
বিচারপতি এস এ রহমান ১০৮
বিচারপতি কে এম সোবহান ২৯২, ৩০৫
বিচারপতি কে এম হাসান ৩০৯, ৩১৭
বিচারপতি মো. নিজামুল হক ৩৩৪
বিচারপতি মো. ফজলুল করিম ২৮৯
বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহীম ৭৭
বিচারপতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন ২৮৯
বিচারপতি লতিফুর রহমান ২৮৮, ২৯০, ২৯৬
বিচারপতি সায়েম ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৭, ১৮৮, ২০১, ২০২
বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ২৪২, ২৪৫, ২৭৮
বিচারপতি হাবিবুর রহমান ২৭২, ২৭৪, ২৭৮
বিদেশি নাগরিক হত্যা ৩৫০
বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ১৭৫, ১৭৮, ১৮৬ (নোট ১১), ১৮৯
বিমান বসু ৩৫৭
বিল ক্লিনটনের ঢাকা সফর ৩০৪ (নোট ১৪)
বিশ্বব্যাংক ৩৩৬, ৩৪৭ (নোট ১৫), ৪৫৪
বীর বাহাদুর এমপি ২৬৮, ২৯৮
বীরাঙ্গনা ১৪৯, ৩৪৬, ৩৬৪, ৪৫৪
বেগম আইভি রহমান ২৮৪, ৩০৬
বেগম আনোয়ারা খাতুন এমএলএ ৩, ৫
বেগম আমেনা মনসুর ১৮০, ১৮৮, ১৯১, ১৯১
বেগম নজরুল ইসলাম ১৮০
বেগম নুরজাহান মুর্শীদ ১৩১
নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা (১৯৭০) ১৩১
বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ৩৫৬
বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ
আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ১৩০
বেগম মনসুর আলী ২৩৬, ২৮৩, ৩০২, ৩২৫, ৩৪৫, ৩৭২
বেগম মন্নুজান সুফিয়ান ২৩৫, ২৩৬, ২৫৮, ৩০২, ৩২৫, ৩৪৫, ৩৭২
বেগম মতিয়া চৌধুরী ৩০২, ৩২৩
বেগম রোকাইয়া আনোয়ার ৭৫, ৮১
বেগম সাজেদা চৌধুরী ১৯১, ১৯৬, ২১৩, ২৩৯, ৩১৬, ৩২৩, ৩৩৯, ৪৪৬, ৩৭২
আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ১৫২, ১৬৭
আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক (১৯৭৬) ১৭৯, ১৮৮, ২১৯
দল পুনর্গঠনে ভূমিকা ১৭৯, ১৮০
গ্রেপ্তার ১৮০

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে রিপোর্ট পেশ ২২৭, ২৫২-২৫৪
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ২৩৫
প্রেসিডিয়াম সদস্য ২৫৮, ২৮২, ৩০০, ৩২৪, ৩৪৪, ৩৭০
ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ৩৫৮
ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম ২৯২
ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ৩৫৮
ব্যারিস্টার শওকত আলী খান ২০০, ২৩৬, ২৬২
ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ২৬২, ৩৭৩
ভি পি গিরি ২০৭
মঈনউদ্দিন খান বাদল এমপি ৩৫৮
মওদুদী ১২৪, ১৩২, ১৩৩, ২৫৩, ৪৩৬, ৪৪১
মওলানা আকরম খাঁ ১, ১০৯
মওলানা আতাহার আলী ২১, ২৫, ২৭, ৩৩
মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ৫৪, ৬৬ (নোট ২১), ৭৫, ৮০, ৮৭, ৯৬, ১০০ (নোট ২), ১০৬,
আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ৬২
আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ৬৩, ৬৪
আওয়ামী লীগের সভাপতি ৮১
৬-দফা প্রশ্নে ভিন্ন মত ১০০ (নোট ২)
পিডিএম-এ যোগদান ১২৩
আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার ১১৬ (নোট ১২)
আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন ১২৮ (নোট ৩৯)
গণ আজাদী লীগ ২০৬, ২০৯
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ৩, ১১, ১৩, ১৫-১৬, ৫৩, ৫৯, ১৩২, ৩৮৫
আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ৪, ১৬
ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে গ্রেপ্তার ১১
১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ ১০, ১৪-১৫
পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে ভাসানী বনাম সোহরাওয়ার্দী ৫১-৬৪, ৩৮২, ৩৮৪
আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ ৫১, ৫৬, ৬২-৬৩, ৬৮
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন ৫১-৫৩, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৮৪
মওলানা আলতাফ হোসেন ২৪৫, ২৬২, ২৬৪
মজিবুর রহমান (বগুড়া) ১৭, ৯৫, ১৭৯, ১৮৫, ১৯৭
মতিউর রহমান ১১৬, ১৮৫, ১৯১, ১৯৪, ১৯৫, ২১৬, ২৩৫, ২৩৬, ২৫৯
মতিউর রহমান নিজামী ২৯১, ৩০৩, ৩২৬, ৩৩৪, ৩৫০, ৩৬২
মনজুরুল আহসান খান ২৯৫, ৩১৬, ৩৫৮
মনিরুল ইসলাম মনি ওরফে মার্শাল মনি ১৫৮
মনিরুজ্জামান বাদল ২৫২
মনু মিয়া ১০৪, ১৩৪
মনোরঞ্জন ধর ১৫১, ১৮৫, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২১২, ২১৬
মঞ্জুরুল ইমাম ২০৮, ২১৭
মফিজুল ইসলাম কামাল ২০০, ২১৩, ২৩৫
মমিনুদ্দিন আহমদ ৯৬, ১১৬
মশিউর রহমান ১৬, ৪৫, ৬৪, ৭৪
মশিউর রহমান যাদু মিয়া ২০২
মহিউদ্দীন আহমেদ ১০৩, ১৭৯, ১৮০, ১৯৪, ১৯৫, ২২৫
মহিউদ্দিন আহমদ (পিস্তল মহিউদ্দিন) ২০৪, ২১৫, ২১৬, ২৬৭
মহিউদ্দীন আহমেদ (মুন্সিগঞ্জ) ৩৬৬
মহিউদ্দীন আহমেদ ৫৯, ৬৭, ৬৮ (নোট ৩৪), ১০৩, ১০৮, ১৮০, ১৮৫, ১৯৪, ১৯৭, ২০০
গণতন্ত্রী দলে যোগদান ৬৭, ৬৮
যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে এমএলএ ৬৭, ৬৮
আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ১৫৯, ১৮০
আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ২১৩
বাকশালের সভাপতি ২১৯, ২২৫, ২২৬
আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার ২২৫
আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন ২২৬
মহিবুস সামাদ ৫০, ৬২, ৬৪
মানকী শরিফের পীর সাহেব ৭৬
'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' জাতীয় কনভেনশন (ফেব্রুয়ারি ২০০২) ২৮৭-২৮৮, ২৯২, ২৯৭
মার্শাল জোসেফ টিটো ২০৭
মালিক ফিরোজ খান নুন ৬৮, ৭১, ৭৭
মালিক হামিদ সরফরাজ ৮১, ৮৫, ১০৩, ১৩১
মাস্টার খান গুল ১২৩, ১৩১

www.pathagar.com

মাহমুদ আলী ২৭, ৫২, ৬৯
মাহমুদুল হক ওসমানী ৬৩
মিজানুর রহমান চৌধুরী
আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ১০৪, ১১৬ (নোট ৭)
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ১০৩, ১০৮, ১১৭
সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ ১১৯, ১৮১-১৮১
পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন (১৯৭৮)১৯৮, ২০১, ২০৩-২০৪
আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার ২০৫
মিহনিয়া চিরগুই ১৬২
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৩৫৮
মিসেস মেহেরুন্নেসা খাতুন ৬৪
মিসেস সেলিনা বানু এমএলএ ৪৫, ৫৩
মিয়া ইফতেখার উদ্দিন ১৯, ২০, ৬৩, ৭৬
মীর্জা সুলতান রাজা ১৫৮, ২৪৮, ২৫৯
মীর কাসেম আলী ৩৫০
মুকুল সিনেমা হল ১০, ১৩, ১৭, ৩৯১
'মুজিবনগর সরকার' নামে প্রথম বাংলাদেশ সরকার ১৪০, ১৫৭, ৩৩৫
মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ২৭৬, ৩১৬, ৩৫৮
মুজিবুর রহমান (রাজশাহী) ১৬, ৯৬, ১০৪, ১১৬
মুস্তাফা সারওয়ার ৮, ১৩১, ১৫২, ১৫৫, ১৬৭
মূলনীতি কমিটি (বিপিসি) ১০, ১১, ১৩, ২২
মেজবাহ উদ্দিন সিরাজ ২৯৮, ৩৭১
মেজর এম এ জলিল ১৭০, ১৭৫, ১৭৮, ২২০
মেজর বজলুল হুদা ২৪৪, ২৬১, ৩৩৩, ৩৬২
মেজর ডালিম ১৭৭, ৩৪৬
মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা ২৯, ৩০, ৩২, ৫১, ৫২, ৬৫, ৭০, ৭১, ৭২
মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ (অব.) ৩২৫, ৩৪৬
মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান ১৯১, ১৯৯
মো. রশিদুল আলম ৩৭২, ৩৭৩
মো. শামসুল হক ৫৪, ৬৪, ৯৬, ১৩১
মোজাফফর হোসেন পল্টু ১৭৯, ১৮০, ১৯৮, ২০০, ২০৪, ২১৫, ২১৬, ২২৬, ২৪১, ২৫৮
মোজাফফর আহমদ এমপিএ ৫২, ৬২
মোতাহার হোসেন তালুকদার ২৫৩
মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এমপি ২৮০, ৩০২, ৩২৫, ৩৪৫, ৩৭২
মোনায়েম সরকার ২৫৯, ২৮৩, ২৮৪
মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ ৫, ৮, ৭৪, ৯৬, ১৭৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮২-১৮৫, ১৯১, ১৯৭-২০০, ২০৭
মোস্তফা ফারুখ মোহাম্মদ ৩২৫, ৩৪৫
মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার এমপি ৩০২
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১০, ১২, ১৮, ১৯, ৩৬, ৮৮, ১০১, ২৫৩
মোহম্মদ আলী বগুড়া ১২, ২৮, ৩০-৩৪
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ১৬৮
মোহাম্মদ তোয়াহা ১৫৭
মোহাম্মদ নাসিম ২১৩, ২৩৫, ২৩৬, ২৪৮, ২৫৮, ২৮২, ২৮৩, ৩০২, ৩২৫, ৩৪৪, ৩৫৭, ৩৭০, ৩৭২
মোহাম্মদ ফরহাদ ২২৭, ২৪৯
মোহাম্মদ মহসীন ১৩০, ১৯৭, ২০০, ২১৬
মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন ১৭৯, ১৮৫, ১৯৭, ২০০, ২১৫, ২১৬, ২২২, ২২৭
মোহাম্মদ শাজাহান ১৫৮
মোহাম্মদ হানিফ ১৮৫, ২০০, ২০৬, ২৩৬, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৮৩, ২৯৮, ৩০২
মোহাম্মদউল্লাহ ১৬, ৪৫, ৬৪, ৯৬, ১১৪, ১৩০
মৌলভী তমিজ উদ্দীন খান ১১
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ১৫০, ৩২১, ৩২৮, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৬, ৩৪৮ (নোট ২২), ৩৫১, ৩৫৪, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৮৩, ৩৮৫
যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা ১৪, ২৮, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪৬, ৪৯, ৯৪, ১৩৩
রওশন আলী ৫৪, ৬৪, ৮১, ৯৫, ৯৭, ১১৬, ১৫২, ১৬৩, ১৬৭, ১৯০, ১৯৯, ২৩৬, ২৫৯
রফিক উদ্দিন ভূইয়া ১১৪, ১৬৭, ১৭৯, ১৯৬, ২০৩
রমেশ চন্দ্র সেন ৩৭০, ৩৭৭
রহিমুদ্দিন আহমেদ ১৬, ১৭, ৪৫, ৪৬, ৯৭, ১১৬
রক্ষী বাহিনী ১৫৯
রাজাকার দালালদের বিচার ১৫০
রাজাকার, আলবদর, আলশামস ১৫০, ২৫৩, ২৯১
রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু এমপি ২৩৬, ২৫৯, ২৮৩, ৩০২, ৩২৪, ৩৭৩

www.pathagar.com

রাজিব গান্ধী ২৪৯
রাফিয়া আখতার ডলি ১৫২
রাশেদ খান মেনন এমপি ২৭৬, ২৯৫, ৩১৬, ৩৩৮, ৩৫৭, ৩৫৮
রাশেদ মোশাররফ ২০০, ২২৬
রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জমির ৩৪৫, ৩৭৩
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
জিয়া বনাম ওসমানী ২০১, ২০২
বিচারপতি সাত্তার বনাম ড. কামাল হোসেন ২১৯
রুহুল আমিন ভূঁইয়া ১৫২, ১৫৮, ২৮৯
রূপমহল সিনেমা হল ২৮, ৬৩, ৪০০
লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) ৩৬, ৯১
লিয়াকত আলী খান ১০
লুৎফর রহমান ৮১, ১৫২, ১৬৮, ১৮৫, ১৯৭, ১৯৮, ২০০
লুৎফুজ্জামান বাবর ৩৩৬
লে. কর্নেল এ কে এম মহিউদ্দিন ৩৩৩
লে. কর্নেল শাহরিয়ার রশীদ ৩৩৩
শওকত আলী ওরফে শওকত মিয়া ৫, ৮
মুগলটুলী পার্টি হাউজ ১, ৫
আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় অবদান ৫, ৮ (নোট ১২)
শওকত হোসেন হিরণ ৩৪২
শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু ৩০২
শফিকুল আজিজ মুকুল ২১৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৪০
শরীফ নূরুল আম্বিয়া ১৫৮
শরীফ শিক্ষা কমিশন ৭০
শহীদউদ্দিন এস্কান্দার ২০৭
শাইখুল হাদিস আজিজুল হক ২৯০
শাজাহান সিরাজ ১৫৮, ১৭০, ২২২
শামসুর রহমান খান শাহজাহান ২৩৫, ২৫৮, ২৮৩
শামসুর রহমান শরীফ ডিলু ৩৪২
শামসুল হক ৮৪
মুগলটুলী ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের প্রধান সংগঠক ২
টাঙ্গাইলে উপ-নির্বাচনে এমএলএ নির্বাচিত ৮ (নোট ৭)
নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচনের ফল বাতিল ৮ (নোট ৭)
আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ৩, ৪, ৯৭
'মূলদাবী' নামে খসড়া ম্যানিফেস্টো ৫-৬, ৪৩, ৯৮
গ্রেপ্তার ১১-১২
শামসুদ্দীন মোল্লা ১৫২, ১৬৭
শাহ আজিজুর রহমান ৭৬, ৯৭, ১১৬ (নোট ১৪), ২০৩
আওয়ামী লীগে যোগদান ৭৭
মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন ৭৭
প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়া ২০১
শাহ আহমদ শফী ৩৫১
শাহ এ এম এস কিবরিয়া ২৫৯, ৩০৮, ৩১৭
শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ১৫১-১৫২
শাহজাদা আবদুল মালেক খান ১৭৯
শাহরিয়ার কবির ২৬২, ২৯২, ৩০৪
শাহেদ আলী ৭১, ৭৮
শি জিন পিং ৩৫০
শিরিল শিকদার ৩৪৬
শিরীন আক্তার এমপি ৩৫৮
শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের প্রতীকী বিচার ৩৩৪
শেখ আব্দুল আজিজ ১৩, ১৫, ১৭, ৪৫, ৬৪, ৭৫, ৮১, ৯৫, ১১২, ১৯০, ১৯৯, ২০০, ২৩৬, ২৫৯
শেখ কামাল ৩৫৬
শেখ জামাল ৩৫৬
শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি ২১৩, ২৮৩, ২৯২, ৩০০-৩০২, ৩২৩, ৩২৪, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৬৭, ৩৭০, ৩৭২
শেখ ফজলুল হক মনি ১৭২, ১৯২, ২২৫, ২৭৬, ২৭৭
শেখ রাসেল ৩৫৬
শেখ রেহানা ২১১, ২২০, ২৬১, ৪৬১, ৪৬২
শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ২৮০, ৩০১, ৩০৬, ৩২৫, ৩৪৫, ৩৭১
শেখ মো. হারুনুর রশিদ ২৮০, ৩২৫
শেখ শহীদুল ইসলাম ১৬৭, ২৯৫, ২৯৬, ৩৫৮
শেখ হাসিনা
দলের সভানেত্রী নির্বাচিত ২১২-২১৩
সভাপতি হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া ২১৪-২১৫, ৪৬২-৪৬৩
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ২১৯

www.pathagar.com

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দীর্ঘ সংগ্রাম ২১৯-২২৪
কাউন্সিলে প্রথম (১৯৮৭) উদ্বোধনী ভাষণ ২২৮-২৩২
কাউন্সিলে ভাষণ ২২৮-২৩২, ২৪৯-২৫১, ২৬৮-২৭০, ২৭৭-২৭৯, ২৯৬-২৯৮, ৩১৭-৩২০, ৩৩৯-৩৪১, ৩৬০-৩৬৬,
গ্রেপ্তার ৩৯৬ (নোট ১১)
তিনজোটের অভিন্ন রূপরেখা ২৪২, ২৪৫, ২৬১, (নোট ৭),
ভারতের সাথে সরকারের ত্রিশ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর ২৭২, ২৭৫
পার্বত্য শান্তি চুক্তি ২৮৭-২৮৮
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের উদ্যোগ ২৮৭, ৩০৪ (নোট ৯)
একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি ২৮৭
ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল ২৭২, ৩৩৩
হত্যার উদ্দেশ্যে সমাবেশে (২০০৪) গ্রেনেড হামলা ৩০৭-৩০৮
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে অঙ্গীকার ৩৪৮ (নোট ২২)
১/১১-এর সময় সাব-জেলে বন্দি ৩৬৩
বিশেষ আদালতে বিচারের সম্মুখীন ৩৬৩
'ভিশন-২০২১' ৩১৮, ৩২৬
সরকারের সাফল্য ৩৩২-৩৩৭
শোলাকিয়ায় সন্ত্রাসী হামলা ৩৫৪
শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৪০, ১৪৩, ১৫৯, ২০৭, ৩৬১
সজীব ওয়াজেদ জয় ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭৪
সঞ্জয় গান্ধী ২০৭
সতীশ চন্দ্র রায় ৩২৪, ৩৪৪, ৩৭৩
সত্যেন সেন ২০৭
সরদার আমজাদ হোসেন ১৫১, ১৬৭, ১৯০, ১৯৬, ২০৭, ২১৩, ২৩৯, ২৪০
সত্যজিৎ রায় ২৪৯
সম্মিলিত বিরোধী দল বা কপ ৮৭, ৮৮
সংখ্যাসাম্য নীতি ২৮, ৩১, ৩৪, ৪৮, ৯৪
সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক ২৯৫
সাইমন ড্রিংক ২৯২
সাখাওয়াত হোসেন ৪, ৫
সাদ আহমদ ৪৫, ৬৪
সাবিস্তান সিনেমা হল/নিউ পিকচার হাউস ৫১, ৪১৯
সাবের হোসেন চৌধুরী ২৯২, ৩০১, ৩০৬, ৩৩১, ৩৭৫
সার্জেন্ট জহুরুল হক ১২৩
সামসুদ্দোহা খান মজলিশ ২৫৫, ২৮০
সালমান এফ রহমান ৩৭২, ৩৭৩
সালাউদ্দিন ইউসুফ ১৫২, ১৭৯, ১৮০, ২৫৯
সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ৩৩৪
সালিম সামাদ ২৯২
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ১৪৩
সিরাজুল আলম খান ১২৩, ১৫৮, ১৭০, ১৭৮
সিমিন হোসেন রিমি ৩৪৫, ৩৭২
সুখেন্দু দস্তিদার ১৯৭
সুধাংশু শেখর হালদার এমপি ২১২, ২৫৯, ২৮৩, ৩০০, ৩০২
সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি ২৮৩, ৩০০, ৩২৫, ৩২৬, ৩৪৬, ৩৭২, ৩৭৩
সুলতান মো. মনসুর আহমেদ ২৮৩, ৩০১, ৩৩১
সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৭-২০০৮) ৩০৭, ৩১০, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৭, ৩২০, ৩২৮ (নোট ১৩), ৩৩৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের ঘটনা ৩১০, ৩২৮ (নোট ১৩)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলন ৩১০-৩১১, ৩২৮ (নোট ১৩)
মাইনাস টু থিওরি ৩০৬, ৩১০-৩১৩, ৩১৭-৩১৮
সের্গেই ঝেলঝিনিয়াক ৩৫৭
সেলিম ২২২, ২২৭, ২৩৮
সৈয়দ আবু নসর এডভোকেট ২৬৮, ৩৪৬, ৩৭৩
সৈয়দ আবদুস সুলতান ১২৩, ২১৬
সৈয়দ আবুল হোসেন ৩০১, ৩০৬, ৩২৪
সৈয়দ আলতাফ হোসেন ২০৬
সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ২২৭, ৩০১, ৩০২, ৩০৬, ৩০৭, ৩১৩-৩১৬, ৩২০, ৩২৩-৩২৫, ৩৩২, ৩৩৮, ৩৪১-৩৪৪, ৩৪৬, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৭০-৩৭২, ৩৭৭
সৈয়দ আহমদ ১৯৬, ২১৩, ২২৫, ২৩৬, ২৩৯, ২৪০

www.pathagar.com

সৈয়দ কামাল বখত ১৮৫, ২০০
সৈয়দ খলিল আহমদ তিরমিজী ১২৩, ১৩১
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৭৪, ৮১, ৯৫-৯৭, ১১৩, ১৩০, ১৫২, ১৬৭
ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ৮০
আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে (১৯৬৬) সভাপতিত্ব ৮৭, ১০৯
আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে সভাপতির ভাষণ ১০৯-১১১
আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ১০৩, ১০৮, ১১৪
মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৪০
শিল্পমন্ত্রী ১৬৪
সৈয়দ মঞ্জুরুল হক ৮১
সৈয়দ হায়দার আলী ১৯৮, ২০০, ২১৫
সৈয়দ শামসুল হক ২৬২
সৈয়দা জেবুন্নেছা হক ৩২৫
সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন ১৭৪, ১৮০, ১৮১, ১৮৫, ১৯১, ১৯৪, ১৯৭-১৯৯, ২১২, ৩১৪
আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে (১৯৭৭) উদ্বোধনী ভাষণ ১৮১
আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ১৮৪, ১৮৮, ১৯৫
আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে ভাষণ ও রিপোর্ট পেশ ১৯২, ১৯৩
আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ১৯৫
আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ২১৩, ২৩৫, ২৫৮, ২৮২, ৩০০, ৩২৪, ৩৪৪
স্থপতি মাযহারুল ইসলাম ২২৫, ২৫৯, ২৬২
সোহরাব হোসেন ১৭৯, ১৮৫, ১৯১, ১৯৭, ১৯৯, ২০০, ২১৫, ২১৬
সোয়াত জাহাজ ১৪২
হক কথা ১৫৯
হরনাথ বাইন ১৯৮, ২০০, ২৩৬
হাফেজ হাবিবুর রহমান ৬৪, ৭৫, ৯০, ৯৬, ১০০
হাতেম আলী খান ৪৫, ৫৩
হাতেম আলী তালুকদার ১৩, ২১৬
হাসানুল হক ইনু ২৯৫, ৩১৬, ৩৩৮, ৩৫৮
হাজী মোহাম্মদ দানেশ ২৭, ৫২, ৬৮
হাজী আবদুস সামাদ ৩১৬
হাবিবুর রহমান চৌধুরী ওরফে ধনু মিয়া ৩
হাবিবুর রহমান সিরাজ ৩০৬, ৩২৫, ৩৪৫, ৩৭১
হামিদুর রহমান ১৩১, ১৬৭, ২১৬
হামিদুল হক চৌধুরী ২১, ১০৫
হাশিমউদ্দিন আহমদ ১৩, ২৬
হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ২৪৯
হুইপ মোস্তফা রশিদী সুজা ২৫৫, ২৯২, ৩০২, ৩০৬
হুসেন আলী ২০৭
হুয়েরী বৃমেদীন ২০৭
হ্যারাল্ড উইলসন ২৬৭
হেফাজতে ইসলাম
মতিঝিল শাপলা চত্বরে অবস্থান গ্রহণ ও তাণ্ডবলীলা ৩৫০
১৩-দফা দাবি ৩৫১, ৩৭৬ (নোট ৭)
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১, ২, ৭, ১২
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সরকারি জুলুম ২, ৩০,
গণপরিষদ সদস্যপদ বাতিল ২
আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে (১৯৫৫) উদ্বোধনী ভাষণ ৩২
পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী ২৮, ৩০, ৩৩
মন্ত্রিত্বের অবসান ৩১
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ৫২
আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িকীকরণ ও যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান ৩২, ৩৬
কাউন্সিলে পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা ও ভোটের ফল ৩৮
'জিরো তত্ত্ব' ৬৬
গ্রেপ্তার ৭২
কারামুক্তি ৭৩
এনডিএফ ৭৩-৭৪
মৃত্যু ৭৪
ক্ষিতীশ চন্দ্র মণ্ডল ১৫২, ১৮৫

www.pathagar.com

"আমি যখন কারাগারে, সেই সুযোগে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান যুক্তফ্রন্ট [পিডিএম] গঠনের নামে আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি এবং আমাকে ডিসমিস করিয়া নতুন পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন করেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না, নেতা নেওয়া যায়, কর্মী নেওয়া যায় না, তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রক্তের।"

[আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু বন্দি থাকাকালে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান (পশ্চিম পাকিস্তান) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কতিপয় সিনিয়র নেতাকে সঙ্গে নিয়ে ৬-দফাপন্থিদের বিপরীতে 'ঐক্যের নামে' পিডিএমপন্থি পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠনের চেষ্টা করেন। মুক্তি লাভের পর আওয়ামী কাউন্সিলে (১৯৭০) প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ।]

প্রাসাদের অভ্যন্তরে বা সেনা ছাউনিতে এই দলের জন্ম হয়নি। কোনো সামরিক শাসকের পকেট থেকেও বের হয়ে আসেনি। বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘ তিন যুগ ধরে। কোনো ষড়যন্ত্র আমাকে ক্ষমতায় বসিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন দলে পরিণত করবে আমরা তা বিশ্বাস করি না। একমাত্র ব্যালট ও জনগণের ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কিছুই ক্ষমতা দখলের উপায় হিসাবে আমরা বিবেচনা করি না।

[১৯৮৭ সালে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ হাসিনা]

বিভিন্ন সময়ে অনেকে দল ছেড়েছেন কিন্তু আওয়ামী লীগ কখনও ভাঙেনি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, দলত্যাগে দুর্বল না হয়ে বরং তাতে দল আরও শক্তিশালী হয়েছে।

লেখক